সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

সপ্তম খণ্ড]   ১৩১৩ সাল, আষাঢ়।   [৩য় সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,

এফ, আর, জি, এস্।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

কলিকাতা

১০৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'সাহিত্য-সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

সাহিত্য-সভা।

PATRON :

SIR ANDREW FRASER, K.C.S.I.—*Lieutenant-Governor, Bengal.*

VICE-PATRONS :

THE HON'BLE MR. H. H. RISELEY, C.I.E.—*Secy. Government of India.*

THE HON'BLE MR. A. EARLE, I. C. S.—*Director of Public Instruction, Bengal.*

Sir A. PEDLER, ESQ., F.R.S., C.I.E.

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে, সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র
সহযোগী সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্ক- মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্র- বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা- সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচ

৩। ইতিহাস, ভূগোল...

সাহিত্য-সংহিতা।

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা

কলিকাতার ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায়।

ইংরেজ-শাসনাধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারবিতরণের ইতিবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

আমরা এক্ষণে জন্ জেফানিয়া হলওয়েল নামক বিখ্যাত জমিদারের বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি জাতিতে আইরিশ ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব-ভারতগামী একখানি জাহাজের সার্জেন্টের মেট (সহকারী) হইয়া ১৭৩২ অব্দে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৩৬ অব্দে তিনি মেয়র্স কোর্টের অন্যতম এল্ডার্ম্ম্যান্ নিযুক্ত হন এবং ১৭৮৮ অব্দে ইউরোপে প্রতিগমন করেন। তিনি জমিদারের গচ্ছারী সংক্রান্ত কুপ্রথাসমূহ ও দোষাবলীর [illegible]রসাধনার্থ একটী মন্তব্য লিপিবদ্ধ [illegible]য়া ডিরেক্টর-সভার বিচারার্থ অর্পণ [illegible]রেন, এবং ডিরেক্টরেরা তজ্জন্য তাঁহার [illegible]তি এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহারা তাহাকে [illegible]লকাতার স্থায়ী জমিদার ও কাউন্সিলের [illegible]শ সদস্য নিযুক্ত করেন। ১৭৬০ অব্দে [illegible]ইভ্ স্বদেশে প্রতিগমন করিলে তিনি [illegible]য়ক মাস গভর্ণররূপে কার্য্য করেন। [illegible]নি এক সময়ে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম [illegible]নির্ম্মাণঘটিত একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা [illegible] করিতে উদ্যত হইলে কোন ব্যক্তি [illegible]কে ঐ কার্য্য হইতে বিরত [illegible]বার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা উৎকোচস্বরূপ প্রদান করেন। হলওয়েল সাহেব ঐ টাকা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া উহা কোম্পানিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি মূল্যবান পুস্তিকা প্রচার করেন। সেগুলি হলওয়েল ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট্স্ (Holwell India Tracts) নামে পরিচিত। তাহা হইতে কলিকাতাসংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় কথাই জানিতে পারা যায়। তিনি ১৭৬০ অব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত এবং ১৭৯৮ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৭২৬ অব্দে (পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন, ১৭২৪ অব্দে) কলিকাতায় "মেয়র্স্ কোর্ট" সংস্থাপন ব্যাপারের আলোচনায় অনেক প্রাচীন কথার স্মৃতিই জাগিয়া উঠে। ডিরেক্টর-সভার আদেশক্রমেই উহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। ডিরেক্টরগণ অপরাপর যুক্তি ব্যতীত এইরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করেন যে, "মাদ্রাজ, ফোর্ট উইলিয়াম্ ও বোম্বাই নগরে দেওয়ানী মোকদ্দমা-সমূহের অপেক্ষাকৃত সত্বর ও সুন্দর নিষ্পত্তির নিমিত্ত এবং প্রাণদণ্ডযোগ্য ও অন্যান্য প্রকার অপরাধ ও দুরাচরণের বিচার ও দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যথোচিত ও যথোপযুক্ত ক্ষমতার অভাব দৃষ্ট হয়।" একজন মেয়র

ও নয়জন এল্‌ডার্ম্যান্‌ লইয়া এই বিচারালয় গঠিত হয় এবং স্থির হয় যে ইঁহাদের মধ্যে সাতজন এল্‌ডার্ম্যান ও মেয়র প্রকৃত বৃটেন-জাত বৃটিশ-প্রজা হওয়া আবশ্যক। অবশিষ্ট দুইজন বৈদেশিক প্রোটেষ্টাণ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রেট বৃটেনের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ কোন রাজ্যের বা রাজার প্রজা হওয়া চাই। মেয়র ও এল্‌ডার্ম্যানদিগের নিয়োগ-ক্ষমতা গভর্ণর বা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পিত হয়। রেণি সাহেবের মতে, মেয়র প্রতিবৎসর এল্‌ডার্ম্যানগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। এল্‌ডার্ম্যানের পদ আজীবনকাল স্থায়ী হইত, কিন্তু গভর্ণর ও কাউন্সিল কোন যুক্তিসঙ্গত হেতুতে যে কোনও এল্‌ডার্ম্যান্‌কে পদচ্যুত করিতে পারিতেন। এই বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারক্ষমতা ছিল। তদ্ভিন্ন উইলের প্রোবেট বিচার এবং যাহারা উইল না করিয়া মরিত তাহাদের বিষয়সম্পত্তি পরিচালনের ক্ষমতা-পত্র অর্পণ করিবারও ইহার ক্ষমতা ছিল।

মেয়র ও এল্‌ডার্ম্যানগণের পারিশ্রমিক মাসিক ২০৷২২৲ টাকা ছিল। রেণি সাহেব বলেন, মেয়র ও এল্‌ডার্ম্যানগণ আফিসের নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। মেয়র একটি মখমলের গদির উপর উপবেশন করিতেন, এবং এল্‌ডার্ম্যানগণ গাউনের স্থলে লাল তাফতা ধারণ করিয়া উপস্থিত হইতেন। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমায় কেবলমাত্র ইউরোপীয়দিগের উপরই "মেয়র্স কোর্টের" অধিকার ছিল; পরন্তু পক্ষগণের সম্মতিক্রমে দেশীয়দিগের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী মোকদ্দমাও তথায় দায়ের হইতে পাইত। অবশেষে এইরূপ ঘোষিত হয় যে, দেশীয়দিগের মোকদ্দমাগুলি তাহাদের আপনাদের মধ্যেই নিষ্পত্তি হইবে, এবং তাহাদের উপর "মেয়র্স কোর্টের" কোনও ক্ষমতাই থাকিবে না। বুরুশিয়ার সাহেব কলিকাতায় "মেয়র্স কোর্ট" নির্ম্মাণ করেন। উহা তৎকালে "কোর্ট হাউস্‌" নামে পরিচিত এবং ওল্ড কোর্ট হাউস্‌ ষ্ট্রীট্‌ নামক রাস্তায় অবস্থিত ছিল। কোন কোন লেখক উহার কার্য্যবিবরণী প্রসঙ্গে উহার অদ্ভুত বিচারফল ও রায় প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে আমোদিত করিয়া থাকেন। জনৈক লেখক "কলিকাতা রিভিউ পত্রে" পশ্চাল্লিখিত আখ্যায়িকা প্রচার করিয়াছেন;—

কলিকাতা কাউন্সিলের জনৈক ইউরোপীয় সদস্য (যিনি তৎকালে "জমিদারও" ছিলেন) উইলিয়াম উইলসন্‌ নামক জনৈক পাইল-প্রস্তুতকারকের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ (মোট ৭৫৷৶৭ পাই) ঋণী ছিলেন, এই শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত সামান্য কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাইল-প্রস্তুতকারক উক্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনার প্রাপ্য টাকার বিল ও তৎসহ তাহার রসিদ প্রেরণ করি-লেন, কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহা অতি[illegible] জ্ঞান করিয়া টাকা দিলেন না, অধি[illegible] সেই বিল ও রসিদ নিজে রাখিয়া [illegible] পাইল-প্রস্তুতকারক এই ব্যাপার মে[illegible] কোর্টের গোচর করিলেন। তখন [illegible] ভদ্রলোক সাধারণের নিকট অপদস্থ হই[illegible] ভয়ে বিলের সমস্ত টাকা যায় মোকদ্দ[illegible] খরচা প্রদান করিয়া মোকদ্দমা আপে[illegible] মিটাইয়া ফেলিতে সম্মত হইলেন। বাদ[illegible] এটর্ণির একজন হিন্দু "কলিকাতার কৃষ্ণব বণিক্‌" বেনিয়ান্‌ (মুচ্ছুদ্দী) ছিল। [illegible] ব্যক্তি সমাজে সাতিশয় মান্যগণ্য ছিলেন বাদীর এটর্ণি আপনার এই বেনিয়ান্‌টি[illegible] উক্ত ভদ্রলোকের নিকট উক্ত টাকার তাগাদায় পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতে বাধ্য

হন। কিন্তু কোন বারেই কিছুমাত্র টাকা না পাইয়া সেই বেনিয়ান্ শেষবারে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে বলিলেন যে, যদি এই টাকা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অশুভফল উৎপন্ন হইতে পারে। এই কথা বলায় সেই "জমিদার" সাহেব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণকায় বণিক্‌কে ধরিয়া কাছারীতে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তথায় নীত হইলে, বিনা বিচারে তাঁহার হাত পা বাঁধা হইল ও তাঁহাকে কশাঘাত করা হইল এবং "জমিদার" সাহেব স্বীয় চর্ম্মপাদুকাদ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলেন।

গভর্ণর ভেরেলেষ্ট সাহেব আর একটী আখ্যায়িকা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন;—

১৭৬২ অব্দে জনৈক দেশীয় ব্যক্তি তাহার একটি পত্নীকে পরপুরুষাভিগমন কার্য্যে ধরিয়া ফেলে। প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন এবং প্রত্যেক স্বামী নিজ পত্নীকৃত অহিতাচরণের প্রতিশোধগ্রহণকর্ত্তা। সুতরাং ঐ ব্যক্তি পত্নীর অপরাধসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তাহার নাসিকাকর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার দণ্ডবিধান করে। পুরুষটি কলিকাতার সেশন (দায়রা) আদালতে অভিযুক্ত হইল। সে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করিল, কিন্তু আত্মপক্ষসমর্থনার্থ বলিল যে, আমি যেরূপ বিধিব্যবস্থা ও আচারব্যবহার সমূহের মধ্যে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধই করি নাই; স্ত্রীলোকটী আমার নিজসম্পত্তি এবং দেশীয় রীতি-অনুসারে তাহার দুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত তাহার দেহে কোনরূপ চিহ্ন করিয়া দিবার অধিকার আমার আছে; আপনারা যে সমস্ত আইন-অনুসারে আমার বিচার করিতেছেন, তাঁহাদের কথা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, কিন্তু আমি বিচারকগণকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে, যদি আমি জানিতাম যে, ইহার দণ্ড মৃত্যু, তাহা হইলে আপনারা যাহাকে এক্ষণে অপরাধ বলিতেছেন, আমি কখনও তাহা করিতাম কি? এইরূপ সুন্দর আত্মপক্ষ সমর্থন-সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি অপরাধী বিবেচিত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, কারণ যদি আদালতের বিচার-ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্য ইংরেজের আইন-অনুসারেই বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।"

রাধাচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তিও জাল করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলিকাতার অধিবাসীরা ১৭৬৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করায় ঐ দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া যায়। রাধাচরণ মিত্রের বৃত্তান্ত সাধারণের নিকট সুবিদিত আছে; সুতরাং এস্থলে তাহার সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ, "কলিকাতা রিভিউ পত্রে" জনৈক লেখক লিখিয়াছেন যে, "মেয়র্স কোর্ট" গভর্ণমেণ্টের অঙ্গুলি চালনার অধীন ছিল, 'এমন অনেক মোকদ্দমা ঘটিয়াছে যে, ঐ সকল স্থলে গভর্ণরের আদেশক্রমে বিচার ব্যর্থ বা রহিত হইয়া গিয়াছে, কারণ গভর্ণর স্বীয় প্রভাববলে কোর্টের সদস্যগণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতেন।' এইরূপে যদিও এমন অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, তদ্দ্বারা বিচারবিতরণ-কার্য্যে ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল বা অযোগ্যতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল বিচারালয়ের দ্বারা যে তৎকালে মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে মুহূর্ত্তমাত্রও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ঐগুলি

সমাজের উপরও অতি সুস্পষ্ট শুভফলসমূহ উৎপাদন করিয়াছিল।

কোর্ট অভ্ রিকোয়েষ্ট (Court of request) নামক বিচারালয় ১৭৫৩ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাতে ২৪ জন কমিশনার থাকিতেন এবং তাঁহারা সকলেই কলিকাতার অধিবাসিগণের মধ্য হইতে গভর্ণর ও কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। যে সকল স্থলে ঋণ, শুল্ক বা বিবাদীয় বিষয় প্যাগোডা বা ৪০ শিলিঙের অনধিক", কেবল সেই সকল মোকদ্দমারই তাঁহারা বিচার করিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে অভিযোগসমূহ শ্রুত হইত এবং ৩ জন সদস্য উপস্থিত হইলেই বিচারালয়ের অধিবেশন হইত। প্রথম প্রথম দেশীয় অধিবাসীরা কমিশনার নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু অবশেষে কেবল ইউরোপীয় বণিক্‌গণই সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন।

"কোর্ট অভ্ কোয়ার্টার সেশন্‌স্" নামক বিচারালয়ে কেবল নরহত্যা, রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি উৎকট অপরাধসমূহের বিচার হইত। ইহাও কথিত আছে যে, এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় মোগলদিগের ক্ষমতাধীনে আরও তিনটি বিচারালয় ছিল। কোম্পানির ভূমি ও কুঠির সীমার মধ্যে সুধারা ও শান্তি এবং সুশাসন পরীক্ষা করাই এই সকল বিচারালয়ের আদিম উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরেজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর বিচারালয়গুলির অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর নিয়মবহির্ভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। শাসন-তরণীর কর্ণ মুসলমান সুবাদারের হস্তেই ছিল। গুরুতর রাজনৈতিক হেতু বশতঃ তৎকালে শাসনরশ্মি মুসলমানদিগের হস্তে রাখাই অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। এইরূপে রাজক্ষমতা এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার তাঁহাদের হস্তেই থাকিয়া যায়। সুবার শাসন দুই অংশে বিভক্ত ছিল, যথা (১) দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ এবং দেওয়ানীবিচারের প্রধান প্রধান বিভাগের পরিচালন, এবং (২) নিজামৎ অর্থাৎ সামরিক বিভাগ এবং তৎসহ ফৌজদারী বিচারবিভাগের তত্ত্বাবধান। তৎকালে দেওয়ানী নিজামতের অধীন ছিল। ইহা যেন স্মরণ থাকে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট সভার শাসনাধীন ছিল। পার্লামেণ্ট সভা আবার ইংলণ্ডের জনসাধারণের অধীন। পলাসীর যুদ্ধের পর কোম্পানি এতদ্দেশে ভূম্যধিকার লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই দেখিলেন যে তাঁহারা মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। পার্লামেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কি পরিমাণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিধিসঙ্গতরূপে প্রদান করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সদস্যের পর সদস্য বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের সুশাসনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে এক একটি আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা কোম্পানির উপর রাজার ক্ষমতাপরিচালনের ও শাসনের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল। এদিকে ভারতবর্ষে দ্বিবিধ শাসনপ্রণালীর (অর্থাৎ ইংরেজী রীতি নীতিতে পরিচালিত এক প্রণালীর এবং প্রচলিত মুসলমান রীতি-অনুসারে পরিচালিত অপর প্রণালীর) ফল অতি সত্বর প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বাণিজ্য দ্বারা যে কোন প্রকারে অধিক লাভ করাই কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; আবার সুবাদারের অত্যাচার উৎপীড়নে ও শোণিত শোষণে জনসাধারণ একরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।

এতৎ সম্বন্ধে জেনারেল বর্গোয়েন্ সাহেবের উক্তির উল্লেখ করিলেই এস্থলে যথেষ্ট হইবে। পার্লামেণ্টের কমন্স্ সভা ১৭৭২ অব্দে ভারতের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে কমিটি নিযুক্ত করেন, এই মহাত্মা তাহার চেয়ারম্যান্ অর্থাৎ সভাপতি বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পাপাচার, অর্থশোষণ ও অবিচারের এরূপ দৃশ্য, এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরাচরণ, এবং নৈতিক সাধুতার প্রত্যেক নিয়মের, প্রত্যেক ধর্ম্মবন্ধনের ও শাসন-প্রণালীর প্রত্যেক নীতির এরূপ প্রকাশ্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই * * * এরূপ বহু অপরাধ সর্ব্বদা ঘটিত, যাহা মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, এবং এমন বহু কার্য্য ঘটিত, যাহা বিশ্বাসঘাতকতা ও নরহত্যা দ্বারা সংসাধন করা হইত।

১৭৬৫ অব্দ অতি গুরুতর পরিবর্ত্তনসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত বৎসর লর্ড ক্লাইভ শেষ বার বঙ্গদেশে আগমন করেন। হেষ্টিংস্ নামক স্থানের যুদ্ধের পর "উইলিয়াম দি কঙ্কারের" উপর যেরূপ অতি গুরুতর ও দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনের ভার পড়িয়াছিল, এবার লর্ড ক্লাইভ্ও তদ্রূপ গুরুতর ও দুঃসাধ্য কার্য্য সংসাধনের ভার প্রাপ্ত হন। ইণ্ডিয়া অফিসে ক্লাইবের শত্রুগণ প্রথমে যেভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের ভাব প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারা পরে আপনাদের উক্তির প্রত্যাহার করায় ক্লাইভ যে ভাবে উক্ত ভার গ্রহণ করেন, তদ্বাবতের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এস্থলে অনাবশ্যক। টরেন্স সাহেব স্বকীয় এম্পায়ার ইন্ এসিয়া (Empire in Asia) নামক গ্রন্থে সেই অবস্থার কথা অতি বিশদভাবে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"লোকের চক্ষু আর একবার ক্লাইভের উপর পতিত হইল। তিনি যে অবস্থা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার আরাম ও বিলাস উপভোগ করিতে কেবল আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। বার্কেলি স্কোয়ার-স্থিত তাঁহার ভবন, তাঁহার সাজসজ্জা, এমন কি তাঁহার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত তাঁহার দৈনিক বিভব ও উল্লাসের পরিচয় প্রদান করিত। পার্লামেণ্ট সভায় তাহার আয়ত্তাধীনে এক ডজন ভোট ছিল ; এজন্য প্রতিযোগী রাজনৈতিকগণ তাঁহার সঙ্গলাভের চেষ্টা করিত। জীবিত সেনানায়কদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই রীতিমত যুদ্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে জয়লাভ করিয়াছিলেন ; এজন্য তিনি হর্স্ গার্ড্স্ (Horse Guards) দলে পরম সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। ইংরেজদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত না করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন ; এজন্য রাজা তৃতীয় জর্জ্জ লেভিতে (দরবারে) তাঁহার সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। সেণ্ট জেম্স্ ষ্ট্রীটের খোষপোষাকী ফুলবাবুরা তাঁহাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিলেও এবং বিলাসিনী রমণীকুল তাঁহাকে অমার্জ্জিত বলিয়া হাস্যপরিহাস করিলেও জনসাধারণ তাঁহাকে বীর বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল এবং রাজনীতিবেত্তারা তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ইণ্ডিয়া ষ্টকের স্বত্বাধিকারিগণ ভাবিতে লাগিলেন, যদি ক্লাইভ্কে বুঝাইয়া সুঝাইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সমস্তই নিশ্চিত সুন্দররূপে চলিবে। চেয়ারম্যান্ সলিভ্যান্ সাহেব কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু ছিলেন, এবং তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট

নত হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনিই অতঃপর তাঁহাদের প্রভু হইয়া বসিবেন। কিন্তু এদিকে অবস্থা খারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া উঠিল এবং ত্রুটিসমূহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শতকরা ১০৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড (লাভ) কিরূপে দেওয়া হইবে, ইহাই ভাবনার বিষয় হইল। ইণ্ডিয়া হাউসে বিষম বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তাহাতে ক্লাইভ্ জেদ্ করিলেন যে, সালিভ্যান্‌কে পদচ্যুত করা হউক। অবশেষে তিনি কলিকাতার শাসন-বল্গা পুনর্গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং রাজা তাঁহার এইরূপ নামকরণ করিলেন,—এসিয়ার যাবতীয় ইংরেজ সৈন্যের জেনারেল-ইন্-চীফ্ অর্থাৎ প্রধান অধিনায়ক।"

ক্লাইভ্ প্রথমে অতি মহনীয় দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মচারিবর্গের সংস্কার-সাধনে ব্রতী হইলেন; এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে উত্তরকালে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি কোম্পানির অধিকারকে বিধিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাটের নিকট হইতে তিনি দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন; ইহাতে বঙ্গের শাসন-প্রণালী এক অভিনব ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। বঙ্গের আভ্যন্তরিক শাসনসংক্রান্ত এই সকল সুব্যবস্থা ব্যতিরিক্ত তিনি কতিপয় সন্ধিপত্রদ্বারা ভারতের অন্যান্য রাজশক্তির সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের শাসন-সংস্কার-সাধনে ও রাজনৈতিক কার্য্যের সম্পাদনে লর্ড ক্লাইভের পারসী ভাষার সেক্রেটারী ও দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার বিস্তর সাহায্য করেন। দেওয়ানী সনন্দে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ;—

"এই সুসময়ে আমাদের রাজকীয় সনন্দ (যাহা সকলকে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে) প্রচার করা হইল; যেহেতু উচ্চ ও প্রতাপান্বিত, উন্নত সম্ভ্রান্তগণের মধ্যে মহাসমুন্নত, প্রখ্যাত যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রধান আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য ও প্রকৃত শুভকাঙ্ক্ষী, এবং আমাদের রাজকীয় অনুগ্রহলাভের সুযোগ্য ইংরেজ কোম্পানির অনুরাগ ও উপকারের বিবেচনায় আমরা তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় ১১৭২ অব্দের ফসল রবির প্রারম্ভ হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানি এমনভাবে প্রদান করিলাম যে, ইহাতে অন্য কোনও ব্যক্তির সংস্রব থাকিবে না এবং আদালত দেওয়ানির নিমিত্ত যে শুল্ক প্রদান করিতেন, তাহাও তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না, অতএব ইহা আবশ্যক যে, উক্ত কোম্পানি রাজকীয় করস্বরূপ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিভূ হইতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন (এই টাকা নবাব নাজুম্-উদ্দৌলা বাহাদুরের সময় হইতে নিরূপিত হইয়াছে) এবং ঐ টাকা নিয়মিতরূপে রাজসরকারে প্রেরণ করেন, এবং এই স্থলে, যেহেতু উক্ত কোম্পানিকে বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশগুলির রক্ষার জন্য বহুসৈন্য পোষণ করিতে হইবে, অতএব রাজসরকারে উক্ত ২৬ লক্ষ টাকা প্রেরণের পর এবং নিজামতের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহের পর পূর্ব্বোক্ত প্রদেশগুলির রাজস্ব হইতে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা আমরা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলাম। ইহাও আবশ্যক যে, আমাদের রাজকীয় বংশধরগণ, উজিরগণ, মর্য্যাদা দাতৃগণ, উচ্চপদস্থ ওমরাহগণ ও কর্ম্মচারিগণ

দেওয়ানির মুৎসুদ্দিগণ, সুলতানের কার্য্যের ম্যানেজার (তত্ত্বাবধায়ক), জায়গীরদার ও ক্রোড়ীগণ, ইঁহারা ভাবিকালীনই হউন বা বর্ত্তমানকালীনই হউন যাঁহারা আমাদের রাজকীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই যেন উক্ত পদটি পূর্ব্বোক্ত কোম্পানির হস্তে পুরুষানুক্রমে চিরদিনের নিমিত্ত থাকিতে দেন। ইঁহারা কস্মিন্ কালেও পদচ্যুত হইবেন না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কোনও কারণেই ইঁহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন না এবং ইঁহারা যে দেওয়ানির সর্ব্বপ্রকার শুল্ক প্রদান ও রাজকীয় দাবী হইতে বিমুক্ত, ইহা তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞান করিবেন। আমাদের এতদ্বিষয়ক আদেশাবলী অতিশয় কঠোর ও সুনিশ্চিত বুঝিয়া তাঁহারা যেন তাহা হইতে বিচ্যুত না হন। ইতি তারিখ জালুসের ষষ্ঠ বর্ষের ২৪ শে সফর, ১২ই আগষ্ট ১৭৬৫।”

ক্লাইভ্ দেওয়ানি লাভ করিয়া যান বটে, কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংসই দেশের শাসনকার্য্যে [illegible]র পূর্ণ প্রয়োগ করেন। ক্লাইভ্ বিচারবিভাগের কার্য্য—দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বীয় নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত তত্ত্বাবধানের এক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; উহাই “ডবল গবর্ণমেণ্ট” অর্থাৎ দ্বিবিধ শাসনপ্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে তিনি যে সামান্য সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা কিছু দিনের জন্য একরূপ চলিয়াছিল। কিন্তু কুশাসন ও অত্যাচার উৎপীড়ন পুনরায় জাগিয়া উঠিল। অবশেষে ১৭৭১ অব্দে ডিরেক্টরেরা তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহারা স্বয়ং দেওয়ান হইবেন এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ দ্বারা স্বহস্তে রাজস্বের সমস্ত পরিচালন ও তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে ভূসম্পত্তি-সংক্রান্ত স্বত্বসমূহের সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের এবং বিচারবিতরণের কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। যে নীতি ইতঃপূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেই নীতি অর্থাৎ শাসনব্যাপার ইংরেজদিগের তত্ত্বাবধানাধীনে নবাবের কর্ম্মচারিবর্গের হস্তে পরিত্যাগ এবং রাজকার্য্যপরিচালনের প্রত্যক্ষ ভার কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের হস্তে অর্পণরূপ নীতি ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল। ইহার পরেই ওয়ারেন্ হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বঙ্গের গভর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ১৭৭২ অব্দের প্রথম ভাগে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসই শাসনকার্য্যের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে মহম্মদীয় আইন ও আফিসগুলি উঠাইয়া দিয়া তত্তৎ স্থলে কোম্পানির রেগুলেশন ও ভৃত্যবর্গকে সংস্থাপন করিলেন। অবশেষে তিনি রাজধানী ও তৎসহ প্রধান প্রধান বিচারালয়গুলি মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। পাদরি গ্লীগ্ সাহেব এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার ক্রিয়াকলাপের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;—

তিনি প্রদেশত্রয়ের কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন যে কোষাগার অর্থশূন্য ও গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রভাবশূন্য। কেহই বলিতে পারিত না, রাজস্ব কিরূপে সংগৃহীত হইত; তাহাও আবার বৎসর বৎসর উত্তরোত্তর অল্প লাভজনক হইতেছিল। এমন কোন বিচারালয় ছিল না যে, যেখানে লোকে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বা দুর্ব্বলের চাতুরি জালের বিরুদ্ধে

আবেদন করিতে পারে। পুলিশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল; তদ্রূপ পুলিশকে তৃণজ্ঞান করিয়া দস্যুগণ দলে দলে দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। তদুপরি এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বহু লোককে গ্রাস করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার ফলে বিষম দারিদ্র্য ও রোগ দেখা দিল;—দুর্ভিক্ষহতাবশিষ্ট লোকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। বাণিজ্যের অবস্থাও তদ্রূপ; দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রকার বাণিজ্যই অংশতঃ ব্যক্তিবিশেষের অসদাচরণবশতঃ ও অংশতঃ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষস্থানীয়গণের ঔদাসীন্য হেতু সম্পূর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সামান্য দুই বৎসর কালের মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব এই অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় করিয়া তুলিলেন। ডাকাইত, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লুণ্ঠনকারীদিগের অত্যাচার হইতে প্রদেশগুলিকে ক্রমশঃ উদ্ধার করা হইল। উহারা যেখানেই দেখা দিতে লাগিল, তিনি সেইখানেই উহাদিগকে ধরিয়া সাজা দিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে অবশেষে উহাদের উৎপাত নির্ম্মূল করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ের দারুণ বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তিনি পরীক্ষাস্থলে প্রথমে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির যে বন্দোবস্ত করিলেন, তৎকালের সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত সে সময়ে আর হইতে পারিত না। বিচারকার্য্যনির্ব্বাহার্থ তিনি জেলায় জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট্ কোর্ট স্থাপন করিলেন এবং সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ জেলায় জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট্ অফিসার নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে শাসনসংস্কারের বিলক্ষণ সৌকর্য্য সাধিত হইল। তিনি সুপ্রীম্ কাউন্সিলকে কতিপয় কমিটিতে বিভক্ত করিলেন, এবং যে সমস্ত তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড দ্বারা কোন কাজই হইত না, সেই সমস্ত বোর্ডের স্থলে এক এক বিভাগের উপরে এক এক জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিলেন,—ইহাতে কার্য্য-যন্ত্র সুন্দররূপে চলিতে লাগিল এবং তাহার বিভিন্ন চক্রসমূহ যথানিয়মে ও সুশৃঙ্খলে ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে যৎকালে হেষ্টিংস সাহেব ইণ্ডিয়া আফিসের সহকারিতায় ও সহযোগিতায় নানা বিভাগের সংস্কারসাধনের পন্থা আবিষ্কার করিতেছিলেন, ওদিকে তৎকালে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছিলেন; কারণ ঐ সকল কর্ম্মচারী কতিপয় বৎসর মাত্র এদেশে থাকিয়া অগাধ ধনসম্পত্তিসহ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন এবং প্রাচ্য রাজার হালে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ আকস্মিক ভাগ্যবিবর্ত্তনে অনেকেরই বিষম ঈর্ষার উদ্রেক হইত এবং তজ্জন্য তাহাদের নামে নানাপ্রকার দোষারূপ হইত। ক্রমে ভারত-প্রবাসী ইংরেজগণের নিন্দাবাদে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদের ভিত্তিসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহাদের অন্যায্য অর্থোপার্জ্জন অসম্ভবপর করিয়া তুলিবার নিমিত্ত ও ভারতরাজ্যের শাসনব্যাপার সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য বিবিধ বিধিব্যবস্থা ও আইনকানুন স্থিরীকৃত ও বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল।

১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি চরম বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম প্রথম প্রেসিডেণ্ট এবং কাউন্সিলের তিন জন বা তদধিক সংখ্যক সদস্য লইয়া এই কোর্টের অধিবেশন হইত। মফস্বল আদালতের যে যে স্থলে বিবাদের বিষয়ীভূত

সম্পত্তির মূল্য ৫০০০৲ টাকার অধিক হইত, সেই সেই স্থলেই ঐ সকল আদালতের উপর ইহার অধিকার ছিল।

পার্লামেণ্ট মহাসভা ভারতরাজ্যের শাসনসৌকর্য্যার্থ ১৭৭৩ অব্দে "রেগুলেটিং একট্" নামে যে একটি আইন জারি করেন, তাহার বিধানানুসারে কলিকাতায় সুপ্রিম-কোর্ট নামক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্ট-সভার সভ্যগণ দুই দলে বিভক্ত এবং দুই দলের মত পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই দুই দলের মধ্যে যখন যে দল প্রবল থাকেন, তখন সেই দলই ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিত্ব করেন। এই সময়ে যে দল মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই সবিশেষ যত্নচেষ্টায় উক্ত আইন বিধিবদ্ধ ও সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়, কারণ তাঁহাদের মনে এইরূপ একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ভারতস্থ ইংরেজগণ লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বিচার ও শাসনবিভাগের স্বতন্ত্রীকরণই এই বিচারালয় স্থাপনের মুখ্য ও ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই সুপ্রীম কোর্ট ইংল্যাণ্ড হইতে প্রাপ্ত সহায়তার বলে ক্রমশঃ নিম্ন আদালতগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ হইবে এবং সমস্ত বিচার বিভাগ শাসন-কর্ম্মচারীদিগের অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিবে। সুপ্রীম কোর্টে প্রথমতঃ একজন চীফ্ জষ্টিস্ (প্রধান বিচারপতি) এবং তিনজন পিউনি জজ অর্থাৎ অধস্তন বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁহারা গভর্ণর ও কাউন্সিলের অনধীন হইলেন, এবং তদ্ভিন্ন তাঁহাদের হস্তে বিস্তৃত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা অর্পিত হইল। এই সকল বিচারপতি এইরূপ সংস্কারবদ্ধ হইয়া বঙ্গে পদার্পণ করিলেন যে, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের অবিচারে ও অযথা উৎপীড়নে এতদ্দেশীয়-দিগের দুঃখের অবধি নাই। পশ্চাল্লিখিত আখ্যায়িকায় তাঁহাদের সেই পূর্ব্ববদ্ধ সংস্কারের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের লোকেরা উৎকট অত্যাচার উৎপীড়নে ক্লেশ ভোগ করিতেছে, এই-রূপ প্রবল ধারণা লইয়া সুপ্রীম কোর্টের নবনির্ব্বাচিত বিচারপতিগণ যখন চাঁদপাল ঘাটে অবতীর্ণ হইয়া এতদ্দেশীয়দিগকে নগ্নপদ দেখিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন অপর জনকে কহিলেন, "ঐ দেখ ভাই! এ দেশের লোক কি দারুণ উৎপীড়নই সহ্য করিতেছে! প্রয়োজনের পূর্ব্বে সুপ্রীম কোর্টের সৃষ্টি হয় নাই। আমি বোধ করি, আমাদের কোর্ট প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যেই এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তি জুতা ও মোজা পায়ে দিবার সংস্থান প্রাপ্ত হইবে।" সুতরাং এই সকল বিচার-পতি যে এ দেশে উপস্থিত হইয়া সেই দিনই শাসনকর্ম্মচারীদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাদের দমনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

এইরূপে সুপ্রীম কাউন্সিল (১৭৭৩ অব্দের যে রেগুলেটিং এক্টের বিধানানু-সারে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই বিধানানুসারে এই সুপ্রীম কাউ-ন্সিলও সৃষ্ট হয়) এবং সুপ্রীম কোর্ট্ প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাপূর্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং তাহার ফলে বিচার ও শাসনসংক্রান্ত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা বিবদমান প্রতিপক্ষরূপে পরস্পরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। চীফ্ জষ্টিস্ এবং তাঁহার সহযোগী বিচার-পতিগণ মনে করিতে লাগিলেন, কেবল কলিকাতার উপর কেন, কোম্পানির

অধিকারস্থ তাবৎ ভূভাগের উপরই তাঁহাদের একাধিপত্য আছে। এই সময়ে এরূপ কথা ও জনশ্রুতি রটিতে লাগিল যে, এই সকল বিচারপতি যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট সভা হইতে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন এবং যখন তাঁহারা কোন মতেই এ দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার অধীন নহেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে পারেন। মেকলে সাহেব স্বীয় স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় এই অবস্থার যে সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কিয়দংশে উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জন হইলেও তাহাতে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন ;—"এই ইংরেজ ব্যবহারাজীবগণের আগমনে দেশ মধ্যে যে বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, কোনও মার্হাট্টা আক্রমণেও তাহা হয় নাই। সুপ্রীম-কোর্টের সুবিচারের তুলনায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উৎপীড়কদিগের যাবতীয় অবিচারই পরম সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত।"

অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ যখন মফস্বলের প্রাদেশিক বিচারালয়গুলি বিধিসঙ্গতরূপে স্থাপিত কি না এই তর্ক উপস্থিত করিলেন, তখনই বুঝা গেল তাঁহাদের খেয়াল চরম সীমায় উঠিয়াছে। অতঃপর কাশী জোড়ার রাজার সুপ্রসিদ্ধ মোকদ্দমায় সুপ্রীম কাউন্সিল এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রকাশ্য সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল রাজাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যেন সুপ্রীম কোর্টের ডিক্রী প্রভৃতি আদেশ মান্য না করেন। সুপ্রীম কোর্টও গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেকের নামে ব্যক্তিগতভাবে শমন জারি করিলেন। অবশেষে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট সভায় আবেদন করা হইল, এবং ১৭৮১ অব্দে একটি সংশোধক আইন জারি হইল। তদ্দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইল, উহাকে সুপ্রিম কাউন্সিলের অধীন করা হইল এবং মফঃস্বলের বিচারালয়গুলি যে দেওয়ানীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও স্বীকৃত হইল। এইরূপে ক্ষমতা ও প্রভাব সঙ্কুচিত হওয়ায় সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা দেশের সবিশেষ হিত সাধিত হইতে লাগিল এবং উহা শীঘ্রই ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। এই গুরুতর সমস্যাকালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে ধীরতা ও তীক্ষ্ণ মেধার সহিত কার্য্য করেন তাহাতেই এই ঘোর সঙ্কট কাটিয়া যায়। অতঃপর তিনি সুবুদ্ধিসহকারে সার ইলাইজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করায় সমস্ত অপ্রীতিকর গণ্ডগোল চুকিয়া গেল। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া মেকলে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইম্পের চরিত্রের প্রতিও ঘৃণাসূচক শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু "বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল সৈনিক বলের সহায়তা গ্রহণ আর করিতে হইল না।" কেহ কেহ সুপ্রীম কোর্টকে কতকটা একাধারে মিলিত ইংল্যাণ্ডের কোর্ট অভ্ চ্যানসারি (Court of Chancery) ও কোর্ট অভ্ কিঙ্স্ বেঞ্চের (Court of King's Bench) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

১৮০১ অব্দে বা তৎসমকালে সুপ্রীম কোর্টের গঠনে আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত সাধিত হইল এবং চিহ্নিত সিভিল সার্ভি (Covenanted Civil Service) হইতে বাছিয়া আরও দুইজন পিউনি জজ নিযুক্ত করা হইল। ইহার কিছু কাল

স্থিরীকৃত হইল যে, সিভিলিয়ানেরাও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ পাইতে পারিবেন। এইরূপে উত্তরোত্তর উহার গঠনে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬২ অব্দে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত এই দুইটি বিচারালয় একত্র মিলিত করিয়া উহাদের স্থলে বর্ত্তমান কলিকাতা হাইকোর্টের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ এই হাইকোর্টের এলাকাধীন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, আদিম ও আপীল। ইহার আদিম বিভাগ কতকটা পূর্ব্বতন সুপ্রীম কোর্টের এবং আপীল বিভাগ সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিরূপ। ইহার আদিম বিভাগে কেবলমাত্র কলিকাতা সহরের দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার হইয়া থাকে। আপীল বিভাগে আদিম বিভাগের এবং মফঃস্বল আদালতের মোকদ্দমার আপীলের শুনানি ও বিচার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই বিভাগে ফৌজদারী মোকদ্দমার শাসন ও আপীলের বিচার এবং অন্যান্য কার্য্যও হইয়া থাকে। হাইকোর্টে আবার ইন্‌সল্‌ভেন্সি, এক্লিজিয়াষ্টিক প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ আছে, এবং তদ্ব্যতীত রেজিষ্ট্রার, রিসিভার প্রভৃতি কতিপয় আফিসও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্থলবিশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইয়া থাকে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগের ভার একটি জুডিসিয়াল কমিটির হস্তে ন্যস্ত। উক্ত কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট লর্ড চ্যান্সেলর এবং বিলাতের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আর কয়েক জন জজ লইয়া এই কমিটি গঠিত; তদ্ভিন্ন রাজা ইচ্ছা করিলে আরও দুইজন প্রিভিকাউন্সিলরকে কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন সদস্য উপস্থিত হইলেই আদালতের কার্য্য চলিতে পারে এবং অধিকাংশের মতানুসারে বিচারের জয় পরাজয় হয়। জুডিসিয়ল কমিটির এই কয়েকটী ক্ষমতা আছে, যথা— (১) ইচ্ছানুসারে সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া বা লইবার আদেশ করা, (২) পুনর্ব্বার শুনানির নিমিত্ত মোকদ্দমা অধস্তন বিচারালয়ে প্রেরণ করা, এবং (৩) এইরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর সময় আরও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা, পূর্ব্বে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এরূপ প্রমাণ গ্রাহ্য করা, পূর্ব্বে যাহা গ্রাহ্য করা হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা, এবং ইংল্যাণ্ডেশ্বরের অধিকারস্থ রাজ্যের যে কোনও বিচারালয়ে ইতর বিচারের আদেশ করা। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারের উপর আর আপীল চলে না। ১৭২৬ অব্দে যৎকালে মেয়র্স কোর্ট স্থাপিত হয়, তদবধি ভারতবর্ষের উপর প্রিভি কাউন্সিলের আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বতন কোর্ট অভ্‌ রিকোয়েষ্টস্‌ নামক বিচারালয়ের স্থলে ১৮৫০ অব্দে বা তৎসমকালে কলিকাতার "স্মল কজ কোর্ট" স্থাপিত হয়।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা ও উৎকোচগ্রহণাদি দোষের কথা সকলের মুখেই বিঘোষিত হইতে লাগিল। এবিষয়ের সংস্কার-সাধন-চেষ্টা প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি নগরগুলিতেই হয়। তদুদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে স্বতন্ত্র কয়েকজন পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় বেসরকারী জষ্টিস্‌ অভ্‌ দি পীস নিযুক্ত করা হইল। এই পরীক্ষায় উক্ত প্রকার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির যৌক্তিকতা সর্ব্বত্রই প্রতিপন্ন হইল। এদিকে জষ্টিস্‌ অভ্‌ দি পীসগণও অতি সন্তোষজনকরূপে আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পা-

দান করিতে লাগিলেন। কাউয়েল সাহেবের সেই 'লেকচার' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৬৬ অব্দের ৪ আইনের বিধানের মর্ম্ম এই যে, কলিকাতার পুলিশের সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার পুলিশ কমিশনার নামক একজন কর্ম্মচারীর হস্তে থাকিবে এবং তিনি লেপটেন্যান্ট গভর্ণর (ছোট লাট) কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন; তদ্ভিন্ন উক্ত কমিশনারের আদেশক্রমে তাঁহার কার্য্যসম্পাদন জন্য ছোট লাট বাহাদুর তদধীনে এক বা একাধিক ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কলিকাতা সহরে বিশেষ এক প্রকার পুলিস ফৌজ থাকিবে এবং তাহার লোক-সংখ্যা ছোট লাট ভারত গভর্ণেমেণ্টের অনুমোদনক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। কমিশনার এই সকল লোককে নিযুক্ত করিবেন। তিনি তাহাদের অর্থদণ্ড করিতে এবং উহাদিগকে পদচ্যুত করিতেও পারেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশেষ আবশ্যক স্থলে সাধারণ পুলিশের ক্ষমতাবিশিষ্ট স্পেশ্যাল কনেষ্টবলও নিযুক্ত করিতে পারেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে আর দুইটি বিচারালয় আছে। তথায় যাবতীয় মিউনিসিপাল ও পুলিস সংক্রান্ত এবং অন্যান্য প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে। বিচারকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে তিন জন ফৌজদারী ম্যাজিষ্ট্রেট তিনটী আদালতের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এবং তদ্ব্যতীত মিউনিসিপাল মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্ত আর একজন মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে। বোধ হয়, পূর্ব্বে যে জমিদারের কাছারী ছিল এবং কলিকাতার ইংরেজদিগের প্রথম উপনিবেশ-স্থাপনকালে জষ্টিস্ অভ্ অক দি পীসগণের যে কাছারী ছিল, ঐ দুইটি বিচারালয়ের স্থলে কলিকাতা পুলিস কোর্টের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় কলিকাতায় দুইটি জেল-খানাও ছিল। একটি ছিল লালবাজারে। তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "উহা বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর, কিন্তু উহাতে স্ত্রীলোকের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের অভাব আছে।" অপরটি ছিল বড়বাজারে। তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "একটা আবদ্ধ স্থান, তথায় অত্যন্ত রোগপীড়া হওয়ার সম্ভব।" বর্ত্তমান সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল নামক একটি কারাগার ময়দানের (গড়ের মাঠের) উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহাও উল্লিখিত আছে যে, শুক্রবার অপরাধীদিগকে বেত্রদণ্ড দিবার দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সেকালে ব্যবহারাজীবগণের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের প্রায়ই সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হইত। ১৭৭৪ অব্দে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ভারতীয় সেনা-দলের যাত্রাকালে গলিত মাংসভোজী বায়সদল যেরূপ তাহাদের অনুসরণ করে, তদ্রূপ যে সকল এটর্ণি শিকারের অন্বেষণে জজের অনুগমন করে, তাহারা দেশীয়দিগের মধ্যে মামলাপ্রিয়তার ভাব পরিপুষ্ট রাখিতে সাতিশয় কৃতকার্য্য হইয়া থাকে; তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ এই যে, শিশুরা যেরূপ নূতন খেলানা পাইলে অতিশয় আহ্লাদিত হয়, দেশীয়েরাও তদ্রূপ বিরক্তিজনক মামলা মকদ্দমাদ্বারা পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। আর এই যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ বেলিফের (পেয়াদার) দল, এই দুর্বৃত্ত দল ভারতে নূতন আবি-র্ভূত, ইহারা আইনের নির্য্যাতনে উৎপীড়িত হতভাগ্য শিকারের প্রতীক্ষায় সহরের

প্রত্যেক রাস্তাতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। যে ইংরেজী উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতার ভাব গোলামকে প্রভুর প্রতি অবমাননাসূচক ব্যবহার করিতে এবং তাহার সেই ঔদ্ধত্য জন্ম যথাযোগ্য দণ্ডিত হইলে তাহাকে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ড্যামেজের (ক্ষতিপূরণের) নালিশ উপস্থিত করিতে শিক্ষা দেয়, অধুনা অতি সামান্য ভৃত্যেরাও সেই উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে। যে সকল ভদ্রলোক আপনাদের গোলামের গায়ে হাত তুলিতে সাহসী হন, তাঁহাদের প্রতি এক্ষণে প্রতি দিনই যথেচ্ছ অর্থদণ্ডের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মাজিষ্ট্রেট্ মেছুনীর ঝগড়ার বিচার করেন এবং শিলিঙ্ ওয়ারেন্টের বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, এরূপ মাজিষ্ট্রেটের আফিস যেরূপ, আজিকালি বাঙ্গালার চীফ জষ্টিসের ভবনও সেইরূপ।

ওয়াল্টার হ্যামিল্টন স্বকীয় গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন, "সুপ্রীম কোর্টে সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন ব্যবহারাজীব স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ১৪ জন এটর্ণি এবং ৬ জন ব্যারিষ্টার। সে সময়ে ব্যবহারাজীবগণ অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এবং তাঁহারা দেশীয়দিগের মধ্যে মোকদ্দমা বাধাইয়া তাহাদের মামলাপ্রিয়তা বাড়াইয়া তুলিতেন।" আর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ব্যবহারাজীব-"গণ যে এক এক জন ধন-কুবের হইয়া এ দেশ হইতে প্রতিগমন করেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই! তাঁহাদের ফি অত্যন্ত অধিক! তুমি যদি কোন বিষয়ে একটিমাত্র কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তোমাকে একটি সোণার মোহর ঝাড়িতে হইবে, আর তিনি যদি তিন ছত্রের একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইলে অমনি ১৮৲ টাকা! পাছে তাঁহাদের হস্তে পড়িতে হয়, এই ভয়ে আমার থর থর কম্প উপস্থিত হয়; কারণ এত অধিক ব্যয়ভার বহন করার পর কত টাকাই বা উদ্ধার হইবে! সে যাহা হউক, এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আদালতের রেজেষ্টারিতে ১২ জন এটর্ণির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহাদিগকে তিন বৎসর মাত্র আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক (articled clerk) থাকিতে হয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এটর্ণি হইতে হইলে পাঁচ বৎসর কাল এরূপ ক্লার্ক থাকিতে হয়। উইল প্রস্তুত করিবার ফি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণানুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। সে ফির ন্যূন পরিমাণ পাঁচ মোহর, কিন্তু ঊর্দ্ধ পরিমাণের নির্দ্দেশ নাই, উহা যথেচ্ছ হইতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তি পত্রাদির কথা কি বলিব, তাহাতে লোককে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, আর আদালতের প্রসেস উভয় পক্ষকেই সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, তৎকালে এটর্ণির ক্লার্ক (উকিলের কেরাণী) হওয়া একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল; তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ছিল কতকগুলি ছাঁকা ছাঁকা বাঁধি বোল, আর যখন তিনি সেই সকল বোলের ব্যবহার করিতেন, তখন লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার সহিত উকিল ও প্লীডার নামক আর এক শ্রেণীর ব্যবহারাজীব আবির্ভূত হইয়াছেন। এটর্নিদিগের সহিত ইহাঁদের প্রভেদ এই যে, ইহাঁরা সকল আদালতেই মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিতে পারেন। কিন্তু এটর্ণিরা তাহা পারেন না। এই উকিল ও এটর্ণি সম্প্রদায় উত্তরোত্তর সাতিশয় প্রভাবসম্পন্ন এবং কলিকাতা সমাজে বিশেষ গণ্যমান্য

হইয়া উঠিতেছেন। এই ব্যবসায় বিলক্ষণ অর্থকর বলিয়া যুবকদিগের দৃষ্টি স্বতঃই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং একথা বলিলে বোধ করি কিছুই অত্যুক্তি হইবে না যে, দেশের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই এই ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথম অবস্থা হইতেই এই ব্যবসায়ে ব্যবহারাজীবগণ অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ রায়, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মোহিনী মোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই স্ব স্ব উত্তরাধিকারীদিগকে বহুমূল্য সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, প্রভূত অর্থাগমের এই অভিনব পথ এক-মাত্র ইংরেজের আবিষ্কৃত। আজিকালি উকিল মোক্তারের ছড়াছড়ি হওয়ায় এই ব্যবসা-য়ের আয় বহুজনের মধ্যে বিভক্ত ও বণ্টিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার মোট পরিমাণ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরো-ত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে, আর আইনের বিলম্বও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিচারকগণ এই নিয়ত বর্দ্ধমান কার্য্য শেষ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। উকিল ব্যতীত বহুসংখ্যক দেশীয় ও ইউ-রোপীয় ব্যারিষ্টার আছেন; তাঁহাদের আয়ের কথা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল লেখক পূর্ব্বতন ব্যবহারাজীবগণের আয় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রেতাত্মা যদি এক্ষণে এই দেশের অবস্থা দেখিতে আসেন, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে, বলিতে পারা যায় না। বিচার অধুনা সহজে বা সামান্য ব্যয়ে পাইবার উপায় নাই। মোকদ্দমায় কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত এক সময়ে একটি দেশীয় সংবাদপত্রে একটি বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মর্ম্ম এইরূপ ;—দুই ভ্রাতার পৈত্রিক একটী দুগ্ধবতী গাভী ছিল। গাভীটীর বিভাগ ও বণ্টন লইয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। চিত্রে এক ভাই গাভীর শৃঙ্খল ধরিয়া এবং অপর ভাই তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; সেই অবকাশে উকিল বাবু গাভীটী দোহন করিয়া দুগ্ধটুকু বাহির করিয়া লইতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিচারালয় ব্যতীত অন্যান্য যে সকল আফিস আদালত কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ সে সকলের কথা এস্থলে কিছুই বলিতে পারা গেল না। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী যে এত-দ্দেশীয়দিগের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও মনোভাবের সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ শাসনকার্য্যপরিচালনের পাশ্চাত্য প্রথাটী এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। প্রজাসাধারণের মস্তকে যে গুরুতর ব্যয়ভার পতিত হইয়াছে, তাহা বহন করা নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী হইতে যে সমস্ত উপকার ও সুবিধা লাভ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে। এই পরগাছা হইতে যে নানা কুফলও না ফলিতেছে, এরূপও নহে। এ কথা সত্য যে, আমাদের ইংরেজশাসনকর্ত্তৃগণ অতি উন্নত ও মার্জ্জিত ভাব এবং সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এদেশের শাসনসংস্কারে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। পরন্তু তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে যে উপকার লাভ হইয়াছে, তাহা অবিমিশ্র শুভজনক নহে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসিবর্গের বিদ্যাবুদ্ধিবিষয়ক নৈতিক ও সাংসারিক উন্নতি কল্পে যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, তাহার

তত্ত্ব আলোচনা করিলে, এই মতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। ইংরেজের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নপ্রণালী ক্রমোন্নতিশীল। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহপ্রশমনের পর যৎকালে ইংল্যাণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, তদবধি গভর্ণমেণ্টের বিধি-ব্যবস্থাসমূহ এক নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে ইংল্যাণ্ডেশ্বরের সাম্রাজ্যের একটি অংশ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইহার হিতাহিতও এক্ষণে ইংল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্টের সবিশেষ চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে।*

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত The Early History and growth of Calcutta নামক পুস্তকের অনুবাদ।

সাহিত্যের সমালোচনা উপক্রম ও উপসংহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

আর্য্যসাহিত্যে গ্রন্থসমালোচনার প্রথম নীতি এই যে, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রারম্ভ কিরূপ এবং সেই প্রারম্ভ হইতে ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের উপসংহারে উপনীত হওয়া গিয়াছে কি না। যদি এরূপ না ঘটিয়া থাকে, তবে গ্রন্থখানি সুপ্রণালী-সিদ্ধ হয় নাই। সমুদায় অংশকে সুপ্রণালী-ক্রমে এক সঙ্গে গাঁথার নামই গ্রন্থ। সেই অংশ বা অধ্যায়গুলি যদি বিভিন্নবিষয়ক হয়, তবে একত্র সংবদ্ধ হইয়া কোন বিশেষ ফলের সমুৎপাদন করিবে কিরূপে? কিন্তু অনেক গ্রন্থে তাহাও ঘটিয়া থাকে। অনেক ঔপন্যাসিক কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গল্পবিশেষের সূত্রপাত করা হইল বটে, কিন্তু সেই গল্পের প্রবর্দ্ধনে আর একটি স্বতন্ত্র গল্প সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। তজ্জন্য সেই দুই গল্পের সংমিশ্রণে বইখানি খুব মোটা হইল বটে, কিন্তু তাহাতে উভয় গল্পের স্বাতন্ত্র্যহেতু রসভঙ্গ হওয়াতে তেমন ফলোদয় হইল না। এরূপ স্থলে কোন্‌টি প্রকৃত উপক্রম, তাহা ঠিক্ করা দুষ্কর। কোন কোন বিলাতী ঔপন্যাসিক কাব্যের এই দোষ। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণে সেই বিলাতী ছাঁচে ঢালা ঔপন্যাসিক কাব্যের অনুকরণ হওয়াতে বাঙ্গালা-সাহিত্যে উক্ত দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। নিজে বঙ্কিমচন্দ্রও এ দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই দোষে তাঁহার 'চন্দ্রশেখর" এবং "দুর্গেশনন্দিনী" দুষ্ট। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী এবং দলনীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস দেখা যায়। এ কথা আমরা "কাব্য-সুন্দরী"তে প্রদর্শন করিয়াছি। তদ্রূপ "দুর্গেশনন্দিনী"র গল্প কতদূর অগ্রসর হইলে আয়েষার কথা উপস্থিত হইল। আয়েষা ও ওসমানের গল্পটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা; তাহা গ্রন্থের উপক্রম হইতে উঠে নাই। ঘটনাক্রমে উপনীত করিয়া তাহা গাথিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সেইরূপে সূত্রবদ্ধ হইয়া তাহা এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা কেবল যে একটি স্বতন্ত্র উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন নহে, প্রধান কথাও অপ্রধান হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহার" কাব্যও এই দোষে দূষিত।

"বৃত্রসংহারের" প্রধান বিষয় বৃত্রাসুর-বধ। কিন্তু তাহা কল্পনার দোষে অপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। এই কল্পনার বৈচিত্র্যসাধন জন্য

কবি শচীহরণের আখ্যায়িকা তন্মধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাই কাব্যের প্রথম ভাগ জুড়িয়া আছে। দ্বিতীয় ভাগেও কবি শচীকে বিড়াল-নাড়ানাড়ি করিয়াছেন। দানবপতি নিজ পত্নী ঐন্দ্রিলার সাধ ও আব্দার মিটাইতে বড়ই ব্যস্ত; এত ব্যস্ত যে, তাঁহার রাজদ্বারে যে সংগ্রাম ও ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত, তাহা যেন কিছুই নহে। ঐন্দ্রিলাও নির্ভাবনায় আপনার আব্দার ও আদর লইয়াই আছেন। সুতরাং কাব্য মধ্যে এই ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা ও শচী-ঘটিত আখ্যায়িকার যত রস সঞ্চারিত হইয়াছে। কবি একবার করিয়া এই উপকথা লেখেন, আর একবার করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করেন। সে যুদ্ধও কোন ঘটনা দ্বারা বিচিত্রিত হয় নাই। ঘটনার মধ্যে একবার ইন্দ্রের কৈলাসে গমন, দধীচি মুনির সহিত তাঁহার আশ্রমে সাক্ষাৎ এবং বজ্র প্রস্তুত করিবার উপলক্ষে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা দর্শন। সেই তিন উপলক্ষেই প্রধান কল্পনার রসভঙ্গ হইয়াছে। কি কৈলাস-দর্শন, কি মুনির আশ্রমদর্শন, উভয়েই শান্তিরসের আবির্ভাবে বীর রসের ভঙ্গ। এই সকল বর্ণনা এবং শচী-ঘটিত আখ্যায়িকা বর্ণনার গুণে বরং কাব্যখানি সুন্দর বর্ণনা-কাব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহতে প্রধান কল্পনার কোনরূপে প্রগাঢ়তা সাধন করিতে পারে নাই। সুতরাং তজ্জন্য কাব্যরস ঘনীভূত না হইয়া বরাবরই ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এক একবার দেবদানবের যুদ্ধ যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। কাব্য মধ্যে কোন রসেরই পরিপুষ্টি হয় নাই। বরং শচী-ঘটিত আখ্যায়িকাই পাঠকের মন কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করে। আর সেই বর্ণনা-গুলিই কাব্যের ফলস্বরূপ হৃদয়ে থাকিয়া যায়।

বিলাতী আদর্শের আর এক মহা দোষ এই যে, সেই ছাঁচের উপন্যাসিক কাব্যের উপক্রম যেমন তেমন হউক না কেন, তাহা পরিণামে হত্যাকাণ্ডে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। এই দোষে এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত হইয়াছে। হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত করিতে হইলে কল্পনাকে তদুপযোগিনী করিয়া সাজাইতে হয়। কল্পনাকে পাপের ঘোর রাগে এবং রিপুর ঘোর আবেগে ভয়ানক করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং সে কল্পনায় কেবল পাপের প্রাবল্যই প্রদর্শিত হইতে পারে। যদি কোনখানে কিছু পুণ্যের বা ধর্ম্মের আলোক থাকে, তাহা পাপের ঘোর ঘটায় ও কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এরূপ গ্রন্থ-পাঠের কুফল কিরূপ, তাহা আমরা "সাহিত্য-চিন্তায়" বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। এজন্য বাঙ্গালায় বিলাতী প্রেমঘটিত যত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ গুলিতেই দুইটি জিনিষ পরিদৃষ্ট হয়—একটি স্ত্রীপুরুষের কামজ প্রেম-জাত নেশা, অন্যটি খুন। নেশা নহিলে খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হইবে কেন? সুতরাং নেশায় যাহার উপক্রম, খুনে তাহার উপসংহার।

"সাহিত্য-চিন্তায়" আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, কামজ প্রেম হয় রূপজ, না হয় গুণজ। সে প্রেমের ক্ষেত্র বিলাতী সমাজ;—হিন্দু সমাজ নহে। হিন্দু পরিবার-ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের কামজ প্রেমের স্থান নাই। কারণ, হিন্দুর বিবাহ কামজ বিবাহ নহে। কামজ প্রেম বড়ই অস্থায়ী;—তাহা প্রেমই নহে। একমাত্র গান্ধর্ব্ববিবাহ কামজ; তাহা কেবল ক্ষত্রিয়রাজকুলেই প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সচরাচর ঘটিত না, কচিৎ কখন ঘটিত। সাধারণজনগণ মধ্যে তাহা প্রচলিত ছিল না। আসুর এবং

রাক্ষস বিবাহও তদ্রূপ। পৈশাচ বিবাহ ভদ্রসমাজের জন্য নহে। কিন্তু এ সকল বিবাহ যখন বঙ্গসমাজে প্রচলিত নাই, তখন তাহাদের কথা বঙ্গ-সাহিত্য-আলোচনায় আসিতে পারে না। বঙ্গদেশীয় সাধারণ জনগণ মধ্যে যে হিন্দু বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে কি রূপজ, কি গুণজ কোন প্রকার কামেরই সম্পর্ক নাই। যেহেতু হিন্দুসমাজে প্রেমের পর বিবাহ নহে, বিবাহের পর প্রেম। এজন্য কামজ প্রেমের অধিকার হিন্দু পরিবারক্ষেত্রের বাহিরে। তাই আমরা হিন্দু সমাজ মধ্যে যে কামজ প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা অধিকাংশ পাপ-পথে ও পাপাচারে। হিন্দুর পবিত্র পারিবারিক ক্ষেত্রে কামজ প্রেমের পরিচয় ও অবসর নিতান্ত বিরল। কখন ঘটনাক্রমে কোন বৈধ বৈবাহিক দাম্পত্য মিলন কামজ প্রেমজাত হয়। সেরূপ মিলন সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

হিন্দু সংসারে বিরল বটে, কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল নহে। এখনকার বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক কাব্য এই কামজ প্রেমের পাপচিত্রে প্লাবিত। এই কামজ প্রেম অনেক কাব্যেই রূপজ এবং চক্ষের নেশা। কচিৎ কোন কাব্যে তাহা গুণজ। শুধু যে রূপজ এমন নহে, সর্ব্বস্থানে না হউক অনেক স্থলেই আবার তাহা কোন হিন্দু বালবিধবার সৌন্দর্য্যজাত। সেই হতভাগিনীকে কুপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা। কারণ একজন বালবিধবাকে কুপথগামিনী করা যত সহজ, সধবাকে কুপথে আনা তত সহজ নহে। সেইজন্য বাঙ্গালা অনেক উপন্যাসেই দেখা যায়, কোন সুন্দরী বালবিধবাই শিকারস্থানীয় হইয়াছে। সেই শিকার জন্যই উপন্যাসের ঘটনাজালের বিস্তার। যেখানে সে পাপচেষ্টা সফল হয়, সেখানেও খুন, যেখানে না হয়, সেখানেও খুন। কারণ, খুন না আনিলে, উপন্যাসের উপসংহার হইবে কিরূপে? বিলাতী আদর্শের কৃপায় গ্রন্থোপসংহার করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। হয় বিষপান, না হয় ছুরিকাঘাত; হয় পিস্তল-ছোঁড়া, না হয় জলে ঝাঁপ দেওয়া; হয় আত্মহত্যা, না হয় অন্যবিধ খুনে প্রায়ই এরূপ পাপপূর্ণ কাব্য-নাটক পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ উপকরণের গুড়নপাড়নে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উপন্যাসই সংগঠিত হয়। যেমন রেণলডের একখানি উপন্যাস পড়িলে প্রায় তাঁহার সমুদায় উপন্যাস পড়া হয়, তেমনি আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক একখানি বিলাতী প্রেম-ঘটিত উপন্যাস পড়িলে, সেই শ্রেণীর অনেক উপন্যাস পড়া হয়। প্রভেদ কেবল, ঘটনা লইয়া। যে গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি যেমন তেজস্বিনী, তাহার ঘটনাযোজন তদ্রূপ হয়।

কিন্তু এরূপ পাপচিত্রময় কাব্য-নাটক-পাঠের ফল অত্যন্ত মন্দ। সর্ব্বদা পাপচিত্র দেখিলে কল্পনা দূষিত হয়, খুন দেখিলে খুনে আর অপ্রবৃত্তি থাকে না। এরূপ পাপচিত্রের সর্ব্বত্র প্রচারে আমাদের তরুণ-বয়স্ক তরলমতি পাঠক ও পাঠিকাগণের কল্পনা হইতে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং আত্মহত্যার পাতক অপনীত হইতেছে এবং তাহারা তদ্রূপ পাপপথে দিন দিন প্রলোভিত হইতেছে। এইরূপ পাপচিত্র উজ্জ্বলবর্ণে আঁকিয়া এক্ষণে আমরা দেখাইতেছি, বঙ্গ সমাজে বালবিধবাগণের সতীত্ব-রক্ষা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? হিন্দু সমাজে অবলাগণের জাতি-কুল-মান যেরূপ সুরক্ষিত হয়, বিলাতী সমাজে সেরূপ হয় না। এ কথা আমরা "সমাজতত্ত্বে" বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাই

হিন্দুসমাজে ভদ্রনারীগণের পদস্খলন অত্যন্ত বিরল; কচিৎ কখন দুই একটা ঘটিতে দেখা যায়। ঘটিলে লোকে তাহা চাপা দেয়, পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সমাজে বিরল বটে, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে বিরল নহে। অনেক কাব্য-নাটকেই তাই, যেন আমরা দেখাইতে চাই, আমাদের সমাজ সেইরূপ পাপাচারে পরিপূর্ণ। চাপা দেওয়া দূরে থাক্, কল্পনা করিয়া পাপ কথা প্রচার করি। সুতরাং সমাজে এরূপ কুদৃষ্টান্ত বিরল প্রচার হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার বহুল প্রচার হওয়াতে সেই কুদৃষ্টান্তের কুফল এক্ষণে সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব এরূপ কাব্যনাটক আমাদের সমাজে প্রকাশিত এবং প্রচলিত করা যে কত অনিষ্টের কারণ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাস এইরূপ কামজ প্রেমে আরব্ধ এবং খুনে ও আত্মহত্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাস-গুলির উপসংহার এরূপ বিষময় হইলে ত রক্ষা ছিল, অনেকের উপক্রম আরও ভয়ানক। "দুর্গেশনন্দিনী"র উপক্রম দেখ।

কবি দেখিয়াছেন, ইংরাজী সমাজে 'চর্চ্চেই' অনেক বিলাতী দাম্পত্য-প্রেমের সূত্রপাত হয়। 'চর্চ্চে' স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে বারংবার যাতায়াতে যুবক যুবতীগণের প্রথমে দেখাদেখি, হাসাহাসি, এবং নানা ভাবভঙ্গির আরম্ভ হইয়া চক্ষের নেশা জন্মায়। ক্রমে সেই নেশা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বঙ্কিমবাবু তাই দেখাদেখি, হিন্দুর দেবমন্দিরকে সেইরূপ 'চর্চ্চ' বানাইতে গেলেন, কিন্তু তিনি হয় ত তখন ভুলিয়া গিয়াছিলেন হিন্দুর দেবমন্দির 'বিলাতী চর্চ্চ' নহে। হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রত্যক্ষ দেবতা বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষ দেবতার সমক্ষে কেমন এক ধর্ম্মভয় উদয় হয়, যাহা শূন্য 'চর্চ্চে' হয় না। কোন হিন্দু এ পর্য্যন্ত দেবালয়ে আসিয়া কখন 'পীরিতি' করিতে সাহসী হয় নাই। প্রত্যক্ষ দেবতার সম্মুখে কাহারও সে ভাব মনে আসে না। সেখানে সবাই স্তব-স্তুতিতে ও ফুলবিল্বদলে পূজায় নিরত। হিন্দুর দেবমন্দির বড়ই ভক্তিপূর্ণ স্থান, বড়ই পবিত্র। সেখানে কি বালিকা, কি বৃদ্ধা; কি সধবা, কি বিধবা; সকলেই গললগ্নীকৃতবাসা ও কৃতাঞ্জলিবদ্ধা হইয়া একদৃষ্টে দেবতার কৃপালাভের জন্য একান্ত ভক্তিপূর্ণচিত্তে দেবারাধনায় প্রবৃত্ত। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি। সেরূপ পবিত্র স্থানের পবিত্রতা কলুষিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেবালয়ে শৈলেশ্বরের সাক্ষাতে সেই স্ত্রীজাতির একজনকে নহে, দুইজনকে পাপ প্রণয়ের সূত্রপাতে লিপ্ত করিয়াছেন। এরূপ কল্পনায় কি হিন্দু মাত্রেই শিহরিয়া উঠেন না? হিন্দুর দেব সাক্ষাতে পাপ প্রণয়! হিন্দুর পবিত্রতা ভঙ্গ করিতে হিন্দু অকুণ্ঠিত!!

এত তবু পদে আছে; "বিষবৃক্ষ" আরও ঘৃণিত চিত্র। বিষবৃক্ষের ঠিক উপক্রম নহে, উপক্রম হইতে গ্রন্থ কল্পনা একটু অগ্রসর হইয়াছে, তখন কেমন একটী পাপচিত্র আমাদের সমক্ষে উদিত হয়? কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের কৃপাপাত্রী হওয়াতে অগ্রে গৃহে আনীত হইল। এ চিত্র বড়ই সুন্দর! কিন্তু তার পর সেই শরণাগত বালবিধবার প্রতি নগেন্দ্র কিরূপ পাপ-ব্যবহার করিলেন! গ্রন্থের উপক্রম যত বিশুদ্ধ, সেই বিশুদ্ধতার উপর যেন ততই কলঙ্কপাত করিবার জন্য হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরের পবিত্রতা বিনষ্ট করা হইয়াছে। শরণাগত বালবিধবা যখন নগেন্দ্রের অন্তঃপুরের পবিত্র ক্ষেত্রমধ্যে আনীতা হইলেন, তখন আমরা জ্ঞান করিয়াছিলাম, তিনি নগেন্দ্রের প্রতিপাল্য কন্যা-স্থানীয়া

হইবেন! কিন্তু কুন্দনন্দিনীর ভাগ্যে অন্যরূপ ঘটিয়া উঠিল। কুন্দ নগেন্দ্রের রূপজ প্রেমের পাত্রী হইয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রের গৃহপুর সেই পাপকলঙ্কিত কামজ প্রেমের লীলাভূমি হইল। ভগিনী কমলমণি কুন্দনন্দিনীর সজ্মটিকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কুলটা পাপানুরাগে একদা জলে ডুবিতে গিয়াছিল। সেই বিষ্ঠা চাপা দিবার জন্য নগেন্দ্র বিধবাবিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে কেবল ছলনামাত্র। পবিত্র পরিবার-মণ্ডলে সেই পাপপ্রেমের অভিনয় চলিতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর অসহ্য হইয়া উঠিল। গৃহলক্ষ্মী সেই লক্ষ্মীছাড়া কীর্ত্তন দেখিয়া রাগে ও ঘৃণায় বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবমন্দিরের পবিত্রতায় কলঙ্কপাত করিয়াও যেন কবি সন্তুষ্ট হন নাই। তাই তিনি লক্ষ্মীর আবাস-স্থানীয় হিন্দুর অন্তঃপুরের পবিত্রতা-বিনাশ-চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিলেন। হিন্দুর অন্তঃপুরও দেবমন্দিরপ্রতিম এবং ততোধিক পবিত্র। তথায় গৃহবিগ্রহ পূজিত হন, গৃহলক্ষ্মী বাস করেন; ভাই ভগিনী ও গুরুজনেরা থাকেন। হিন্দু, তাঁহার পরিবার-মণ্ডলীকে চিরদিন অতি পবিত্র বলিয়া জানেন। পাপ ব্যভিচারের অভিনয় হইলে সে পবিত্রতা ভঙ্গ হয়। তাই হিন্দু সেই পরিবার-ক্ষেত্রে কোন ব্যভিচারের সূত্রপাত হইলে অমনি তাহা প্রথমে যথোচিত শাসন করেন; শাসনে অশাসিত হইলে যাহাতে সেই ব্যভিচার গৃহপুর হইতে দূরীভূত হয়, তাহারি বিশেষ চেষ্টা দেখেন। ঘরের পাপ লোকে বাহির করিয়া দেয়; না, সেই পবিত্র গৃহধামে কুন্দ-নগেন্দ্রের পাপপ্রেমের অভিনয়! ছি! এতদপেক্ষা ঘৃণিত চিত্র আর কি আছে! এরূপ পাপচিত্রের কুদৃষ্টান্ত অতি ভয়ানক। অল্পবুদ্ধি যুবকগণের কল্পনা এতদ্দ্বারা কি কলুষিত হয় না? ভদ্রসমাজে এইরূপ অপবিত্র চিত্র যে কত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা এক মুখে বলা যায় না। আমাদের তরলমতি যুবক যুবতীগণ এই ছবি পুস্তকে অঙ্কিত দেখিতেছেন এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে দেখিতেছেন। এই প্রকার শত শত পুস্তকের পাপছবি সুপ্রচার করিবার জন্য পল্লীতে পল্লীতে এক্ষণে প্রকাশ্য পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ, গ্রন্থালয়, এবং রঙ্গালয়ের অভিনয় দ্বারা দেশীয় সমাজের যে প্রকার অনিষ্ট-সাধন হইতেছে, তাহার নিদর্শন এক্ষণে সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। এতদপেক্ষা ঔপন্যাসিক কাব্যের উপক্রম কি অধিক ভয়ানক হইতে পারে? যাহার উপক্রম এত ভয়ানক, তাহার সমুদায় পাঠের ফল যে কত ভয়ানক, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

এতক্ষণ আমরা কুগ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে সুগ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের আলোচনা করিব।

উপন্যাস এবং আখ্যায়িকা প্রায়ই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়—ঘটনাপ্রধান এবং লোকচরিত্র-প্রধান। আরব্য, ও পারস্য উপন্যাসাদি ঘটনাপ্রধান। তাহাতে ঘটনার উপর ঘটনা, সুশৃঙ্খলাক্রমে পুঞ্জে পুঞ্জে উপস্থিত হইয়া উপক্রম হইতে উপসংহারে উপনীত হয়। তাহার উদ্দেশ্য লোকচরিত্র প্রদর্শন করা যত না হউক, ঘটনাপুঞ্জদ্বারা সমাকৃষ্ট করিয়া চিত্তরঞ্জন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক বিলাতী উপন্যাসও এই শ্রেণীভুক্ত। এক এক বিশেষ রস আশ্রয় করিয়া এই ঘটনাপুঞ্জ মেঘমালার ন্যায় ঘনীভূত

হইতে থাকে। কোন গল্পে অদ্ভুত রস, কোনটীতে আদি রস, কোনটীতে বীর রস সঞ্চারিত হইয়া ক্রমেই প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকচরিত্রপ্রধান উপন্যাস ও আখ্যায়িকার সেই চরিত্রমাত্র চিত্রিত করিবার জন্যই ঘটনাসকল অবলম্বিত হয়। যেরূপ সংস্থানে আনিলে সেই চরিত্রের সুন্দর বিকাশ হয়, তাহাই ঘটাইবার জন্য যথোপযুক্ত ঘটনা যোজনা করা হয়। বিলাতী সাহিত্য এই শ্রেণীর উপন্যাস ও আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। তাহারই দেখাদেখি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক্ষণে এই শ্রেণীর উপন্যাস বহুল পরিমাণে সৃষ্ট হইতেছে। বিলাতী সাহিত্যের আদর্শে বাঙ্গালায় এক্ষণে যে নাটক নভেলের সৃষ্টি হইতেছে, আমরা স্বীকার করি, তাহার অনেক স্থলেই সুন্দররূপে মানবপ্রকৃতি চিত্রিত হইয়াছে এবং সেই প্রকৃতিচিত্রে লোকচরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্রাবলীতে একদেশদর্শিতারই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। মানব কি কেবলই পশুপ্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে? না, তন্মধ্যে দেবপ্রকৃতিও আছে? যদি দেবপ্রকৃতি থাকে, তবে সেই প্রকৃতিরই মহত্ত্ব ও গৌরব অধিক, না, পাশবপ্রকৃতির গৌরব অধিক? কিন্তু বিলাতী আদর্শে এক্ষণে যে সকল উপন্যাসের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার অধিকাংশেই সুরাপায়ী, হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, লোভী, পাপী, শঠ, লম্পট প্রভৃতি দুরাচার পাশবপ্রকৃতির চিত্রই অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যদি কিছু দেবচিত্র থাকে, যদি কোন সাধুসজ্জনের চরিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহার বর্ণরাগ এত অনুজ্জ্বল যে, পাপচিত্রসকলের উজ্জ্বলতায় তাহা নিষ্প্রভ দেখায়; সেই পাশবচিত্রসকলই উদ্ভাসিত হইয়া মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। সুতরাং, সমগ্র গ্রন্থপাঠের অধ্যয়নফলস্বরূপ সেই পাপচিত্রগুলিই মনে জাগিতে থাকে।

এই সমস্ত পাপচিত্রময় গ্রন্থের সমর্থনার্থ লোকে বলিয়া থাকেন, পাপের দণ্ড ও কুফল প্রদর্শন করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। লোককে তদ্রূপ পাপপথ হইতে বিরত করাইবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি। আমরা বলি, তদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাক্, বরং ঠিক বিপরীত ফলই ফলে। এ সংসারের চারিদিকেই দুরাচার, পাপ ও পাপের কুফল সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ঘটিতেছে। একবার চক্ষু চাহিবার অপেক্ষা; ঘরে বাহিরে যে দিকে চাও, সেই দিকে দুরাচার, পাপ এবং পাপের দণ্ডভোগ দেখিতে পাইবে। তদ্দ্বারা কয়জন লোক শিক্ষিত ও শাসিত হয়? যদি হয়, তবে তাহার আবার অনুচিত্র আঁকিবার আবশ্যক কি? প্রকৃত ঘটনাপুঞ্জ ও রাশি রাশি পাপের দণ্ডভোগ কি প্রচুর নহে? প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষা কি অনুকৃতি অধিকতর উজ্জ্বল? যদি প্রকৃত ঘটনার অভাব হইত, তবে বটে কাল্পনিক ঘটনার সৃষ্টি আবশ্যক হইত। কিন্তু যখন প্রকৃত ঘটনা আমাদিগের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তখন আর তাহার অনুকরণ করা কেন? করিলে এই অনিষ্ট হইতেছে, পাপেই আমাদের আমোদ ও আনুরক্তি জন্মিতেছে। পাপ আমাদের গা-সহা হইয়া যাইতেছে। কুদৃষ্টান্তের দেখাদেখি তরলমতি যুবকগণের আসক্তি সেই পাপ পথে যাইতেছে; প্রবৃত্তি কলুষিত হইতেছে। ঘরে পাপ, বাহিরে পাপ, গ্রন্থে পাপ, রঙ্গালয়ে পাপ,—পাপে পাপে কল্পনা পরিপূর্ণ। সুতরাং, পাপে আর ঘৃণা হয় না। পাপের সহিত সহানুভূতি জন্মে! কাজেই প্রবৃত্তি

কলুষিত হইয়া যায়। পাপের সংক্রামক শক্তি অতি ভয়ানক। এজন্য আমরা বলি, পাপের কুদৃষ্টান্ত চাপা দেওয়াই ভাল। তাহার প্রচারে বিশেষ অনিষ্টোৎপত্তিই ঘটিয়া থাকে।

পাপ যেমন সংসারে প্রচুর এবং সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান, পুণ্য তেমনি বিরল এবং অদৃশ্য। লোকে দুরাচারী পাপিগণকে যেমন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা দেখিতে পায়, সাধু-গণকে তত দেখিতে পায় না। সাধুলোকে গা ফুলাইয়া বলিতে আসে না, দেখগো আমি কেমন সাধু। লোকের পুণ্যকর্ম্ম অতি নিঃশব্দে কৃত হয়। সাধুগণ নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের গণ্ডীর মধ্যে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা উদ্ধার হইয়া যান। ধর্ম্মের প্রভাব এমনি,—গৌরব এতই অধিক! ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত এবং সৎকার্য্যের দৃষ্টান্ত কখন বিফল হয় না। অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও মন বিচলিত হয়। তাই পুণ্যছবির গৌরব এত। যাহা লোকলোচনের অদৃশ্য, অথচ যাহার গৌরব এত অধিক, তাহাকে সুদৃশ্যমান করাইবার জন্য আর্য্য-কাব্যাবলি পরিপূর্ণ। কারণ, তাহাই চিরদিনের জন্য রক্ষণীয়। তন্মধ্যে যে পাপচিত্র আছে, তাহা বরং পুণ্যের ও ধর্ম্মের গৌরবই দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। যদি লোকচরিত্র দেখাইতে হয়, তবে এই সাধুচিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত কর। এত উজ্জ্বলবর্ণে আঁকিবে যেন তদ্দ্বারা পাপচিত্র-সকল মলিন হইয়া যায়।

আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের পরিবর্ত্তে যে অবধি এই বিলাতী আদর্শের ঔপন্যাসিক সাহিত্যের এ দেশে প্রচলন হইয়াছে, তদবধি সেই সাহিত্যের পাঠক ও পাঠিকাগণের আমোদ সেই দিকেই গিয়াছে। পাপ এবং খুন লইয়া যাহাদের সতত চিত্তরঞ্জন হয়, তাহাদের প্রবৃত্তি কি কখন ভাল থাকিতে পারে? প্রবৃত্তি সেই পাপ এবং খুনেই প্রমত্ত হয়। তাই বলি, বঙ্গসমাজে এক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি পাপ-পথে অধিকতর ধাবিত এবং খুনে অসঙ্কু-চিত। এইরূপ কুফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের ঋষিগণ যে পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন এবং আমাদের কবিগণ যে পৌরাণিক কাব্যাদির রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পুণ্যচিত্রের উজ্জ্বলতায় পাপ নিষ্প্রভ হইয়াছে, এবং খুনে পর্য্যবসিত হয় নাই। যে সাহিত্য পাঠে লোকের কল্পনা এবং প্রবৃত্তি কলুষিত হয়, সে সাহি-ত্যের প্রচার বন্ধ করাই উচিত। কিন্তু যে সাহিত্য-পাঠে লোকের মন ধর্ম্মামোদেই প্রমত্ত হয়, সেই সাহিত্যেরই কি প্রচার হওয়া উচিত নহে? পৌরাণিক কাব্য ও নাটকাদির কাব্যরসে চিত্ত আর্দ্র হইলে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ ধর্ম্মেরই আনন্দ এবং তদঙ্কিত ধর্ম্মাদর্শের চিত্রসকল মনকে চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া থাকে। তাই, কালিদাসের শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের চিত্র এবং ভবভূতির সীতা ও রামচন্দ্রের চিত্র, চিরদিনের জন্য ভারত-বাসীর হৃদয়ে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সঞ্জী-বিত থাকিয়া আজিও কত ভারতবাসীকে রামচন্দ্রের মত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠ এবং কত ভারতললনাকে সীতার আদর্শে সংগঠিত করিতেছে। এইরূপ চিত্রে যে গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার, তাহারই অধ্যয়ন-ফল অতি সুন্দর ও সুমধুর।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, হিন্দু পরিবারমণ্ডলে ও সংসারে যে দাম্পত্য-প্রেমের বিকাশ, তাহা ইন্দ্রিয়জ প্রেম নহে। যে সকল হিন্দু ভারতললনা

সীতার আদর্শে সংঘটিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রেম ভক্তিমিশ্রিত। প্রেম ভক্তিমিশ্রিত হইতে গেলেই তাহা হয় সতীপ্রেম, না হয় ভগবৎপ্রেম হইবে; হয় সীতার আদর্শে, না হয় রাধিকার আদর্শে পরিণত হইবে। এজন্য হিন্দু উপন্যাস-ক্ষেত্রে যে প্রেমের পরিচয়, তাহা ঐ দুয়ের অন্যতর হওয়াতে সে প্রেম-পরিচয়ে ভক্তির উদয় হয়। দ্রৌপদী ও সত্যভামা যে এত তেজস্বিনী ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সতীপ্রেমে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রুক্মিণী ও কুন্তির প্রেমে ভগবদ্‌ভক্তি উছলিয়া পড়ে। গান্ধারী পতিভক্তির সহিত ভগবদ্ভক্তি অতি আশ্চর্য্যভাবে মিশাইয়াছিলেন। এ সকল প্রেমপাত্রীর চিত্র দেখিলে তাঁহাদিগকে ভক্তি ও পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং সে প্রেম-পরিচয়ে কোন কুফল দর্শিতে পারে না। কিন্তু বিলাতী ঔপন্যাসিক প্রেমের প্রকৃতি সেরূপ নহে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ফল সমুৎপাদন করে। সেই প্রেমাদর্শে আমাদের যে সকল বাঙ্গালা উপন্যাস এক্ষণে রচিত হইতেছে, তাহার আদিগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপক্রম এবং উপসংহার পর্য্যালোচনায় আমরা কি রূপ অধ্যয়নফল পাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে আদর্শ ছাড়িয়া মাইকেল প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের পৌরাণিক আদর্শে যে সকল কাব্যনাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের অধ্যয়নফল কেমন সুমধুর ও সুন্দর তাহা আমরা তাঁহার ব্রজাঙ্গনার পর্য্যালোচনায় দেখাইব। বঙ্কিম হিন্দু হইয়াও অহিন্দু চিত্র আঁকিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদন খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুভাবের সুন্দর ও পরিপাটী চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "মেঘনাদ-বধের" সীতা ও সরমার চিত্রদ্বয়ের কি তুলনা আছে? কত মধুরতায়, কত কোমলতায় তাহা পরিপূর্ণ! আবার ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধা এরূপ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ যে, তাহা পড়িলে চিত্ত একেবারে আর্দ্র হইয়া যায় এবং কবির প্রতি আমাদের ততোধিক ভক্তি জন্মে। ব্রজাঙ্গনায় আমরা যে প্রেমভক্তির পরিচয় পাই, তাহা ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত যখন শ্রীকৃষ্ণের রাসের রমণ শেষ হইয়াছে, তখন ব্রজলীলা শেষ হইয়াছে। তাই কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। আর ব্রজে থাকিবার আবশ্যকতা কি? রাধিকা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি—হিন্দু সাধকের ভক্তিময়ী মূর্ত্তি। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং ভগবদ্ভক্তির যদি রূপ থাকে, তবে তাহা গোপী-প্রধানা শ্রীরাধায় প্রকটিত। রাধিকা ব্রজপুরবাসিনী ও বৃন্দাবনবিলাসিনী। তিনি মানুষের গোকুল রূপ ব্রজপুর হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। সাধক যখন ব্রজভাবে উপনীত হন, যখন তিনি সংসার-আসক্তি রূপ যমুনা পার হইয়া থাকেন, তখন তিনি ব্রজবাসী হন। এই ব্রজধামে কেবল মুনিগণই সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতে পারেন। যখন তাঁহারা বাল্যভাবের সরলতায় উপনীত হইতে পারেন, তখন তাঁহাদের প্রকৃতি ভক্তি-রূপিণী বাল্যসরলতা-পূর্ণ রাধারূপিণী হয়। ব্রজপুর এইরূপ বালভাবপূর্ণ গোপ গোপী-গণে পূর্ণ। * সেখানে ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত। প্রত্যক্ষীভূত কাহাদের কাছে? মুনিজনোচিত বালভাবপূর্ণ গোপালগণের কাছে এবং সরলতাপূর্ণ বালিকা গোপীগণের কাছে। তিনি তখন বালকৃষ্ণরূপে

* এই বালভাব কিরূপ, তাহা "হিন্দু-ধর্ম্মের প্রমাণ" নামক গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বেদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।" গীতা বলেন—যিনি সমদর্শী তিনিই পণ্ডিত।—৫।১৮।

দেখা সাক্ষাৎ দেন। তাই হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রে ব্রজলীলা মানুষের অধ্যাত্মধামে ভগবানের সহিত ভক্তের সাক্ষাৎ বাল্যলীলা। সেই ভক্ত রাধিকা রূপে শ্রীকৃষ্ণের রাসে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়াছেন। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন।

তথাপি অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম এই, সকল সময় ভক্ত তন্ময়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। নিত্য তন্ময়তা লাভের পূর্ব্বে অনেক বার ধ্যান ভঙ্গ হয়, যোগীদিগের ব্যুত্থান হয়। এই তন্ময়তারও পরিচর্য্যার্থ অভ্যাস-যোগ চাই। সেই যোগই শ্রীরাধার শত বৎসর-বিরহ। নারদ তাঁহার ভক্তি-সূত্রে বলিয়াছেন, এই বিরহেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। পরাভক্তিতে উপনীত হইবার প্রধান উপায় বিরহ। যেমন বিরহে পতীপত্নীর দাম্পত্যপ্রণয়ের পরিপুষ্টিলাভ হয়, তদ্রূপ ভগবৎ বিরহে ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়। ধ্যানভঙ্গে কৃষ্ণ বিরহেই প্রধান যোগাভ্যাস। এই ধ্যানভঙ্গে ঈশ্বরসর্ব্বস্ব যোগীরা কৃষ্ণবিরহে একান্ত কাতর হইয়া পড়েন।

রাধিকা এইরূপ বিরহকাতরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলে সহসা ক্ষণকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নবৎ উদয় হইয়াছেন। সেইরূপ তন্ময়তা লাভ করিবামাত্রই তিনি কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন ;—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রঞ্জন।"
"মানস-সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে।
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?" ইত্যাদি

আমরা ব্রজাঙ্গনার বিরহ-বর্ণনায় প্রারম্ভেই শ্রীরাধার ক্ষণকালের জন্য এইরূপ তন্ময় ভাবের পরিচয় পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার ভগবদ্ভক্তির কতদূর পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে। একবার তন্ময়তা জন্মে, আবার যায়, আবার হয়। সেই বিরহ-বিধুরা, থাকিয়া থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতে পাই-তেছেন। কবিও সেইভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই কৃষ্ণ-স্বপ্নময়ী ভক্তিতে ডুব দিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন।

রাধিকার এই ধ্যানজ অবস্থা আমরা গ্রন্থের উপক্রমেই উপলব্ধি করিলাম। পরে সেই অবস্থারই ক্রমপুষ্টি গ্রন্থের প্রবৃদ্ধিতে ক্রমান্বয়ে সাধিত হইয়াছে। সাধিত হইলে রাধিকা গ্রন্থের উপসংহারে কিরূপ তন্ময়তার অধ্যাত্ম অবস্থার উপনীত হইলেন? সেই অবস্থা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কল কল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল, চললো বনে।
চললো জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে!"

তিনি গ্রন্থের উপক্রমে সখীগণকে ত্বরা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে কেবল যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু উপসংহারে সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, সখি! আমি দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে বন অতি রমণীয় হইয়াছে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের রূপে মধুময় হইয়াছে, তিনিই পিকরূপে মধুরস্বরে গাহি-তেছেন, অলিরূপে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছেন, কালিন্দীর কৃষ্ণজলে সুরবে তরঙ্গায়িত হইতে-ছেন, সুতরাং নিকুঞ্জ কাননেও সেই রূপ দেখিয়া মানস-চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব। যেমনি উপক্রম, তেমনি উপসংহার।

মাইকেল মধুসূদন পৌরাণিক কাব্য

নাটকে যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন, আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে সেই রূপ সফলতা বাঙ্গালা ভাষায় পৌরাণিক কবিমাত্রই লাভ করিয়াছেন। পুরাণ অবলম্বনে কাব্য-নাটক লেখা বড় সহজ কথা নহে। পুরাণের ভক্তিরস বজায় রাখা অতি কঠিন। পুরাণ সেই ভক্তিরস অনেকবিধ উপকরণে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। অদ্ভুত ঘটনাবলির সহিত দেবচরিত্র, ঋষিচরিত্র এবং সাধকচরিত্র অতি আশ্চর্য্য কৌশলে মিশাইয়া অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের ঘনীভূত রসে পুরাণ ভক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এ সকল উপকরণ বিরহিত হইলে সে রসের সঞ্চার হওয়া দুষ্কর। তজ্জন্য পুরাণের গাম্ভীর্য্য ও গৌরবরক্ষা করা বড়ই কঠিন। সেই গৌরব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে বিপরীত ফল ফলে। তাই দেখিতে পাই, অনেক লেখকই পৌরাণিক খণ্ডব্যাপার লইয়া বাঙ্গালায় উপন্যাস বা কাব্য-নাটক লিখিতে গিয়া পুরাণকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে বিলাতী প্রেম ও বিলাতী ন্যায়ান্যায়বিচার মিশাইতে গিয়া পুরাণের গৌরব বিনষ্ট এবং রসভঙ্গ করিয়াছেন। পৌরাণিক চিত্রসকল অনেক স্থলে বিলাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাহা হউক এক্ষণে আর একখানি গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার গৃহীত হইতেছে। আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রহণ করিলাম।

গীতার উপক্রম কোথায়? গীতার উপক্রম অর্জ্জুনের বাক্যে। কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জ্জুনের সম্মুখে তাঁহার গুরুজনগণ আততায়িরূপে উপস্থিত, তখন সেই আততায়ীর যথার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রাজধর্ম্মানুযায়ী কোন দোষ নাই বটে, কিন্তু গুরুবধ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী ঘোর পাতক আছে। অতএব, ব্যবহারশাস্ত্রের অনুসারী হইতে গেলে যে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহাকে পতিত হইতে হয়। এরূপ সঙ্কটস্থলে তিনি কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? ব্যবহার-বিধি-প্রকরণে মনু বলিয়াছেন;—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবা বিচারয়ন্॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বা প্রকাশং বা মন্যুস্তংমন্যুম্ ঋচ্ছতি।
মনুসংহিতা। ৮অ-৩৫০।৩৫১।

"গুরু, বালক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বা বহুশ্রুত-ব্যক্তি আততায়িরূপে আগত হইলে অন্য কোন আত্ম-রক্ষার উপায় না থাকিলে তাহাকে অবিচারে হনন করিবে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ী বধে হন্তার কোনও দোষ হয় না। কারণ, তাহাতে ক্রোধ ক্রোধকে সংহার করে।"

রাজ্যরক্ষা এবং লোকরক্ষার্থ অনেক স্থলে অনেক কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও রাজাদিগকে রাজ-ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহারশাস্ত্রের বিধি-অনুসারে চলিতে হয়। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই বিধি অনুসারেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র রণে অনেক শাঠ্যের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই জন্য লক্ষ্মণ ছদ্মবেশে ছলনা করিয়া ভেদনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞ-গৃহে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাক্য-ছলে দ্রোণাচার্য্যকে বিপন্ন করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ-বধ করিয়াছিলেন। এ সমস্তই রাজনীতি। মনু বলিয়াছেন, এইরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিলে তত দোষ নাই। দোষ নাই বলিতে এই মাত্র বুঝা গেল যে, লোকপালনবিধান করিতে হইলে এরূপ কার্য্য অবলম্বন করিতেই হইবে, নহিলে গুরুতর ধর্ম্ম যে লোকরক্ষা তাহা সম্পন্ন হয় না। সুতরাং ব্যবহারমতে এরূপ কার্য্য রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় নহে। রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় না হইলেও ধর্ম্মদণ্ডে অবশ্য দণ্ডনীয়।

আততায়ী কে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপানির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আতায়িনঃ॥

বশিষ্ঠসংহিতা। ৩য় অধ্যায়।

"প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে যে অগ্নি ও বিষ প্রদান করে, অথবা অস্ত্রধারণ করে, যে ধন, ভূমি, ও স্ত্রী হরণ করিতে আইসে—সেই ছয়জন আততায়ী।"

অতএব, আচার্য্য দ্রোণ পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি যখন আততায়িরূপে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে বধ করাই বিধেয়। কিন্তু সেই বধ-হেতু যে পাতকের উৎপত্তি হইবে, সেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিলেন। গীতার এই উপক্রম। এই উপক্রমে দেখা যায় যে, অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বধর্ম্মেরই সাধারণ প্রশ্ন—মানুষ কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে? লোকসমাজে যত ধর্ম্ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, সে সমস্তই মনুষ্যের পাপ হইতে মুক্তিলাভের পন্থা। গীতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বেদোক্ত মুক্তি-পথই ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং গীতার উপক্রম যেমন সমগ্র মানবজাতির এক অত্যাবশ্যক মহা বিষয়,—মহা বিষয় কেন বলি—পরমার্থ-সাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, তাহার উপসংহার ও তেমনি মানবজাতির অবশ্যজ্ঞাতব্য পরম সম্পত্তি। গীতা অভ্যাস, অর্থবাদ এবং উপপত্তির এক অপূর্ব্ব রীতিক্রমে সেই পরম উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। সেইরূপ উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া, গীতাপাঠের ফলও বিশিষ্টরূপে লভ্য হইয়াছে। সেই উপসংহার ও ফল গীতা শেষেই উক্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যে গ্রন্থ যথারীতিক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে উপনীত হয়, তাহার অধ্যয়ন ও শ্রবণফল বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। অতএব এই ফল ধরিয়াই সকল গ্রন্থ বিচার করা কর্ত্তব্য। গীতার মহা উপসংহার এই :—

"ইতি তে জ্ঞানামখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্ব্বগুহ্যতমংভূয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহ সিমে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামিতে হিতম॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুর
মামৈবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহাস॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥

"হে অর্জ্জুন! তোমাকে অতি গোপনীয় জ্ঞানোপদেশ দিলাম। এখন তুমি আমার উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র (জ্ঞানোপদেশ) সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তদ্দ্বারা তোমার মোহ দূরীভূত হইবে। তুমি আমার একান্ত প্রিয়ভক্ত; সেইজন্য যাহা অত্যন্ত গুহ্য এবং নানা প্রকরণে কথিত হইয়াছে, তোমার হিতার্থ আমি তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কহিতেছি;—

হে কৌন্তেয়! তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমারই ভজনা কর, পূজা কর, নমস্কার কর, এবং সর্ব্বতোভাবে আমারই শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে! সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমার শরণাপন্ন হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না, কারণ, তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না, কেবলমাত্র কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই তোমাকে আর পাপ স্পর্শ করিবে না। এবম্ভূত ত্যাগই মুক্তির কারণ।"

তবে আর মানবজাতির শোকের কারণ কি? ইহাতে যে শুদ্ধ অর্জ্জুনের শোকের

হেতু অপনীত হইয়াছে এমন নহে, এতদ্দ্বারা সমস্ত মানবজাতির মহাশোক হেতু যে পাপ, তাহা হইতে পরিত্রাণের ধ্রুব অথচ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ উপায় নিরূপিত হইয়াছে। মানুষ হস্তপদাদির সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও যদি এমন ভাবে কর্ম্ম করে যে, সে কর্ম্ম তাহার কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত আর সে কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। আমারই যদি কর্ম্ম না হইল, তবে তাহার ফলস্বরূপ পাপপুণ্য আমার কিরূপে হইবে। সকলই ঈশ্বরের কর্ম্ম, আমার নিজের কর্ম্ম নহে, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ না হইলে কর্ম্মফল-ত্যাগ সম্ভাবিত হইতে পারে না। ভৃত্য আদিষ্ট হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে, যেমন সে কর্ম্মফল তাহার হয় না, যে আদেশ করে, তাহা সেই প্রভুকেই বর্ত্তে, তেমনি আমরা যদি কোন কর্ম্ম ঈশ্বরের আদেশজ্ঞানে সম্পন্ন করি, তাহাতে আমাদের নিজ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ কিছুমাত্র না থাকে, তবে তাহাতে আমাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে কেন? কারণ যেরূপে নিজের কর্ম্ম নিজের না হয়, তদ্রূপে কার্য্য করিলে আর সেই কর্ম্ম-জনিত ফলভোগ নিজের হইবে কেন? যখন মানুষ নিজ কর্ত্তৃত্ব ও অহঙ্কার পরিহার করিতে পারিয়াছেন, যখন তাহার আমিত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দ্বারা ততদূর ঈশ্বরে ভক্তি জন্মিলে, কর্ম্মসন্ন্যাসহেতু সকলই ঈশ্বরের কার্য্য এমত জ্ঞান ও বুদ্ধি সঞ্জাত হইলে আর আমার কর্ম্ম রহিল কিরূপে? যদি আমার কর্ম্মই না থাকে, তবেআমার পাপ-পুণ্যও কিছুই নাই। এরূপ হইলেই ভগবান্ সকলকেই বলিতে পারেন;—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ।"

এরূপ সুস্পষ্ট উপসংহার কি আর কোন গ্রন্থের আছে? এইরূপ উপসংহার করিয়া গীতা স্পষ্টাক্ষরে নিজের ফলশ্রুতি বলিতেছেন;—

"অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেন হমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ
পুণ্যকর্ম্মনাম্॥"
৮ অ ৭০।৭১।

"যিনি আমাদিগের (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের) এই ধর্ম্মানুগত সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে তাঁহার পূজা করা হইবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যকারগণের পবিত্র লোকসকল প্রাপ্ত হন।"

এস্থলে দেখুন, ভগবান্ প্রথমে অধ্যয়ন-ফল বলিয়া পরে শ্রবণফল বলিলেন। অধ্যয়নফলে অবশ্য যে প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মে, শুধু শ্রবণে ততদূর হয় না। সেই জন্য অধ্যয়ন-ফলের গৌরব শ্রবণ-ফলের অপেক্ষা অধিক। তাই ভগবান্ বলিলেন, অভিনিবেশ সহকারে গীতাপাঠ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞানযজ্ঞ তদ্দ্বারা আমাকে পূজা করা হয়। কিন্তু যে কেবল শ্রবণ করিয়া গীতার্থ পরিগ্রহ করে, তাঁহার ততদূর প্রগাঢ় জ্ঞান না হওয়াতে তাঁহার কেবল ঈশ্বর গৌণভক্তি জন্মে এবং সেই গৌণভক্তি হেতু তিনি যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার কেবলমাত্র পুণ্য-লোক লাভ হয়। সুতরাং এই দুই ফলের তারতম্য গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। অতএব, গীতার অধ্যয়নফলই সমধিক এবং সেই ফল হেতু যে পরম জ্ঞান জন্মে, তাহাই

মুক্তির কারণ ও সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার প্রধান উপায়। গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফলের যখন এত গৌরব, তখন যে গ্রন্থ পাঠের সেরূপ অধ্যয়নফল নাই, সে গ্রন্থ কি পাঠযোগ্য? সুতরাং এই অধ্যয়ন-ফল দ্বারাই সকল গ্রন্থের বিচার সিদ্ধ হওয়া উচিত। সাহিত্য-সমালোচনার এই সুপ্রধান নীতি। এ নীতি কেবল আর্য্যসাহিত্য স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দেয়। আর কোন দেশীয় সাহিত্যে এ নীতি এমন স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট হয় নাই। যাহা ভগবানের আদেশ, যে আদেশ স্বয়ং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, হিন্দুমাত্রই সেই নীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের বিচার করিয়া থাকেন। এরূপ ফলশ্রুতি পৌরাণিক কাব্যমাত্রেই এবং অনেক স্থলে কাব্যখণ্ডেও উক্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আর সেই সেই কাব্য বা কাব্যখণ্ডের স্বতন্ত্র সমালোচনা আবশ্যক হয় না। কারণ, সমালোচনা দ্বারা যাহা বাহির করিতে হইবে, তাহা গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া দিতেছেন। পাঠক কেবল মিলাইয়া দেখেন, সেই ফলশ্রুতি স্বরূপ কি না। সেইরূপ অধ্যয়ন বা শ্রবণফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থ বিরচন করেন এবং গ্রন্থপাঠেও সেই ফল প্রতীত হয়। আর্য্যসাহিত্যের এই প্রকার নীতি থাকাতে সে সাহিত্যে স্বতন্ত্র আকারে সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা হয় নাই।

এখন কথা এই, পৌরাণিক সাহিত্যে যেন এইরূপ ফলশ্রুতি উক্ত হইয়া থাকে, কালিদাস, ভারবি মাঘ প্রভৃতি বিরচিত কাব্যেও কি ফলশ্রুতি উক্ত হয়? যদি না হয়, তবে তাহাদের সমালোচনা ত আবশ্যক। সেরূপ কাব্যের ফলশ্রুতি এই জন্য উক্ত হয় না যে, সে সকল কাব্য যে যে পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই সেই পুরাণের ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সে সকল কাব্যের আর স্বতন্ত্র ফলশ্রুতি দেওয়া নাই। আর্য্যকবিগণ যে সকল পৌরাণিক ইতিহাস লইয়া নিজ নিজ কাব্য বিরচন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও সেই পৌরাণিক ধর্ম্মনৈতিক ফল ফলিয়া থাকে। ধর্ম্মকে এবং ভগবান্‌কে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখান সেই সকল কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল পৌরাণিক কাব্য বিরচিত হইতেছে, তাহাদের ফল অন্যবিধ হইয়া পড়ে। কারণ, সে সকল কাব্য বিলাতী আদর্শে সংগঠিত হয়। সেই আদর্শে সংঘটিত হওয়াতে তাহাতে পাপাংশই সমধিক প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অধ্যয়ন-ফল সেরূপ সুমিষ্ট হয় না। তজ্জন্যই এক্ষণে এই আর্য্যরীতি-অনুসারে সাহিত্য-সমালোচনার আবশ্যকতা হইয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সৃষ্টি-চিন্তা।

ঘোরা অমাবস্যা রজনীর দিগ্‌দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত অন্ধকাররাশির ভীষণতা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়া আকাশমণ্ডল গাঢ় মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন। আকাশে একটীমাত্র গ্রহনক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃকণাও লক্ষ্য হইতেছে না। ঘনতিমিরপরিপূর্ণ পৃথিবীর কোথাও কিছুমাত্র আলোকের চিহ্নমাত্র নাই। ঘোরা নিশীথিনীর মধ্যযাম অতীত হইতে চলিল, সারাদিনের কর্ম্মশ্রান্ত মানবগণ স্ব স্ব আলয়ে নিদ্রাদেবীর স্নেহময়-ক্রোড়ে দেহ ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত। দূরে—কোথাও দুই একটী আরণ্যজন্তু খাদ্যের অনুসন্ধানে অরণ্যপথে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের পদশব্দে শুষ্ক পত্র সকল 'মর্ম্মর' ধ্বনি করিয়া উঠিতেছে, যেন সুপ্ত নিশীথিনী পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল।

আকাশে গাঢ় মেঘ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও গম্ভীর গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তুলিতেছে না। এখনও লোল-কটাক্ষশালিনী সৌদামিনী তেমন ঘন ঘন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে না। আকাশ—ধরণী, ঝটিকারম্ভের প্রাক্কালীন সুপ্ত সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল, নিঃশব্দ ও গম্ভীর ভাবমগ্ন।

কি জানি কেন আমার নিদ্রা হইতেছে না, ইতঃপূর্ব্বে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছি বলিয়া যদি নিদ্রাদেবী সপত্নীদ্বেষিণী কামিনীর ন্যায় রাগ করিয়া থাকেন,—একটু ভয় যে না হইল তাহা নহে, এ সম্বন্ধে পুরুষজাতির দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক বলিয়া এ দীনের বিশ্বাস। যাহা হউক আপাততঃ চিন্তাদেবীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় এ পাশে ও পাশে, মুদ্রিতলোচনে, বিকশিতনেত্রে, কৃতাঞ্জলিপুটে শতসহস্র প্রক্রিয়া দ্বারা "মানভঞ্জন" ব্যাপারে লিপ্ত হইলাম, আমার এমনি কপাল,—নিদ্রাদেবী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না!—বড় রাগ হইল, ভাবিলাম, ধিক্ আমার জীবনে! সামান্য নিদ্রার জন্য এত কান্নাকাটি করিলাম, তবু তাঁহার দয়া হইল না, আবার তাঁহাকে সাধিব?—ধিক্!

যেমনি নিদ্রাদেবীর উপর ক্রোধ করিয়া শয্যাত্যাগ করিব মনে করিলাম, অমনি স্নিগ্ধমধুর-হাস্যবিজড়িত—অধরপল্লবে চিন্তাদেবী আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন, তাঁহার কিবা চাতুরী! কিবা মনোমোহন বিলাসভঙ্গিমা! বলিতে কি দেখিতে দেখিতে আমি সর্ব্বস্ব দান করিয়া চিন্তাদেবীর ক্রীতদাস হইয়া পড়িলাম!

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাতায়নপথ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলাম, আকাশ পাতাল তেমনি একাকার রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মাঝখান হইতে যেন পৃথিবীটাকে কে কোথায় অন্ধকারগহ্বরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, যে দিকে চাই কেবলই অন্ধকার, অন্ধকারের পৃষ্ঠে অন্ধকারস্তূপ, তাহার পৃষ্ঠে গভীর অন্ধকার শৈলশ্রেণী, তাহার চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের অনন্ত আকাশমণ্ডল, যদি সুধু অন্ধকার লইয়া একটা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার সাধ কখনও বিধাতার হইত, তবে বুঝি এইরূপ অন্ধকারময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইয়াই ভালমানুষের ছেলেকে অগত্যা অঙ্কুরেই সাধ মিটাইতে হইত।

শুনিয়াছি অন্ধকারে অনেকেই ভীত হইয়া থাকে, তা অন্ধকারে ভীত হইবার এমন কি জিনিস আছে তাহা ভাবিয়া পাই

না, অন্ধকার পৃথিবীর পাপকে লুকাইয়া রাখে, হিংস্র জন্তুকে আবৃত করিয়া রাখে, দস্যুকে আঁচলে জড়াইয়া রাখে, তাই তাহাকে ভয় হয়, পৃথিবীর নিখিল শোভারাশি আঁধারের ভীষণ গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া রহে, তাই অন্ধকার ভাল নহে, তাই অন্ধকার যত শীঘ্র চলিয়া যায় ততই মঙ্গল,—এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার মত মিলে না, আমার মনে হয়, পাপীকে লুকাইয়া রাখা সুধু আঁধারের অপরাধ নহে,—মৃত্যুকে সুধু অন্ধকারই ডাকিয়া আনে এমন কথা মানিতে চাহি না, আর পৃথিবীর অনন্ত শোভারাশি যে আঁধারে লুকাইয়া থাকে তাহা কে বলিল? আমার মনে হয়, পৃথিবীতে আলোক যত পাপীকে লুকাইয়া রাখে, অন্ধকার তত পারে না। ইউরোপীয় নানা দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, নব্যসভ্যতালোকপরিপূর্ণ জনসমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া ক্রূরমতি রাজদ্রোহীরা পৃথিবীর দেবতা রাজার বুকে ছুরিকাঘাত করিতেছে, কোনও দিন শুনিয়াছ কি 'নিহিলিষ্ট' বা এনার্কিষ্ট' দল, অন্ধকারময় গুপ্ত কক্ষে বিশ্রান্ত রাজপুরুষের বুকের রক্ত পান করিয়াছে? আমার মনে হয়, পাপী কখনও আঁধারে লুকাইয়া থাকিতে পারে না, আঁধার তাহাকে সহস্র নরকের ভীষণতাময় তমিস্র গহ্বর দেখাইয়া দেয়, পাপী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, পাপী আত্মসংবরণ করিতে পারে না, পাপী স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তমিস্রতাপূর্ণ নিরাধার স্বরূপ দর্শন করিয়া, আলোকের রশ্মি রেখামাত্র দেখিতে না পাইয়া, ভীষণ ঝটিকা-বিধ্বস্ত তরণীর—সন্তরণশক্তিবিহীন আরোহীর ন্যায় তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের আবর্ত্তে পড়িয়া কেবলি মুক্তপ্রাণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে থাকে "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ! রক্ষ।" পাপ যদি অন্ধকারময় তমোগুণের কার্য্য হয়, তাহা হইলেও মনে হয়, পাপী যেমনি অন্ধকার দেখিবে, অমনি তাহার পাপ চরিত্রের কথা মনে পড়িবে, সুতরাং অন্যের নিকটে যেমনি হউক নিজের কাছেও লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। আরও মনে হয়, পাপের স্বরূপ যদি অন্ধকার হয়, আর পুণ্যের স্বরূপ যদি আলোক হয়, তবু বলিতে হয় আলোকই আঁধারকে লুকাইয়া রাখিতে পারে, আঁধার কখনও আলোককে লুকাইয়া রাখিতে পারে না, সুতরাং অন্ধকার পাপকে লুকাইয়া রাখে এ অনুযোগ বৃথা। বাহিরের যত রকম পাপের প্রলোভন আছে, তাহারা সকলি আলোকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে, আলোক যদি সুন্দরীর হাবভাব বিমিশ্রিত, অনিন্দ্য সুন্দর রূপকে আত্মপ্রকাশ করিতে না দিত, আলোকময় চক্ষু যদি অন্ধকারময় হইত, তবে কি এমন সোণার ট্রয় নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইত? আমার মনে হয়, আলোকই যত অনিষ্টের মূল। আলোকই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। রূপ তৈজস পদার্থ, সুতরাং আলোকময় রূপ যত মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, রূপ যত সোণার সংসারকে শ্মশানে পরিণত করে, রূপ যত নির্ম্মলচিত্তকে কলুষিত করে, সংসারে তেমন শক্তি আর কাহারও নাই। বিশ্বাস না কর, আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর, রূপ যত তোমার জীবনের উন্নতিসোপানের গাঁথুনি শিথিল করিয়াছে, তেমন যদি আর একটীমাত্র থাকিত, তবে তোমার অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিনে ট্রয় নগরীর শোচনীয় দশায় আত্মসমর্পণ করিত; মানুষকে বিশ্বাস না কর, ঐ দেখ নয়নমনোহর লোলশিখা বিস্তার করিয়া ধক্ ধক্ বহ্নি জ্বলিতেছে, চতুর্দ্দিক্ তরল প্রভায় আলোকিত করিয়া রূপের বহ্নি জ্বলিতেছে, আর তাহাতে রূপোন্মত্ত

পতঙ্গের দল, ভালমন্দ বিচার না করিয়া হাস্যমুখে আত্মাহুতি দিতেছে, লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ চক্ষের সম্মুখে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ তাহাদের ভস্মাবশেষরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। কৈ আঁধারের কোলে এমন শোচনীয় মৃত্যুশিখা ধক্ ধক্ করে কি? তাই বলিতেছিলাম, মৃত্যুকে শুধু অন্ধকার লুকাইয়া রাখে না! বরং অন্ধকার মৃত্যুর স্বরূপকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, অপরিণামদর্শী পথিককে মৃত্যুর দ্বার দেখাইয়া দিয়া সাবধান করিয়া দেয়, সুতরাং অন্ধকারে ভয় করা স্বাভাবিক নহে। আমার যেন মনে হয়, অন্ধকারই জগতের মূলস্বরূপ, এবং স্বাভাবিক অবস্থা! সকলেই জানে এই সংসার সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশাল তমিস্রতা ব্যতীত জগতের আর কিছুই ছিল না "আসীদিদং তমঃ কৃচ্ছ্রমপ্রজ্ঞাত মলক্ষণং"! আবার জগতের প্রলয় অবস্থাতেও এই তমোরাশিমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং জগতের মূলতত্ব বোধ হয় অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনেকে বলেন, সমস্ত বর্ণের অভাবই অন্ধকার, আমি বলি তাহা নহে, জগতের সমস্ত বর্ণের একত্র সম্ভাবই অন্ধকার, অন্ধকাররাশির বিশ্লেষণ করিয়া একটী একটী বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখিলেই বোধ হয় দেখা যাইবে, বিভিন্ন বর্ণগুলি যত সরিয়া আসিতেছে অন্ধকারের গভীরতা ততই কমিতেছে; ক্রমে সমস্ত বর্ণগুলি বিধাতার নিয়মানুসারে বিভিন্ন হইয়া পড়িলেই আলোক ফুটিয়া উঠে। আমার মনে হয়, ইহাই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। একমাত্র অন্ধকার যেমন সমস্ত বর্ণকে প্রসব করিয়া স্বয়ং লুকাইয়া পড়ে, আবার যথাকালে সমস্ত বর্ণগুলিকে নিজের অধিকারে আনিয়া আত্মবিকাশ করিয়া থাকে, আমি ভাবি, বুঝিবা আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপিনী তিমিরবর্ণা জগজ্জননী কালী মা সেইরূপ নিজের অন্ধকারময় শরীর হইতে নিখিল বিশ্বকে পৃথক্ করিয়া দিয়া বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরই মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, বুঝিবা অন্ধকাররাশি হইতে বিশ্লিষ্ট বর্ণাবলী যেমন আলোকমালার সৃষ্টি করিয়া দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, আমার বিশ্ববিধাত্রী জননী, তেমনি চন্দ্রে সূর্য্যে নক্ষত্রে সমুদ্রে সৈকতে পর্ব্বতে ভূমিতে বৃক্ষে লতিকায় পত্রে পুষ্পে ফলে, মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে মধুর আনন্দ হাস্য ফুটাইয়া দিয়া আনন্দে খেলা করিতেছেন, আবার যখনই তাঁহার সংহারময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে, তখনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই বর্ণাবলীর মত একত্র মিশিয়া পড়িবে অর্থাৎ মা সমস্তকেই—আত্মশরীরে টানিয়া লইবেন, সুতরাং জগৎ এমনি আকাশপাতালধরণী ব্যাপ্ত ভীষণ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে, কেবলই আমার মা,—কালী করালবদনা, এই মত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিবেন,—নিখিল প্রাণী মায়ের তমিস্র ক্রোড়ে ঘোর মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিবে। যদি তাই হয়, তবে অন্ধকারে সমস্ত শোভা লুকাইয়া থাকে, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। আমি বলি সমস্ত শোভা যদি একত্র দেখিতে চাও, সমস্ত রূপ, সমস্ত সত্তা যদি একত্র অনুভূত করিতে চাও, যদি সংসারের মূলীভূত কারণ বা রূপকে পরিচিত করিতে চাও, প্রাণ ভরিয়া অন্ধকারের রূপ দেখিয়া লও। আলোকে তুমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে পার, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে কোনও দিক্ দেখিতে দিবে না, সে শুধু তোমাকে ঊর্দ্ধে লইয়া চলিবে। যাহারা পৃথিবী ধরিয়া চলে তাহাদেরই দিক্‌দর্শনের প্রয়োজন, যাহারা ঊর্দ্ধে চলিতে চাহে, তাহাদের দিক্ দেখিবার প্রয়োজন হয় না, অন্ধকার তাহা-

দিগকে জগতের আদিভূতা সনাতনী চিন্ময়ী শ্যামাশক্তির পাদমূলে উপস্থাপিত করে। তোমরা যদি কেহ ভাল করিয়া অন্ধকার দেখিয়া থাক, যদি অন্ধকার সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া থাক, তবে আশা করি, মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া জীবনের কৃতার্থতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছ! আহা কি আনন্দ! কি পরিপূর্ণ গভীরতা! ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মানন্দ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে এক করিয়া দেয়, অনন্ত অখণ্ড দীপ্তিরাশিতে নিখিল বিশ্ব আলোকিত হইয়া উঠে, সমষ্টির বহির্দ্দেশে ব্যষ্টিভাবনার লেশমাত্রও স্থান পায় না, তুমি আমি সকলি "একমেবাদ্বিতীয়ং" হইয়া যাই। আমার মনে হয়, যদি আমরা তেমনি ভাবে অন্ধকারকে দেখিতে পারি, তবে বুঝি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুভ্র দীপ্তির পরিবর্ত্তে তমিস্রমালা পরিব্যাপ্ত হইয়া একীভূত হইয়া উঠে,—তবে বুঝি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, নদ নদী পর্ব্বত, বৃক্ষ লতা পুষ্প, মনুষ্য পশু পক্ষী সমস্তই "একমেবাদ্বিতীয়ং" হইয়া যায়, বুঝি বা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মসীময়ী সমষ্টি ব্যতীত ব্যষ্টিভাব চিন্তা করিবার অবসরও হইয়া উঠে না। অদ্বৈতদর্শন যদি শান্তিময় হয়, তবে এমন মসীপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্বৈততা কেন শান্তি দান করিবে না, আমি ইহা বুঝি না।

তর্ক করিতে পার, "মৃত্যুর অন্ধকার কেন শান্তিপ্রদ হয় না।" মৃত্যুর পর পারে অন্ধকার তেমন গাঢ়তর নহে বলিয়া, মনুষ্যের প্রাক্তন্ কর্ম্মসূত্র তাহাদিগকে আলোকে আঁধারে ঘুরাইয়া মারে। মৃত্যুর পর পারেও এমনি পাপপুণ্য অর্থাৎ সুখদুঃখময় জগৎ রহিয়াছে,—মৃত্যুর স্বরূপ অন্ধকারময় হইলেও পরক্ষণেই সে প্রাণীকে অন্য লোকে পাঠাইয়া দেয়। সুতরাং সেখানে এমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী অন্ধকার থাকিলে বুঝি বা মৃত্যুকেও ভয় পাইতাম না!

অন্ধকারে প্রেতযোনি সকল নৃত্য করিয়া বেড়ায় বলিয়া অনেক নিরীহ মানুষ ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না, আঁধারে গভীর তিমিরজাল সমাচ্ছাদিত ব্রহ্মাণ্ডে, যে সময়ে আলোকের ক্ষীণশলাকাটীও থাকে না, তখন ছায়াশরীর প্রেতযোনি সকলের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব! আর সম্ভব হইলেই বা তাহারা আলোকে নিয়ত নৃত্যমান পরস্পরের রক্তোরক্তপিপাসু অট্টহাস-ভীষণ-প্রকৃতি তোমার আমার অপেক্ষা এমন কি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল, তাহা ত বুঝিতে পারি না! ভয়ঙ্কর অন্তর্দ্রোহ, ভীষণ প্রতিহিংসা, অমানুষিক স্বার্থ, এবং লোমহর্ষণ জিঘাংসা লইয়া ত প্রেতযোনিসকল বিচরণ করে না, তাহাদের দ্বারা তোমার আমার এমন কি অনিষ্ট হইতে পারে? তুমি যদি আলোকের পিশাচ-প্রকৃতি নরপ্রেতদিগকে বিশ্বাস করিতে পার, তবে আঁধারের প্রেতযোনিদিগকেও বিশ্বাস করিও;—আমার ধারণা তাহাদের দ্বারা তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না, যদি আত্মশরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল ও হস্তপদাদিকে বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হইলে তাহাদেরও বিশ্বাস করিও, তোমার যদি অনিষ্ট হয় তবে মনে করিতে পারিবে, আলোকের অপেক্ষা আঁধার তোমার অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই!

আর দেখ, আঁধারকে কেহ মন্দ বলিও না, আমার যেন কি জানি প্রাণে বড় বাজে। আমি আঁধার দেখিতে বড়ই ভালবাসি। নবীন—নিবিড় জলঘটাচ্ছাদিত ব্যোমমণ্ডল, গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন ধরণীতল, আমাকে যেন নূতন ভাবে মোহিত করিয়া দেয়; আমাকে যেন নূতন মার্গে সৃষ্টিতত্ত্বের সীমা

প্রান্তে পৌঁছাইয়া দেয়! আর জান কি আমার মন কৃষ্ণরূপিণী প্রকৃতি শ্যামা মায়ের মোহনরূপখানি জাগাইয়া দেয়! আর আমার মনে হইতে থাকে, সহজে সৃষ্টিতত্ত্ব বিকাশ করিবার জন্যই বুঝি আমার মা আদি প্রকৃতি শ্যামার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কল্পনা করা হইয়াছে, এবং এই জন্যই বুঝি বিভিন্ন মতেও সৃষ্টিতত্ত্বের আদি বীজ শ্রীকৃষ্ণের নবীননীরদজাল বিনিন্দি শ্যামলরূপ! তোমরা যাহাই বল, আঁধার বা সর্ব্বরূপের আঁধার আমার বড়ই প্রিয়তম। আমি তাহাকে যখনই দেখি, তখনই ভাবি এই বুঝি আমার মা অভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার দীন-হীন পতিত সন্তানকে কোলে টানিয়া লইতে আসিয়াছেন! প্রাণ শীতল হইয়া যায়, আমার প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

ধীরে ধীরে শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। বুঝিবা এতক্ষণে নিদ্রাদেবীর অভিমান ঘুচিয়া থাকিবে। ধীরে ধীরে কাছে নিদ্রাদেবী আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। চিন্তাদেবী ত রাগে গস্ গস্ করিয়া উঠিলেন! দেখিতে দেখিতে দু'জনাতে বেশ একটু দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। দীর্ঘ জাগরণ ও আকাশপাতালভ্রমণে চিন্তাদেবী একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুঝি সেই জন্যই নিদ্রাদেবী জয়লাভ করিয়া আমাকে বিনা বাক্যব্যয়ে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। আমিও অলক্ষ্যে অনন্ত অন্ধকাররাশির অভয় ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া মাতৃক্রোড়ের বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম!!!

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অহল্যা—বৃদ্ধাশ্বের কন্যা, গৌতম ঋষির পত্নী। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র শতানন্দ জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। একদা প্রত্যূষে গৌতম ঋষি স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এই অবকাশে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার কামাভিলাষ ব্যক্ত করেন। অহল্যা তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়াও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। এ দিকে ইন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে গৌতম স্নান করিয়া প্রত্যাগত হন, এবং সমুদায় ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উভয়কে অভিসম্পাত প্রদান করেন। ঋষিবরের শাপে ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যোনি-চিহ্ন হইল, এবং অহল্যা নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িনী পাষাণরূপিণী হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে, রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রসহ মিথিলাগমনকালে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে অহল্যার শাপ মোচন হয়। তখন গৌতম পুনরায় ইঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—"ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিতেছেন, 'হে অমরেন্দ্র! আমি বুদ্ধিদ্বারা কল্পনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদিগের

সকলেরই এক বর্ণ, এক ভাষা, এবং সকল বিষয়েই তাহারা এক প্রকার। কোন লক্ষণে কিংবা আকৃতিতে তাহাদিগের কিছুই ইতরবিশেষ ছিল না। তাহার পর একাগ্রচিত্তে আমি প্রজাদিগের বিষয়ে চিন্তা করিলাম। তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ করিবার জন্য আমি একটী স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলাম। যে প্রাণীর যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট, আমি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে রূপগুণসম্পন্না অহল্যা কন্যাকে নির্ম্মাণ করিলাম। হল শব্দে বৈরূপ্য; এবং হল হইতে যাহা প্রভূত হইয়াছে, তাহাকে হল্য কহে। যাহার শরীরে কিছুই বৈরূপ্য নাই, তাহাকে অহল্যা বলা যায়। আমি তাহার অহল্যা এই নাম রাখিয়াছিলাম। হে দেবেন্দ্র! তাহার পর সেই কন্যা নির্ম্মাণ করা হইলে সে কাহার হইবে, আমার এই চিন্তা হইতে লাগিল। হে পুরন্দর! তুমি স্বর্গের রাজা, তুমি মনে করিয়াছিলে সেই কন্যা তোমারই হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে গৌতমের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলাম। অনেক বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া তিনি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। সেই মহামুনির স্থৈর্য্য এবং তপঃসিদ্ধি জানিতে পারিয়া আমি তাঁহাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিলাম। মহামুনি তাঁহাকে লইয়া রসভাবে সহবাস করিতে লাগিলেন। গৌতমকে কন্যাদান করা হইলে দেবতারা নিরাশ হইলেন। তুমি কামাতুর হইয়া ক্রুদ্ধমনে মুনির আশ্রমে গিয়া সেই দীপ্ত অগ্নিসদৃশ অহল্যাকে দেখিয়াছিলে। তৎকালে তিনি কামার্ত্ত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, এবং তুমি তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিলে। মহর্ষি তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন সেই তেজস্বী ঋষি তোমাকে এই শাপ দিলেন যে, 'তোমার দশায় ও ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটিবে।'

অহল্যাবাই—মালব প্রদেশের প্রসিদ্ধা রাজ্ঞী; বিখ্যাত মল্হর রাওএর পুত্র কুণ্ডজী রাওএর পত্নী। ইঁহার মালীরাও নামে এক পুত্র ও মুক্তাবাই নামে এক কন্যা ছিল। যশোবন্ত রাওএর সহিত এই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা বর্ত্তমানেই মালী রাওএর মৃত্যু হয়। পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মল্হররাও হোলকারের লোকান্তর হইলে কুণ্ডজীর পুত্র মালীরাও মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু নয় মাস পরে মালীরাওএর মৃত্যু হইলে অহল্যাবাই পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ও কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে ইনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। পরন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিনারক্তপাতেই সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইনি রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভারতের অন্যান্য রাজধানীতে ইনি দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার রাজধানীতেও অন্যান্য রাজগণের দূত ছিল। ইনি অতিশয় দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোকহিতৈষিণী রমণী ছিলেন। ইনি লেখাপড়াও উত্তমরূপ জানিতেন, এবং হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে ইঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। ইনি মৎস্যমাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি বহু লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া

গিয়াছেন। ইঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সিংহাসনাধিরোহণকালে ইনি রাজকোষে দুই কোটি টাকা মজুদ্ পাইয়াছিলেন। এ সমস্ত অর্থই ইনি দেবমন্দির, ধর্ম্মশালা, রাজপথ-নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। ইনি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ এবং কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত গয়াধামের বিষ্ণুপদমন্দির ও নাটমন্দিরের তুল্য উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম্ম ভূমণ্ডলে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইঁহার ন্যায় রাজকার্য্যদক্ষা অতি অল্প রমণীই নরলোকে আবির্ভূতা হইয়াছেন। হিন্দুললনারা যে অন্তঃপুর-নিবদ্ধা দাসীমাত্র নহে, প্রত্যুত সুদুরূহ রাজকার্য্য সম্পাদনেও সবিশেষ দক্ষা, অহল্যাবাই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। ত্রিশ বৎসর কাল সুশৃঙ্খলায় রাজ্য শাসন করার পর ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ষষ্টিবৎসর বয়সে এই গুণবতী রমণী লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

আউলচাঁদ—চৈতন্যসম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখাস্বরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় মতের প্রবর্ত্তক। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউল চাঁদ [illegible]ত হইয়া এই মত প্রথম প্রকটিত করেন। আউল চাঁদের শিষ্যেরা তাঁহাকে 'জয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম 'কর্ত্তাভজা' হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে ঘোষপাড়া-নিবাসী রামশরণ পালের যত্নেই এই মতের সমধিক প্রচার হয়। অদ্যাবধি ঘোষপাড়ায় দোলের সময়ে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতী'। দীক্ষার সময়ে 'মহাশয়' শিষ্য বা শিষ্যাকে প্রথমে এই উপদেশ দেন যে, 'গুরু সত্য'। অতঃপর গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবি ?' শিষ্য উত্তর করে, 'পারিব'। তখন গুরু বলেন, 'তবে তুই মিথ্যা কথা কহিবি না, পরস্ত্রী গমন করিবি না, আপনার স্ত্রীসঙ্গও অধিক করিবি না'। শিষ্য অঙ্গীকার করে, 'করিব না'। শেষে গুরু বলেন, 'বল্, তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য। শিষ্য তাহাই বলিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে। ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রথমে এই সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র ব্যভিচার-দোষ ছিল না। ইহাদের একটী চলিত বচন আছে, 'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা'। এই নিয়মানুসারে পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগিনী জ্ঞান করিতেন ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরন্তু কালক্রমে স্ত্রীপুরুষে একত্র বাস করিতে করিতে এক্ষণে ব্যভিচার এই সম্প্রদায়ের সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন অনেকে, বিশেষতঃ বহু সুবর্ণবণিক ও ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক এই মত গ্রহণ করিয়াছে।

"প্রকৃতি সাধন বিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায় অনেক ভাব অবলম্বন করে, কিন্তু বোধ হয় কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদারভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থসাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতিসহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না;

কি প্রকাশু, কি অপ্রকাশু, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধনসম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। ফলতঃ ইহারা কিরূপ সরল স্বভাবলম্বী তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষ্যা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত, ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে। বাউল ও ন্যাড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে।"

আদিত্য—অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, যথা— ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে অসমর্থা হইলে তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন; সেই দ্বাদশ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নামে দ্বাদশ মাসে উদিত হইয়া থাকে; যথা;—মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ্ণু; ইহাঁরাই কশ্যপতনয় দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রকীর্ত্তিত। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়;—মিত্র অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, এবং অংশু। তৈত্তিরীয়ে আট;—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্।

আদিশূর—ইনি হিন্দুরাজত্বকালের বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সময়ে বঙ্গে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবহেতু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের সহিত যে কয়েকজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গের উত্তর রাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বহুকাল অপুত্রক থাকায় আদিশূর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ উপলক্ষে ইনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনান। এই ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্ত্তমান রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ এবং এই সকল ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরেরাই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। এই যজ্ঞের পর আদিশূরের একটী পুত্র জন্মে। কিন্তু অল্প বয়সেই পুত্রটী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় আদিশূর স্বীয় তনয়া লক্ষ্মীকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। ইনি ঠিক কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ কেহ বলেন ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণ গ্রামে (সোণার গাঁয়) ইহাঁর রাজধানী ছিল।

আরুণি—জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের নাম। ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থ আয়োদধৌম্য নামক ঋষির শিষ্য হইয়াছিলেন এবং অতার্কিতভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতেন। ইহাঁর গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদা ধৌম্য ইহাঁকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে

নিযুক্ত করেন। জলের স্রোতে আলি ভাসিয়া যাওয়ায় এবং জলরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া আরুণি স্বয়ং তথায় শয়ন করিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষা করেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ধৌম্য সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অতি যত্ন-সহকারে শিক্ষা দিয়া অল্পকাল মধ্যে আরুণিকে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিলেন।

আর্য্যভট্ট—স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার গ্রন্থে জানা যায় যে, ইনি কুসুমপুরনিবাসী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ ও আহ্নিকগতি ইনিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। পরন্তু বরাহমিহির প্রভৃতি ইঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইঁহার মত গ্রাহ্য করেন নাই। অনন্তর পিথাগোরাস, কোপর্নিকস, গালিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ মত সত্য বলিয়া প্রচার করেন। আর্য্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিত নামক গ্রন্থদ্বয় ইঁহারই বিরচিত।

আবি—একজন দৈত্যের নাম। ইহার পিতার নাম অন্ধক দৈত্য। মহাদেব ইহার পিতা অন্ধককে বধ করিয়াছিলেন। এই হেতু পিতৃহন্তাকে কিরূপে বিনষ্ট করিবে, তাহাই আবির একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পরিশেষে তপস্তা-দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট এই বর লইল যে; রূপান্তর গ্রহণ না করিলে ইঁহার মৃত্যু হইবে না।

পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া আনিয়া মহাদেব যৎকালে মন্দরপর্ব্বতে বিহার করেন, সে সময়ে পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। একদা মহাদেব পার্ব্বতীকে কাল বলিয়া পরিহাস করেন। ইহাতে উমা লজ্জাবোধ করিয়া অরণ্যে গমন করেন। এই সুযোগ পাইয়া আবি সর্পের আকার ধারণ করিয়া দ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক গৃহমধ্যে যাইয়া পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিয়া পিতৃহন্তার বিনাশের চেষ্টা পায়। শিব সমুদায় বুঝিতে পারিয়া রূপান্তরিত দৈত্যের প্রাণ বধ করেন।

আশানন্দ ঢেঁকি——জনৈক বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীর। নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রামে ইঁহার জন্মস্থান। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইঁহার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনীর প্রচার আছে। সে সময়ে এদেশে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বড় বড় জমীদারেরা লাটের সময়ে আশানন্দের নিকট কালেক্টরীর দেয় টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাঁহাদের লোকজন সমভিব্যাহারে সেই টাকা কালেক্টরীতে যাইয়া পৌছাইয়া দিতেন। কথিত আছে যে, এক সময়ে ইনি এইরূপ অনেক টাকা লইয়া যাইবার সময়ে পথে এক দল দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। আশানন্দের সঙ্গে কেবল কয়েকজন পাইকমাত্র ছিল। পাইক-দিগকে টাকা রক্ষা করিতে বলিয়া ইনি একাকী প্রায় দুই শত সশস্ত্র ডাকাতের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাতেরা ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দস্যুদলের দুইজন অগ্র-

নীকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট অস্ত্র দস্যুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আশানন্দ সেই দুইজন ডাকাতকে বগলে পুরিয়া লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে কালেক্টর সাহেবের নিকট অর্পণ করিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কালেক্টর সাহেব ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি আর এক সময়ে এইরূপ টাকা লইয়া যাইবার সময়ে পথে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। ডাকাতেরা টাকার সন্ধান পাইয়া গভীর নিশীথে বাটী আক্রমণ করে। গোলমালে আশানন্দের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, ইনি তাড়াতাড়ি আর কিছু না পাইয়া ঢেঁকিশালা হইতে ঢেঁকি লইয়া তাহাই ঘুরাইতে ঘুরাইতে দস্যুদলের সম্মুখীন হইলেন, এবং ঢেঁকির প্রহারে ডাকাতগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেই হইতে ইহাঁর নাম "আশানন্দ ঢেঁকি" হইল। এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়া ইনি অনেকবার ডাকাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ইহাঁর বিলক্ষণ আহারশক্তি ছিল। দরিদ্রের উপর ইহাঁর অসাধারণ দয়া ছিল।

আস্তিক, আস্তীক—একজন মুনি। ইহাঁর পিতার নাম জরৎকারু মুনি, বাসুকির ভগিনী জরৎকারু (মনসাদেবী) ইহাঁর জননী। কথিত আছে যে, জরৎকারু (অর্থাৎ মনসাদেবী) স্বামীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে জরৎকারু মুনি, "অস্তি" (অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে) বলিয়া চলিয়া যান; সেই হেতু ইহাঁর নাম "আস্তিক"। অভিমন্যু-তনয় মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে তক্ষকদংশনে মৃত্যু হওয়ায়, তৎপুত্র জনমেজয় সর্প যজ্ঞ করিয়া নাগকুল নির্ম্মূল করিলে, সর্পরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীর দ্বারা আস্তিককে সমুদায় জ্ঞাপন করেন। আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত করেন। অতঃপর জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে আস্তিক বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইছাই ঘোষ—অজয় নদের তীরবর্ত্তী ঢেকুর নামক জনপদের অধিপতি; ইনি জাতিতে গোপ, শক্তির উপাসক। সে সময়ে ঢেকুর, বঙ্গের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে ইছাই স্বাধীন হইলেন, ইনি গৌড়রাজকে আর কর দিতে চাহিলেন না। গৌড়রাজ ইহাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন,—যুদ্ধে গৌড়রাজ পরাজিত হইলেন। ইছাই ঘোষ বহুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেন। এ দিকে গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। গৌড়রাজ ভাগিনেয়কে ইছাই ঘোষের দমনার্থে প্রেরণ করিলেন। দুই বীরে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। এবার ধর্ম্মবীর লাউসেনের জয় হইল,—ইছাই নিহত হইলেন। অজয় নদের পারে এখনও ইছাই ঘোষের রাজবাটীর চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে।

ইড়া—মনুকন্যা ইড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; "প্রজাপতির ইচ্ছায় মনু পাকযজ্ঞ করেন। যজ্ঞার্থ ঘৃত, দধি, ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংবৎসর মধ্যে এক

কন্যা উৎপন্ন হন। তাঁহার নিকট মিত্রা-বরুণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' উত্তর হইল, 'মনুর কন্যা'। তাঁহারা পুনরপি বলিলেন, 'তুমি আমাদের'; কন্যা বলিলেন, 'না, যিনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমি তাঁহারই'। তথাপি তাঁহারা কন্যাকে পুনরায় চাহিলেন। তখন তিনি কোনও উত্তর না দিয়া মনুর নিকট গমন করিলেন। মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' কন্যা উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার তনয়া; আপনার ঘৃত, নবনী, আমিক্ষা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন, আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।' অতঃপর সেই কন্যাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মনু প্রজাপতি হইলেন।

ইন্দুমতী—সূর্য্যবংশীয় অজনামক রাজার পত্নী; দশরথের মাতা, সুতরাং রামচন্দ্রের পিতামহী। ইহার স্বয়ংবরকালে ইনি অন্যান্য নৃপবৃন্দকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজ অজকে বরমাল্য প্রদান করেন। ইহাতে উপেক্ষিত রাজগণ অজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অজ তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া ইন্দুমতীসহ অযোধ্যায় উপনীত হন। কিছুকাল পরে এক দিন ইন্দুমতী পতির সহিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে শূন্যপথগামী দেবর্ষি নারদের বীণা হইতে পারিজাতমালা স্খলিত হইয়া ইহাঁর দেহে পতিত হওয়ায়, ইহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্র—পৌরাণিক মতে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ সকলেই ইহাঁর অধীন। ইহাঁর রাজ্য অমরাবতী (স্বর্গ), উদ্যানের নাম নন্দন (তথায় পারিজাত বৃক্ষ আছে), অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রধনু, অস্ত্র বজ্র। তিলোত্তমা সৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমার দর্শনলালসায় ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে সহস্রসংখ্যক নেত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতেই ইন্দ্র সহস্রলোচন হন। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করায়, তদীয় পতি মহর্ষি গৌতমের শাপে ইহাঁর সর্ব্ব গাত্রে নেত্রাকার সহস্রসংখ্যক স্ত্রী-চিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্র পুলোমানামক দানবের কন্যা শচীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম জয়ন্ত। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ও বানররাজ বালী ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া কথিত।

দৈত্য, দানব, রাক্ষসপ্রভৃতি দেব ও বেদবিদ্বেষীদিগকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ও লোকস্থিতি রক্ষা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট নিজেও পরাজিত হইতেন। এক সময়ে ইনি বৃত্রাসুর দ্বারা পরাজিত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পরে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রাস্ত্রদ্বারা তাহার প্রাণবধ করিয়া অমরাবতী পুনরধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, পণি, বৎস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। নমুচিবধবৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে।

কথিত আছে যে, শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিলে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ হয়। সেইজন্য ইন্দ্র নৃপতিগণের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধানে ব্যাঘাত

জন্মাইতেন। তপস্বী মুনিঋষিরাও ইহার ভীতিষণ ; এজন্য ইনি স্বর্গীয় অপ্সরা দ্বারা তাঁহাদের তপোভঙ্গের চেষ্টা দেখিতেন।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের পুত্র. ইঁহার অপর নাম মেঘনাদ, ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হন ; ইঁহার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর সেকালে অতি অল্পই ছিল ; ইনি মেঘের অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া অর্থাৎ বিপক্ষের অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকিয়া, যুদ্ধ করিতে পারিতেন ; নিকুম্ভিলা যজ্ঞকালে রামানুজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইঁহার নিপাত সাধন করেন [এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখিয়া কবিবর মাইকেল অমরত্বলাভ করিয়াছেন]।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—১। ইনি সূর্য্যবংশীয় এবং অবন্তীর (মালবের) রাজা। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি একদা পুরুষোত্তমবৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণকে নীলাচলে প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে নারায়ণের দর্শন লাভ করিলেন, এবং প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বরূপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা পরিবার ও প্রজাবর্গ সহ দেবর্ষি নারদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুদর্শনাভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে নানারূপ অমঙ্গল দর্শন করিয়া নারদকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় দেবর্ষি উত্তর করিলেন, রাজন্! যে দিন বিদ্যাপতি নীলাচল পরিত্যাগ করেন, সেই দিন রমাপতিও অন্তর্হিত হইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া রাজা হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বিষ্ণুর চারিটী দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের আদেশে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মুহূর্ত্তেক অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমাকে বর দিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্য লোকের ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন, 'তুমি একবার তোমার নিজ রাজ্য হইতে ঘুরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্ত্তি প্রদান করিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন তাঁহার রাজ্যের চিহ্নমাত্র নাই। এই কালের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের রাজ্য চিনিতেও পারিলেন না। অবশেষে সেকালের একটি পেচক ও পরে একটি কূর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী বর্ণন করিল। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন আবার রাজা হইলেন। কৌশাদ্য-রাজের কন্যা মালাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্ম্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। এক দিন জনৈক দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, সমুদ্রতীরে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিম্ববৃক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিম্ববৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। রাজা মহাসমারোহে সেই কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সেই কাষ্ঠদ্বারা জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের

সহিত স্বীয় তনয়া সত্যবতীর বিবাহ দেন।

ইরাবান্—অর্জ্জুনের এক পুত্রের নাম। নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী গোপনে একাসনে অবস্থিত আছেন, অর্জ্জুন সহসা ইহা দর্শন করায় যৎকালে দ্বাদশবৎসর অজ্ঞাত-বাসে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে নাগকন্যা উলূপীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয় ও সেই সময়ে উলূপীর গর্ভে ইরা-বানের জন্ম হয় [অর্জ্জুন দেখ]। মতান্তরে কথিত আছে, নাগ ঐরাবতের পুত্র গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হইলে বংশরক্ষার্থে নাগ চিন্তিত হইলেন এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান্ নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া লন।

যাহা হউক, ইরাবান্ নাগলোকেই প্রতিপালিত হন এবং একজন মহাবীর ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। কুরুক্ষেত্র সমরকালে পিতা ইহলোকে বর্ত্তমান আছেন শুনিয়া ইনি তথায় গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে ইনি অষ্টম দিনের যুদ্ধে আপনার অশ্বসেনা দ্বারা সৌবলরাজের অশ্বসেনা ধ্বংস করেন। অতঃপর অলম্বুষ রাক্ষসের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ইলা—বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী ও পুরূরবার জননী। মনু একটি যজ্ঞ করিয়া মিত্রাবরুণের উপাসনা করেন; পরন্তু তাহাতে সামান্য ত্রুটি হওয়াতে পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা উৎপন্ন হয়। পরে সেই কন্যা বিষ্ণুর বরে পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। অনন্তর একদিন বৃষধ্বজপদেশে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমার বনে প্রবেশ করায় ইনি পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পুরোহিত বশিষ্ঠ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইনি একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী হইবেন। এইরূপ স্ত্রী অবস্থায় বুধের সহিত ইঁহার বিবাহ ও তাঁহার ঔরসে ইঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র হয়। পুরুষ অবস্থায় ইঁহার তিন পুত্র হয়,—উৎকল, গয় ও বিমল।

ইল্বল—দৈত্যবিশেষ; সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির ঔরসে ইহার জন্ম, এই জন্য ইহার আর এক নাম সৈংহি-কেয়। মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। এই দৈত্য নানা মায়া শিক্ষা করিয়াছিল। সে এত মায়া জানিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া যমালয়ে গিয়াছে, ইল্বল ডাকিলে সেই মৃত ব্যক্তি সশরীরে উপস্থিত হইত।

ইহার কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্রের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ তাহার অভি-মত বর না দেওয়ায় বাতাপি ও ইল্বল উভয়েই ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং তদবধি ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। ইল্বল আপনার কনিষ্ঠ বাতাপিকে মেষ-রূপ ধারণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে কাটিত, এবং তাহার মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়াইত। পরে ইল্বল বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে সজীব হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা পঞ্চত্ব পাইত। এইরূপে বহু ব্রাহ্মণের বিনাশসাধন করিলে পর, একদা অগস্ত্য মুনি কতকগুলি রাজর্ষি সমভিব্যাহারে

ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে ইল্বল পূর্ব্বের ন্যায় মেষরূপী বাতাপিকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস পাক করিল। তদ্দর্শনে রাজর্ষিরা ভীত হইলেন। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন, "ভয় নাই, আমি ঐ মাংস ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া অগস্ত্য সমুদায় মাংস এককই ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর ইল্বল 'বাতাপি, বাতাপি' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সেই সময়ে অগস্ত্যের বায়ু নিঃসরণ হইল। তিনি বলিলেন, 'কোথায় তোর বাতাপি, সে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।' ইহা শুনিয়া ইল্বল অগস্ত্যের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন অগস্ত্যের নেত্র-নিঃসৃত বহ্নি তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

ঈশ্বর কৃষ্ণ—ইনি একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার প্রণীত সাংখ্যকারিকা সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ইনি একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যজাতীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি বড় দুরন্ত ছিলেন; লেখাপড়ায় ইঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না; গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। কথিত আছে যে, ইনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় দেড় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থ সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা লিখিবার সখ ছিল। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপুত্র মহেশচন্দ্রের সহিত ইঁহার কবিতার লড়াই হইত। মহেশচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। কোন কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত থাকিতে তিনি আর কবিতা লিখিবেন না। ফলতঃ এ প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন মহেশচন্দ্রকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "দাদা, লেজ গুটালে কেন? তাহাতে মহেশচন্দ্র উত্তর করেন;—

ওরে দুই ভায়ের দুই থাক্‌লে লেজ,
থাকৃত না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে,
সোণার লঙ্কা ছারখার॥

দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরে ইঁহার পিতা দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন। ইনি এখানে থাকিয়া ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা করেন, কিন্তু অনুরাগের অভাবে তাহাতেও অধিক উন্নতি করিতে পারিলেন না। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুপ্তিপাড়ায় গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণি নাকি দেখিতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না, অধিকন্তু কতকটা হাবা বোবার মত। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়েও সুখী হইতে পারিলেন না।

কলিকাতার ঠাকুর বংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদাই ঠাকুর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে *গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র

যোগেন্দ্রমোহনের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়েই সমবয়স্ক। কথিত আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্র মোহনেরও রচনাশক্তি জন্মিয়াছিল। এই যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রভাকরও অদৃশ্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তি দেখিয়া আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ঐ বৎসরেই "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত পত্রিকার লেখা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন এবং শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া ১২৪২ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১২৪৫ সালে প্রভাকর দৈনিক আকার ধারণ করে। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। ইহার কিছুদিন পরে স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পুস্তিকা প্রচার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রতিবাদস্বরূপ ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া বিধবা বিবাহ বিরোধীদিগের চিত্তরঞ্জন করেন। ১২৫৩ সালে ইনি "পাষণ্ডপীড়ন" নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) রসরাজ নামে এক খানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রও পাষণ্ড পীড়ন পত্রে গৌরীশঙ্করের কবিতার উত্তর দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দুইখানি পত্রই উঠিয়া যায়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালে "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের কবিতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় ১০ বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত ও অনেক লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধার বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। ১২৬৪ সালে ইনি সংবাদ প্রভাকর পত্রে 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিত প্রভাকর' ও 'বোধেন্দুবিকাশ' নামক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; পরন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথমে কেবল নিজের লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইনি বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তেমনই তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেন। ইনি মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন।

ইঁহার বাড়ীতে সদাব্রত হইত। অন্নপ্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। ইনি খুব উচ্চশ্রেণীর কবি না হইলেও একজন স্বভাবকবি ছিলেন। ইঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের ভারে মধ্যে মধ্যে পীড়িত। হাস্যরসে ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বস্তুতঃ হাস্যরসে ইনি অদ্বিতীয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত মহেশচন্দ্র গভীর দুঃখের সহিত গাহিয়াছিলেন ;—

সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
অগ্রে কলম ধরেনিক রাম হল তার এডিটর।
আগা পাছ বাদ দিয়ে শ্রাম হল কমাণ্ডর।

ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর—ইনি বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। বাঙ্গালা ১২২৭ সালের (১৮২০ খৃঃ অব্দের) ১২ই আশ্বিন তারিখে বীরসিংহ গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সে সময়ে বীরসিংহ হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে বাঙ্গালার খ্যাতনামা লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস অতি অল্প বেতনের চাকুরি করিতেন,—পরিবার লইয়া বিদেশে থাকিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে মাতা ও পিতামহীর সহিত বীরসিংহে থাকিয়া গ্রাম্যপাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। অতঃপর ৯ বৎসর বয়সের সময়ে পিতার সহিত পদব্রজেই কলিকাতায় আগমন করেন। প্রতিভাবান্ পুরুষের বাল্যেই প্রতিভার বিকাশ হয়। পথে আসিবার সময় মধ্যে মধ্যে মাইল-নির্দ্দেশ-প্রস্তর সকল (Milestones) দেখিয়া ইনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন "বাবা! রাস্তায় শিলের মত ওগুলা কি পোতা রহিয়াছে ?" ঠাকুরদাস সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে বালক উহা হইতেই ইংরেজী অঙ্কচিহ্নগুলি (১,২,৩ ইত্যাদি) শিখিয়া লইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। বালক একেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন; তাহার উপর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে অধ্যয়ন করায় প্রত্যেক বারেই বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালমধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ১৮৪০ খৃঃ অব্দে কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগরের পিতার আয় অতি সামান্য ছিল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ আরও দুইটী সহোদর বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। সুতরাং পাচক বা দাসদাসী রাখিয়া বাসার এতগুলি লোকের ও দেশের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বাসার সমস্ত কাজ করিয়া ও তৎপরে পাক করিয়া পিতাকে ও ছোট ভাই দুইটীকে খাওয়াইয়া তবে নিজে খাইতেন। দুই বেলাই এরূপ করিতে

হইত, কাজেই রীতিমত পুস্তক পাঠের সময় তাঁহার ছিল না। পাক করিবার সময়েও পুস্তক নিকটে রাখিতেন এবং অবকাশ পাইলেই একটু পড়িয়া লইতেন। এইরূপ দারিদ্র্যে লালিত পালিত হওয়াতেই বিদ্যাসাগর দরিদ্রের মর্ম্ম-ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর নামেও পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। বিলাত হইতে আগত নূতন সিভিলিয়ান সাহেবেরা এই কলেজে এদেশের ভাষা কিছু শিক্ষা করিয়া তবে স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইতেন। এক্ষণে বিদ্যাসাগরকে সর্ব্বদাই সাহেব-দিগের সংস্রবে আসিতে হইত;—ইংরেজী জানা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকালমধ্যে উহাতেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। সাহেবদিগের পরীক্ষার হিন্দি কাগজও তাঁহাকে দেখিতে হইত, এই নিমিত্ত বিদ্যাসাগর হিন্দি ভাষাও শিক্ষা করিয়া লইলেন। ফলতঃ বিদ্যা-সাগরের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

বিদ্যাসাগরের কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত ইহাঁর মতের মিল না হওয়ায়, পর বৎসরেই ইনি ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন। এবারে তথাকার প্রধান কেরাণী (Head writer) হন। পদের মাসিক বেতন ৮০৲ টাকা। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যা-ধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালের পদ ছিল না। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে প্রথম প্রিন্সিপাল হন। এইখানে তাঁহার বেতন ক্রমে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে কলেজের অধ্যক্ষতা সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট ইহাঁকে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক (Special Inspector of Schools) নিযুক্ত করেন। দুই পদে এক্ষণে বিদ্যাসাগরের বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকা হইল।

এই সময়ে ইনি একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু-বাল বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, তাহাই প্রতি-পাদনার্থে পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। দেশময় তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজে অজ্ঞাত অসজ্ঞাত, কৃতবিদ্য, মূর্খ, সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবধেরও কল্পনা করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর স্বদেশীয় লোকের গ্লানি, নিন্দাবাদ, কুৎসা,

নির্যাতন প্রভৃতি অকাতরে সহ্য করিয়া অকুতোভয়ে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধবা-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইলেন। তিনি কেবল আইন করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে দেশের নানা স্থানে কয়েকটি বিধবাবিবাহও সাধিত হয়। এমন কি নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রেরও একটী বিধবার সহিত বিবাহ দেন। বিধবাবিবাহের আইন প্রচলিত করিয়া তিনি হিন্দুসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই, পরন্তু এই কার্য্যে তাঁহার ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্য করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর হ্যালিডে সাহেবের পরামর্শে দেশের নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে ইয়ং নামক এক উদ্ধত যুবক সিভিলিয়ান নূতন ডিরেক্টর হন। কোন কোন বিষয়ে এই সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের মতের অমিল হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মনের অকৌশল চলিতেছিল। বালিকাবিদ্যালয়-সংস্থাপনের কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগর ঐ সকল স্কুলের বিল করিলে ইয়ং সাহেব সুবিধা পাইয়া সেগুলি অগ্রাহ্য করিলেন। হ্যালিডে সাহেবও এসময়ে নিরুত্তর রহিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর অনায়াসে ৫০০৲ টাকা বেতনের চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

সকলমঙ্গল বিশ্বনিয়ন্তা যাহা কিছু করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। বিদ্যাসাগরের এই কর্ম্ম ত্যাগ প্রভূত মঙ্গলের নিদান হইল। তাঁহাকে এক্ষণে একমাত্র লেখনীর উপরই আত্মনির্ভর করিতে হইল। তাঁহার ব্যয় বড় কম ছিল না। সেই ব্যয়ের অধিকাংশই তাঁহার দানে যাইত; তিনি যথার্থই মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে?" বস্তুতঃ দরিদ্রের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া শোণিতধারা তীব্রবেগে ছুটিত, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। এ সকল কবিকল্পনা বা অতিরঞ্জিত চাটুবাদ নহে। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত। ১৮৬৬-৬৭ খৃঃ অব্দে দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—যাহা "বায়াত্তরে মন্বন্তর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—সেই দারুণ দুঃসময়ে বিদ্যাসাগর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া প্রায় ছয় মাস কাল সহস্র সহস্র অন্নপ্রার্থীকে অন্ন বিতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র কিনিয়া বস্ত্রহীনদিগকে দান করেন। বঙ্গদেশে ধনাঢ্যের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে, কিন্তু কয়জন ধনবান্ দানশীলতায় ধনহীন বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ হইতে পারেন? এই সকল ব্যতীত তিনি গোপনে কত দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের যে সাহায্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার বিধবাবিবাহ ব্যাপারে তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেবল পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া তিনি এই

সকল ব্যয় নির্ব্বাহ ও সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াও অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি যদি দানশীল ও মুক্তহস্ত না হইতেন তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। বলিতে কি, বিদ্যাসাগরই বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের জনক। তিনি সরকারি কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে আমরা এতগুলি সুন্দর বাঙ্গালা পুস্তক পাইতাম কি? তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার কর্ম্মত্যাগে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি তাঁহার মেট্রপলিটান কলেজ। এই সময়ে সকলেরই ধারণা ছিল, সাহেব অধ্যাপক না হইলে কলেজ চলিতে পারে না। সাহেবরাও অহঙ্কার করিয়া বলিতেন, বাঙ্গালীরা আর যাহাই করুক, নিজে নিজে কলেজ চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। এইরূপ বিবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিদ্যাসাগর নিজব্যয়ে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। প্রথম বর্ষের (১৮৭৪ খৃঃ অব্দের) এফ এ পরীক্ষার ফল দেখিয়া সাহেবরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে উক্ত কলেজে বি, এ, ক্লাশ খোলেন। বি, এ পরীক্ষাতেও প্রথম বৎসরেই (১৮৮১ খৃঃ অব্দে) ১৬ জন ছাত্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রী প্রাপ্ত হইল। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিঃস্বার্থতাই এরূপ উন্নতির একমাত্র কারণ। অতঃপর তাঁহার দেখাদেখি অনেক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি এক একটি দোকান, আয়ের সম্পত্তি। বিদ্যাসাগর কখনও আপনার কলেজের এক কপর্দ্দকও নিজের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতেন না। কলেজের উদ্বৃত্ত টাকা কলেজের উত্তম বাটী, সুন্দর পুস্তকালয়, যন্ত্রালয় প্রভৃতি ব্যাপারেই ব্যয়িত হইত।

ইহা ভিন্ন তিনি জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শত শত বালককে অন্ন বস্ত্র দিয়া আপনার বাটীতে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। যেকোনও অনাথ বালক যখনই তাঁহার নিকট আপনার দুরবস্থার কথা জানাইয়াছে, তখনি বিদ্যাসাগর সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সকল অভাব দূর করিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এত দয়া না থাকিলে তাঁহার নাম 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' হইবে কেন? শেষ অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি বৈদ্যনাথের নিকট কর্ম্মাটাঁড় নামক স্থানে স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া থাকিতেন। সেখানকার অসভ্য সাঁওতালদিগকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করিতেন; তাহাদের রোগের সময়ে ঔষধপথ্য দিতেন, সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাহারাও বিদ্যাসাগরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তেমনি হৃদয়ে অসাধারণ বলও ছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে যেমন তাঁহার হৃদয় করুণারসে বিগলিত হইত, আত্মীয় স্বজনের দোষ দেখিলে আবার

সেই হৃদয় ক্রমে [illegible] বজ্রাদপি কঠোর হইয়া পড়িল। অন্য লোকের সহস্র দোষ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন, ক্ষমা করিয়া তাহার দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন ; কিন্তু আপনার পরিজনবর্গের কাহারও দোষ দেখিলে তাঁহার অসহ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, তিনি যেরূপ আদর্শ পুরুষ, তাঁহার পরিবারের সকলেই সেইরূপ আদর্শ-পুরুষ হইবে। তাহার অন্যথা দেখিলেই তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। অধিক কথা কি, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এতদূর বিরক্ত ও রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি অক্লেশে নারায়ণকে ত্যজ্য পুত্র করেন। এইরূপ কতিপয় কারণে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন বিষাদময় হইয়া পড়িয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় ভক্তিময় ছিল। জনকজননীকে তিনি আরাধ্য দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। একবার কাশী-ধামে অনেক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মানেন কি না। বিদ্যাসাগর হাসিতে হাসিতে আপনার পিতামাতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করেন "ইনি আমার বিশ্বেশ্বর, আর ইনিই আমার অন্নপূর্ণা।" বস্তুতঃ তিনি পিতা মাতাকে ঈশ্বরতুল্য মান্য করিতেন। বৃদ্ধ পিতামাতার মৃত্যুতে প্রৌঢ় বিদ্যা-সাগর মাতৃহীন শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং কিছুদিন বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহা-দের প্রতিমূর্ত্তির দিকে ঊর্দ্ধে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতেন এবং অনবরত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। এরূপ মাতাপিতৃভক্ত লোক আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার দিনে এ দেশে নিতান্ত বিরল, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণতার ও লোকহিতৈষিতার। পথি-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেশ্যারাও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হইত না। আধুনিক মহাশয়েরা পাশ্চাত্য লোকহিতৈষী হাও-য়ার্ড প্রভৃতির নামে মন্ত্রমুগ্ধ হন, কিন্তু ঘরের রত্ন চিনিতে পারেন না। বাস্ত-বিকই বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। আশা করি, শিক্ষিতমাত্রেই ইঁহার বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠ করিবেন। যাঁহারা বাঙ্গালা জানেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার কৃত "বিদ্যাসাগর" পাঠ করুন, আর যাঁহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা আমাদের কৃত ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত পাঠ করুন, সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের ২৯ শে জুলাই রাত্রি ২ টার সময়ে (ইংরেজী হিসাবে ৩০শে জুলাই) ভারতমাতার এই সুসন্তান সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেশের যে অভাব হইয়াছে, তাহা কস্মিন্‌কালেও যে পূরণ হইবে তাহা বোধ হয় না, কারণ আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, যেমনটি যাই-তেছে, তেমনটি আর হইতেছে না। তবে তিনি আমাদিগের শিক্ষার্থ যে সকল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি তাহার কণামাত্রও অনুকরণ করিতে পারি, তবেই বুঝিব যে এদেশে ওরূপ মহাপুরুষের জন্ম বৃথা হয় নাই। বিদ্যা-সাগর বুঝি এই হতভাগ্য দেশে না

জন্মিয়া পাশ্চাত্য কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে আমরা দেখিতাম, সে দেশের ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও জীবনের আলোচনা হইতেছে। দেশের কি দুর্ভাগ্য যে, সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির সহিত এতদিনের সংস্পর্শেও আমরা মহানুভব বীরপুরুষের প্রকৃত পূজা করিতে শিখিলাম না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকাবলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ অষ্ট শতাধিক পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ পুস্তকই অপাঠ্য। কতকগুলি আবার বিশিষ্টরূপ অহিতকর। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গভাষায় লিখিত সকল শ্রেণীর দুই চারি খানি পুস্তকের আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। প্রথমে আমরা উপন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আলোচ্য বর্ষে ৬২ খানি উপন্যাস বাহির হইয়াছিল। নিম্নে কয়েকখানি উপন্যাস আলোচিত হইল।

উপন্যাস।

১। মরা মেম। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা ৫৭।১ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস। ভবানীপুরের নিকটবর্ত্তী একটা পুষ্করিণীতে একটি মেমের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। তাহাকে কে হত্যা করিল, কেনই বা হত্যা করিল, এই সব বিষয় "মরা মেমে" বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য ঘটনারও অবতারণা করা হইয়াছে। ডিটেক্‌টিভ পুলিশ বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই হত্যাকারীকে ধৃত করিয়াছিল। উপন্যাস খানি আদ্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

২। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন। স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা বিরচিত। কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান কালের ন্যায় যখন বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই, বর্ত্তমান কালের ন্যায় যখন মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তুত হয়; এবং বিলাত হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বিলাত হইতে এই দেশে যাঁহারা সিবিলিয়ান, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য "বত্রিশ সিংহাসন" প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষেও তখন এই পুস্তকখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল।

"বত্রিশ সিংহাসন" কৌতূহলোদ্দীপক, মধুর ভাবাপন্ন এবং অতীব আকর্ষণীশক্তিবিশিষ্ট। পড়িবার সময় মনে হয়, যেন কোন উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস পাঠ করিতেছি, গ্রন্থখানি বীর করুণ হাস্য—সকল রসেরই আধার।

আদিরসও ইহাতে প্রচুর আছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি যেন সর্ব্বরসের আধার।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত এক রত্নময় সিংহাসন ছিল। মহারাজের স্বর্গারোহণের পরে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকায় সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিল। কিছুকাল পরে ভোজ রাজার অধিকার সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশিত হয়। ভোজ রাজা ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিবার যে যে দিন স্থির করিতেন, সেই সেই দিনে এক একটী পুত্তলিকা মহারাজকে সম্বোধন করিয়া এক একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিত। প্রত্যেক পুত্তলিকা মনোহর গল্পচ্ছলে রাজাকে বলিত যে,—"মহারাজ,এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন না হইলে ইহাতে আরোহণ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন। সেইজন্ত তিনি এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। আপনার এই যোগ্যতা আছে কি না, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া তার পর আপনি এই সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।" ভোজ রাজা ক্রমে ক্রমে বত্রিশটী পুত্তলিকার বত্রিশটী গল্প শ্রবণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। সেই বত্রিশটী মনোহর গল্পে এই গ্রন্থ সমলঙ্কৃত। গল্পগুলি বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতূহলপ্রদ

একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গদ্য ভাষা কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা সম্যক্ জানিতে পারা যায়। সেকালের ভাষা যেরূপ ছিল, আমরা দেখিতেছি বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ অবিকল তাহাই ছাপিয়াছেন। "শুদ্ধ" করিতে যাইয়া সেকালের ভাষার কোন প্রকার বিকৃতি সাধন করেন নাই।

৩। **একটি সামাজিক চিত্র**। জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক লিখিত। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্ এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রজনীকান্ত বাবুর পরলোকগতা পত্নী "রাজেন্দ্র ও নিরুপমার" গল্প শুনিয়া আপনার দৈনন্দিন লিপিতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পত্নীর আত্মার প্রতি প্রীতির চিহ্নস্বরূপ "একটী সামাজিক চিত্র" নাম দিয়া রজনীকান্ত বাবু তাহাই প্রকাশিত করিয়াছেন। গল্পটী বেশ মনোহর। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

৪। **প্রিয়বালা**। শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। বরিশাল হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার বলেন, এই উপন্যাসখানি একটী ঐতিহাসিক চিত্র। আমরা কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের নামগন্ধও পাইলাম না। তা না হউক, এই উপন্যাসখানির ভাব ও ভাষা ভাল।

৫। **শৈলবালা**। শ্রীযুক্ত নন্দিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৪১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভ কাল লইয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত। উপন্যাসের ভাষা বেশ সুন্দর। ঘটনার বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

৬। **দলিয়া বিবি**। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বটতলা হইতে প্রকাশিত। কাল্পনিক প্রণয়ঘটিত উপন্যাস। বাঙ্গালার নবাব মীরকাশিমের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত।

৭। **প্রভাতী**। শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার সাম্য-যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই উপন্যাসখানি ইতঃপূর্ব্বে "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আজকাল শিক্ষিত সমাজে মদ্যপায়ী চরিত্রহীন স্বামীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মপত্নীর উপর সকল প্রকার অত্যাচারই করিয়া থাকেন। স্বামীর এবংবিধ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে আত্মহত্যা করে, কেহ কেহ বা অভিমানবশতঃ স্বামীর চির-অশান্তির কারণ হয়। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অত্যাচার নিবারণ করে সদুপায় উদ্ভাবন করা এবং ধীরভাবে তাঁহার দোষসংশোধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অশান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। স্বামী স্ত্রীর পরম দেবতা; স্বামীর সুখে স্ত্রীর সুখ, স্বামীর দুঃখেই স্ত্রীর দুঃখ। যে স্ত্রী সেই দেবসেবার মধ্যে "আমিত্ব" হারাইতে পারেন, সেই স্ত্রীই স্বর্গবাসের অধিকারিণী। গ্রন্থকর্ত্রী "প্রভাতী" উপন্যাসে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখানি একখানি সুন্দর স্ত্রী-পাঠ্য উপন্যাস।

৮। **রূপসী মরু-বাসিনী**। ১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। রহস্যময় বিলাতী রমন্যাস অবলম্বনে লিখিত। ন্যূনাধিক ৪০০ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। দীনেন্দ্রকুমার বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। বাঙ্গালা ভাষায় রমন্যাসের একান্ত অভাব, এখানি কিন্তু একখানি খাঁটি রমন্যাস। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সুবিস্তীর্ণ দুর্গম সাহারা মরু ইহার ঘটনাস্থল। মরুচর আরবরমণী ইহার নায়িকা। অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

৯। **গোবিন্দরাম** ডিটেক্টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত। ২৩।১২ সিংহের বাগান হইতে পাল ব্রাদার্স কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। ডিটেক্টিভ গল্পে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ। গোবিন্দরাম উপন্যাসের ভাষা মনোহর, বর্ণনা বেশ চাতুর্য্যময়, রহস্য-বিন্যাস কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাবু এইরূপ উপন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করুন।

১০। **পুলিসকাহিনী**। গ্রন্থকারের নাম নাই। করুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি একখানি ডিটেক্টিভ উপন্যাস। উপন্যাসখানি নিতান্ত মন্দ নয়। ইহাতে পুলিসের অনন্তলীলা প্রকটিত। গ্রন্থকারের বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতা আছে।

১১। **ভাবে অভাব**। শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত। আমাদের "সাহিত্য-সংহিতায়" এই উপন্যাস ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাহাই পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন। সাহিত্য সংহিতায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিতেছি গ্রন্থকার অনেক স্থলে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে কিছু কিছু পরিবর্দ্ধনও করিয়াছেন।

১২। **জয়চাঁদের চিঠি**। শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত। জয়চাঁদের চিঠি "প্রবাহ" মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রবাহ হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। লেখকের

স্বকপোলকল্পিত জয়চাঁদ কিছু দিন পূর্ব্বে যখন পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে নানা স্থান হইতে তিনি ১৪ খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই ১৪ খানি পত্রই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পশ্চিমের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, 'করণ কারণ,' সমাজ-রহস্য, ব্যভিচার-রহস্য, ইত্যাকার অনেক গূঢ়রহস্যই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর সেখানকার কালযাপন প্রণালী, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, লম্পট আচরণ, প্রভৃতি অনেক বিষয় এই সকল পত্রে আলোচিত হইয়াছে।

১৩। প্রমদা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সংশোধিত। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সদেশনিবাসী ব্যবসায়-কুশল যুবার্ট সাহেব কলিকাতা রাজধানীতে মহামেলার আয়োজন করেন। প্রাচ্য জগতে এরূপ মেলা কস্মিন্‌কালেও হয় নাই। এই মেলার সময়ে বাঙ্গালীরা আপনাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া সপরিবারে মেলা দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই মেলা দর্শনব্যাপারে গণ্যমান্য বাঙ্গালীরা পদে পদে অপমানিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সভ্যজাতির সভ্যতার পরিচায়ক মুষ্ট্যাঘাত অনেককেই নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ-প্রভুগণ বাঙ্গালীদিগকে বেত্রাঘাত, চপেটাঘাত, কখনও কখনও বা পদাঘাত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, অনেক বঙ্গললনা বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত ও নির্য্যাতনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন পল্লীবাসিনী তরুণবয়স্কা কুলীন-কন্যা কিরূপ অভাবনীয় বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই উপন্যাসাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ। সামাজিক চিত্র কিরূপে ফুটাইতে হয়, তাহা গ্রন্থকারের বেশ জানা আছে।

১৪। যোগরাণী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহার মূল বর্ণনীয় বিষয় বঙ্গরাজ্যের সুবাদার মুর্শিদ কুলিখাঁর বিরুদ্ধে রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ। রাজা গোপীকৃষ্ণ রায় নামক একজন জমিদারের অনেক টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় সুবাদারের দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। গোপীকৃষ্ণের কন্যা কল্যাণকুমারী পিতাকে কারামুক্ত করেন। এই কল্যাণকুমারীই গ্রন্থের নায়িকা "যোগরাণী"। অতঃপর পিতা পুত্রীতে রাজসাহীর অন্তর্গত চাকলার রাজা উদয়নারায়ণের শরণাপন্ন হন। গোপীকৃষ্ণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উদয়নারায়ণ সুবাদারকে বিস্তর অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু এ পক্ষে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হয়। অবশেষে সুবাদারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র সাহেব-রাম বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে উদয়নারায়ণ পরাজিত ও ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। সাহেবরাম আত্মহত্যা করেন, এবং তাঁহার পিতা কারাগারেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন। গোপীকৃষ্ণ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করার অল্পকাল পরেই কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জমিদারী অন্যান্য লোকের হস্তগত হইয়াছিল।

কল্যাণকুমারী বা যোগরাণীই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র। এই চরিত্রটি অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। মোটের উপর বলিতে

হইলে, পুস্তকখানি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজত্বকালে প্রজাগণের উপর কিরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার হইত, বিশেষতঃ নবাবের রাজস্ব-কর্ম্মচারীরা জমিদারদিগের উপর কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করিত, তাহার চিত্র গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত বিশদভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ করিয়া আপনার গ্রন্থের চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রধান চরিত্র যোগরাণী বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের নায়িকার অনুকরণে চিত্রিত।

১৬। অমরাবতী। গার্হস্থ্য উপন্যাস, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রকৃত হিন্দুর উচ্চ আদর্শ ও ধর্ম্মনীতি অতি নিপুণতার সহিত প্রকটিত হইয়াছে। ইহার মূল গল্লাংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :—

নায়ক বীরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক। তিনি সরোজিনী নাম্নী একটী সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা বালিকাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। সুশীলাও অন্তরের সহিত এই ভালবাসার প্রতিদান করেন। ফলতঃ বীরেন্দ্র সরোজিনীর পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। ইতোমধ্যে বীরেন্দ্রের পিতা পুত্রের জন্য অন্য একটী পাত্রী স্থির করেন। এই পাত্রীটী জনৈক ধনবানের কন্যা। ইহার যেমন স্বভাব, তেমনি চরিত্র। বাস্তবিক ইহাকে নারী না বলিয়া রাক্ষসী বলাই অধিকতর সঙ্গত। পিতৃভক্ত বীরেন্দ্র পিতার আদেশে এই নারী-রাক্ষসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে বীরেন্দ্রের বিবাহের পর সরোজিনীকে অন্য পাত্রে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক বিপত্নীক ধনবান্ পাত্রও উপস্থিত হইল। সরোজিনী কিন্তু পাতিব্রত্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুললনা একবার যাহাকে (মনে মনেও) পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া অন্যকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে না,—তাহা করিলে সে দ্বিচারিণী হয়। সুতরাং সরোজিনী পিতার কথায় অস্বীকৃতা হইলেন, স্থির করিলেন চির-কুমারী থাকিয়া আমরণ কাল পতি-দেবতা বীরেন্দ্রের পদধ্যান করিবেন। পরন্তু বিধাতার বিধানে আজি হউক কালি হউক পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। সরোজিনীও হিন্দু নারীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পাতিব্রত্যপালনের সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। বীরেন্দ্রের বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার রাক্ষসী-ভার্য্যা কালগ্রাসে পতিত হয়। অতঃপর বীরেন্দ্র সানন্দে সরোজিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সংসার ভূতলে অমরাবতী (অর্থাৎ স্বর্গধাম) হইল, এইরূপে গ্রন্থকার অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় গ্রন্থের নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মোটের উপর পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক আধুনিক শিক্ষিতা বঙ্গললনাদের হস্তে যত অধিক পড়িবে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলের বিষয়।

১৮। ললিতমোহন। সামাজিক উপন্যাস। ইহাও শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত, এবং ইহাতেও হিন্দুধর্ম্ম-নীতি প্রকটিত। ইহার গল্লাংশ স্থূলতঃ এইরূপ ;—

ললিতমোহন একজন বড় জমিদার। দুশ্চরিত্র ইয়ার বন্ধু ও কুলটা কামিনীগণের সহবাসেই তিনি কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ছিল, এবং

তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন, তিনি হিন্দুনীতির সারধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন,—সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না; তিনি অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতেন এবং যাহা কিছু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহাই অনাসক্তচিত্তে উপভোগ করিতেন। দৈবক্রমে রাধিকাসুন্দরী নাম্নী এক ধনবতী বিধবার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাধিকা যুবতী; তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ললিতের বিশ্বহিতৈষণা প্রবৃত্তিগুণে রাধিকা প্রথমে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। পরন্তু এই আকর্ষণই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত প্রণয়ানুরাগে পরিণত হয়। ললিতও মনে মনে এই ভালবাসার প্রতিদান করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু অচিরে এই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং ললিত রাধিকাকে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভক্তি করিতে আরম্ভ করেন। রাধিকা জানিতেন, তিনি বিধবা,—পতি ভিন্ন অন্যকে ভালবাসা হিন্দু বিধবার পক্ষে অধর্ম্ম। সুতরাং তিনি প্রাণপণে আপনার অন্তরের অনুরাগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং সেই চেষ্টায় প্রকৃতই তাঁহার প্রাণান্ত হইল। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, রাধিকা মৃত্যুর পূর্ব্বে হৃদয় হইতে ললিতের চিত্রপট ছিন্ন করিয়া তাহার স্থলে নিজ মৃত পতির প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে এবং ললিতকে প্রণয়িরূপে গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে গুরু ও উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পক্ষে ললিতকেও বাহাদুর বলিতে হইবে। তিনি অনায়াসে আপনার হৃদয়ের অনুরাগকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার সংসারে অনাসক্তি। সাধারণ সংস্কার অনুসারে ললিতমোহন পাপাচারী ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার পাপকর্ম্মগুলি কেবল উপরেই ভাসিত, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নৈতিক চরিত্র কলুষিত করিতে পারিত না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। এই রূপে গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ললিতমোহনকে ভগবদ্গীতার এই উপদেশের উচ্চ আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মানুষ সংসারে অনাসক্ত ও কামনাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই মানসিক সুখশান্তি লাভ করিতে পারে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অমরাবতীর ন্যায় এই উপন্যাসখানিও সুখপাঠ্য।

নাটক

আলোচ্য বর্ষে ৪০ খানি নাটক বাহির হইয়াছিল। আমরা উৎকৃষ্ট কয়েকখানির আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতি জঘন্য দুই একখানির নাম করিব।

১। কাঁচাখেগো দেবতা।

প্রহসন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় চৌধুরী প্রণীত। বটতলা হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তক সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। এরূপ পুস্তক সমাজের কলঙ্কস্বরূপ।

২। মারুতির মতিভ্রম।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস মিত্র প্রণীত। নলতা অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত। অভিনয়ে এ নাটক হয়ত মন্দ খুলে না; কিন্তু আদ্যন্ত পাঠ করিতে ধৈর্য্য থাকে না।

৩। সুখের ফল বা মায়াবিনীর অদ্ভুত মোহজাল।

গীতিনাট্য। শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা প্রণীত। বটতলা হইতে প্রকাশিত। এরূপ জঘন্য গীতিনাট্য যত প্রকাশিত না হয়, ততই ভাল।

৪। পৃথ্বিরাজ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী বি. এ. প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। গ্রাণ্ড থিয়েটারে অভিনীত। দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বিরাজকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। গদ্য ও গৈরিশী ছন্দে লিখিত। নাটকখানি অভিনয়ের সময়ে দর্শকদিগকে আমোদিত করিয়াছিল।

৫। পূর্ণিমা। গীতিনাট্য। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দে রায় প্রণীত। ঢাকা হইতে প্রকাশিত। যাঁহারা গীতিনাট্যের অনুরাগী, পূর্ণিমা তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবে। ইহাতে অনেকগুলি গান আছে। গানগুলি নিতান্ত মন্দ নয়।

৬। কল্কি অবতার। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব প্রণীত। ঢাকা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। বিক্রমপুর দয়েহাটা গ্রামের ভীষণ ঘটনা সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহা অবলম্বনে নাটকাকারে লিখিত।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, অতি অল্প দিন পূর্ব্বে বিক্রমপুর দয়েহাটার কালাচাঁদ সাধু ওরফে কালীকুমার চক্রবর্ত্তী কল্কি অবতার সাজিয়া ভদ্র কুলমহিলাগণের উপর কি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। এই কল্কি অবতারের প্ররোচনায় অনেক ভদ্র লোক অসৎপথে গমন করিয়াছিল। অবশেষে কল্কি অবতার স্বয়ং এবং তাহার শিষ্যেরা কতকগুলি পুরাঙ্গনার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। এই নাটকখানি সেই সকল সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। নাটক যেমনই হউক, যিনি ঐ সত্য ঘটনা জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই পুস্তকখানি পাঠ করুন। ধর্ম্মের নামে যেসকল স্ত্রীপুরুষ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ভাক্ত ভণ্ড সাধু পুরুষদের সহিত মিলিত হয়, তাহাদের এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৭। বৌবাবু। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সামাজিক প্রহসন। আজকালকার বধূঠাকুরাণীরা কিরূপ বিলাসিনী হইয়া গৃহকর্ম্মে উদাসিনী হইয়া পড়িয়াছেন, গ্রন্থকার তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

৮। শ্রীমন্তের মশান বা কমলে কামিনী দর্শন। গীতাভিনয়। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। এই গীতাভিনয়খানি আদ্যাশক্তি ভগবতীর মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় কল্পনা দ্বারা দেবলোক, প্রয়াগতীর্থ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, মশানে ভগবতীর শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী ভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি ধারণ, যোগিনীগণের নৃত্যগীতাদি, রাজকন্যা সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৯। প্রেমের পাথার। গীতিনাট্য। শ্রীযুক্ত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত। লুরিস্থানের নবাব শা আলম অতিদানের বশবর্ত্তী হইয়া মোসাফের নামক জনৈক ফকিরকে আপনার রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। অনন্তর নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর শা-আলম নিজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাসের সহিত এই ঘটনার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই ব্যাকুল হন না, এই বিষয় ইহাতে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০। প্রতাপসিংহ। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। দ্বিজেন্দ্র বাবু নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাহার মতের সহিত অনেকের

মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে অতি সুনিপুণ চরিত্র-চিত্রকর, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সমালোচ্য গ্রন্থে তিনি আপনার সেই অসামান্য শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই রাণা প্রতাপের অদ্ভুত বীরত্ব, অসাধারণ স্বদেশ-প্রীতি ও অতুলনীয় ত্যাগ-স্বীকারের বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ঐ সমস্ত বিষয় অবলম্বন করিয়াই দ্বিজেন্দ্র বাবু এই উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিলে গ্রন্থখানি নীরস হইত। এই জন্যই গ্রন্থকার স্বীয় উচ্চ কল্পনার সাহায্যে নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করিয়া পুস্তকখানিকে অত্যন্ত সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। প্রবলপ্রতাপ মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত প্রতাপের যুদ্ধই ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের চরিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, প্রতাপের চরিত্র ঠিক সেই ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মানবচরিত্রের অতি উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ এ বিষয়ে নাটককার অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর পরম শত্রুও এ বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ ধরিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রতাপ আজন্ম সুখভোগে অভ্যস্ত ও একটি বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা ভোগ ও অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা যে সাতিশয় মহনীয় এবং তাহার চিত্র যে গ্রন্থকার অতি সুন্দর ফুটাইয়াছেন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রতাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আকবরের চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনসম্মত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আকবরের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যে ধারণা, অনেকের ধারণা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। তবে কথা এই যে, তৎসম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা যে অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবিস্তারই আকবরের রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিল; এই মন্ত্রসাধনের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই করিতে পারিতেন,—বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; যেরূপ কাজ করিলে, যে ভাবে চলিলে, যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে, আকবর তদ্রূপই করিতেন, তাহাতে ন্যায়ান্যায় বিচার করিতেন না; এ ভাব প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে, সুতরাং আকবর প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। আকবরের চরিত্র সম্বন্ধে ইহাই দ্বিজেন্দ্র বাবুর ধারণা। এ ধারণা ঠিক কি না, ইতিহাসের সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞেরা ও মানব-চরিত্র-সমালোচকেরা তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এবং আকবরের অন্যতম সভাসদ্ ও রাজকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী জোবী এই দুইটি চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্ত অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্ত; শক্ত ধর্ম্মে ও সাধুতায় বিশ্বাসহীন; অথচ ক্ষত্রিয় বংশে জাত বলিয়া শক্ত বীর ও সর্ব্বত্র ন্যায়ের পক্ষপাতী। ইহা কবির বিচিত্র সৃষ্টি। এরূপ অদ্ভুতচরিত্র এ দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা যেন ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা। জোবীর চরিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর রাজপুত-মহিলার যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, জোবীতে তৎসমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু তিনি নিজের অনুরূপ

স্বামী প্রাপ্ত হন নাই। পৃথ্বীরাজ সকল কথায় কবিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। তিনি আকবরের কোন দোষই দেখিতে পান না। তাঁহার এই ভাব দূর করিবার জন্যই গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খুসরোজের বৃত্তান্ত স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই খুসরোজেই জোষীর চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২। সভ্যতা। গার্হস্থ্য নাটক। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক বঙ্গীয় যুবকগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়, তাহাকে আপনাদের সামাজিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারে না এবং তাহার গুণভাগ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দোষভাগই গ্রহণ করে। তাহারা দেখিতে পায়, সাহেব-সমাজে স্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা, সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়া। ইহা দেখিয়া তাহারাও অনুকরণ করিতে যায় এবং প্রথমেই জননীকে অভক্তি করিতে আরম্ভ করে,—তাহারা ভুলিয়া যায় যে, হিন্দুর সংসারে স্ত্রী আদরণীয়া হইলেও মাতাই সর্ব্বেসর্ব্বা সর্ব্বাপেক্ষা আরাধ্যা। এই রূপে তাহারা সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দেয় এবং সেই আগুনে আপনারা পুড়িয়া মরে। এই অবস্থা আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অশুভজনক। এ ভাবের পরিবর্ত্তন অচিরে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত কথাই গ্রন্থকার নাটকাকারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

৩। বলিদান। সামাজিক নাটক। প্রথিত-নামা নাটককার ও নট-শিরোমণি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। গিরিশ বাবুর অধিক পরিচয় আর কি দিব? নাট্যজগতে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। অনেকে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ও নট গ্যারিকের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া থাকেন। এরূপ সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকাপ্রসূত 'বলিদান' যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বর পণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পাংশ স্থূলতঃ এইরূপ;—

করুণাময় বসু কলিকাতাবাসী মধ্যবিত্ত কায়স্থ। তিনি চাকরি-জীবী, কিন্তু তাঁহার আয় অতি অল্প। তাঁহাকে তিন কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি নিজের বাড়ীখানি বাঁধা দিয়া অতি কষ্টে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। তিনি অঙ্গীকৃত পণের টাকা সমস্তই দিলেন, কিন্তু তাহাতেও বরের ও তাহার মাতার মন উঠিল না। তাহারা কন্যাটিকে নানাপ্রকারে বিষম জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিল এদিকে করুণাময়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। অর্থাভাবে করুণাময় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, এবং অবশেষে এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের হস্তে কন্যারত্নকে তুলিয়া দিয়া কোন প্রকারে 'জাতি' রক্ষা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই সেই কন্যাটি বিধবা হইল এবং মনোদুঃখে জলে ডুবিয়া মরিল। এদিকে করুণাময়ের ঋণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার এক ধনবান্ প্রতিবেশী স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ

লইয়া কপট-মিত্ররূপে উপস্থিত হইল এবং অর্থসাহায্য করিতে লাগিল। এই ধনবানের দুলালচাঁদ নামে এক অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্র ছিল। ধনবান্ স্বীয় অর্থের বিনিময়ে দুলালচাঁদের নিমিত্ত করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণি প্রার্থনা করিল। করুণাময় অনন্যোপায় হইয়া এই ঘৃণিত প্রস্তাবেই সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। ইতোমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। বিবাহের রাত্রে আর একটি ভাল পাত্র জুটিল। সে বিনা পণেই করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইল। করুণাময় মহা সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও এই লোমহর্ষণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির শবদেহের উপর পতিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। এইখানেই যবনিকা পতিত হইল। এই শোচনীয় দৃশ্য আজি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজমান!!

গ্রন্থের রচনা এমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না এবং স্থানে স্থানে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। পুস্তক পাঠেই যখন হৃদয় এতদূর বিচলিত হয়, তখন ইহার অভিনয় দর্শনে মনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

গ্রন্থকার নিজে কায়স্থ। বোধ করি, এই জন্য স্বভাবতঃ কায়স্থ কন্যাদায়গ্রস্তের দুঃখের কথাই তাঁহার মনে প্রধানভাবে স্থান পাইয়াছে এবং করুণাময়কে কুলীন কায়স্থ রূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। অপিচ, অধুনা বঙ্গদেশে চারি শ্রেণীর কায়স্থ দেখা যায়, (১) বঙ্গজ, (২) বারেন্দ্র, (৩) উত্তর রাঢ়ীয় এবং (৪) দক্ষিণ রাঢ়ীয়। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আচারব্যবহার ও বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। এই হেতু প্রত্যেক শ্রেণীকে নিজ সমাজ হইতেই বর-কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হয়। এবম্প্রকার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ বরের সংখ্যা অল্প হওয়ায় বরের বাজার চড়িয়া উঠিয়াছে; সুতরাং বর-কন্যা নির্ব্বাচনের এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া যদি চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ অবাধে যে কোন শ্রেণী হইতে বর নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তাহা হইলে বরের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় বরপণের মাত্রা স্বতঃই কমিয়া যাইবে। আমাদের সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, এরূপ বহু মান্যগণ্য এবং বিচক্ষণ, বিবেচক ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত বহু ব্যক্তির ইহাই অভিপ্রায়। গিরিশ বাবুও এই মতের পক্ষপাতী, কারণ তিনি আলোচ্য নাটকে করুণাময়ের মুখ দিয়া এই মতের পৃষ্ঠপোষক যুক্তি বাহির করিয়াছেন। পরন্তু এই একাকার-মতাবলম্বীদিগকে আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ইঁহারা বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক শ্রেণীর কায়স্থ স্বীয় সমাজ মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় বরনির্ব্বাচনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণে বরের সংখ্যা অল্প হওয়ায় বরপণের পরিমাণ চড়িয়াছে। ভাল জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, অধিক দিনের কথা নহে, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কি ঠিক এইরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে বর নির্ব্বাচিত হইত না? নবীন মতাবলম্বীদিগের যুক্তি যদি পরামর্শসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ২৫।৩০ বর্ষ পূর্ব্বের সমাজের বরপণের এরূপ আধিক্য ছিল না কেন? আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। যদি প্রত্যেক শ্রেণীতে বরের সংখ্যার অল্পতা ও কন্যার সংখ্যার আধিক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে চারি শ্রেণী একত্র হইলেও বরকণ্যার অনুপাতে ত সেই একরূপই থাকিবে; সুতরাং তাহাতে বর্ত্তমান বিবাহ-সঙ্কটের নিস্তার

কিরূপে হইবে? ফলতঃ এরূপ যুক্তি যে নিতান্ত অসার, তাহা বলাই বাহুল্য। আসল কথা এই যে, ইহাঁরা একাকার চাহেন।

আমাদের মনে হয়, ইহাঁরা যে পথ অবলম্বন করিতেছেন, রোগ-প্রতীকারের তাহা প্রকৃত পথ নহে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজিকালি লোকের মনে ধর্ম্মভাবের হ্রাস এবং সাংসারিকতা, অর্থলালসা, ভোগবিলাসিতা প্রভৃতি প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটিয়াছে। লোকের প্রত্যেক কার্য্যেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া যদি পূর্ব্বের ন্যায় লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য বহু দোষের ন্যায় এই বিবাহ সঙ্কটেরও প্রতীকার হইতে পারে। অন্য কোন উপায়ে এই বিষম রোগের প্রতিবিধানের চেষ্টা দুরাশামাত্র।

এই একাকারে কোন সুফল প্রদান করিবে না। প্রত্যুত ইহাতে অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করিবে। অনেক অকায়স্থ বা নীচ কায়স্থ এই সুযোগে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইবে। আরও কথা এই, দক্ষিণাঢ়ীয় প্রভৃতির সহিত বঙ্গজ প্রভৃতির আদান প্রদানে কুটুম্বিতা কিছুতেই সুখকর হইবে না। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, একাকার করিবার চেষ্টা না করিয়া, আমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর মান্যগণ্য অগ্রণীরা কৌলীন্য, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির তারতম্যানুসারে বর-পণের এক একটা উচ্চ-সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এবং সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সেই পণ বরপক্ষীয়েরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, তাহার অতিরিক্ত কেহই বলপূর্ব্বক লইতে পারিবেন না, বরং অল্প লইতে পারিবেন—এবং তাহার পর কন্যাপক্ষীয়েরা বরের যৌতুক স্বরূপ ইচ্ছা বা সাধ্য অনুসারে যাহা দিবেন, বরপক্ষ তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন, সে বিষয়ের কিছুমাত্র জোর জুলুম জবরদস্তি করিতে পারিবেন না, কিংবা যৌতুক না দিলেও কথা কহিতে পারিবেন না। আমরা যদি এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তবেই এ রোগের প্রতীকার হইতে পারে। আমাদের সমাজের মাননীয় অগ্রণীরা এই সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে নানা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে, এরূপ পথে কেন চলিতেছেন, বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা 'ধান ভানিতে মহীপালের গীত' আরম্ভ করিয়া দিয়াছি,—কথায় কথায় কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। এজন্য পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। মোটের উপর ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

৪। জ্যোতিঃ। প্রণয়-ঘটিত নাটক। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস প্রণীত। বঙ্কিমচন্দ্রই গ্রন্থকারের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস দেবী-চৌধুরাণীর অনুকরণে ইহা লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী-চৌধুরাণীতে নিষ্কাম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থেও সেই নিষ্কাম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা দেবী-চৌধুরাণী আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া স্বামীর, সপত্নীদিগের ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সুখসাধনে সর্ব্বদা ব্যাপৃতা থাকিতেন। শশীবাবুর নায়িকা জ্যোতিঃও আত্মসুখবাসনা পরিহার করিয়া স্বামীর সুখসাধনের চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিলেন, এবং স্বামীর হৃদয় অন্য একটী বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে জানিতে

পারিয়া নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার সহিত স্বামীর বিবাহ সঙ্ঘটন করাইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কত, এ গ্রন্থখানি তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

৫। ঐন্দ্রিলা। পৌরাণিক নাটক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত। ইহা নামে পৌরাণিক নাটক হইলেও ঠিক পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই,—সুপ্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৃত্র-সংহার" অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। পুরাণে বৃত্রাসুরের 'ঐন্দ্রিলা' নাম্নী কোনও পত্নীর উল্লেখ নাই। ইহা হেমচন্দ্রের প্রতিভার সৃষ্টি। আবার মনোমোহন বাবু সেই ঐন্দ্রিলাকেই আপনার গ্রন্থের নায়িকা করিয়াছেন। বৃত্র ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লয়। পরন্তু ঐন্দ্রিলা তাহাতেও পরিতৃপ্তা হইতে না পারিয়া ইন্দ্র-মহিষী শচী দেবীকে আপনার দাসী করিতে ইচ্ছা করে। তাহাতেই শিবের ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, এবং তাহারই ফলে অসুরগণের সর্ব্বনাশ ঘটে। মনোমোহন বাবুর পূর্ব্বপ্রকাশিত 'রিজিয়া' নাটকের নায়িকা রিজিয়ার অনুকরণে এই ঐন্দ্রিলার চরিত্র অঙ্কিত। রিজিয়ার চরিত্র আবার সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক সার্ ওয়াল্টার স্কটের 'কেনিল ওয়ার্থ' নামক উপন্যাস হইতে গৃহীত। সুতরাং ঐন্দ্রিলার চরিত্রেও যে পাশ্চাত্য চরিত্রের গন্ধ পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম দৃশ্যটি সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি মিল্‌টনের Paradise Lost নামক কাব্যের প্রথম সর্গের ছায়াবলম্বনে চিত্রিত। আমরা এস্থলে আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ ঐন্দ্রিলা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

সূচীভেদ্য অন্ধতমসার মসীময়
আবরণে ঢাকি' কলঙ্ক-কালিমা ব্যাপ্ত'
বিশুষ্ক বদন, পাতালের অন্ধতম
দেশে বসি কি ভাবিছ দেবগণ? সত্য
বটে দৈত্যরাজ কঠিন শৃঙ্খল দিয়া
ভাগ্যলক্ষ্মী রেখেছে বাঁধিয়া সিংহাসন
পাদমূলে তার, সত্য বটে দৈববল
দুর্ভেদ্য কবচে সুরক্ষিত বক্ষঃস্থল
তার; কিন্তু হে অমরবৃন্দ! জেন স্থির
দৈবশক্তি নহে কভু চিরন্তন;
জয় পরাজয় আর উত্থান পতন—
নিয়তির অদ্ভুত শাসনে, দেব দৈত্য
নর আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর বদ্ধ সবে
সমভাবে—

৬। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। রাজনৈতিক নাটক। সুবিখ্যাত নট ও নাটককার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। এ পুস্তকের অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহার মর্ম্মার্থ বঙ্গবাসী মাত্রেই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। এ নাটকখানি একাঙ্ক। গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জননীস্বরূপা জন্মভূমির এতাদৃশ অপমৃত্যুতে নিতান্ত দুঃখাভিভূত হইয়া ছাত্রগণ ও অন্যান্য বঙ্গবাসীরা শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, তাহারা দ্বাদশ বৎসর কাল শোকবেশ ধারণ করিবে এবং যথাসাধ্য স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইবে।

জীবন-চরিত।

১। বঙ্গভাষার লেখক। আলোচ্য বর্ষে ১০ খানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" নামধেয় গ্রন্থখানিই সবিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। ইহার সকলক বঙ্গবাসীর সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য বর্ষে ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খণ্ডে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তকের যে নিতান্ত অভাব ছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। হরিমোহন বাবু সেই অভাব পূরণ করিয়া বঙ্গবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা যে এই পুস্তক দ্বারা মহোপকার লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক আছি। আশা করি, হরিমোহন বাবু একটু তৎপর হইয়া দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিয়া আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন।

২। হেমন্তকুমার। সাধুজীবন শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হেমন্তকুমার বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বহুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। এই জীবনচরিতখানি প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩। প্রতাপসিংহ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত। মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত। আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সে আদর্শ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হইলে অধিকতর আদরণীয় ও কার্য্যকরী হয়। মনুষ্যের আদর্শ কাল্পনিক দেবতা না হইয়া মনুষ্য হওয়াই উচিত। স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের আদর্শ-জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। প্রত্যেক দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। অতীত ইতিহাস প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদিগের জীবনবৃত্তান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দেশের অতীত গৌরব আছে, তাহার ভবিষ্যতের আশাও আছে। ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে উন্নতির আশা নাই। সুতরাং উন্নতিই যাহাদের লক্ষ্য, অতীত যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্তের আলোচনা করা তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। যাহারা অতীত যুগের স্বদেশীয় মহাত্মগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এই পুস্তকখানি আমরা প্রত্যেক যুবককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৪। পণ্ডিতা রমা বাইয়ের বিবরণ। জনৈক খ্রীষ্টান মহিলা কর্ত্তৃক লিখিত। রমা বাইয়ের জীবনের কার্য্যারম্ভ, সারদাসদন-প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালাভ, আমেরিকায় গমন প্রভৃতি বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

৫। শাক্যমুনিচরিত। স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ প্রণীত। যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্রচিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নিবারণের জন্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষান্নই পরম সুখ জ্ঞান করিতেন, যিনি রাজসংসার ছাড়িয়া তরুতলে বাস করিতেন, তাঁহার জীবনচরিত সকলের একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধদেবের সর্ব্বত্যাগী জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে

ইতিহাস।

আলোচ্য বৎসরে ৩৬ খানি ইতিহাস বাহির হইয়াছিল। এখানে আমরা তিন খানির মাত্র উল্লেখ করিব।

১। রাজাবলী। স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা কৃত। বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত। শর্ম্মা মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌দিগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কতজন হিন্দু নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন ক্ষত্রিয় এবং কতজন হিন্দুজাতির কোন্ বর্ণভুক্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে। হিন্দুরাজত্বের পর কিঞ্চিদধিক সাড়ে ছয় শত বৎসর কাল এই ভারতভূমি যে যে মুসলমান নরপতির শাসনাধীন ছিল, তাহারও বিবরণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে মুসলমান রাজত্বের অবসানে কোম্পানির শাসনভারপ্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই উজ্জয়িনী রাজধানী, রাজা ভর্তৃহরির সংসারে বিরাগ, শালিবাহন রাজার বিবরণ, ভোজ রাজার ইতিহাস, এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। সমুদ্র পাল, বিক্রম পাল, তিলকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, ধীসেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন এবং আদিশূর প্রভৃতিরও বিবরণ রাজাবলীতে আছে। মুসলমান বাদসাহ, আমীর ওমরাহ প্রভৃতির বিবরণ, আকবর ও আরঙ্গজীব প্রভৃতি বাদসাহদিগের এবং আলিবর্দ্দি ও সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি নবাবগণের ইতিবৃত্ত রাজাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে।

২। নব্য জাপান। রুষ জাপানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শ্রীযুক্ত উমাকান্ত হাজারী প্রণীত। এই পুস্তকে জাপানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, জাপানীগণের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস, শিক্ষাপ্রণালী, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

৩। রাজা সীতারাম রায়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। সীতারাম যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মহম্মদপুরের জমিদার ছিলেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। খৃঃ ১৬৭৫ অব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৭২৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি স্বীয় ভুজবলে মহম্মদপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ তৎকালে বাঙ্গালার নবাব। সীতারাম চতুর্দ্দশ বৎসর কাল নবাবের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত ও মুসলমান সৈন্যগণকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। কিন্তু অবশেষে স্বয়ং পরাজিত হন। এই সমস্ত ঘটনা ভট্টাচার্য্য মহাশয় মার্জ্জিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে অনেকগুলি দলিলের প্রতিলিপি মুদ্রিত হওয়ায় ইহার আদর সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহা দ্বারা ঐতিহাসিকেরা অনেক উপকার লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। এইরূপ পুস্তক যত অধিক প্রচারিত হইবে, বঙ্গবাসিগণের মনে ততই স্বদেশভক্তির উদ্রেক হইবে।

কাব্য—পদ্য

আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর ১৫৩ খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই অপাঠ্য,—কতকগুলি আবার বঙ্গবিভাগজনিত ক্রোধ ও ক্ষোভের মর্ম্মোচ্ছ্বাস। এই সকল পুস্তক সম্বন্ধে কোন কথা বলা অনাবশ্যক। যে কয়খানি কাব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাদেরই সম্বন্ধে

সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

১। **স্বদেশ**। স্বনাম প্রসিদ্ধ সুকবি ও উপন্যাসকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বঙ্গদেশে এমন পাঠক পাঠিকা কে আছেন, যিনি রবীন্দ্রনাথকে চিনেন না? রবীন্দ্রনাথের এই "স্বদেশ" তাঁহার নাম আরও সমুজ্জ্বল করিয়াছে। ইহাকে দার্শনিক কাব্য বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি এবং কি উপায়ে দেশের উদ্ধার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কবি অন্তরে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই দার্শনিক ভাবে কাব্যাকারে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির অন্তরের কথা বলিয়া তাহা পাঠকেরও অন্তর স্পর্শ করিয়া থাকে। কবির মতে, মানুষমাত্রেরই কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে। সে সমস্ত অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতে প্রত্যেকে বাধ্য,—কেবল নিজে রক্ষা করিতে কেন, রক্ষা করিয়া তাহা আবার পুত্র পৌত্রাদিকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দিয়া যাইতে বাধ্য। তাই তিনি স্বদেশবাসিগণকে কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া আত্মপদের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতে এবং আপনাদের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ তাঁহার করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন কি না বলিতে পারা যায় না, কিন্তু করা যে উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনোযোগসহকারে 'স্বদেশ' পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, কবির মতি গতি ফিরিয়াছে,—তিনি এক্ষণে আমাদের সেই প্রাচীন পূজ্যপাদ ঋষিগণের প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

২। **বঙ্গস্বাধীনতা**। বীর-রসাত্মক কাব্য। শ্রীযুক্ত প্রমোদকান্ত বসু প্রণীত। উদ্ভিজ্জ-ভোজী "দুর্ব্বল ভীরু" বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য কিরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মাংস-ভোজী সাহসিক মোগল সৈন্যকে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত ও সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া যশোহরে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই বৃত্তান্ত নবীন কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকটিত করিয়াছেন। কাব্যখানি উচ্চ শ্রেণীর। তবে গ্রন্থখানির একটি দোষের কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। কতকগুলি দুর্ব্বোধ শব্দের ব্যবহারে ভাষা স্থানে স্থানে যেন কিছু কটমট হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, কবি ছন্দের অনুরোধে ঐ সকল কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু কবি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করিলে কাব্যখানি সহজে পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিত। চর্চ্চা রাখিলে প্রমোদ বাবু কালে যে উচ্চ শ্রেণীর কবিদলমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

৩। **মহাশ্মশান**। বীর-রসাত্মক কাব্য। জনৈক মুসলমান বিরচিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মার্হাট্টাদিগের পরাজয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সুন্দর। বিশেষতঃ মুসলমানের পক্ষে এরূপ মার্জ্জিত বাঙ্গালা লেখা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। সত্য কথা বলিতে কি, মুসলমানী আচারব্যবহার ও উৎসবসূচক আরবী ও পারসী ভাষামূলক কয়েকটী শব্দের ব্যবহার না থাকিলে, পুস্তকখানি যে মুসলমানের লিখিত, তাহা বুঝিবার উপায় থাকিত না।

৪। গীত গোবিন্দ।

আর একখানি কাব্যের নামোল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের সুপ্রসিদ্ধ গীতি-কাব্য "গীতগোবিন্দ" পদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রমশিল্প।

শ্রমশিল্প সম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে ১৭ খানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল। আমরা একখানি মাত্রের উল্লেখ করিব।

১। দীপ-শলাকা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ কর্ম্মকার প্রণীত। নামেই গ্রন্থের পরিচয়। সুতরাং অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মকার মহাশয় অতি সরল ভাষায় বিলাতী দীয়াশলাই নির্ম্মাণকৌশল বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশে যে শিল্পানুরাগের উদ্রেক হইয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হইবে, দেশের ততই মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব কর্ম্মকার মহাশয়ের এই সাধু চেষ্টার নিমিত্ত তিনি বঙ্গবাসিগণের আশীর্ব্বাদভাজন, সন্দেহ নাই।

বিবিধ।

আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর পুস্তক ৭২৪ খানি বাহির হইয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েক খানির আলোচনা করিলাম ;—

১। প্রবন্ধ মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কোন একটি বিষয় ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হয় নাই। থিয়সফি-তত্ত্ব, ডারউইন-তত্ত্ব, মৈস্মর-তত্ত্ব, ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি, রুশীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ইহাতে সন্নিবিষ্ট এই সমস্ত প্রবন্ধ লেখকের বহু ভাষায় ও বহুবিষয়ে পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের যে বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি ফরাসী ভাষাতেও সুপণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরাসী কবিতা ও নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এজন্য বঙ্গবাসিগণ তাঁহার নিকট অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

২। পল্লীবৈচিত্র্য।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। দেবেন্দ্র বাবু যে অতি সুনিপুণ চিত্রকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে কার্ত্তিক মাসে কালীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চড়ক পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজা পার্ব্বণ উৎসবাদি হইয়া থাকে, তাহারই চিত্র গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পল্লীবাসীদিগের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধারণ অবস্থায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না,—উৎসব ও আমোদ প্রমোদের দিনে ঐগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু সংসার-কোলাহলে তাহাদের প্রতি সাধারণতঃ লোকে লক্ষ্য করে না। গ্রন্থকারেরাও উহাদের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। এই সমস্ত কারণে বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব ছিল। রায় মহাশয় সেই অভাব পূরণ করিয়া স্বদেশবাসিগণের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

৩। বেদ প্রকাশিকা

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রণীত। ইহা বটব্যাল মহাশয়ের বেদসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ। এই সকল প্রবন্ধের

অধিকাংশই প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল দুইটি প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই,—এই নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। বটব্যাল মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। তিনি এই প্রবন্ধগুলি দ্বারা বৈদিক গবেষণার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান হইয়াও, রাজকার্য্যের গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও যে আবার মাতৃভাষার সেবা করিবার সময় পাইতেন এবং তজ্জন্য শ্রমস্বীকার করিতে কাতর হইতেন না, ইহা অতীব প্রশংসার কথা। তিনি অকালে কাল কবলিত না হইলে বঙ্গভাষার যে আরও অনেক পুষ্টি সাধন করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। দেশের গান। বরিশালবাসী শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সঙ্গীতের অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদিনী শক্তি সকলে অনুভব করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সময়ে সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক জাতীয় সঙ্গীত গান করিতেছেন। অনেকগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

৫। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সংগৃহীত অদৃষ্ট দর্শন বা সৌভাগ্য পরীক্ষা। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত। প্রায় ৫০০ শত বৎসর অতীত হইল, এই গ্রন্থখানি লিপজিক্‌নগরীস্থিত Cabinet of curiosities নামক পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ কথিত আছে যে, সম্রাট্ নেপোলিয়ন এই পুস্তকখানি দুর্লভ পবিত্র সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত করিতেন। এই পুস্তকের উপর তাঁহার এমন অটল বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ কার্য্য তিনি এই গ্রন্থের মতানুসারে নির্ব্বাহ করিতেন। আদর্শ পুস্তকখানি জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত, এক্ষণে উহা নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত কেহই অনুবাদ করেন নাই—ঘোষাল মহাশয় এই প্রথমে অনুবাদ করিলেন।

৬। অপূর্ব্ব রহস্য। শ্রীযুক্ত হরিহর নন্দী প্রণীত। কতকগুলি হাসির গল্প সংগ্রহ করিয়া নন্দী মহাশয় "অপূর্ব্ব রহস্য" নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

৭। হরবোলা সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গান সংগৃহীত হইয়াছে।

৮। কৃষি ও গোময়। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় এম এ প্রণীত। ইতঃপূর্ব্বে "প্রচার" মাসিক পত্রিকায় যে গোময়ের সদ্ব্যবহার শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, গ্রন্থকার এতদিন পরে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী বিশেষ উপকারী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুধু বই কি রিপোর্ট পড়িয়া কৃষির উন্নতি করার কল্পনা, আর সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়া দেশোদ্ধারের জল্পনা প্রায় একই রকম। তবে যদি কেহ রায় মহাশয়ের কথাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তবেই তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

৯। কৃষি উপদেশ। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ আর্ এস্ প্রণীত। বগুড়া কৃষি শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃষিবিষয়ক

একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটী এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমন ধান্য, আশু ধান্য, সরিসা পাট, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সার কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

৯। বর্ত্তমান ভারত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। "বর্ত্তমান ভারত" প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক পত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একখানি দর্শন গ্রন্থ। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশিসমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব সহস্র বর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত, পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয় "বর্ত্তমান ভারতে" আলোচিত হইয়াছে।

১০। দেদার মজা। শ্রীযুক্তবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে ১২৬টী রংদার গল্প আছে। গল্পগুলি পড়িবার সময় পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। এমন মজার গল্প আমরা খুব কমই পড়িয়াছি। "দেদার মজা" দেদার মজাই বটে!

১১। গুঞ্জন। শিশুরাজ্যের কবিতা। জনৈক রমণী রচিত। ছোট ছোট বালকদিগের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গুঞ্জনে অনেকগুলি কবিতা আছে—কবিতাগুলি নিতান্ত মন্দ নয়।

১২। গার্হস্থ্যধর্ম্ম। স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত। গার্হস্থ্য জীবনে নারী জাতির কর্ত্তব্য, ধর্ম্মজীবন, জাতীয় উন্নতি, দম্পতিধর্ম্ম, দেবত্বলাভের উপায়, ধর্ম্মের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচিত। পুস্তকখানি নারীগণের অবশ্যপাঠ্য।

১৩। বঙ্গসমাজে সুরাপানের প্রসার। শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শিক্ষিত বঙ্গ সমাজে সুরাপান কিরূপে আরব্ধ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

১৪। প্রেম। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনের প্রথমাবস্থায় ছাত্রগণ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যে কোন স্থানে প্রাণের সমগ্র অনুরাগ সমর্পণ করিতে লালায়িত হয়। অনেক সময়েই ইহার পরিণাম বিষময় হয়, কিন্তু যদি ঠিক এই সন্ধিক্ষণে—চিত্তের ভাবান্তর হইবার পূর্ব্বেই কোন উচ্চ লক্ষ্য ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ছাত্র দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল, পরিবারের সুখশান্তি এবং আত্মীয়স্বজনের গৌরববর্দ্ধনের সম্ভাবনা; অন্যথা কেবল তরলভাবপূর্ণ উপন্যাস পাঠ, নিরাশ প্রেমগীতি-রচনা, অথবা উচ্ছৃঙ্খল কলঙ্কিত জীবন যাপনের আয়োজন করিয়া রাখা হয়। প্রেমরচয়িতা ছাত্রগণের পরম বন্ধু। প্রহার, ভর্ৎসনা শাসন দ্বারা বালকের চরিত্র সংশোধিত হয় না; সুমিষ্ট বাক্য ও সহানুভূতি দ্বারা এবং ধীরে

ধীরে পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে ছাত্রজীবনকে উন্নত করিতে হয়, তাহা তিনি এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন। অভিভাবকগণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে এই পুস্তকখানি পড়িতে দিন।

সাময়িক পত্র।

আলোচ্য বর্ষে ন্যূনাধিক ৮০খানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সকলগুলির আলোচনা করা দূরে থাকুক, নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা অসম্ভব। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকখানির মাত্র নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল, যথা;—(১) প্রবাসী, (২) ভারতী, (৩) নব্য ভারত, (৪) সাহিত্য, (৫) বঙ্গদর্শন, (৬) প্রদীপ, (৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, (৮) সাহিত্য সংহিতা, (৯) ভাণ্ডার (১০) নবনূর। সকলগুলিই মাসিক পত্রিকা এবং অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত। ইহাদের মধ্যে একমাত্র শেষোক্তখানি অর্থাৎ 'নবনূর' মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা সম্পাদিত; অবশিষ্টগুলি হিন্দু বা ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। নবনূর মুসলমানসম্পাদিত পত্র হইলেও উহার লেখা অতিশয় সুন্দর; কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি সমস্তই হিন্দু লেখকগণের লেখনীপ্রসূত। এই সকল পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যে কয়েকটী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাদেরই সম্বন্ধে দুই চারি কথা এস্থলে বলিবার চেষ্টা করিব। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক যেপ্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারই সমালোচনা করিয়া ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'নব্য-ভারত' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সমাজ দ্বারা দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অন্যান্য অভাব মোচন হইয়া দেশের উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত তৎপরিবর্ত্তে একটি সামাজিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই কংগ্রেসে রাজা, জমিদার, পণ্ডিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এবং রাজনীতিকুশল ও বাণিজ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা সদস্য থাকিবেন, এবং তাঁহারা দেশীয় লুপ্ত শিল্প বাণিজ্যের উদ্ধার ও চিন্তার বিষয়ে সহায়তা করিবেন এবং যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদির প্রভাবে বিপথে পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রবন্ধলেখক আরও বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজগঠনের পূর্ব্বেই সমাজপতি নির্ব্বাচনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এটা নিতান্ত অসঙ্গত। অগ্রে সমাজ হউক, পরে সমাজপতি স্থির হইবে। রবীন্দ্রনাথ সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যগ্রহণের বিরোধী, তাহা কিন্তু উক্ত প্রবন্ধকারের মত নহে। তিনি বলেন, যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যলাভের চেষ্টা করিতে হইবে এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রকার সভাসমিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে হইবে।

১৩১২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য' পত্রে "বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক যেপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক সসার কথা আছে। উক্ত প্রবন্ধটী সকলেরই মনোযোগসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। উক্ত অব্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে কংগ্রেসের তত্ত্বকথা আলোচিত হয় ও উহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া সকলে উহার সমাদর করে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যে একটী স্থায়ী অর্থভাণ্ডার

সৃষ্টিরও প্রস্তাব হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ড 'প্রবাসী' পত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কংগ্রেসের কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত একটী জাতীয় আত্মনির্ভর-সমিতি স্থাপনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটী সকলের একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। উক্ত অব্দের ভাদ্র মাসে 'ভাণ্ডার' পত্রে "বহুরাজকতা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে এক বা একাধিক রাজার শাসনাধীন নহে, একটী সমগ্র জাতির শাসনাধীন। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ পদগুলিতে যে সেই জাতীয় লোকেরই একচেটিয়া অধিকার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এরূপ অবস্থায় প্রজার পক্ষে ঐ সকল পদলাভের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত দুরাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সাগর-সৈকতে

১।

দিগন্তনীলিম সাগর সৈকতে,
রক্তিম বিশাল ভগ্ন-শৈল প'রি,
একটী যুবতী অলস নয়নে,
অনন্ত মূরতি হেরিছে শিহরি।

২।

বিস্মিত বদন জলধি সলিলে
কিবা শোভাময়ী সুষমার ছবি,
প্রকৃতির চিত্র পূর্ণত্বে বিলীন,
কাব্যের বিকাশে যথা বিশ্বকবি।

৩।

ঊর্ম্মির লহরী অনন্ত ভ্রমিয়া,
বেলাভূমি চুমি কেন ফিরি যায়,
আত্মার জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত সতত,
মীমাংসার শেষ নাহি তবু চায়।

৪।

অরুণের জ্যোতি পরশনে কভু,
নীলিমে দ্যুতিছে শুভ্র রেখা ছায়া,
অনন্ত হইতে অনন্তে পড়িছে,
পাখিকুল বুঝি কল্পনার কায়া।

৫।

বীচিমালা সনে দুলিতে দুলিতে,
আইল তথায় তরণী সুচারু,
আরোহী একটী সুরূপ যুবক,
সৈকতে শোভিছে তাল দেবদারু

৬।

উতরি যুবক বালার সমীপে,
পুত্তলিকাসম চলিল নিথর,
মুগধ নয়ন, অবশ পরাণ,
নেহারি বালার রূপ মনোহর।

৭।

অনিন্দ্য বালিকা একটীও বার,
ফিরিল না চাহি যুবকের পানে
অনিমিষ ভরে রহিল নিস্পন্দ
প্রেমের প্রতিভা সৌন্দর্য্যের ধ্যানে।

৮।

বিমল যুবক ভাষিল উচ্ছ্বাসে
"হে স্বর্ণলতিকে! উপাস্য আমার,
চাহ ফিরি শুধু অভাগার পানে
ভালবাসা যাচি সুন্দরি তোমার।

৯

তোমা বিনে অন্যে চাহে না হৃদয়,
তোমার তরেতে সর্ব্বস্ব জীবন,
বিসর্জ্জন দিব না করি ভ্রূক্ষেপ,
মজেছি রূপেতে রূপসি রতন।

১০।

কত নিশি দিন রহিব এমন,
তোমার লাগিয়া চাহি আশাপথ,
নারীর হৃদয় এত কি কঠিন,
পূরাবে কি দেবি মম মনোরথ ?"

১১।

উত্তরিল ধীরে জোছনা-প্রতিমা,
জানি তব হৃদে জাগে ভালবাসা,
একটী মিনতি ও চরণে মম
পূরাবে কি তুমি দুঃখিনীর আশা ?

১২।

এসো ধীরে তুমি আমার সমুখে,
দোঁহে ধরি এসো দোঁহাকার কর,
নিমীলিত কর তব আঁখিদ্বয়,
বাঁধিও হৃদয় অতি দৃঢ়তর।"

১৩।

মিলিল বন্ধনে প্রণয়িযুগল,
পাপিয়া সুতানে গগনে গাহিল,
না জানি সুখিত যুবার হৃদয়ে
সে পরশে কিবা অবশ ঢালিল।

১৪।

পঞ্চ পল শেষে যুবতী কহিল ;—
"খোল আঁখি তব চাহ একবার,
প্রেমিক রতন, দিনু ভালবাসা
সঁপিলাম আমি সর্ব্বস্ব আমার।"

১৫।

এই সে যুবতী, সৌন্দর্য্যের খনি !
হায়রে বীভৎস, হায়রে ভীষণ !
একিরে অগণ্য পুরীষের কৃমি
সে চন্দ্র বদনে করে বিচরণ।

১৬।

গলিত দুর্গন্ধ মহাকুষ্ঠব্যাধি
সর্ব্ব কলেবর করিয়াছে গ্রাস,
বৃদ্ধা জরাজীর্ণা বিলোল রসনা
এইরূপ দশা একি সর্ব্বনাশ

১৭।

চাহিতে নিমিষে হায়রে যুবক,
করধৃত সেই যুবতীর পানে,
পঞ্চবিংশ বার ঘৃণায় বমন
করিল বিষাদ হতাশ অন্তরে।

১৮।

বিস্ময়ে যুবার হেন ভাবান্তর,
নেহারি যুবতী কহিল মোহন,—
"চল প্রিয়তম, অই চারু গেহে
দোঁহে করি বাস হরষিত মন।

১৯

"হয়োনা উতলা প্রেমিকপ্রবর,
নিষ্কাম প্রেমের অপূর্ব্ব মহিমা,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিবে যখন,
বিকৃত এ রূপে হেরিবে সুষমা।"

২০।

দারুণ ঘৃণায় মরমে মরিয়া,
কহিল যুবক ক্রোধেতে চীৎকারি,—
"ছাড় শীঘ্র মোরে নারকী পিশাচি
আমি নহি তোর প্রণয় ভিখারী।"

২১।

কাতরে যুবতী উত্তরিল ধীরে,
"চাহিও না মোরে আর পুনরায়,
নিমীলিত কর নয়নযুগল,
পারিবে অচিরে ছাড়িতে আমায়।

২২।

"নারীর হৃদয় কেন যে কঠিন,
তুমি কি বুঝিবে পুরুষপ্রবর ?
জানিতে প্রকৃত প্রেম ভালবাসা,
নারীর হৃদয় নিকষ পাথর।"

২৩।

প্রেমহীন শুষ্ক রূপমত্ত যুবা,
মূরতির মত মুদিল নয়ন,
কাণ্ডারীবিহীন তরণীর সম
ভাবনার স্রোতে হৃদয় মগন

২৪।

প্রেমিকা সুন্দরী কহিল মোহন,—
"খোল আঁখি তব রূপের পাগল ;'
একিরে যুবতী অকলঙ্ক রূপ,
জোছনার প্রভা হাসি খল খল।

২৫।

সম্ভ্রমে যুবক ব্যথিত পরাণে,
হেরি সে রূপের উজ্জল মাধুরী,
সাপটি ধরিতে করিল প্রয়াস
শূন্যেতে মিলিল প্রেমের চাতুরী।

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু।

এল।

কন্‌কনিয়ে পোষের সাথে,
শীত এসেছে কবে ;
শুষ্ক নদী, তরুলতা
খাদ খন্দ সবে।
লাবণ্য হীন পুরুষ, নারী
হিমেল হা'য়া পেয়ে ;—
রাহু যেন চাঁদ ধরেছে,
চুপে চুপে যেয়ে।
ফিরে এল চন্দন বায়ু,
হাসল লতা বন ;
ঊর্দ্ধ ডালে— ধবল গুচ্ছ,-
ফুট্‌ল শোভাঞ্জন।
দীঘির ঘাটে অশোক তরু
রঙিন ফুলে ভরা ;
বেল বকুলে গন্ধ রাজে
পূর্ণ নীরস ধরা।
আকুল ছিল চাতক কেঁদে,
আকুল ছিল চাষী,
দুর্দ্দুর কুল আকুল ছিল,
আকুল গৃহবাসী।
বৃক্ষ-ছায়া, কুঞ্জকানন,
আগুন ছিল বাতাসে ;—

(আজ) টুপ্ টুপ্ টুপ্— বৃষ্টি এল
মেঘ ভরা অই আকাশে।

* * * *

পেথম ধরা পক্ষি রাজা
লুকিয়ে কাঁদে কোথা সে !
আয় আয় আয় দীর্ঘ কালে
মেঘ উঠেছে আকাশে ?

(২)

কৃষাণ কহে মনের কথা
শান্ত পল্লী বাটে,—
ভাত দুটী চাই সকালে তার,—
লাঙল যাবে মাঠে।
এ দুর্যোগে— সুযোগ হ'ল,
ফেলি দীর্ঘ শ্বাস,
শাক সব্‌জী বুন্‌বে গৃহী,—
বাগান করে চাষ।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ আঁধার মেঘে
বৃষ্টি ধারা ঝরে ;
বাদ্‌লা দেখি খোকা, খুকী
হেসে পাগল ঘরে।
শান্ত, তৃপ্ত, সিক্ত হ'ল
ধরা রাণীর বুক ;
ফাঁকা মাঠে— বাজার যেন
আস্‌ল নব যুগ।
খালে বিলে ঝিল্লী ডাকে,
ভেকের কুতুহল ;
উচ্চ শাখী, মগ্ন কুটির,
ঝড়ে রসাতল।
'বশেখী' ঝড়,— আম বাগানে
আগিয়ে ওঠা ভার ;
সামাল সামাল পশ্চিমে মেঘ,—
পল্লী ধুন্ধুমার।
নূতন বর্ষে, লাজুক বর্ষা,
মুখ দেখাল আভাসে ;

টুপ্‌ টুপ্‌ টুপ্‌— বৃষ্টি এল
মেঘ ভরা অই আকাশে।
* * * *
পাহাড় তলে কেকা রবে
নাচ রে পাখি রভসে ;
কাল কাল জমাট বাঁধা—
মেঘ উঠেছে নভসে

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়

বোধেন্দু-বিকাশ ।

সুন্দর সুনীলাকাশ বিশাল বিস্তৃত ;
শোভে তাহে, শারদীয় শুভ্র-শশধর ।
'কারণ'-সলিলে যথা 'স্বয়ম্ভু' শয়িত,
সৃষ্টির প্রাক্কালে, যবে বিশ্ব মগ্ন নীরে ;
শোভিত কৌস্তুভ কিংবা কেশব হৃদয়ে ।
অতি তৃপ্ত মনঃ-প্রাণ ইন্দু নিরীক্ষণে,
পড়ি'ছে সুন্দর-রশ্মি, ধরণী উপরে ;
বিকসিত তাহে; স্বচ্ছ সরোবর নীরে
ইন্দু প্রাণা কুমুদিনী—সরঃ সুশোভিনী ।
শশীর সুরম্য মূর্ত্তি সরসী ভিতরে
বিচলিত, বায়ু ভরে নীর-সমুচ্ছ্বাসে ।
ভ্রমি'ছে চকোর, রঙ্গে চন্দ্রের চৌদিকে
সুধা-পান আশে, এই স্নিগ্ধ-নিশা-যোগে ।
নিশীথ নির্ম্মল বায়ু, মৃদু সঞ্চালিত
কুসুম-সুবাস-ভরে আক্রান্ত বিধায় ।
দুলি'ছে মৃদুল লতা ; ক্ষুদ্র বারিবাহ
মন্থর গমনে ধায় উত্তর আকাশে ।
উলুক বাদলী আদি নিশাচর জীব
বিহরে আনন্দে সবে সুধাংশু-আলোকে ।
শুভ্রময়ী বসুন্ধরা নীরব নিথর
শ্রবণবিবরে কভু পশে শান্তিনাশা
শিবা সারমেয় রব অশিব সংসারে ।
নিদ্রিত জড়ের প্রায় দিবাচর জীব ;
নিশ্চিন্ত অন্তর সবে নিশার প্রভাবে ;
কোলাহলপরিশূন্য শান্তি-পূর্ণ ধরা ;
রমণীয় বেশে হাসে 'প্রকৃতি' সুন্দরী ।
স্থির-ধীর-সৌম্য-মূর্ত্তি তুলনারহিত—
মনঃ প্রাণ মুগ্ধ এই রূপ নিরখিয়া ;
তিরোহিত শোক-দুঃখ, দগ্ধ হৃদি-তাপ ,
অপূর্ব্ব উল্লাসে মনঃ হ'তেছে মগন,
উদিছে উল্লাস-রাশি হৃদয়-কন্দরে ।
ক্রমশঃ অবশ অঙ্গ ;—জাগে এই মনে
ধরা বুঝি স্বর্গধামে হ'ল পরিণত ;
রোগ শোক আর্ত্তনাদ বিলুপ্ত সহসা ;
বহিল উল্লাস-স্রোতঃ দিক্‌ মাতাইয়া ;
'শান্তি-নিকেতন' যেন নিখিল ভুবন !
ভুলিনু পূর্ব্বের ভাব ;—মোহ পরবশে
শক্তিশূন্য অবসন্ন প্রকৃতির রূপে ;
মায়ার প্রভাব ইহা, নারিনু বুঝিতে ;
একান্ত আনন্দ-ময় হেরিনু সকল ।
অকস্মাৎ দৈববশে হৃদয়-মন্দিরে
মুক্ত মানসের দ্বার । শুনিনু বিস্ময়ে
কে যেন কহিল কর্ণে অমিয় বরষি'
"সাবধান অরে বাছা ! হও প্রলোভনে ;
অলীক সকলই ভবে ; সার হের কিবা ?
ভুল'না মায়ার বশে সার নিত্য ধনে ।
ভ্রমিও না ভ্রম মার্গে, অজ্ঞানসদৃশ ।
আশ্রিতা যাঁহার তুমি—তব মনঃ প্রাণ
অর্পে'ছ একান্ত যাঁরে সেই শান্তিময়ে
ভুলিও না ; ভক্তিভাবে ভজহ তাঁহার
চরণ-সরোজ যুগ—শান্তির আকর,
লভিবে অনন্ত শান্তি, দুঃখ হ'বে দূর ।"
সঞ্চারিল প্রমা মনে ; ঘুচিল সংশয়
শ্রীগুরু কৃপায় মম—উপযুক্ত কালে ।
উল্লাসে ধাইল মনঃ, শ্রীপদে তাঁহার,
লভিনু "স্বরূপ জ্ঞান" যাঁহার প্রসাদে ।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ ।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে আর্য্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রন্থাবলী অতুলনীয়—বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-বিষয়ক।

১। **সাহিত্য-চিন্তা।** এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **কাব্যচিন্তা।** রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **কাব্যসুন্দরী** দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সৃষ্টিচাতুর্য্য এবং সুন্দরীগণের চরিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সামাজিক।

৪। **সমাজতত্ত্ব।** হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

৫। **সমাজচিন্তা।** বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ধর্ম্মবিষয়ক।

৬। **দেবসুন্দরী।** হিন্দু দেবদেবীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৭। **হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ।** প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হওয়াতে এই গ্রন্থ সর্ব্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১।০ মাত্র।

৮। **সৃষ্টিবিজ্ঞান।** পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২০১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।

REG. No. C. 280.

কলিকাতা, ২০৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, অন্তঃপুর প্রেসে, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

আজি বাদ্‌লায়।

আজি বাদলায়, উচাটন মন
কেমনে কাটিবে সারা রাতি;
নিরালয়ে একা, নাহি কিছু কাজ—
খুঁজিয়া দেখেছি পাতি পাতি।
ঝম্ ঝম্ ঝম্—ঝরিছে বাদল
অলসের নাহি ঘুম ঘোর;
সুপ্ত-স্মৃতি কত বরষার সাথে
জাগিল হৃদয়ে আসি মোর।
হৃদয় চঞ্চল, রোমে রোমে জ্বলে
আমার এ ক্ষুদ্র তনুখানি;
নিভে না এ জ্বালা—যদি তপ্ত বুকে
ঢালি সারা বরষার পানি।
উঠি, বসি, ভাবি, চাহি মেঘ পানে—
পড়ে কত দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস;
বিরহ বিধুর হেথা একা আমি,
একে একে যায় বর্ষা-মাস।
আজি বাদ্‌লায় কানন মাঝারে
ফুল্ল বনজ কুসুম কুঁড়ি;
দূর পল্লীগ্রামে—গ্রাম্য বালিকায়
ঘরে ঘরে খেলে 'বুড়াবুড়ি'।

আজি বাদ্‌লায় ফুটেছে কেতকী
বাগানে বেড়ায় ধীরে ধীরে;
নব কিশলয়ে—সাজিয়া বকুল
চুমিছে মালতী লতিকারে।
আজি বাদ্‌লায় তরু, লতা, বন
আনন্দ সাগরে ডুবে সারা;
আজি বাদ্‌লায় নদী, খাল, বিল
যৌবন-গরবে আত্মহারা।
আজি বাদ্‌লায় প্রগল্ভ মণ্ডুক
হেথা হোথা করে ছুটাছুটি;
আজি বাদ্‌লায় কপোত কপোতী
বাসায় বসিয়া জুটাজুটি।
আজি বাদ্‌লায় বিরহীর দুখ—
বলিবার নাহি ভাষা;
কি জানি কেন যে মনে ভাসে এক
অজানা অতৃপ্ত আশা।
আজি বাদ্‌লায় একাকী প্রবাসী
সুদূর প্রবাসে জীর্ণ-ঘরে,—
সেই মুখখানি আসিয়া স্মরণে
পরাণ কাঁদিছে তারি তরে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উতঙ্ক—১। বেদ নামক মুনির একজন শিষ্য। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও গুরুভক্ত ছিলেন। কোনও সময়ে জনমেজয় ও পৌষ্য নামক নরপতিদ্বয় বেদ মুনিকে আপনাদের উপাধ্যায়রূপে বরণ করেন। একদা বেদ উতঙ্ককে আপনার সংসারের সকল ভার দিয়া প্রবাসে গমন করেন। ইত্যবসরে এক দিন বেদপত্নী, উতঙ্ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'উতঙ্ক, তোমার গুরুদেব গৃহে নাই, তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয়, তুমি তাহাই কর।' গুরুপত্নী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও উতঙ্ক এরূপ কুকর্ম্ম করিলেন না। বেদমুনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের এবংপ্রকার আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং 'তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি হইবে' এইরূপ বর প্রদান করিয়া উতঙ্ককে বিদায় দিলেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে, বেদমুনি তাঁহার পত্নীর আদেশ পালন করিতে অনুমতি করিলেন। গুরুপত্নী পৌষ্যরাজ-পত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। উতঙ্ক পৌষ্যরাজের নিকট যাইয়া কুণ্ডল চাহিবামাত্র পৌষ্যরাজ কুণ্ডল প্রদান করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, "আপনি অতি সাবধানে কুণ্ডল লইয়া যাইবেন; কারণ নাগরাজ তক্ষক ইহার প্রতি লোলুপ হইয়া সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে।" উতঙ্ক আসিতে আসিতে পথে একজন কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া উতঙ্ক স্নানাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণকরূপী তক্ষক কুণ্ডল লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করিলেন। উতঙ্ক স্নানান্তে উঠিয়া দেখেন, কুণ্ডল নাই। তখন তাঁহার পৌষ্যরাজের কথা স্মরণ হইল। অতঃপর বহুকষ্টে ইন্দ্রের বজ্রের সাহায্যে নাগলোকে গমনপূর্ব্বক কুণ্ডল আনিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করেন। তৎপরে গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জনমেজয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তক্ষক বিনাশার্থে ইনিই জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞে উত্তেজিত করেন।

২। উতঙ্ক নামে আর একজন মুনি ছিলেন। তিনি গৌতম মুনির শিষ্য। ইনিও অতিশয় গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ইনিও গুরুপত্নী অহল্যার আদেশে সৌদাসরাজপত্নীর কুণ্ডল আনিয়া দেন। গৌতম ইহাঁকে বড় ভালবাসিতেন। অন্যান্য শিষ্যগণের পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌতম তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু উতঙ্ককে ছাড়িলেন না। এইরূপে প্রায় শতবর্ষ অতীত হইলে উতঙ্ক গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন গৌতম স্বীয় কন্যার সহিত উতঙ্কের বিবাহ দিয়া গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, অতঃপর উতঙ্ক কোনও মরুভূমিতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া বর দিতে চাহিলে, শ্রীহরির দর্শন

ঋষিবর অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। ইহাঁর এইরূপ অনাসক্তি, নির্লোভতা এবং হরিভক্তি দর্শনে বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হইয়া বর লইবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করাতে ঋষিবর বলেন, "আমার বুদ্ধি যেন সতত ধর্ম্মে, সত্যে, দমে নিরতা থাকে। মদীয় চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ যেন আপনার প্রতিই নিয়ত ভক্তিপ্রবণ হয়।" ত্রিলোকের হিতার্থে উতঙ্ক কুবলাশ্ব রাজদ্বারা দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশ সাধন করেন।

উতথ্য—একজন সুপ্রসিদ্ধ মুনি। ইনি বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। মমতার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা নামে ইহাঁর এক অন্ধ পুত্র হয়।

উত্তর—বিরাটরাজের পুত্রের নাম উত্তর। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ পঞ্চভ্রাতা ছদ্মবেশে বিরাটরাজভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক সময়ে বিরাটরাজ, সুশর্ম্মা রাজার সহিত যুদ্ধে গমন করিলে সেই অনুপস্থিতিকালে কুরুবীরগণ বিরাটরাজের উত্তর গোগৃহে উপস্থিত হইয়া গোধনসকল হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাজধানীতে কেবল উত্তর ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, "এ সময়ে আমি একজন সারথি পাইলে গোধন মোচন করিতে পারিতাম।" তখন ক্লীববেশধারী অর্জ্জুন উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু কুরুসৈন্য-দর্শনে ভয়াভিভূত হইয়া উত্তর রথ ফিরাইতে বলেন। অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া উত্তরকে রথের সহিত গণকে পরাস্ত করিয়া গোধন মোচন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিবসেই উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হন। উত্তরের আর এক নাম ভূমিঞ্জয়।

উত্তরা—বিরাট-রাজতনয়ার নাম উত্তরা, ইনি উত্তরের ভগিনী। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বিরাটরাজভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই সময়ে বৃহন্নলানামধারী ক্লীববেশী অর্জ্জুন ইহাঁকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সকলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উত্তরাকন্যারত্ন অর্জ্জুনকে ভার্য্যারূপে সম্প্রদান করিতে চাহেন। শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত ইহাঁর বিবাহ দেন। সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় সমরে অভিমন্যু নিহত হইলে উত্তরা দ্বাদশ বৎসর বয়সে যখন বিধবা হন, তখন পরীক্ষিৎ গর্ভে ছিল। পরে অশ্বত্থামা ঐশিকাস্ত্র-প্রয়োগে গর্ভস্থ শিশুকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে শিশুকে রক্ষা করেন।

উত্তানপাদ—একজন সুপ্রসিদ্ধ নরপতি। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইহাঁর দুই স্ত্রী, সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে, এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপরায়ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুরুচির বাক্যে রাজা সপুত্রা সুনীতিকে বনবাস দেন। পরে কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া যথাসময়ে ধ্রুবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। [ধ্রুব দেখ]।

উদয়নাচার্য্য—ইনি একজন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। বুদ্ধদেব ও উদয়নাচার্য্য

স্থান মিথিলা। কুসুমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত।

উদয়াদিত্য— ইনি সুবিখ্যাত মালবাধিপতি ভোজরাজের পুত্র। ১০৯২ খৃঃ অব্দে ভোজ নরপতির মৃত্যু হইলে উদয়াদিত্য মালবের রাজা হন। ইনি পিতৃবৈরী চেদি ও চালুক্যদিগকে মালব হইতে দূরীভূত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন।

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণের সখা, ইনি সত্যকের পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য, ও বৃষ্ণিবংশীয় মন্ত্রী; যদুবংশধ্বংসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন; ইনি শেষদশায় বদরিকাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন।

উপগুপ্ত—ইনি একজন বৌদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ, বুদ্ধ নির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে কালাশোকের সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে শূদ্র, সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি যোগবলে সমাধিকালে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মথুরাতে ইনি প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য মুনির একজন শিষ্য। ইনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। ইনি গুরুর আদেশে তাঁহার গোচারণ করিতেন, এবং সেই সময় ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন। একদা গুরু উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, উপমন্যু আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানাইলেন। তখন গুরু বলিলেন, "দেখ উপমন্যু! আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষাদ্রব্য উপভোগ করা তোমার উচিত হয় নাই।" তদবধি উপমন্যু ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, গুরুর নিকট রণকালে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করেন, এবং তাহাতেই অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হন এদিকে আয়োদধৌম্য শিষ্যকে যথাসময়ে গৃহাগত না দেখিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপসমীপে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন উপমন্যু কূপমধ্য হইতে আপনার অবস্থা নিবেদন করিলেন। আয়োদধৌম্য তাঁহাকে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে উপদেশ দিলেন। উপমন্যুর স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারেরা তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন। আয়োদধৌম্যও শিষ্যের এবংবিধ গুরুভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া দিলেন।

উপসুন্দ—১। নরকাসুরের সেনাপতি; ইনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ২। জনৈক প্রতাপান্বিত দৈত্য। ইহার পিতার নাম নিকুম্ভ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। উভয় ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে যে, ইহারা অন্যের অবধ্য হইবে, কেবল পরস্পরের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব থাকায় ইহারা প্রকারান্তরে অমর হইল বলিয়া মনে করিল, এবং ত্রিলোক জয় করিয়া দেবতাদিগের ও মুনিঋষিদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহাদের উৎপীড়নে নিতান্ত উৎপীড়িত দেবগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া দৈত্যদ্বয়ের বিনাশের প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা একটী অনুপম রূপবতী কামিনী সৃজন করাইলেন।

এই অলোকসামান্যা রমণী সৃষ্টি করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তিলোত্তমা হইল। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত দুই ভ্রাতায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়েই নিহত হইল।

উমা—'উ' (অয়ি পার্ব্বতি!) 'মা' (না, অর্থাৎ তপস্যা করিও না), এই কথা পার্ব্বতীর মাতা মেনকা বলাতে পার্ব্বতীর এক নাম 'উমা' হইয়াছে। "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" [কালিদাস কৃত কুমার-সম্ভব]। দক্ষযজ্ঞে পতি-নিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং শিবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত অতি অল্প বয়সে গৌরী তপস্যায় প্রবৃত্ত হন; সেই সময়ে মেনকা ইহাঁকে পূর্ব্বোক্তরূপ 'উ-মা' বলিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করেন, তাহাতেই পরে ইহাঁর নাম 'উমা' হইল।

উমিচাঁদ—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমীর চাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিক্ অপর একজন শিখ বণিকের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই আমীরচাঁদ বাঙ্গালার ইতিহাসে উমিচাঁদ নামে পরিচিত। সে সময়ে বৈষ্ণবদাস শেঠ ও মাণিকচাঁদ শেঠ নামক দুইজন বণিক্ বাঙ্গালায় বহুবিস্তৃত বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমীর চাঁদ আসিয়াই ইহাঁদের নিকট বাণিজ্য-বিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এবং আপনার কার্য্যদক্ষতাগুণে ইহাঁদিগের কারবারের বংশে বহুদিন কার্য্য করিয়া আমীরচাঁদও যথেষ্ট ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। অবশেষে পরের দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজেই স্বতন্ত্রভাবে কারবার করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালা ও বিহারের সর্ব্বত্রই ইহাঁর বাণিজ্যব্যবসায় প্রসার লাভ করে।

এই সময়ে বাঙ্গালায় ইংরেজদেরও বাণিজ্য চলিতেছিল। কলিকাতা ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসকল তখন ইংরেজদের অধিকারে ছিল। আমীরচাঁদ কলিকাতায় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে বহুসংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত ছিল। তদ্ভিন্ন একদল অস্ত্রধারী ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ফলতঃ আমীরচাঁদ সে সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত ও পদমর্য্যাদাশীল বণিক্ হইয়াছিলেন। ইংরেজদিগের পণ্যদ্রব্য সরবরাহের অধিকাংশ দাদন আমীর চাঁদ লইতেন। সেই সূত্রে ইংরেজদিগের সহিত ইহাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার সুবাদার (নবাব) আলিবর্দ্দি খাঁ। মুর্শিদাবাদ তাঁহার রাজধানী। এই মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারেও আমীর চাঁদের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, নবাবের সহিত ইংরেজদিগের কোনওরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইংরেজরা অনেক স্থলে আমীর চাঁদকে মধ্যস্থ মানিতেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই আমীর চাঁদ ইংরেজের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া পড়েন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দাদন লইয়া আমির চাঁদ যথেষ্ট লাভ করিতেন। শেষে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্যায়রূপেও লাভ করিবার চেষ্টা করিতে

পারিয়া আমীরচাঁদের দাদন বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং তদবধি ইঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে আলীবর্দ্দিখাঁর মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার (নবাব) হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই ইংরেজদিগের সহিত নবাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ লুটপাটে অধিক ধন না পাইয়া হতাশে আমীরচাঁদের বাটী লুণ্ঠন করিয়া চারি লক্ষ টাকার হীরামুক্তাদি জহরত ও বিস্তর টাকার বাণিজ্য দ্রব্য অপহরণ করিল। অতঃপর এই ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইভ্ ও ওয়াট্‌সন রণপোত ও সৈন্যসামন্ত লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। নবাবের সহিত ইংরেজের সন্ধি হইল। ইহার কিছু দিন পরেই নবাবের সেনাপতি মিরজাফর ও অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মির-জাফরকে নবাব করিবার চক্রান্ত করি-লেন, এবং এ বিষয়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইভ্ সানন্দে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। এদিকে উমিচাঁদ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বলিয়া বসিলেন, "আমাকে ৩০ লক্ষ টাকা না দিলে আমি নবাবকে সকল কথা বলিয়া দিব।" এই সময়ে ধূর্ত্ত ক্লাইভ্ "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" রূপ নীতিবিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি দুই-খানি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খানি সাদা ও অপরখানি লাল। সাদা-খানি আসল, ও লালখানি কৃত্রিম। সাদা কাগজে প্রকৃত চুক্তি সমস্ত লিখিত হইলে ওয়াট্‌সন সাহেব ও কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বারগণ স্বাক্ষর করিলেন; তাহাতে উমিচাঁদের নাম বা তাঁহার প্রাপ্য ৩০ লক্ষ টাকার কথা কিছুই লিখিত হইল না। কৃত্রিম লাল কাগজখানিতে উমি-চাঁদকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার লিখিত হইল। কিন্তু ওয়াট্‌সন সাহেব বা অপর কোনও সাহেব এই কৃত্রিম কাগজে স্বাক্ষর করিতে চাহিলেন না। তখন ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত, স্বার্থান্ধ ক্লাইভ্ অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাতে ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন।

অনন্তর পলাশীর যুদ্ধের পর মির-জাফর যখন নবাব হইলেন, তখন সাদা কাগজের চুক্তি অনুসারে সমুদায় বিষয় মিটান হইল। উমিচাঁদ টাকা চাহিলে তাঁহাকে আসল সাদা কাগজখানি দেখাইয়া বলা হইল, তাঁহার নিকট যে লাল কাগজ আছে তাহা জাল। এই কথা শুনিয়া উমিচাঁদের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে না ধরিলে হতভাগ্য অর্থপিশাচ বৃদ্ধ উমিচাঁদ ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাই-তেন। ইহার পরেই তাঁহার উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতঃপর উমিচাঁদ একদিন ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, ক্লাইভ তাঁহাকে তীর্থ-পর্য্যটনের পরামর্শ দেন। হতভাগ্য উমিচাঁদ সেই কথায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণকালে মালদহের নিকট এককালে জ্ঞান হারাইলেন। এই

সময়ে কখনও তিনি রাজা উজীর সাজিতেন, কখনও বা হায় কি হইল বলিয়া রোদন করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

উর্ব্বশী—স্বনামখ্যাত স্বর্বেশ্যাবিশেষ। ইহাঁর জন্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে ;——নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে ইন্দ্র স্বীয় রাজ্যচ্যুতির ভয়ে কামদেবকে ও অপ্সরাদিগকে তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। নরনারায়ণ ইহাঁদিগের কার্য্যকলাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইহাঁদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। সমাগত দেবগণ নরনারায়ণের এই অলৌকিক ইন্দ্রিয়সংযম দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ তাঁহাদিগকে অদ্ভুতদর্শনসমলঙ্কৃত রমণীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন, এবং দেবগণকে সেই সকল রমণীর মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবগণ উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থিত হইলেন।" নারায়ণের ঊরুভেদ করিয়া সমুদ্ভূত হওয়ায় ইহাঁর নাম উর্ব্বশী হইল।

উলূপী—ঐরাবত কুলসম্ভূত কৌরব্য নামক নাগরাজের কন্যার নাম উলূপী। অর্জ্জুন একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ভ্রমণকালে এই নাগকন্যা দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন করেন, এবং তথায় ইহাঁর প্রার্থনামতে ইহাঁকে বিবাহ করেন। উলূপী সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে এই বর দেন যে, তিনি জলমধ্যে অজেয় হইবেন এবং সমস্ত জলচর জন্তুই তাঁহার বধ্য হইবে।. কুরুক্ষেত্র সমরের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞকালে যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মণিপুরে উপস্থিত হইলে অর্জ্জুনের মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র বভ্রুবাহন ঘোটক বন্ধন করেন। অতঃপর ঘোটকসমভিব্যাহারী অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন পিতার অভ্যর্থনা করিতে আগত হন। পুত্রকে রণসজ্জায় সজ্জিত না দেখিয়া অর্জ্জুন যথোচিত তিরস্কার করেন। বভ্রুবাহন সে তিরস্কার উপেক্ষা করেন। কিন্তু নাগকন্যা উলূপী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করেন। এই যুদ্ধে উলূপীর মায়ায় অর্জ্জুন পুত্রের নিকট পরাজিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। উলূপীই আবার নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া পতির চৈতন্য সম্পাদন করেন। কুমিল্লা ও ত্রিপুরার রাজারা আপনাদিগকে অর্জ্জুনের ও উলূপীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

উশীনর—যদুবংশীয় নরপতিবিশেষ ; ইহাঁর পিতার নাম মহামনা ও পুত্রের নাম শিবি রাজা। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং বহু যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও অগ্নিদেব কপোতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কপোত শ্যেন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া উশীনর রাজার ঊরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্যেন রাজার নিকট আপনার ভক্ষ্য কপোতকে প্রার্থনা করে। রাজা আশ্রিত পরিত্যাগ ঘোর অধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া কপোতের পরিবর্ত্তে তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কিছু গ্রহণ করিতে বলেন। তখন শ্যেন রাজার দেহ হইতে কপোতপরিমিত মাংস প্রার্থনা করে। রাজা

অম্লানবদনে আপনার শরীর হইতে স্বহস্তে মাংস কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কপোত-পরিমিত মাংস দিতে দিতে তাঁহার শরীরের সমস্ত মাংস নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন শ্যেন ও কপোত স্ব স্ব প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করেন।

উষা—দৈত্যপতি বাণ রাজার কন্যার নাম উষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয় [অনিরুদ্ধ দেখ]।

ঋতধ্বজ—শক্রজিতের পুত্র। ইনি গালবমুনির সূর্য্যপ্রদত্ত কুবলয় নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া বজ্রকেতু নামক দানবের পুত্র পাতালকেতুর বিনাশসাধনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা মদালসাকে বিবাহ করেন।

ঋতপর্ণ, ঋতুপর্ণ—অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় একজন নরপতি। ইহাঁর পিতার নাম অযুতাশ্ব। অক্ষক্রীড়ায় ও গণনাবিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পুণ্যশ্লোক নলরাজা কলি প্রাপ্ত হইলে বাহুক নাম ধারণ করিয়া সারথির বেশে ইহাঁর আশ্রয়ে বাস করেন। নল-মহিষী দময়ন্তী নলকে পাইবার আশয়ে আপনার স্বয়ংবরের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিলে ঋতুপর্ণ রাজা অশ্ববিদ্যাবিশারদ নলকে সারথি করিয়া শীঘ্রগমনে বিদর্ভ নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ইনি গণনাবিদ্যার পরিচয় দিয়া নলকে অক্ষবিদ্যা প্রদান করেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া তৎপরদিবস নলের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন, এবং নলের নিকট অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন। এই ঋতুপর্ণ রাজার মন্ত্রপ্রভাবে কলি নলের শরীর হইতে বহির্গত হয়।

ঋষ্যশৃঙ্গ—একজন মুনি। কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র এবং অযোধ্যাধিপতি রাম-পিতা দশরথের জামাতা। কোন সময়ে অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া জলমধ্যে বিভাণ্ডক ঋষির রেতঃস্খলন হয়। এক মৃগী রেতঃসহ সেই জল পান করায় গর্ভবতী হয়। সেই গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। মৃগীর গর্ভে জন্ম হেতু ইহাঁর একটি শৃঙ্গ হওয়ায় ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ নাম প্রাপ্ত হন। জন্মাবধি যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্য নরনারীর মুখ দেখিতে না পাওয়ায় ইনি অতিশয় তপোনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠেন। এই সময়ে দশরথবন্ধু অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় রাজা মহাবিব্রত হইয়া পড়েন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনিতে পারিলেই অনাবৃষ্টি দূর হইবে। লোমপাদ এই কার্য্যে কতকগুলি পরমা সুন্দরী বেশ্যা নিয়োজিত করেন। বেশ্যারা বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়া অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করে। ইহাঁর আগমনমাত্র দেশে প্রচুর বৃষ্টি হইল। তখন লোমপাদ রাজা কৃতকৃতার্থ হইয়া বিভাণ্ডক ঋষির কোপ ও অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত শান্তা নাম্নী আপনার পালিতা কন্যার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন। এই শান্তা দশরথের ঔরসজাতা। দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পরম মিত্র লোমপাদকে এই কন্যা দান করিয়াছিলেন। দশরথ রাজা পুত্রাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ায় এই ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, তাহাতেই রামচন্দ্রাদি পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন।

কলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শন দ্বারা একলব্য অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থ একলব্য দ্রোণসমীপে উপস্থিত হইলে নিষাদপুত্র বলিয়া দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর একলব্য বনগমনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অনন্যমনে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং যোগবলে অল্প দিন মধ্যে ধনুর্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। একদা দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনাদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ একলব্যের বনে উপস্থিত হন। ইহাঁদিগের একটি কুক্কুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জটাবল্কলধারী একলব্যকে দেখিয়া ভীষণ শব্দ করিতে থাকে। সেই চীৎকারে একলব্যের তপোবিঘ্ন হওয়ায় তিনি এককালে সাতটি শব্দভেদী শর কুক্কুরের মুখবিবরে নিক্ষেপ করেন। কুক্কুরের শব্দশক্তি তিরোহিত হইল। কুক্কুর সেই অবস্থায় অর্জ্জুনাদির নিকট ফিরিয়া আসিলে, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া শরক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে একলব্য আপনাকে নিষাদপুত্র ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন অর্জ্জুন সমুদয় বৃত্তান্ত দ্রোণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "আপনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, আমার অপেক্ষা আপনার ভাল শিষ্য নাই, তবে নিষাদপুত্র কিরূপে [illegible] প্রকার শরক্ষেপ-বিদ্যা আপনি আমাকে শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল জগতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর আছে।" অর্জ্জুন এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিলে দ্রোণ তাঁহাকে লইয়া একলব্য সমীপে গমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ব্ববৎ আপনাকে দ্রোণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণ ছল করিয়া তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলে একলব্য অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

একেক্ষণ—শুক্রাচার্য্য। পুরাণে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ বামনদেব বলি রাজার নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা করায় বলি তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তদীয় গুরু শুক্রাচার্য্য যোগবলে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিকে তাহা প্রদান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বলি প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সে কথা না শুনিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন; তখন জল ব্যতিরেকে দান অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শুক্রাচার্য্য সূক্ষ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ভৃঙ্গার মুখে অবস্থিত হইয়া জলপতন রোধ করেন; বামনদেব প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ভৃঙ্গারের ছিদ্রান্বেষণচ্ছলে কুশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া শুক্রাচার্য্যের একটি চক্ষু নষ্ট করেন; সেই অবধি শুক্রাচার্য্য একনেত্র হইয়া "একেক্ষণ" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। কথাতেই বলে "কাণা শুক্র।"

কংস—স্বনামখ্যাত অসুর। কৃষ্ণজননী দেবকীর পিতৃব্য উগ্রসেনের পুত্র; সুতরাং

সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল। ইনি জরাসন্ধ রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একে স্বয়ং স্বভাবতঃ দুর্ব্বৃত্ত, তদুপরি জরাসন্ধের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় কংস যাবতীয় যাদবগণকে উপেক্ষা করিয়া এবং স্বীয় জনক উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া আপনি মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ইহাঁর পিতৃব্যতনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হইলে কংস দৈববাণীতে অবগত হন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবে। অতঃপর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাদের এক একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর ইনি সেই নবপ্রসূত শিশুর প্রাণবধ করেন। নিষ্ঠুর কংস এইরূপে ক্রমান্বয়ে সাতটি সদ্যোজাত শিশুকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব সেই রজনীতেই কৌশল করিয়া শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে [যোগমায়াকে] আনাইয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। পরদিন কংস সেই কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে কংসের ভাবী হন্তা জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

অতঃপর কংস তাঁহার ভাবী হন্তার প্রাণবিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন, এবং কেশী, ধেনুক, পুতনা প্রভৃতি অনুগত অনুচর ও অনুচরীকে আদেশ করিলেন, "তোমরা যে বালকের শরীরে বলাধিক্য দেখিবে, তাহারই প্রাণবধ করিবে।" উহারা কৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণই যে তাঁহার ভয়ের কারণ, তাহা কংস বুঝিতে পারেন। অনন্তর কৃষ্ণের বধার্থে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগত হইলে তাঁহাদের বিনাশের জন্য কংস বহুবলশালী মল্ল ও মাতঙ্গ নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ-বলরাম তাহাদের সকলকে বধ করিয়া কংসের প্রাণবিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। এদিকে কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে কংসেরই পতন হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আপনার জনক-জননীকে ও উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় নরপতি। রামায়ণের মতে, ইনি ভগীরথের পুত্র। [মতান্তরে, ইহাঁর পিতার নাম পুরঞ্জয়]। এই রাজা ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। ইহাঁর আদিম নাম পুরঞ্জয়; পরে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ককুৎস্থ নাম প্রাপ্ত হন। কোনও সময়ে দেবগণ অসুরকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি দেবগণকে পুরঞ্জয় রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অনন্তর দেবগণ ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা মহাবৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং অসুরগণের বিনাশ করিয়া দেবগণকে নিরুপদ্রব করেন. তদবধি ঐ ভূপতি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ক্রমশঃ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ! আজি যে বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত নির্লজ্জ ও দুঃসাহসিকের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলাম, তাহা অতীব গুরুতর, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অত্যধিক মর্ম্মানুবন্ধী। ভাগ্যবশে, বিধিরোষে, অথবা কর্ম্মদোষে আমরা এমনই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, অজ্ঞানান্ধকারে এত ঘোরতর নিমগ্ন হইয়াছি,—হিতাহিত বিবেচনা—এক কথায় সহজ বিবেকবুদ্ধি হইতে এত দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, নিজেদের অবস্থা নিজে বুঝিতে পারি না—আপনাদের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারি না, গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া লইতে পারি না। যেন চাকুরীই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান স্মর্ত্তব্য, শ্রেষ্ঠ অনুসর্ত্তব্য। আজীবন এই চাকুরীর চটুল চমক চাকচিক্যের চিন্তা করিয়া, চরমের পরম গতি বলিয়া বসিয়া থাকি; চরাচর বিশ্বের আর কোন কথাই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই চাকুরীর মর্ম্মর মর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে, দৈনন্দিন পঞ্চ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এই চাকুরীতেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। এখন আমাদের পিতামাতাকে এই চাকুরীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মোক্ষ কামনা করিতে হইবে; কেননা রবিবারে শ্রাদ্ধের দিন না পড়িলে তাঁহাদের শ্রাদ্ধই বুঝি আর হইবে না। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা অথবা বনিতার সঙ্কট পীড়া হইলে অনেকে সেজন্য বিচলিত না হইয়া চাকুরীর চিন্তাতেই নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পড়েন। পাছে বেশি কামাই হইয়া চাকুরীটী হস্তচ্যুত হয়, এই ভাবনাতেই অনেককে ব্যাকুল হইতে দেখা যায়। আমি বলিতে পারি, তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি দেখাইতে পারি, প্রতি শতকে অন্ততঃ ত্রিশজন এইরূপ অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাত্মা আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি; দেবগুরুর পবিত্র নাম ছাড়িয়া সেই মহাপুরুষদিগের বিষয় আমার এক প্রকার জপমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজি সেই পবিত্র জপমালা গলায় ধরিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ভরসা করি, আপনারা সেজন্য আপনাদের বহুমূল্য সময়ের কলা বা কাষ্ঠা মাত্রও নিয়োগ করিতে কাতর হইবেন না।

বঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। কোটী কোটী নিরুপায় বঙ্গ সন্তানের উপায়-বিধান, নিবিড় অন্ধকারে স্নিগ্ধ বিমল আলোক-সঞ্চার, দগ্ধ মরুশ্মশানে মন্দাকিনীর পূত সলিল সেচন;—হইবে কি? স্বজাতিবর্গ কি আমাদের এই মহদভাব মোচন করিবেন? ইহা কি আকাশকুসুম, না উন্মাদ-প্রলাপ? কে বুঝাইবে?—বুঝিবে কে?

ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আজি বঙ্গের ঘরে ঘরে হার্ডার, কোম্‌ত, শোপেনহেয়ার, মিল, বেন্থাম, স্পেন্‌সার! আজি সর্ব্বত্রই কুনিক, ম্যাকিয়েভেলী ও বিস্মার্কের প্রতিভা-বিলাস। চাণক্য আর স্থান পান না; কপিল, কণাদ, গৌতম ও পতঞ্জলির আশা ভরসা আজি অতল জলে নিমজ্জিত। তবে পণ্ডিতের অভাব কৈ? বিদ্বানের অভাব কৈ? বুদ্ধিমানের অসদ্ভাব কোথায়? বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সমস্তই আছে,—নাই কেবল আত্মচিন্তা। গৃহে গৃহে পণ্ডিতের তাণ্ডব

নটন, কিন্তু নাই কেবল সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি! এই "শিরো নাস্তি শিরোব্যথার" ঔষধ কোথায়? এই শূন্য অভিমান, অহংজ্ঞান-বিমূঢ়াত্মার এই বৃথা বিলাপ-প্রলাপ, কিসে নিবৃত্তি পাইবে? হিন্দুর সে সমাজ নাই, সেই সামাজিকতা নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সাম্য দুন্দুভির ভীম নিনাদে প্রাচ্য সমাজনিবহ চূর্ণ হইতে বসিয়াছে। বাহিরে চটুল চমৎকারিত্বের চমক চাকৃচিক্য, ভিতরে কিন্তু সেই প্রাণহীন ঔদাসীন্য;—বাঙ্গালীর আত্মনির্ভর, একাগ্রতা, অধ্যবসায় কোথায়? ভণ্ডতা, কপটতা, স্বার্থপরতার কঠোর কাঠিন্যে, সরল সৌকুমার্য্য, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্বৃত্তিনিচয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন আছে কেবল—ক্ষীণপ্রাণ আড়ম্বর ও আস্ফালন। শুক্র-বিক্রেতার ক্রূর পরাক্রমে সমাজগাত্র শতধা ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত, কিন্তু তাহার প্রতিকার কে করে? সকলেই ভুগিতেছে, ভোগাই-তেছেও সকলে; তবু কাহারও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতেছে না কেন? হইতেছে না, তাহার কারণ—বাঙ্গালী এখন পূরা বারো আনা বিজাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। বাহিরের আড়ম্বর ও চাকৃচিক্যে যেটুকু জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সেই টুকুই আছে। ভিতরে আর সমস্তই ভুয়া। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নাই। অশন, বসন, ব্যসন,—সকল বিষয়েই বাঙ্গালী ইংজে-জের অনুকরণ করিতেছে। বাকি ছিল এক মাত্র ভাষা; তাহাও ইংরেজী হইয়া পড়ি-য়াছে। অনেক শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী এখন চারিটা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা একসঙ্গে বলিতে পারে না,—মধ্যে একটা ইংরেজী বুকনী দিতেই হইবে। এ দোষ এক প্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। টোলের বিদ্যাবাগীশ হইতে জোলের বুনো বদে পর্য্যন্ত এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার মত এই ভীষণ পীড়া জনপদো-ধ্বংসীর ন্যায় দেশ ছারখার করিতে বসিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি? শীঘ্র ইহার প্রতিকার না করিলে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। তবে এক্ষণে উপায় কি?

ইংরেজী-নবিশ ব্যাঘ্রাচার্য্যকেই জিজ্ঞাসা করি,—বল দেখি ভাই, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষার বিভিন্নতা কেন ঘটিল? তুমি ত "সায়ান্স" পড়িয়াছ, "ফাইল্যলজী" পড়িয়াছ, "বায়োলজী জুয়োলজী" অধ্যয়ন করিয়াছ। বল দেখি ভাই, হিন্দুর ও যবনের ভাষা এক নহে কেন? আচারব্যবহার এক নহে কেন? খাদ্যাখাদ্য এক নহে কেন? ইহার ভিতর কি বিজ্ঞানের কিছু গূঢ়তা নাই? ইহার অভ্যন্তরে কি নিগূঢ় ভগবদিচ্ছা প্রকটিত নহে? হয় বিজ্ঞানের দোহাই দাও, না হয় ভগবান্‌কে লইয়া সাফাই গাও। একটা পথ তোমাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। এখন কি তুমি স্বীকার করিবে, দেশজ বৃক্ষ ও লতা-গুল্মের ন্যায় প্রত্যেক দেশের ভাষার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে? সেই স্বাতন্ত্র্য, মনুষ্যকৃত নহে—তাহা সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলা-ভিলাষ। সেই স্বাতন্ত্র্য, একটা বিরাট প্রাকৃতিক নিয়মের কঠোর নিগড়ে নিবদ্ধ। সেই নিগড় ছিন্ন করিলে, প্রকৃতির বিকৃতি হইবে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার অবমাননা করা হইবে। তাহাতে নানা বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। সেই বিপ্লবে দেশ ছারখার হইবে; দেশের ভূগোল ও ইতিহাস অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিবে। প্রাচীন মিশর, মিডিয়া, ফিনিশিয়া ও ব্যাবিলন কোথায়? কোথায় সেই বেকস্, সিসষ্ট্রিস্ ও সেমিরামিসের অপূর্ব্ব সাধন-ভূমি? জগতের মানচিত্র হইতে তাহাদের রেখাপাতও বিলুপ্ত হইয়াছে! সেই সেদিন-কার রেড্ ইণ্ডিয়ান্ ও মেক্‌সিক্যান্‌গণ

কোথায় গেল? কোনও প্রচণ্ড নৈসর্গিক উৎপাতে ঐ সকল জাতি কিছু বিনষ্ট হয় নাই। এক দিনে এক মুহূর্ত্তে পম্পিয়াই রাজ্যের ন্যায় তাহাদের দেশ কিছু ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয় নাই। কালবশে ক্রমান্বয়ে তাহাদের ভ্রংশ ও ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষা ও আচার ব্যবহারের অপচয়—ক্রমে বিলয় হইয়া গিয়াছে। অবশেষে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। অতএব যদি জাতীয়তা রাখিতে চাও, জাতীয় ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখ; তাহা হইলে জাতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শত শত পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইলেও তোমাদিগের বাঙ্গালীত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না। জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, বাঙ্গালার সর্ব্বজনীন আলোচনা ও অনুশীলন কর। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জনসঙ্ঘের কেন্দ্রস্থলসমূহে উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত কর। বাঙ্গালা ভাষাতেই গণিত-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দাও। তোমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির উপযুক্ত মর্য্যাদা সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিয়া এই সকল ব্যাপারে হস্তার্পণ কর। তাহা হইলেই সকল কষ্ট দূর হইবে। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়াদি কাহার অধীন থাকিবে? কাহারা তৎসমুদায়ের সকল কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবে? কে তৎসমুদায়ের জন্য নিয়মাদির প্রণয়ন করিবে,—শাসন করিবে? সেইজন্য বলিতেছি, ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটী শাসক ও নিয়ামক সমিতি আবশ্যক। তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়, পরিষৎ, সমজ্যা, সমাজ, সংসদ্, যাহা ইচ্ছা বল; কিন্তু তাহা চাই।

সভ্য মহোদয়গণ! যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাটী লইয়া আমি এত চীৎকার করিতেছি, ইহা আমাদের কথা নহে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া কোন কথাই আমাদের সংস্কৃত ভাষায় নাই। যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এখন চাকুরীপ্রার্থী মাত্রেরই প্রধান আশ্রয়-স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সমবেত সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই একদিন না একদিন যাহার উচ্চ বেদিকায় বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া আসিয়াছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে কখনও ভারতে দেখা যায় নাই। ইহা ইংরেজী university শব্দের অনুবাদ মাত্র। প্রাচীন কালে—বৈদিক বা পৌরাণিক যুগে এই 'ইউনিভার্শিটী' প্রকৃতির কোন প্রকার অধিষ্ঠান ছিল না। তাহা ছিল না বলিয়া কেহ যেন ভাবিবেন না যে, তৎকালে কেহই লেখাপড়ার আলোচনা করিত না, বা কোন বিদ্যালয় ছিল না। হিন্দু রাজত্বকালে হিন্দুর গুরুগৃহই তাহার বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপযুক্ত মর্ম্ম রক্ষা করিয়া সে উপনয়নের পরই গুরুগৃহে প্রবেশ করিত এবং তথায় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া পঞ্চবিংশ বা ত্রিংশ বর্ষে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংসারী হইত। এইরূপে প্রত্যেক গুরুগৃহই ছাত্রের পক্ষে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলিতে হইবে। তবে এক এক বিষয়ে সামান্য সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। বেদ, উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে আমরা তর্ক ও বাগ্যুদ্ধের অনেক বিবরণ দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত লইয়া সেই সকল তর্কের সৃষ্টি। কিন্তু সেই সকল মতেরই মূলে ধর্ম্ম বা তত্ত্ব-কথা। বৈদিক ধর্ম্ম হইতে যখন উপনিষদের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম হইতে দর্শন শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব, তাহার পর বৌদ্ধ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সেই সময়ে যাঁহাদের মত লইয়া দ্বন্দ্ববিসংবাদের সৃষ্টি হইত, তাঁহাদের এক একটী প্রবল দল ছিল। যে সকল আশ্রম

সেই সকল দলের কেন্দ্রস্বরূপ পরিগণিত ছিল, তৎসমুদায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটা শিক্ষা দীক্ষার পদ্ধতি ছিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তথাপি আধুনিক ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রকরণাদির সহিত তৎসমুদয় পদ্ধতির সামান্য সাদৃশ্যই দেখা যায়। এক্ষণে আমি ইংরেজী "ইউনিভার্শিটী" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া মূল বিষয়ের আলোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইব।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় মধ্যযুগের লাটিন ভাষায় ইউনিভার্শিটাস্ নামে একটী কথা দেখা যায়; তাহা হইতেই এই ইংরেজী ইউনিভার্শিটী কথা ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। তৎকালে সেই ইউনিভার্শিটাস্ শব্দের সহিত সাহিত্যাদির আলোচনার কোন সম্পর্কই ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় সভা, সমিতি, সমজ্যা, সংসৎ, পরিষৎ, গোষ্ঠী, আস্থান প্রভৃতি যে সকল কথা দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ের সহিত উক্ত ল্যাটিন্ "ইউনিভার্শিটাস্" শব্দের সামান্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে যখন তাহার সহিত বিদ্যার অল্প অল্প সংস্রব হইতে লাগিল, তখন সেই শব্দ একা দাঁড়াইতে না পারিয়া আর একটী শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিল। সেই শব্দ তখন "ইউনিভার্শিটাস্" Magistrorum, it scholarium বা ডিসাই পিউলোরমএই বিপুল বপু ধারণ করিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ দংষ্ট্রাদলন কথাটী চলিয়া আসিল। তাহার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউনিভার্শিটাস্ সেই জটিল বেশবিন্যাস ছাড়িয়া আবার অনাবৃত গাত্রে দণ্ডায়মান হইল। তখন তাহা ছাত্র বা শিক্ষকগণের সমিতি বা সম্মিলন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহা রাজার বা ধর্ম্মমণ্ডলের অনুমোদন ও সাহায্য লাভ করিল। উক্ত দুইটী শব্দ ব্যতীত universitus studii ও universitus collegium, আবার Studium genrali প্রভৃতি শব্দও প্রাচীন ল্যাটিন গ্রন্থ সমূহে দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে য়ুরোপে অনেকগুলি ইউনিভার্শিটী উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য Scholastic guild, অর্থাৎ ছাত্রসম্মিলন। সভ্য মহোদয়গণ! "Trades gild" বলিয়া ইংরেজীতে একটী কথা আছে, বোধ হয় আপনারা তাহা জানেন। আপনাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বণিক্‌গণ সমবেত হইয়া সেই সকল গিল্‌ডের সৃষ্টি করেন। প্রাচীনকালে য়ুরোপে ছাত্রগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেইরূপ যে সকল সমাজ বা সমিতি গঠিত করিত, তাহাই ইউনিভার্শিটাস্ ষ্টুডিয়াই নামে নির্দ্দিষ্ট হইত। ইটালির Salerno নগরের ইউনিভার্শিটীই য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম ও সকলের আদি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার আবির্ভাব; এই নগরের বিদ্যালয়সমূহে বহু দূর দেশ হইতে বিস্তর ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত আগমন করিত। বিদেশে আসিয়া আপনাদের জীবন ও সম্মান সম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত তাহারা যে সকল সমিতির সৃষ্টি করিয়াছিল, তৎসমুদয় "ইউনিভার্শিটাস্ এট্ স্কোল্যারিয়াম" প্রভৃতি শব্দে পরিচিত হইয়াছিল। এই কথা প্রসঙ্গে ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় বিস্তর বিপুল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যকার সভায় সে সকল কথা আলোচ্য নহে।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়! এই ইউনিভার্শিটী কথা লইয়া আমি আদৌ কোন উচ্চবাচ্য করিতাম না; তবে সেই ইউনিভার্শিটী হইতে বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ অনূদিত হইয়াছে, এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ—তাহা ভ্রান্ত বা অভ্রান্তই হউক,—যখন এক প্রকার চলিয়া গিয়াছে, তখন সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমি বলিতে-

ছিলাম সেই বিশ্ববিদ্যালয় শব্দ লইয়া আমরা আজি বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কথা প্রয়োগে তাহার স্থাপন জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি এবং অন্যান্য স্বদেশবাসীকে সেইরূপ ধৃতব্রত হইতে বলিতেছি।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, জাতীয়তা সংরক্ষা বা সংগঠনের নিমিত্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যক। যখন আমাদের জাতীয়তা ছিল, বা জাতীয় ভাব ছিল, যখন আর্য্য হিন্দু সমাজ একটী বিরাট জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল, যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, গান্ধার হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত একটী অভিন্ন সুদৃঢ় একতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল; কাশ্মীর মণ্ডলস্থ একটী আর্য্যের বেদনা যখন মুহূর্ত্তমধ্যে তড়িত্তেজে কাঞ্চীপুরীস্থিত অপর আর্য্যের হৃদয় তন্ত্রীকে নাচাইয়া তুলিত; তখন আমাদের এক প্রকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ও নিয়ম-প্রণালী বর্ত্তমান ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও কার্য্যপদ্ধতির সদৃশ না হইলেও তদানীন্তন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের উপর তৎসমুদায়ের শাসন ও নিয়মন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, উশনা, দেবল, শৌনক প্রভৃতি কুলপতিগণের বিবরণ বেদ গ্রন্থসমূহে পাঠ করিয়াছি। মহাভারতেও এই সকল কুলপতির বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ দশ সহস্র, কেহ বিংশতি সহস্র, আবার কেহ বা ষষ্টি সহস্র ছাত্রের ভরণ পোষণ করিয়া বিদ্যা দান করিতেন। এই সকল বিবরণ অতিরঞ্জিত হইতে পারে; কিন্তু ইহাদের অভ্যন্তর হইতে সার উদ্ধার করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সেই সকল অগণ্য ছাত্রের শিক্ষা একরূপ ছিল না। কিন্তু এরূপ না হইলেও শিক্ষার প্রণালী বা পদ্ধতির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সেই শৌচক্রিয়া শিক্ষা, পরে স্নান, আচমন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং সায়ং ও প্রাতর্হোমের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, তদ্বিষয়ে গুরুসকাশে উপদেশ লাভ। ক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে নিজ নিজ শাখার বেদসংহিতা, এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, গৃহ্যসূত্রসকল, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্টু ও নিরুক্ত ও ছন্দঃ ক্রমান্বয়ে শিক্ষা করিতে হইত। মেধাবী ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তৎকালে বেদত্রয় ও ব্রাহ্মণাদি অধিগত করিতেন। অপর সকলে সাধ্যমত বেদশাখাদ্বয়, অথবা একটী মাত্র বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইতেন। ফল কথা, সকলকেই বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। মনু বলিয়াছেন,—যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য অর্থ শাস্ত্রাদিতে অতিশয় যত্ন করেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশে অতি সত্বর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।* তবে এরূপ বিধানও আছে যে, যদি কোন কারণে তাঁহার বেদাধ্যয়ন না ঘটে, এবং তিনি কেবল স্মৃতি ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত দোষ অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয় না। আপস্তম্বসূত্র ও মনুসংহিতার এই সামান্য ও সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণের অভ্যন্তরে বৈদিককালের শিক্ষাপ্রণালীর একটী বিশাল চিত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শিক্ষা বিধির যখন বিকল্পভাব লক্ষিত হয়, তখন পরীক্ষা-প্রণালীরও বিভিন্নতা অবশ্য তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। মেধাবী ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তৎকালে বেদত্রয় ও ব্রাহ্মণাদি অধিগত করিতেন। অপর সকলে সাধ্যমত দুইটী বেদশাখা অথবা একটী মাত্র বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইতেন। ফলকথা সকলকেই বেদ

* ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য ও মনুসংহিতা।
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অধ্যয়ন করিতে হইত। আবার কেহ কেহ পারগ না হইলে কেবল স্মৃতি ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা তাঁহারা গুরুসকাশেই লাভ করিতেন এবং গুরুর নিকট পরীক্ষা দিয়াই তদীয় অনুমতিক্রমে সমাবৃত্ত হইতেন। এইরূপে প্রত্যেক কুলপতির সমাজ বা পরিষদই তৎকালে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কত দূরবিসর্পিণী ছিল, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। সেই কুলপতির অধীন পদে কত অধ্যাপক, কত শিক্ষক, কত সদস্য শিক্ষা, দীক্ষা ও পরীক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয় এক একটী বিরাট ব্যাপার ছিল। বৈদিক যুগে ভারতে ঐরূপ কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাহার বিবরণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

অনেকের ধারণা আছে যে, সেই প্রাচীন আর্য্য-হিন্দু-সমাজে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণেতর দ্বিজের উক্ত বিষয়ে অধিকার ছিল না। এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা আমি এখনই দেখাইব। মনু বলেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য দ্বিজ হইতে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। এটী তিনি আপৎকালের বিধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উশীনর, মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল, কাশী ও বিদেহ—এই ছয়টী দেশের ক্ষত্রিয় রাজার নিকট আমরা দৃপ্ত বালাকি, গৌতম আরুণি ও শ্বেতকেতুর ন্যায় পরম পারদর্শী ঋষিদিগকেও তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতে দেখিতে পাই। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, বৃহৎ আরণ্যক উপনিষৎ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ তিন চারিটী বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তন্মধ্য হইতে সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া অদ্য আপনাদিগকে দুইটীমাত্র উপহার দিব।

গার্গ্য বালাকির বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ প্রশংসা ছিল। তাঁহার নিজেরও অতীব দর্পের কথা শুনা যায়। সেই জন্য তিনি দৃপ্ত বালাকি নামে আখ্যাত। তিনি উশীনর, মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল, কাশী ও বিদেহদিগের মধ্যে পর্য্যটন করিতেন। একদা বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণী" আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। রাজা অজাতশত্রু তৎপ্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, "এই জন্য আপনাকে সহস্র গাভী দিলাম।" অনন্তর গার্গ্য তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তাহাতে উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্তর বাদানুবাদ চলিল। অবশেষে গার্গ্য পরাস্ত হইলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন রাজা কহিলেন, "এতাবদ্‌নু বালাকে ইতি!" "কি বালাকে! এই পর্য্যন্ত আপনার বিদ্যা?" বালাকি লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ! এই পর্য্যন্ত?" তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও বেদপারদর্শী হইয়াও তিনি আজি ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং সমিধ্ গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যভাবে রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহিলেন। রাজা অজাতশত্রু বালাকির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং যাইবার অগ্রে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষিত হইলেন;—ইহা প্রতিলোম বিধি বলিতে হইবে।"

শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে

ঠিক এইরূপ বিবরণই দেখা যায়; সুতরাং বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে শ্বেতকেতু আরুণেয় ও পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবলীর ইতিহাস অনূদিত হইল।

শ্বেতকেতু আরুণেয় পাঞ্চালদিগের পরিষদে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রবাহণ জৈবলীর পরিচারকগণ সেই সময়ে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল। রাজা ঋষিনন্দন শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কুমার! আপনি পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন?"

শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, "হাঁ!"

রাজা কহিলেন, "এই সকল জীব মৃত্যুর পর কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া গমন করে তাহা কি আপনি জানেন?"

শ্বেতকেতু বলিলেন, "না"।

রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা এই পৃথিবীতে কিরূপে প্রত্যাগমন করে, তাহা আপনি জানেন?

শ্বেতকেতু আবার উত্তর করিলেন, "না।"

এইরূপে ইহলোক, পরলোক, দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে রাজা প্রবাহণ জৈবলী ঋষিকুমার শ্বেতকেতুকে যতগুলি প্রশ্ন করিলেন, শ্বেতকেতু তৎসমস্তই স্বীয় অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি ঐ সকল কিছুই জানি না।" তাঁহার লজ্জার সীমা রহিল না। লজ্জাবনত বদনে পিতৃসন্নিধানে দ্রুতপদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মর্ম্মাহত ঋষিনন্দন বলিলেন, "বাব! কিল নো ভবান্ পুরাহনুশিষ্টান্ অবোচঃ?"—বাবা! আপনিত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে।"

গৌতম বলিলেন, "কথং সুমেধঃ?"

শ্বেতকেতু তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা নিবেদন করিলে ঋষি বলিলেন, "বৎস! আমি যাহা কিছু জানিতাম, তৎসমস্তই তোমাকে শিখাইয়াছি। এক্ষণে চল, আমরা পিতাপুত্রে রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করি।"

এই সকল রাজার এক একটী স্বতন্ত্র পরিষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেই পরিষদে বিস্তর দ্বিজতনয় অধ্যয়ন করিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও মহাভারতে বর্ণিত আছে, বিদেহরাজ জনকের যে এইরূপ একটী 'ইউনিভার্সিটী' ছিল, তাহাতে একশত অধ্যাপক ছিলেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। সেই একশত অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন।*

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যের সমালোচনা।

অভ্যাস।

ফলশ্রুতিই যে আর্য্যসাহিত্যের প্রধান নীতি, তাহা আমরা গত প্রস্তাবে গীতার উপসংহার-সমালোচনায় প্রদর্শন করিয়াছি। গ্রন্থ-পাঠের ফল কিরূপ হইবে, তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া আর্য্যসাহিত্যে গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ বিরচন করিতেন। সুতরাং সেই ফলের গৌরবের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই পতিত হইত। যে গ্রন্থপাঠের ফল যত অধিক ও যত মধুর, সেই গ্রন্থেরই তত গৌরব। গীতার অধ্যয়ন-ফলের গৌরব অপেক্ষা বুঝি উচ্চতর গৌরব আর

* ৭ম বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কিছু হইতে পারে না। যে হেতু সেই ফল অন্য কিছু নহে, সে ফল একেবারে পরম জ্ঞান—যে জ্ঞান উদয় হইলে লোকের মুক্তি সাধন হয়, পাপ-তাপ সব দূরে যায়, হৃদয়ে শান্তি স্থাপন হয়, মানুষ আর মানুষ থাকে না, দেবতা হয়, দেবতা হইয়া পরম আনন্দধামে চলিয়া যায়। গীতা-পাঠের যে বাস্তবিক এইরূপ অধ্যয়ন-ফল হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাঁহারা বাস্তবিকই অভিনিবেশসহকারে গীতা পাঠ করেন, যাঁহাদিগের গীতাই জপ, গীতাই তপ, অভ্যাস-যোগ বশতঃ তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি ও বিষয়-বৈরাগ্য অনিবার্য্য; বিষয়বৈরাগ্য হইতে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞান হইতে ব্রহ্মানন্দ ও মুক্তি। সেইরূপ ফল শ্রীধর, শঙ্কর, আনন্দগিরি, চৈতন্য প্রভৃতি অনেকেই লাভ করিয়াছিলেন। আজিও যাঁহারা তাঁহাদের মত একচিত্তে গীতা পাঠ ও গীতা জপ করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ ফললাভে কৃতার্থ হইতেছেন।

গ্রন্থমাত্রেরই যদি ফলশ্রুতি থাকে, তবে সেই ফলের গৌরব অনুসারে যে গ্রন্থের গৌরব হইবে, এ কথা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যে বেদবেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি সকল গ্রন্থেরই অধ্যয়ন-ফলের যেরূপ গৌরব আছে, অপর দেশীয় সাহিত্যের সেরূপ নাই। মানুষের ধর্ম্মই পরমার্থ, সুতরাং সেই পরমার্থের গৌরবেই সর্ব্বশাস্ত্র এবং কাব্যাদি গৌরবান্বিত। কালিদাসাদির কাব্যসকলও পৌরাণিক অর্থে সম্পন্ন। তাহাদের ফলশ্রুতি ধর্ম্ম-লাভ। সে সকল কাব্যাদিতে যে সমস্ত অধর্ম্মের সৃষ্টি আছে, সে সকল সৃষ্টি সেই ধর্ম্মেরই গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে। রামায়ণের রাক্ষসী সৃষ্টি, মহাভারতের দুর্য্যোধনাদির সৃষ্টি, কেবল পুণ্য পক্ষকেই অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। কিরূপে দিয়াছে? পুণ্য-পক্ষের পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া তাহা এত বিস্তৃত করিয়াছে যে, সেই বিস্তৃত চিত্র-মধ্যগত পাপ পক্ষীয় চিত্রের কলঙ্কপাতে সেই পুণ্যেরই বর্ণরাগ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এইরূপ পুনঃপুনঃ আলোচনার নাম অভ্যাস। সেই অভ্যাস কি করে? গ্রন্থের উপক্রমে যে পুণ্যপক্ষের প্রারম্ভ, সেই পক্ষকেই বরাবর বিস্তৃত করিয়া আনে। বিস্তৃত করিয়া আনিয়া উপসংহারে সেই পুণ্যপক্ষের সুবিস্তৃত ছবি বিন্যাস করে। অভ্যাস গ্রন্থকল্পনার সমুদায় শরীরকেই গড়িয়া আনে। রামায়ণ ও মহাভারতের উপক্রমে যে দাশরথিগণের এবং পাণ্ডবগণের বিবরণ, মহাকাব্যের বিশাল দেহ-মধ্যে সেই পক্ষেরই বিস্তৃতি ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা। আবার উপসংহারে দেখ, সেই দাশরথিগণের এবং পাণ্ডবগণেরই জয় এবং দীর্ঘকালীন ঘটনাপূর্ণ রাজ্য-ভোগ। মধ্যে কেবল পাপ পক্ষের লীলাখেলা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই লীলায় পাপের সহিত পুণ্যপক্ষের বলবিক্রমের ও বীর্য্যের মহাদ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে সেই বিক্রম ও বীর্য্যের বিরাট বিকাশে পাপ বিধ্বস্ত ও নিপতিত। এই দ্বন্দ্বে সেই পুণ্যপক্ষেরই প্রভাব দ্বিগুণবলে উজ্জ্বলতা লাভ করিয়া তাহাকেই পরিশেষে জয়শীল ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে। পাপ-পক্ষ কোথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে তবে কিসের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দেখিতে পাই? উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত বরাবরই সেই পুণ্যপক্ষেরই গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এইরূপ অভ্যাস

দ্বারা গ্রন্থের এক বিশেষ বিষয়েরই বিস্তৃতি ও গৌরব-সাধন হয়। যাহার বিস্তৃতি ও গৌরব, তদ্দারাই গ্রন্থপাঠের ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রন্থের সমালোচনকালে দেখা উচিত, গ্রন্থ মধ্যে কোন্ বিষয় বারংবার ও আগাগোড়া অভ্যস্ত হইয়াছে। সেই বিচারেই প্রতীত হয়, গ্রন্থপাঠের ফল মন্দ কি ভাল হইল। যদি মন্দ হয়, কেন মন্দ হইল; যদি ভাল হয়, কেন ভাল হইল;—তদ্দারাই অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। যে গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফল মন্দ, তাহার বিচারে প্রতীত হইবে যে, অভ্যাস সেই গ্রন্থের পাপপক্ষ এবং মন্দ দিক্‌কে যত প্রবৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার পুণ্যপক্ষ ও ভাল দিক্‌কে তত নহে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, গ্রন্থের কলেবরে সেই পাপপক্ষই অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া পুণ্যপক্ষকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। অতএব ধর্ম্মের গৌরব দেখান যদি গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়, তবে গ্রন্থের উপক্রমে সেই ধর্ম্মবীজই রোপণ করা উচিত। গ্রন্থের বিশালক্ষেত্রে সেই বীজের অঙ্কুর ও বৃক্ষোদ্গম দেখাইয়া তাহাই বিস্তৃত শাখায় পল্লবিত করা উচিত। তাহা না করিয়া যদি পাপবীজ প্রথমেই রোপণ করা হয়, তবে সেই বীজই ক্ষেত্র-মাঝে বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। তাহার ফল অবশ্য বিষময় হয়। শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে গেলে কি আবশ্যক? ধর্ম্মকে অসাধারণ মূর্ত্তিতে দেখান আবশ্যক। আমরা মনুষ্য-সমাজ মধ্যে সচরাচর ধর্ম্মের যে সামান্য মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহাতে ধর্ম্মের তত গৌরব দৃষ্ট হয় না। লোকসমাজে সচরাচর লোকে যেরূপ ধর্ম্মাচার করে, তাহাতে কেহ চমকিত হয় না। তদ্রূপ আবার সচরাচর লোকে যেরূপ পাপাচার করে, তাহাও তত ঘৃণার্হ নহে। অনেকেই সেরূপ করিয়া থাকে। অনেকেই মিথ্যা কথা বলে, অনেকেই চুরি করে। কিন্তু যখন মিথ্যা ব্যবহার ঘোর জুয়াচুরীতে এবং চুরী ডাকাতিতে পরিণত হইয়া বিশেষ অনিষ্টাপাত হয়, তখনই তাহা লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদ্রূপ পুণ্য কর্ম্ম। সামান্য সামান্য দান ধ্যান অনেকেই করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সেই দান ধ্যান অসামান্য হয়, তখনই তাহা বিশেষ রূপে লোকের চিত্তাকর্ষণ করে। পাপ স্বভাবতঃই ঘৃণার্হ, এজন্য পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা উৎপাদন করা আবশ্যক হয় না। অসাধারণ পাপাচারের দৃষ্টান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাতে কি ফল? লোককে কি তদ্রূপ পাপাচার শিক্ষা দিতে হইবে, না তদ্রূপ পাপাচারের প্রতি লোকের ঘৃণা উৎপাদন করিতে হইবে? যদি সেরূপ ঘৃণা স্বাভাবিক না হইত, লোকে স্বভাবতঃই যদি ঘোর পাপকে ঘৃণা না করিত, যদি খুনের নামে লোকে স্বভাবতঃই শিহরিয়া না উঠিত, তবে বটে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তৎপ্রতি ঘৃণা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করা উচিত হইত। বিশেষতঃ পাপের দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষে যত না পড়ে, ততই ভাল। কারণ, পাপের কেমন এক স্বাভাবিক আকর্ষণ-শক্তি আছে, যে জন্য পাপাচার দেখিতে দেখিতে অপরিণতবয়স্ক লোকে তদ্রূপ পাপাচারী হইতে শিখে। সর্ব্বদা পাপাচার দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি ঘৃণা অপনীত হইতে থাকে। যে সর্ব্বদা কসাইখানায় বেড়ায় ও বসে দাঁড়ায়, সে ক্রমে কসাই হইয়া উঠে। যে সর্ব্বদা চোরের সহিত সহবাস করে, সে চোর হইয়া উঠে। পাপের

সংসর্গ-দোষ যেমন ভয়ানক ও অনিষ্টকর, পুণ্যের সংসর্গগুণ তেমনই মঙ্গলকর ও আনন্দদায়ক। তজ্জন্য সাধুকার্য্যের দৃষ্টান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই উচিত। সেই সাধুকার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু অসাধারণ, তাহাই রক্ষণীয়। অসাধারণ ধর্ম্ম-সাধনা ও ধর্ম্মকর্ম্মের দৃষ্টান্ত রক্ষা করা উচিত। সেই সকল দৃষ্টান্ত সমাজে সর্ব্বদা ঘটে না বলিয়া দুর্লভ এবং তজ্জন্য রক্ষণীয় এই জন্য যে, সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপরে তদ্রূপ সাধু হইতে শিখিবে। সেই সকল দৃষ্টান্ত যদি অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে তাহা জীবিতাকার ধারণ করে। জীবিত রূপে তোমার কল্পনার সমক্ষে বিচরণ করিতে থাকে। তুমি যেন ভরতকে, লক্ষ্মণকে, যুধিষ্ঠিরকে ও রামকে চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাও। সীতা, সাবিত্রী ও দ্রৌপদী তোমাকে সতত জীবিত-পথে চালিত করে। গোপীভক্তিতে তোমার মন মোহিত হয়। তুমি ততদূর কৃষ্ণভক্তির আকাজ্ক্ষা করিতে অভিলাষী হও। এই জন্য অসাধারণ সাধু দৃষ্টান্তসকল সাহিত্যক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই যদি কাব্যনাটকাদির সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা হয়, তবে কিরূপে সেই শিক্ষা দিতে হইবে? গীতা বলিয়াছেন;—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অতএব, সর্ব্বরূপ পাপ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় সর্ব্বদা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। যিনি ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিপথে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন, তিনিই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। অতএব পাপপথ হইতে ধর্ম্মপথে আসিতে হইলে শুধু পাপের দণ্ডভোগ দেখিলে হইবে না, ধর্ম্মের আকর্ষণে ভক্তি-পথে আসিতে হইবে। সেই ধর্ম্মের আকর্ষণে ভক্তিবৃদ্ধি করাই প্রধান কার্য্য। সে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে হইলে ধর্ম্মের মনোহর রূপকে বিশিষ্টরূপে দেখা উচিত। দেখিয়া সেই ধর্ম্মপথের পথিক হইতে হইবে। ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। অতএব শুধু পাপ-পথের দণ্ডভোগ দেখিয়া সে পথ পরিবর্জ্জন করিলে হইবে না, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইলে সাধুসঙ্গ একান্ত আবশ্যক। জীবিত সাধুগণের সংসর্গ যাঁহারা লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট বড়ই প্রসন্ন। কিন্তু সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে আর এক প্রকার সাধুসঙ্গ আছে। সে সাধু সাহিত্য-ক্ষেত্রের অসাধারণ সাধুগণের আদর্শ-চরিত্র। সেই আদর্শ-চরিত্রের চিত্রসকল কল্পনার সমক্ষে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিলে সাধু-সংসর্গের ফললাভ করিতে পারা যায়।

এই অসামান্য ধর্ম্মাদর্শের চিত্রাবলি আমাদের পুরাণে এবং পৌরাণিক কাব্য নাটকে। সেই আদর্শের চিত্রাঙ্কনে সেই কাব্যনাটকের উপক্রম। সেই উপক্রম যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সেই চিত্রে উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বর্ণরাগ পড়ে। পড়িয়া উপসংহারে তাহা সঞ্জীবিত লোকচরিত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। রামায়ণের উপক্রমে যে সীতা জনকালয় হইতে অযোধ্যার রাজপুরে আনীতা হইলেন, রামের বনবাসকালে সেই সীতাচরিত্র কতক কতক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপরে অশোক কাননে তাহা আরও উজ্জ্বলতর প্রভায়

প্রদীপ্ত হইল। সে সীতা এমনি স্বর্গীয় ভাবে দেবপ্রতিম হইলেন যে, তিনি অগ্নিতেও দগ্ধ হন নাই। অগ্নিতে তাঁহার স্বর্ণরেখা আরও উজ্জলতা লাভ করিল। যাহা এমনি দেবপ্রতিম, তাহা অবশ্যই রক্ষণীয়। তাই রামচন্দ্র তাঁহাকে যত্নে রাজগৃহে লইয়া গিয়া রাজলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেন। কি! সে সীতারও অঙ্গে লোকে কলঙ্ক পাত করে! তাই রামচন্দ্র তাঁহার দীপ্তি আরও প্রভাসিত করিবার জন্য তাঁহাকে বনবাস দিলেন; চুপি চুপি জনকালয়ে পাঠাইলেন না। সেই বনবাসে সীতার জীবিত উজ্জলচিত্র আরও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া উঠিল। তখন সে সীতা কি? জগতের আরাধ্যা স্বর্ণময়ী প্রতিমা—যে স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে স্বয়ং নারায়ণ রামচন্দ্র স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিদিন পূজা করিতেন। সেই স্বর্ণময়ী প্রতিমা রামায়ণের অধ্যয়ন-ফল। রামায়ণের অধ্যয়ন-ফলরূপে সেই স্বর্ণময়ী প্রতিমা চিরদিন লোকের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণের অধ্যয়ন-ফল যে স্বর্ণময়ী প্রতিমা, তাহা কিরূপে গ্রন্থমধ্যে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল? অযোধ্যাকাণ্ডে তাহার উপক্রম; গ্রন্থের অভ্যাসক্রমে সেই উপক্রম ক্রমশঃই প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া উপসংহারে এক স্বর্ণময়ী জীবিত প্রতিমারূপে রামায়ণের অধ্যয়ন-ফলস্বরূপ লোকের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই অভ্যাস-গুণে যেমন সাধুচরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তেমনি অসাধু লোক-চরিত্রের গাঢ় হইতে গাঢ়তর কলঙ্কপাত হয়। ম্যাকবেথ নাটকের প্রারম্ভে আমরা যে লেডি ম্যাকবেথের উপক্রম দেখি, তাহা গ্রন্থের অভ্যাসবশতঃ এতই প্রবৃদ্ধ হইয়াছে যে, নাটক মধ্যে দুই একটি সাধু-চিত্র থাকিলেও সেই লেডি ম্যাকবেথের ঘোর কালিমায় সকল আভা বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিলীন হইয়া এমন মিলাইয়া গিয়াছে যে, অবশেষে গ্রন্থের উপসংহারে সেই লেডি ম্যাকবেথের চিত্রই প্রভাসিত হইয়া লোকের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহাই সেই নাটকের অধ্যয়ন-ফল স্বরূপ হইয়াছে। সেই অধ্যয়ন-ফল গ্রন্থের অভ্যাসক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই অভ্যাস-দোষে অনেক গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফল অতি কদর্য্য হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের উপক্রম তত মন্দ নহে; কিন্তু কুন্দকে নগেন্দ্র লাভ করিয়া যখন গৃহে আসিলেন, তখন হইতে তাহার কুপ্রবৃত্তি দেখা দিল। কুন্দও নগেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। সেই পাপ-প্রেমের অভিনব অভ্যাস-বশতঃ ক্রমশঃই প্রবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থখানিকে বিষময় করিয়া তুলিল। আবার এরূপও দেখা যায়, গ্রন্থের উপক্রমে পাপচিত্র এবং অভ্যাসেও সেই পাপচিত্রেরই প্রবৃদ্ধি; এত প্রবৃদ্ধি যে তাহাই ক্রমশঃ পাঠকের হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলে। সে গ্রন্থের শেষভাগে যদি সামান্যত পুণ্যচিত্র অঙ্কিত হয়, এবং সে পুণ্য-চিত্রের তত বৃদ্ধি-সাধন না হয়, তবে তাহার অধ্যয়ন-ফলে সেই পাপাধিকারই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। ম্যাকবেথ-নাটকের এই দশা। শেষভাগের সামান্য পুণ্যচিত্রে কি ম্যাকবেথের অধ্যয়ন-ফলের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? না তাহা পয়োমুখ বিষকুম্ভবৎ হইয়া রহিয়াছে? সুতরাং গ্রন্থের অভ্যাসের দোষগুণে তাহার অধ্যয়ন-ফলের দোষ-গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। উপক্রম ভাল হইলেও হয় না, যদি অভ্যাসে পাপেরই প্রবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে, তবে অধ্যয়ন-

ফলে সেই পাপই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। তদ্দ্বারা ধর্ম্মলাভের অত্যল্পই সম্ভাবনা। অতএব, গ্রন্থের সমালোচন-কালে এই অভ্যাসেরই বিচার করিয়া তাহার দোষ গুণ নির্ণয় করা উচিত।

যাহা কাব্যনাটক সম্বন্ধে উক্ত হইল, তাহা জ্ঞান-গর্ভ ঐতিহাসিক, চরিতাখ্যায়ক গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সেই গ্রন্থই গ্রন্থ, যাহার অধ্যয়ন-ফল আছে, যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা গ্রন্থই নহে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং যে সকল গ্রন্থ শুধু জ্ঞান-প্রচারার্থ রচিত হয়, তাহারও সমালোচনায় এই উপক্রমোপসংহার এবং অভ্যাস বিচার করা কর্ত্তব্য। একখানি জীবন-চরিত দেখুন। আমরা বিলাতী সাহিত্যে যেমন প্রচুর নাটক-নভেল ও ইতিহাস দেখিতে পাই, তেমনি জীবন-চরিতও দেখিতে পাই। সেই জীবন-চরিতের সাহিত্যে দেখা যায়, সেই জীবন-চরিতেরই সমধিক গৌরব, যাহাতে জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়। এজন্য তন্মধ্যে জীবনের সামান্য অসামান্য ভালমন্দ সর্ব্ববিধ ঘটনাই সন্নিবেশিত করা হয়। তজ্জন্য এক একখানি জীবন-চরিত ফুলিয়া ফুলিয়া বৃহৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু বিলাতী সাহিত্যের দোষ এই, সেই জীবন-চরিতের অধ্যয়ন-ফল কিরূপ দাঁড়াইল, তৎপ্রতি কিছুই দৃষ্টি নাই। যতদূর পাওয়া যায়, জীবনের ঘটনাবলি দিতে পারিলেই জীবন-চরিত সম্পূর্ণ হইল। জীবন-চরিত সম্পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সেই জীবন-চরিতদ্বারা যাঁহার জীবন-চরিত, তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইল কিনা, তাহা বিচার করা হয় না। ডাক্তার সেমুয়েল জনসনের জীবন-চরিত দেখ। বসওয়েল যে জীবনী-চরিত দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কোন বিষয়ের আর ফাঁক পড়ে নাই! তজ্জন্য বিলাতী সাহিত্যে তাহা একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী-চরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই জীবন-চরিতদ্বারা জনসনের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; না, তাহার গৌরবের লাঘব করা হইয়াছে? সেই জীবন-চরিত পাঠের অধ্যয়ন-ফল কিরূপ হয়, তাহা লর্ড মেকলে বর্ণন করিয়াছেন। জনসনের গ্রন্থাদি পড়িয়া জনসনের প্রতি আমাদের যে ভক্তি হয়, তাঁহার জীবন-চরিত পাঠে সে ভক্তি দূরে উড়িয়া যায়। তাই যদি হয়, যদি শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়া হয়, তবে সেরূপ জীবন-আখ্যায়িকা লিখিবার প্রয়োজন ছিল কি? এইরূপ গৌরব হ্রাস হয় বলিয়া আর্য্য সাহিত্যে তদ্রূপ জীবন-চরিত লিখিবার রীতি ছিল না। তা বলিয়া পৌরাণিক আর্য্য সাহিত্যে যে একেবারে লোকের জীবন-চরিত নাই, এমনও নহে। ঋষিদিগের, তপস্বি-গণের সাধু ও সাধকগণের জীবন-চরিত মধ্যে যাহা যাহা তাঁহাদিগকে গৌরবে উত্তোলিত করিয়াছে, যাহা যাহা জানিলে পাঠককে তদ্রূপ গৌরব-পথে উত্তেজন করিতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বাকী সমস্ত সামান্য ঘটনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরিত্যক্ত হইয়াছে এইজন্য যে, সে সকল জানিলে কোন ফললাভ নাই। বাস্তবিক যাহা কিছু সামান্য, যাহা সচরাচর লোক-সমাজে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা দোষপূর্ণ হউক আর না হউক, কিন্তু যাহাতে গৌরব কিছু নাই, সে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর এবং গ্রন্থসংখ্যার বৃদ্ধি করা বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন।

বিলাতী সাহিত্যে যাহা ইতিহাস (History) বলিয়া প্রসিদ্ধ, নৃপতি-বর্গের সেই ধারাবাহিক বিবরণ, লোভের প্রতি-মূর্ত্তি-স্বরূপ রাজগণের পাপ-বৃত্তান্ত আর্য্য সাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। তবে কি রাজাদিগের কোন বিবরণই আর্য্য-

সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই? পুরাণে আমরা অনেক রাজবংশের বিবরণ দেখিতে পাই। সেই বিবরণ মধ্যে আমরা সামান্য সামান্য রাজাদিগের কেবল নামোল্লেখমাত্র দেখি। তাহাদিগের সামান্য ক্রিয়া-কলাপ বা পাপাচারের বৃত্তান্ত সাহিত্য মধ্যে রক্ষণীয় নহে বলিয়া রক্ষিত হয় নাই। তবে সেই রাজাদিগের মধ্যে যাহার কোন বিশেষ গুণ এবং গৌরবের বিষয় ছিল, যিনি অসামান্য দাতা, বা ধর্ম্মপরায়ণ বা অন্য কোন গুণে যশোভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই গৌরবের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। তা বলিয়া তাঁহাদিগের জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনাবলী উল্লিখিত হয় নাই। কারণ, সেরূপ উল্লেখের ফল নাই। যতটুকু উল্লেখের ফল আছে, ততটুকুই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে যে সকল নৃপতি ধর্ম্মকর্ম্ম-প্রভাবে জনকের মত ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ এবং বিস্তৃত আলোচনা পুরাণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, সেরূপ জীবনচরিত পাঠের ফল প্রভূত। অনেকের দিগ্বিজয়েরও প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু সে দিগ্বিজয় রাজ্যলোভে কৃত হয় নাই, যজ্ঞের দানধ্যানার্থ। এ সকল পুণ্য ইতিবৃত্ত পাঠের ফল শুদ্ধ ঐতিহাসিক জ্ঞান মাত্র নহে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম লাভও হইয়া থাকে।

আর্য্যসাহিত্যে কিন্তু ইতিহাস আর এক কার্য্য করিয়াছে। আর্য্য-সাহিত্যে ইতিহাস বলিলে শুধু নৃপতিবর্গের বিবরণ বুঝায় না। সে সাহিত্যে মহাভারত একখানি বৃহৎ ইতিহাস। সে ইতিহাস আস্তিকোপাখ্যান প্রভৃতি নানা অদ্ভুত কথায় পরিপূর্ণ। ভীষ্মদেব শান্তিপর্ব্বে নানা ইতিহাস বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ অধ্যাত্ম বিষয় উপদেশ দিয়াছেন। সে ইতিহাসে "সমীরণ" প্রভৃতিও কথা কহিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং যাহা আখ্যায়িকা, কথা, উপাখ্যান ও পদ্যাকারে লিখিত, তাহা আর্য্য সাহিত্যে ইতিহাস বলিয়া গণ্য। সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিতে হইলে আর্য্য সাহিত্য ইতিহাস, আখ্যায়িকা প্রভৃতিকেই গরিষ্ঠ উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেই সাহিত্য দৃষ্টান্তকেই মহা শিক্ষাগুরুরূপে গণ্য করিয়াছে। বাস্তবিক দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন লোক শিক্ষা হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আমরা শিশুকালে সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যত শিখিয়াছি, তৎপরে সমস্ত জীবিতকালে তত শিক্ষা করিয়াছি কি না সন্দেহ। পণ্ডিতে লিখিতে পারেন, সামান্য লোকে ত নহে। এমন কি, সেই সাত বৎসরের মধ্যে মাতৃভাষাটা শিখিয়া ফেলিয়াছি। একটা ভাষা শিখিতে কত কাল লাগে! কিন্তু শৈশবে আমরা মাতৃভাষা কেমন অনায়াসে শিখিয়া ফেলি। সে শিক্ষার কি কেহ গুরুমহাশয় আছেন? না অন্যান্য বিষয় যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই কেহ গুরুমহাশয় ছিল? সে কালে শিশুগণ দেখাদেখি এবং শুনিয়া শুনিয়া আপনা আপনি সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষালাভ করে। আরও এক কথা বিচার্য্য। "পিতামাতাকে ভক্তি করিবে"—এইরূপ বিধিবাক্যে শিশুগণকে সাক্ষাৎভাবে কোন কথা বলিলে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। তদ্রূপ সাক্ষাৎভাবে কোন কথা বারণ করিলেও তাহা তত শুনিবে না। এ বিষয়ে (Gay) গে সাহেবের গল্পাবলিতে (Fables) বেশ একটী দৃষ্টান্ত আছে। কোন কুক্কুট তাঁহার ছানাগুলি লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক কূপসন্নিকটে আসিয়াছিল। তথায় আসিয়া ছানাগুলিকে বারণ করিয়া দিল, সাবধান যেন কেহ তন্মধ্যে উঁকি মারিয়া দৃষ্টিপাত না করে। এ কথায় কুক্কুট-শিশুগুলির মহা কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। বৃদ্ধ কুক্কুট সেই

কথা বলিয়া চলিয়া গেলে একটি কুক্কুট-শিশু আসিয়া নিজ কৌতূহল নিবারণ জন্য সেই কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। যেমন দেখা, অমনি জলমধ্যে ছায়ারূপী আর একটা কুক্কুট শাবক দেখা দিল। দুই জনে দ্বন্দ্ব বাঁধিল। অবশেষে সেই কক্কুট-শিশু কোপাবিষ্ট হইয়া আক্রোশে কূপে যেমন ঝাঁপ দিয়া পতিত হইল, অমনি প্রাণত্যাগ করিল। এজন্য লোকশিক্ষার্থ আর্য্যসাহিত্যে এরূপ সাক্ষাৎ উপদেশ সম্পন্ন Dialectic গ্রন্থ একান্ত বিরল। শুধু ভারতীয় আর্য্যসাহিত্যে কেন, আরব, পারস্য প্রভৃতি ভাষাতেও তদ্রূপ। সাধারণ লোকশিক্ষার্থ প্রাচ্য রীতিই এই। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে বিভিন্ন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহাতে সাক্ষাৎ উপদেশসম্পন্ন গ্রন্থই বিস্তর। গল্পাদি বিরল, কিন্তু ইদানীন্তন কালে বরং প্রাচ্যরীতি অধিকতর অবলম্বিত হইতেছে। অবলম্বিত হইতেছে কেন? প্রাচ্য রীতির অধিকতর ফল দেখিয়া। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিজ্ঞেরাও এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পশু পক্ষিপ্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দিলে তরুণবয়স্ক বালকবালিকাদিগের মনে প্রভূত ফল উৎপন্ন হয়। কারণ সেইরূপ গল্প, আখ্যায়িকা ইতিহাসাদিতে উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত অভ্যাসক্রমে প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি সাধিত হইয়া বর্ণিত কার্য্যাদির ফলাফল অতি সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হয়। শৈশব হইতে এরূপ গল্পাদির শিক্ষা লোকমনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, সেই উপদেশ আপনা আপনি গ্রহণ করে—চিরজীবন গ্রহণ করে। কিন্তু সাক্ষাৎ নীতি-উপদেশক নিজে সচ্চরিত্র ও সাধু না হইলে সে নীতি-উপদেশ নিতান্ত বিরুদ্ধ বোধ হয় এবং তাহার কোন ফল ফলে না। গল্পাদির উপদেশে এ দোষ ঘটে না। সেই গল্পাদিই নিজে গুরুরূপে শিক্ষাপ্রদ হয় এবং সে শিক্ষা চিরদিন জীবনকে চালিত করে। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সাক্ষাৎ বিধি-নিষেধ বাক্যাবলি পণ্ডিতগণের শিক্ষার্থ সাধারণ লোকের জন্য নহে। সেই শ্রুতি স্মৃতিকে লোক সাধারণগম্য করিবার জন্যই ইতিহাসাদির সৃষ্টি। সুতরাং উহাদিগের অধিকারী পাঠার্থী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রুতি স্মৃতিকে লোকসাধারণগম্য করিবার জন্য যাহার সৃষ্টি, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নিজে উপনিষৎ বাক্যাবলি তাহার পথ দেখাইয়াছে। সেই উপনিষদের দেখাদেখি শাস্ত্রকারগণ পরম্পরাক্রমে উপদেশ দিবার সুফল বিলক্ষণ বুঝিয়া পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই পুরাণাদির দেখাদেখি পরে আর্য্যসাহিত্যে ভূরি ভূরি ইতিহাস, আখ্যায়িকা, কথা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। উপনিষদের রীতি ক্রমে আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া আমরা দেখিতে পাই তাহা ক্রমে মিশর হইতে প্রাচীন গ্রীসে প্রবেশ করিয়া সক্রেটিশের Dialecticsএর সৃষ্টি করিয়াছে। সক্রেটিসের এই গুরুশিষ্যের উপদেশরীতি কিরূপ প্রভূত শক্তি সম্পন্ন, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ইউরোপীয় ইতিহাসই শিক্ষা দিয়াছেন, মিশর প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাগুরু এবং মিশরের শিক্ষাগুরু পরম্পরাক্রমে প্রাচীন ভারত। কারণ প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা আরবাদি দেশ দিয়া মিশরে উপনীত হইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

কবির ইতিহাস

পঞ্চম প্রস্তাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রত্যেক সাহিত্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণালোক সুপ্তাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। প্রত্যেক 'আর্টেই' বিশ্বপ্রকৃতির সজীবতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহা দ্বারাই কবি চালিত হইয়া থাকেন। কবি-হৃদয়ে এই ভাব পরিচিত থাকুক্ বা নাই থাকুক্, তিনি ঐ সজীবতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ঘটনা-পরম্পরার সহিত যখন কবি তাহার কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পান, সেই সময় সেই মহান্ সৌম্য সৌন্দর্য্য, যাহা প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত পদার্থেই বিদ্যমান আছে এবং কবির তুলিকাসম্পাত ব্যতীত যাহা সাধারণ চক্ষে পতিত হইতে পারে না,—সেই সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব তখন পরিস্ফুট হইতে থাকে। হোমরের রচনাবলীর মধ্যে সুখ-শান্তিময় গ্রীসের বীরত্ব-ব্যঞ্জক Paganismএর উন্নত জীবন্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; দান্তের রচনায় গোঁড়া ক্যাথলিক্‌দিগের ভয়ঙ্কর শোচনীয় ও ভয়াবহ দৃশ্য এবং ঘৃণ্য ইতালীয় চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই দুই রচনা হইতেই আমরা মানব প্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সুষমা নিষ্কাষণ করিতে পারি। অন্যান্য রচনা সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। কিন্তু এই মূল কল্পনা হৃদয়ে ধারণ করিবার তারতম্য হেতু সাহিত্য বা কাব্যও ভাল মন্দ হইয়া থাকে। একজনের হৃদয়ে প্রকৃতির ও সজীবতার মহোন্নত চিত্র ঢুকাইয়া দাও, দেখিবে, সে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তৎপরে নিজের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়া—শিল্প-সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, অভিনবভাবে ব্যক্ত করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিবে। আর একজনের হৃদয় হইতে ঐ উন্নত চিন্তা বাহির করিয়া ফেল, দেখিবে, সে জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিবে, কোনও ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিবে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, কাব্যের বা সাহিত্যের প্রাণ—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সজীবতার বিশ্লেষণ।

সিড্‌নি (Sidney) বলিতেন, মানবের হৃদয় উন্নত করিবার, হৃদয় উচ্চ করিবার কোন ক্ষমতা যদি বিজ্ঞান বা ললিত-কলাদির মধ্যে থাকে, তবে একমাত্র কাব্যই সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করিবে। সৎকাব্য পাঠে লোকের হৃদয় যত উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়, এত অপর কিছুতেই হয় না। তিনি একে একে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সহিত কাব্যের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে—কাব্যই শ্রেষ্ঠ। একজন নাইট (Knight) তাঁহার পত্নীর জন্য যেরূপ শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইতে পারেন, সিড্‌নি পদ্যের খাতিরে—সংগীতের উত্তেজনায়—কাব্যের উৎকর্ষতা বুঝাইবার নিমিত্ত তেমনি সংগ্রাম করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

"I never heard the old song of Percie and Douglas, that I found not my heart moved more than with a trumpet: and yet it is sung but by some blinde crowder, with no rougher voyce, than rude stile;

which being no evill apparelled in the dust and cobweb of the uncivillage, what would it work, trimmed in the gorgeous eloquence of Pindare?"*

তিনি সর্ব্বশেষে যে স্বর্গীয় সুষমা, নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই মনোরম;—

"Leave me, O Love; which
reachest but to dust,
And thou my minde aspire
to higher things:
Grow rich in that which
never taketh rust:
Whatever fades, but fading
pleasure brings....
O take fast hold, let that
light be thy guide,
In this small course which
birth draws out so death.'†

এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যই আবার স্থান বিশেষে এবং লেখকের লিপি-অক্ষমতায় কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকে। লোকশিক্ষার পক্ষে কাব্য যত প্রয়োজনীয়, অপর কোনও সাহিত্য তত প্রয়োজনীয় নহে। মোটা কথায় বা সোজাভাবে বলিলে, লোকের হৃদয়ে তাহা যতটা স্থায়ী না হয়, সুর করিয়া সেই কথা বলিলে অতি অল্পক্ষণেই লোকের মনে তাহার একটা স্থায়িভাব মুদ্রিত হইয়া যায়। এই কারণেই এদেশের প্রাচীন সংগীতাদিতে তৎকালপ্রচলিত একটা জীবন্ত সমাজ-চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে কেন—এখনও লোকের রুচি-অনুসারে গান রচিত হইয়া থাকে। অধুনিক থিয়েটার বা যাত্রার দলে শ্রোতার রুচি-অনুযায়ী সংগীতাদি রচিত ও দৃশ্যপটাদি প্রদর্শিত হইতেছে। এই সকল সংগীত ও নাটকাদি হইতে এ কালের জনসমাজের রুচির একটা গতি নির্ণীত হইতে পারে। তদ্রূপ প্রাচীন সংগীতাদি হইতে তৎকালীন সমাজের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আবার সংগীতের দ্বারা সমাজের কুরুচিও বিনাশ করা যায়। প্রকাশ্য স্থানে অগণ্য শ্রোতার সমক্ষে সমাজের প্রকৃত ক্ষতস্থান সুমিষ্ট কথায় দেখাইয়া দিলে, জনসাধারণের হৃদয়ে তাহার একটা কার্য্যকরী শক্তির আরোপ করা হয় বলিয়াই আমার ধারণা। আমাদের কবি-সংগীত এইরূপ লোকের রুচি-অনুসারে চালিত হইয়া পঙ্কিলময় হ্রদে নিপতিত হইলেও, লোকের কুরুচিও অল্পাধিকপরিমাণে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সংগীত যে স্বর্গীয় পদার্থ, সংগীতে যে সমাজের ক্ষত শুষ্ক হইতে পারে, তাহার প্রধান কারণ—উহাতে খলতা-প্রকাশক কোন ভাব নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন;—

"ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ-বাচক সংগীত সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ব্বলোক মধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সংগীত নাই। যাহাতে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীত মধ্যে আছে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাব-সঙ্গত নহে। শোক-প্রকাশক গীত আছে, গীত মধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্রূরভাব নহে; ভক্তি ও প্রেম বাচক।"

সর্ব্বদেশে সর্ব্বসমাজে সর্ব্ব সময়েই এক দল খোসামুদে লোক থাকে। তাহারা কিঞ্চিৎ লাভের আশায় অসম্ভবকে সম্ভব,

* *The Defance of Poesie.*
† Last Sonnet.

ক্ষুদ্রকে মহৎ, উচ্চকে নীচ করিয়া, নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। কবিওয়ালাদের গানে এ শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে। ইহার ফল যাহাই হউক না, প্রকাশ্যে খোসামোদ করার প্রবৃত্তিটা অনেক হ্রাস হইয়াছিল। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল থানার অধীনে 'জাড়া' নামক একখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। রায় উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বংশ এই গ্রামের জমীদার। গ্রামে অনেক চাষার বাস ও বাঁশের ঝাড় ছিল। ইহার সন্নিকটস্থিত মাণিককুণ্ডু নামক গ্রামে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূলা হইত। তথা হইতে নানা স্থানে উহা প্রেরিত হইত।

একদা কবিওয়ালা ভোলা ময়রা ও যজ্ঞেশ্বর দাস উক্ত রায় বাবুদের আবাসে গান গাহিতে যান। যজ্ঞেশ্বর বড় খোসামুদে ছিলেন, কিছু অধিক প্রাপ্তির আশায় তিনি একটী গানে—জাড়া গ্রামটীকে ঠিক 'গোলক বৃন্দাবন' এবং রায় বাবুদিগকে 'পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ভোলার নিকট এরূপ জঘন্য খোসামোদ সমীচীন বোধ হইল না, তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, স্পষ্ট করিয়া গাহিলেন;—

'কেমন ক'রে বল্‌লি জগা!
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন?
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
কেমন ক'রে বল্‌লি জগা!
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন!
জগা! কোথারে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথারে তোর রাধাকুণ্ড,
ঐ সামনে আছে মাণিককুণ্ড,
কর্‌গে মুলো দরশন!
কেমন ক'রে বল্‌লি জগা!
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন!!
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
ওরে বেটা কবি গাবি, পয়সা লবি,
খোসামুদি কি কারণ?
কেমন ক'রে বল্‌লি জগা!
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন॥
'কৃষ্ণচন্দ্র' কি সহজ কথা, কৃষ্ণ বলি কারে?
সংসার-সাগরে যিনি (জগা!) তরাইতে পারে।
বাবুতো বাবু লালাবাবু, কলকাতাতে বাড়ী।
বেগুণ পোড়ায় নুন দেয় না,
এ বেটারা তো হাড়ী॥
পিঁপ্‌ড়ে টিপে গুড় খায়, মুফ্‌তের মধু অলি।
মাপ করগো রায় বাবু!
দু'টো সত্যি কথা বলি॥
জগা ধোপা খোসামুদে, অধিক বল্‌ব কি?
তপ্ত ভাতে বেগুণ পোড়া, পান্তাভাতে ঘি।'

কেমন মিষ্ট কথায় শ্লেষ উদ্গীরণ! শুনিতে পাওয়া যায়, এই ঘটনার পর হইতে যজ্ঞেশ্বরের খোসামোদ করার প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস হয়। কবি-গান এক সময়ে জন-সমাজের উপর এতটা প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

এখন দেখা যাক্, মন উন্নত করিবার, হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার উপযোগী কোনও উপাদান কবি-সংগীতে আছে কি না। দেখা যাক্ কবি-সংগীতে ইংরেজ কবিদিগের ন্যায় ভালবাসার কথা প্রকাশ পাইয়াছে কি না। সারে (Surrey) লিখিয়াছেন;—

'Yea, rather die a thousand times,
than once false to my faith;
And if my feeble corpse,
through weight of woful smart
Do fail, or faint, my will it is
that still she keeps my heart.

And when this careass here
to earth shall be refar'd,
I do beqeeath my wearied
ghost to serve her afterwards.'

কিন্তু বঙ্গীয় কবিওয়ালা প্রথমেই গাহিয়াছেন যে, প্রেমের কথা বলিয়া শেষ করে, এরূপ ক্ষমতা তাহার নাই।

'পিরিতেরও কথা কোয়ে তো ফুরায় না।
প্রাণ যত কও, ততই উপজে কতই,
পরিসীমা হয় না।'

তা' নাই বা হ'ল, মনের কথাটা তোমায় আভাষে জানাইতেছি ;—

এই ভয় সদা মনেতে,
বিচ্ছেদ বা ঘটে পিরীতে ;
হ'তেছে এখানে নূতন যতন,
কি হ'ল কি হ'তে শেষেতে।
প্রাণ নব অনুরাগে, পিরীতি সোহাগে,
আছি আলাপনতে।
চিনি আবাহনে ও বিধুমুখ পাই সদা দেখিতে।
হেন ভাব থাকে নিরবধি।
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে॥

প্রাচ্য কবিওয়ালারা প্রেমের দায়ে শ্মশানবাসী হইবার কথা বলিয়াছেন। যে প্রেম করিতে হৃদয়ে দ্বিধা বোধ হয়, লোক-গঞ্জনার কথা মনে পড়ে, সে প্রেম তাহাদের বাঞ্ছিত নহে। যে প্রেমে তাহাদের মন-প্রাণ মজিয়াছিল, তাহা অলৌকিক—অপার্থিব এবং এই প্রেম-মন্ত্র সাধনের নিমিত্ত তাহারা শরীর বিনাশ করিবার সংকল্প করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ;—

কর্‌ব উত্তম পিরীত প্রাণরে,
সে প্রেম কি সামান্যেতে হয় ?
তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নূতন ব্রতী,
পিরীত হবে কি, মন তোমার তেমন নয়।
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়।
দেখ, ভগীরথ মোক্ষ, প্রেমের আশাতে।
ক'রে মন্ত্র সাধন, কিংবা শরীর পাতন,
আনিলেন গঙ্গা ভারতে।
দেখ, প্রহ্লাদের যন্ত্রণা, হরিনাম তবু ছাড়্‌লে না,
তার তাইতো হ'ল শেষে সুখোদয়॥
শ্রীহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগী।
দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে,
সদাশিব হয়েছেন যোগী॥
তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই ?
একবার চাও পিরীতকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে,
দ্বিধা-মন কর রসময়ি!
যেজন পিরীতে রত হয়, প্রেম-ধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়,
দেখ, প্রেমের-দায়ে—শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥

কবিওয়ালাদের গান এইরূপ বিলাসের আবিলতা বর্জ্জিত। তাহাদের অধিকাংশ গানই উচ্চতর প্রেমের মর্ম্মকাহিনী এবং তাহাদের নিকট প্রেমধর্ম্মের একটী শাখা রূপে বিবেচিত হইত।

বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীতে এতদপেক্ষাও উচ্চতর প্রেম-সংগীত বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি-গানেও সমাজের রুচির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছিল। তাহাতে নানারূপ প্রেমকাহিনী থাকিলেও, অবাধ প্রেমের প্রতি, লোক ঢলাঢলির প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। হরুঠাকুর দেশের নারী-সমাজের কদাচারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন ;—

যৌবন কালে যদি নারী বুঝ্‌তো পিরীত।
তমোগুণে না হইত পূরিত॥
পুরুষেরো হইত বাধিত।
তবে তো হইত প্রেমে সুখ সমুচিত॥
সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন।
করয়ে কথন্—যার যৌবন যখন ;
সে প্রণয়ে হয় কি না—নানা বিঘটিত॥*

* কবি রামবসু নারী-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন,—

এদিকে আবার রামবসু প্রেমের ফলাফল বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও গভীর গবেষণা-মূলক।

প্রেম-তরুতে সখি, চার্‌টি ফল ফলে;
শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম;
সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে।
গোড়া কেটে মেরে কেউ আগায় জল ঢেলে;
চিনে মূল যে দিতে পারে জল,
ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেম-তরুতে হাতে২ ফল
তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়,
বিচ্ছেদ-ছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখো দেখো, যত্নে রেখো
ফল্‌বে না মূল শুকালে।
প্রেম-বৃক্ষ দিয়ে আশা-নীর, কর্‌তেছ সিঞ্চন;
দেখ লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন;
বেড়া দাও সই, প্রবৃত্তি-কণ্টক,
প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এম্‌নি পোড়া লোক
যদি থাকে ফলের বাসনা,
বেশি জল দিয়ে জ্বালিও না,
সময়ে একবিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উছলে॥

এখন আধ্যাত্মিকতার কথা বলি। কবি-সংগীত শ্রবণে মন প্রশান্ত হয় কি না, হৃদয়ে উচ্চভাবের বিকাশ হয় কি না, দেখা যাক্‌। আমরা পূর্ব্বেও আধ্যাত্মিকতামূলক কবি-গান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কবি-গান কেবলই অশ্লীল নয়, তাহাতে ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। তত্রাচ অতি সংক্ষেপে এস্থলেও একটু পরিচয় বিবৃত হইল। কবিওয়ালাদের এই সকল গানে যে কেবলই ভক্তি-স্রোতের ঢলাঢলি তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে উন্নত হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও গভীর তত্ত্বকথা নিহিত আছে। উন্নত হিন্দুধর্ম্ম বলিবার তাৎপর্য্য—তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা ও দেবদেবীসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। চতুর্থ প্রস্তাবেই প্রমাণিত হইয়াছে, ভক্ত কবি নির্ব্বাণ কামনা করেন না, তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিখারী। তাহা লাভ হইলেই তিনি জন্ম সফল জ্ঞান করেন।

মা, হরারাধ্যা তারা!
তোমার নাম মোক্ষধাম তন্ত্রে শুন্‌তে পাই।
তাইতে তারা, তোমায় তারা—
তারা তারা তারা ব'লে ডাক্‌ছি মা সদাই॥
তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,
তোমায় ধরা সে তো বিষম দায়।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে
ডাকি দুর্গা দুর্গা ব'লে,
ধরেছিল ব্যাধের ছেলে কালকেতু তোমায়॥
এবার বেঁধেছি মন আঁটা আঁটি,
ক'রেছি মন খুব খাঁটি,
তারা গো মা, এবার ধ'রেছি পাষাণের বেটি,
আর পালাতে পার্‌বি নে।
তারা গো, আজ তারা-ধরা ফাঁদ পেতেছি মা,
হৃদয়-কাননে॥
আমায় ব'লেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরু মহামন্ত্র-জাল,
সাধন পথে সেই জাল পেতে
থাক্‌বো কিছু কাল।
এখন ভক্তি-ডোর করেছি হাতে
তারা যদি যাস্‌ সে পথে,
ধর্‌বো মা তোর হাতে নাতে বাঁধ্‌বো দু'টী চরণে
মন-কারাগারে তোমায় রাখবো

আর নারীরে করিলে প্রত্যয়।
নারীর নাইক কিছু ধর্ম্মভয়।
নারী মিল্‌তে যেমন, ভুল্‌তে তেমন
দুই দিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে, চায় না ফিরে,
আপনি হয় অন্তর।
উত্তমেরে ত্যজ্য করে অধমে যতন,
নারী, বারি, দুই জনারি নীচ পথে গমন।
তার প্রমাণ বলি প্রাণ,
নলিনী তপনে ত্যজিয়ে,
বনের পতঙ্গ—সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয়।

মা, অতি যতনে।
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা—
ষোড়শোপচারে পূজা,
তেমন পূজা কোথা পাব বল?
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি ক'রে
মনকে নৈবেদ্য ক'রে,
দিব মা তোর চরণ ধরে নির্ম্মল গঙ্গাজল।
ইত্যাদি।
(নীলমণি পাটনী।)

গর্ভযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের আশায় কবি গাহিয়াছেন;—

ধরাতে দেহ ধরা মা,
তারা তোর করিতে সাধন।
পেয়ে দারাপুত্র পরিবার,
মিছে মায়ায় অনিবার,
আশি লক্ষ বার আসি ভবে করিতে ভ্রমণ।
অনিত্য সংসারে তারা, যাওয়া আসা বৃথা হয়,
ও দীন দয়াময়ি, যাওয়া আসা বৃথা হয়,
আমার হয় না আশা সফল,
কর্ম্মভোগ সবে ভোগি কেবল,
দেই না জবা জাহ্নবীর জল রাঙ্গা চরণে।
আমি কিরূপে তরিব তারা, উপায় দেখিনে,
আমি ঐ চরণে নিলেম শরণ আরতো কিছু
জানিনে॥
(সীতানাথ।)

আমরা দেখিলাম, কবিওয়ালাদের রচনা যেমন প্রাঞ্জল, প্রাণের কথাগুলি যেমন আবেগময়ী, ভাবও তদ্রূপ উচ্চ অঙ্গের। তবে শিক্ষিত-সমাজ কবিগানের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন কেন? তবে বঙ্গ-ভূমি হইতে কবি-গান বিলুপ্ত হইল কেন? পূর্ব্বেই ইহার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুকবি স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বলেন;—"কবির গান বিলুপ্ত হইবার অন্য কারণ—নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বদেশীয় পুরাণ ইতিহাসে জ্ঞানের অভাব এবং প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কারের শিথিলতা। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এ দেশের যতটা ইতিহাস ও রূপক-বর্ণনাচ্ছলে সত্য ও নীতিকথা প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে নব্য-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জ্ঞানের অভাব ও অভিনব সাজসজ্জা ও ঐক্যতানবাদ্যবিহীন কবির গানে অরুচির কারণ। এই অজ্ঞতা কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে। শিক্ষিত দেশীয় লোকের পক্ষে ক্ষমার যোগ্য নহে বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ইতিহাস ও পুরাণে জ্ঞান না থাকিলে জাতীয় সাহিত্যে সমুচিত জ্ঞান জন্মিতে পারে না। রোমক ও গ্রীক পুরাণে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ইউরোপীয় সাহিত্যে পারদর্শিতা কখনই লাভ করিতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যে জ্ঞান না থাকিলে জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্রের প্রকৃতি এবং উন্নতির ও অবনতির বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে হয়। এ সকল বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা সুশিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় নয় কি? বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস যদি সংস্কৃত হইয়া থাকে, সেই সংস্কৃত বিশ্বাস বা মার্জ্জিত জ্ঞানের উপযোগী করিয়াও ত গান রচিত হইতে পারে। "কানু ছাড়া গান নাই"—এইরূপ একটা কথা এ দেশে প্রচলিত ছিল। এখন কিন্তু যাত্রা ও নাটকে কানু ছাড়া অনেক গানের পালাই প্রস্তুত হইতেছে। শিক্ষিত লোকের সংস্কার ও রুচির উপযোগী করিয়াও উৎকৃষ্ট কবির গানের পালা রচিত হইতে পারে। ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিল না থাকিলে কোন জিনিষ ভাল হইতে পারে না, তাহাও ত নহে। আমরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাই বলিয়া কি মহাকবি মিল্টনের Paradise Lost কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না? কৃষ্ণলীলা, শক্তিলীলা বা তাদৃশ অপর পৌরাণিক ধর্ম্ম আমার ভজনসাধনের জিনিষ না হইতে পারে, আমার মুক্তির কারণরূপে বিবেচিত

না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা অস্পৃশ্য হইবে কেন? প্রকৃতরূপে শিক্ষিত লোকের মনের এতটুক, প্রাণের ও হৃদয়ের এতটুক উদারতা না থাকিলে চলে কি? সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও হিন্দু-পুরাণে অসীম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে পৌরাণিক ধর্ম্ম শত শত বৎসর বাঙ্গালীর রাজ্যে আধিপত্য করিয়া বাঙ্গালীর চরিত্রকে কবিত্বময় করিয়াছে, তাহা আমার মার্জ্জিত বিশ্বাসের উপযোগী না হইলেও আমার অতি আদরের আলোচ্য সামগ্রী এবং আনন্দলাভের সুন্দর ক্ষেত্র বলিয়াই আমি অনুভব করিয়া থাকি।

এক দিন নয়, দুই দিন নয় প্রায় এক শতাব্দী কাল কবির গান বাঙ্গালী জাতিকে অসীম আনন্দ প্রদান করিয়াছে। আজি ত সে আনন্দের তরঙ্গ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই। কবির গান যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই দুই চারিটী কবির গান ও দুই চারিজন প্রাচীন কবি গায়ক বা কবিওয়ালার নাম অবগত আছেন। * * * সুকবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার প্রভাকর পত্রে রাম বসুকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমকক্ষ লোক বলিয়াছেন। রামবসু শ্রেষ্ঠতর রচক ছিলেন বটে, কিন্তু হরু ঠাকুর উত্তম রচক ও উত্তম গায়ক ছিলেন। কথিত আছে, হরু ঠাকুর এক দিন গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি আমি গান ধরি, আর দীনে ঢুলী ঢোল বাজায় তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ মাত করিয়া ফেলিতে পারি।" উত্তম রচক এবং অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন বলিয়াই হরু ঠাকুর সাধারণ লোকের মধ্যে "কবির গুরু হরু ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

কবি-সংগীতকে 'গোবিন্দ গীত' বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ সংগীতেই গোবিন্দের লীলামৃত বর্ণিত হইয়াছে। কবির পালারম্ভের সময় গেয় কতিপয় মালসী, ডাক মালসী, সপ্তমী, বা ভাবানী বিষয়ক গান ছাড়িয়া দিলে সম্পূর্ণ কবি-সংগীত রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনী ও প্রেমতত্বে পরিপূর্ণ। সকলেই জানেন, রাধাকৃষ্ণ ও তাঁহাদের সম্পূর্ণ লীলার আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। সুতরাং তাঁহাদের প্রেমলীলাঘটিত সংগীতগুলিকে অশ্লীল অরুচিকর বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? গোবিন্দ গীতি কোন্ কালে অরুচিকর হইতে পারে? অবনতির পঙ্কিলময় হ্রদে নিমজ্জিত না হইলে, কখনও গোবিন্দ-প্রেমামৃত কেহ অশ্লীল বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে না। শিক্ষিত সমাজ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া এই ভাবে খাঁটী স্বদেশী জিনিসকে অশ্লীল বলিয়া অনাদর করিয়াছেন, সে অবস্থা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা হইতে বহু দূরে ছিল না। আমার বিশ্বাস, ঐ দুই অবস্থাই নিকটবর্ত্তী—পাশাপাশি হইয়াছিল। কাযেই ঐ সমাজের অবস্থা দেখিয়া আজ অনেকের চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতেছে। কবিগানের সেই প্রথম অবস্থায়—সেই বাল্যকালে যখন হরু ঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাগণের হাতে খড়ি হইতেছিল, তখন তাঁহারা যাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করতঃ সংগীত কথা শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, যাঁহার নিকট হইতে রচনা সংশোধন করিয়া লইয়া হরু ঠাকুর 'কবির গুরু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ওস্তাদ রঘুনাথ দাসের সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত একটা গান শুনুন;—

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়?
এত দিন আসি যমুনা জলে,
আমি এমন মোহন মূরতি কখন
দেখিনি এসে হেথায়॥

অঙ্গ অগৌর চন্দন চর্চ্চিত, বনমালা গলায়;
গুঞ্জ বকুলের মালে,
বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়।
সই, সজল নব জলদবরণ, ধরি নটবর বেশ
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ, এই কি রসিক শেষ।
চন্দ্র চমকে, চলিতে চরণ, নখরের ছটায়;
আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন,
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥
তোরা দেখিবি লো যদি সখি! আয় আয় আয়
হায়! অনুপম রূপমাধুরী সখি!
হেরিলাম কি ক্ষণে—প্রাণ নিল হরে
ঈষৎ হেসে বঙ্কিম নয়নে।
মন্দ মধুর মুচ্‌কি হাসি চপলা চমকায়,
কুলবতীর কুল-শীল গেল গেল,
মন মজিল হেরে উহায়॥
সই, অলকা-আবৃত বদন, তাহে মৃগমদ তিলক,
মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজ মুকুতার ঝলক।
বিম্ব অধরে অর্পয়ে বেণু, সে রংগে ধেনু চরায়,
কিবা সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
রূপে ভুবন ভুলায়।
সই, বেষ্টিত ব্রজ বালক সবে,
কি শোভা আ-মরি হায়!
গগনেতে তারাগণ মাঝে,
চাঁদ যেন শোভা পায়।
সই! কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম যমুনায়!
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি!
রঘু কহে একি দায়॥

অশিক্ষিত কবিওয়ালার লিপিচাতুর্য্য ভাব-সৌন্দর্য্য ও অনুবীক্ষণ ক্ষমতা দেখুন। আর একটীর কিয়দংশ,—

যে ধন আন্‌তে গেলে, আমার সে ধন কই?
গেলে একা, একা দেখা দিলে সই॥
সেই যে গেলে তুমি, ও বৃন্দে সজনি,
বাক্যে তুষিয়া আমায়;
আছি উর্দ্ধ বদনেতে চেয়ে,
সদা কৃষ্ণের আসার আশায়।
দিন দিন হ'তেছে অবসান,
দুঃখের দিন গেছে যুগের সমান।
ব'লে সুসংবাদ, শুন্‌লে পরে তবে,
অন্তরেতে আমি সুখী হই॥
রসহীন কেন বৃন্দে! হয়ে রসময়ী,
বল তো বিশেষ সমাচার,
কোথা নীলকান্তমণি সে আমার?
সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন,
অন্য ধনের অভিলাষী নই॥
ইত্যাদি।

এবম্প্রকার গোবিন্দগীতে অশ্লীলতার দোষারোপ অজ্ঞতারই পরিচায়ক। অধিকাংশ কবি-সংগীতই এইরূপ রাধাকৃষ্ণ লীলা-ঘটিত, তজ্জন্যই কবিওয়ালাদিগকে আমরা পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবি আখ্যা প্রদান করিয়াছি এবং তজ্জন্যই এখন কবিগানকে গোবিন্দগীত বলিয়া সমাদর করিতেছি, এবং এইজন্যই কবি-গানে বৈষ্ণব কবিদিগের ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা এস্থলে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি।

রাম বসু গাহিয়াছেন,—

হর নই হে আমি যুবতী,
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি।
ক'রো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ,
আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত,
কেন করিতেছ বারবার।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ,
চেনা পুরুষ প্রকৃতি।
হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হয়ো না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিতা কেশা,
নহে এতো জটাভার।

বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা,
যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন।
অরুণ হল নয়ন ক'রে পতি-বিরহে রোদন॥
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥

বিদ্যাপতি ঠাকুর ইহার পূর্ব্বে গাহিয়া গিয়াছেন,—

কতি হুঁ মদন তনু দহনি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর, হউ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি, নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এহেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥*

ইহারও পূর্ব্বে সুকবি জয়দেব গোস্বামী গাহিয়াছেন ;—

হৃদি বিসলতাহারোনায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ।
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠেনসা গরলদ্যুতিঃ॥
মলয়জরজো নেদং ভস্ম, প্রিয়বিরহিতে ময়ি।
প্রহরণ হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি।

পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মধ্যে একজনের গানে বিরহী কৃষ্ণের সহিত, অন্য জনের গানে বিরহিণী নারীর সহিত শঙ্করের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। কিন্তু রাম বসু তৎপথ অনুসরণ না করিয়া অন্যরূপে স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। রাসু-নৃসিংহও একটী গানে এইরূপ কৃষ্ণ ও শঙ্করের সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা ;—

প্রাণনাথ মোর, সেজেছেন শঙ্কর,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে
অপরূপ দরশন, আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥
পার্ব্বতী নাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দুর ভালেতে॥
হায়, মথনের বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীল কণ্ঠদেশ নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে র'য়েছে ঘোষণা॥ ইত্যাদি,

রাম বসুর আর একটী গান এইরূপ,—

আমি নারী, হর নই শুনহে মদন!
বিনা অপরাধে কেন বধহে জীবন॥
এযে বেণী ফণী নয়, নহে জটাজুট।
কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা নহে কালকূট॥
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু চন্দন দেখিয়ে।
ভ্রমেতে ভেবেছে মদন শশী হুতাশন॥
ইত্যাদি—

আর একটী উদাহরণ দিতেছি। রাম বসু গাহিয়াছেন,—

যৌবন জনমের মত যায়।
সেতো আশা-পথ নাহি চায়॥
কি দিয়েগো প্রাণসখি রাখিব উহায়?
জীবন-যৌবন গেলে আর,
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার।
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥
গেল গেল এ বসন্ত কাল আসিবে তৎকাল।
কালে হ'ল কাল আমার এ যৌবনকাল॥
কাল পূর্ণ হলে রবে না, মনতো প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়।
হায় ষোলকলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার॥
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তায়।
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়॥

* বিদ্যাপতি—কাব্যবিশারদ।

যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয় কোটিকল্পে পুনঃ নাহি হয়
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য-গমন প্রায়॥

ইহার বহু পূর্ব্বে প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন ;—

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকী ?
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি ?
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা-যৌবন, বিফলে গোঙায়ু,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বহুপূর্ব্বে বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রাদুর্ভাবের বহুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় কবিবৃন্দের বর্ষার ঝম্ ঝম্ বারি পতন শব্দে, ভেকের মকমকামির শব্দে বিরহ-ব্যথা সঞ্জাত হইত। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাঁহারা প্রিয়ার শোকে অধীর হইতেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিগণ বসন্তকালই বিরহের উপযুক্ত সময় নির্ণয় করেন এবং তৎকাল হইতে এ পর্য্যন্ত এই রীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ হইলেই, কোথা হইতে পোড়া কোকিল আসিয়া কুহু কুহু আরম্ভ করে, কালো ভ্রমর আসিয়া গুঞ্জন করিতে থাকে। উহারাই যেন প্রিয়-বিরহ-ব্যথা জাগাইয়া দেয়। সারা বৎসর প্রিয়-বিরহে কাটান যায়, কিন্তু বসন্তকাল আসিলেই প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে ;—

সখিরে ! বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল॥

বসন্তকালে প্রিয়তমের নিকট না থাকিলে আর যৌবনে কি সুখ ? বৈষ্ণব কবি বসন্তকালের ও রমণীর যৌবনের চিত্র এই ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কলিকাতার ইতিহাস।

মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র।

৮ম অধ্যায়।

যে সমস্ত কারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আধুনিক সভ্যতাকে বর্ত্তমান পথে পরিচালিত করিয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম প্রধান কারণ। সংবাদপত্রের প্রভাবের পরিমাণ ও ইহার যথোচিত স্থান নির্ণয় করা একান্ত দুঃসাধ্য। অনেকে বলিয়াছেন, "সংবাদপত্র রাজ্যের চতুর্থ বল।" বোধ হয়, ইহার শক্তি তদপেক্ষাও অধিক। ল্যাটিন ভাষায় একটি

প্রবাদ-বাক্য আছে ; তাহার অর্থ 'জনসাধারণের বাণীই ভগবানের বাণী'। সংবাদপত্র সেই জনসাধারণের বাণী প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। সভ্যতার উন্নতির সহিত সংবাদপত্রের ইষ্টানিষ্ট-সাধনশক্তি অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। ইংল্যাণ্ডের মহাবাগ্মী চেদাম যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার এক স্থলে সংবাদপত্রকে বায়ুর ন্যায় সর্ব্ববন্ধনমুক্ত ও অব্যাহত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই সংবাদপত্রের রাজনীতি-সমালোচক আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আরাম করিতে করিতে রাজা, সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মযাজক ও জনসাধারণকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। ইহা চরিত্রহীন ব্যক্তিদিগকে চরিত্র দান করিয়া থাকে।

সংবাদপত্রের প্রকৃতি এইরূপ। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সিসিরো ও ডিমস্থিনিস যৎকালে বক্তৃতাদ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করেন, তৎকালে সংবাদপত্রের শক্তি বিকশিত হয় নাই। আধুনিক বাগ্মিগণকে বক্তৃতা করিতে বা প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যে নবশক্তি সদা আত্মাভিমানে মত্ত ও যাহার নিকট কোন ব্যক্তির, কোন ধর্ম্মের পরিত্রাণ নাই, সেই শক্তি অচিরে তাঁহাদের উক্তি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার সমালোচনা করিবে। কথিত আছে যে, "সিজারের মহিষী সর্ব্বপ্রকার নিন্দা ও সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবে।" কিন্তু মহাপ্রভাবশালী সংবাদপত্রের নিকট তাঁহাকেও মস্তক নত করিতে হয়; নচেৎ উহা এক সময়ে সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে এবং তাঁহার চরিত্রের দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। বস্তুতঃ ইহা "শিক্ষকগণকেও শিক্ষা দিয়া থাকে"। ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, চারিশত বৎসর কালের মধ্যে ইহা এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং এরূপ অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেছে। উল্লিখিত আছে যে, প্রথম সংবাদপত্র জার্ম্মানি দেশে ১৪৯৮ অব্দে প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ, অতি প্রাচীনকালে যখন শাসনবিজ্ঞান ও শাসন-নীতি অতি অপক্ক অবস্থায় ছিল, সে সময়ে প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সাধারণ্যে প্রচার করায় যে যথেষ্ট সুফল ফলিত, তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ প্রশংসা প্রচার দ্বারা সৎকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইত এবং নিন্দা প্রচারে অসৎ কর্ম্মের দমন হইত। অন্যান্য লোকের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা ও অনুমোদন করা, অথবা তাহাতে সম্মতি দেওয়া আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম। লোকে বলে, সত্য ও ন্যায় সমধিক প্রচার দ্বারাই বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করে। সংবাদপত্রের শিক্ষা দিবার শক্তিও বিলক্ষণ আছে, কারণ এ কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানবিস্তারের যে সমস্ত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অতি অল্পকাল মধ্যে বহুলোকের নিকট যেরূপ সত্বর জ্ঞান বিস্তার করিতে পারে, আর কোনও উপায় দ্বারাই তেমন হয় না। ইহা জনসাধারণকে ভাব ও চরিত্র দান করে, এবং ইহা দ্বারা বর্ত্তমান সাহিত্যের যে কত দূর উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জ্ঞান-জনিত সাধুতা বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহা জ্ঞান বিস্তারের এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা বহুসংখ্যক লোকের মত গঠিত ও পরিচালিত করে এবং তাহার প্রতিধ্বনিও করিয়া থাকে। তথাকথিত "বাক্‌শক্তিহীন" লক্ষ লক্ষ

অশিক্ষিত প্রজা সংবাদপত্রকেই তাহাদের স্বত্বাধিকারের প্রকৃত ব্যাখ্যাকর্ত্তা ও রক্ষক বলিয়া জানে। সুতরাং ইহা যে অল্পকাল মধ্যে মানবসমাজের বিষয় ব্যাপারে এতাদৃশ প্রভাব ও ক্ষমতা লাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ইউনিভার্সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক হেনরি মর্লি "সংবাদপত্র প্রাচীন ও আধুনিক" এতদ্বিষয়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহার বীজ মধ্যযুগে প্রথম রোপিত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে ভেনিস নগরে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের দ্বারা প্রস্তুত ও সাধারণের চিত্তাকর্ষক সংবাদ সমূহে পূর্ণ একখণ্ড হস্তলিখিত কাগজ কোন প্রকাশ্য স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ প্রথা হইতেই সংবাদ-পত্রের উদ্ভব হয়। পূর্ব্বোক্ত সংবাদপূর্ণ কাগজ পড়া যাহারা শুনিতে যাইত, তাহা-দিগকে এক এক "গেজেটা" (এক প্রকার সামান্য মূল্যের মুদ্রা) দিতে হইত; ঐ গেজেটা কথা হইতেই উত্তরকালে "গেজেট" শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। মর্লি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে পূর্ব্বে বণিকগণ যে সংবাদপূর্ণ চিঠিপত্র বিদেশে লইয়া যাইতেন, তাহা হইতেই সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। খৃষ্টিয় ১৬শ শতাব্দীতে জনসাধারণের চিত্তা-কর্ষক বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে সংবাদ-পূর্ণ কাগজ বাহির করা হইত। ইংল্যাণ্ডে ন্যাথানিয়েল বট্লার এবং ড্যানিয়েল ডিফো "উইক্লি নিউস (Weekly News)" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান শাসনকালে দেশীয় রাজগণের ব্যয়ে সংবাদসংবলিত কাগজ রাজকীয় গেজেট রূপে বাহির করা হইত। ঐ সকল কাগজে সত্য ও মিথ্যা ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়া প্রকাশ করা হইত, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশিত হইত না। ঐরূপ কাগজের নাম ছিল "আকবর"। তাদৃশ গভর্ণমেণ্টের অধীন লেখকগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইংরেজী সংবাদপত্রের সহিত ঐ সকল আকবরের তুলনাই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র। প্রায় দুরতিক্রম্য অসুবিধাসমূহের মধ্যে ইহার উদ্ভব হয়, এবং তাহার পর পদে পদে ইহাকে নানারূপ সঙ্কটে পড়িতে হয়। তখন অবস্থা এরূপ ছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসীরা তখনও বিলক্ষণ প্রভাবশালী ছিল এবং দারুণ উদ্বে-গের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ভিন্ন কতকগুলি ইংরেজ, বিশেষতঃ খৃষ্টিয়ান পাদ-রিরা, দেশীয়দিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির তারস্বরে নিন্দা করিতেছিল। ঈদৃশ অবস্থায় ইংরেজ কর্ত্তৃ-পক্ষীয়েরা এই নব শক্তির অভ্যুদয় যে দারুণ ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তৎকালে এতদ্দেশের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিলাতের এক বিশেষ সভার প্রত্যক্ষ অধীন ছিল, এবং সেই প্রভুরা এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সার্ জন্ ম্যাল্কম সাহেবের ভারত ইতিহাসের পরিশিষ্টে তাঁহার যে বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেই এই প্রণালীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমর্থন দৃষ্ট হয়। ঐ সমর্থনে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে উই-লিয়ম ডিগ্বি সাহেব লর্ড হেষ্টিংসকে ভারতীয় ইংরেজী সংবাদপত্র সমূহকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্তু এ বিষয়ে সার্ চার্লস্ মেট্কাফই (পরে লর্ড মেট্কাফ) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও

প্রশংসা পাইবার যোগ্য। লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ কিছুদিন তাঁহার পদে অস্থায়িভাবে কার্য্য করেন এবং সেই সুযোগে এই সংস্কার সাধন করিয়া ভারতবাসিগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন। এই কার্য্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ দায়িত্বে সংসাধন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে মেকলে সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। সার চার্লস্ মেট্‌কাফ প্রকৃতই "ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা" নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে মনোভাব ও প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশমান। তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, তদুত্তরে তিনি বলেন, "জ্ঞান বিস্তারের ফলে পরিণামে ভারতে আমাদের রাজত্বের বিলোপ হইবে, ইহাই যদি উহাদের একমাত্র যুক্তি হয়, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে উহাদের সহিত তর্ক করিতে চাহি না, পরন্তু এই মাত্র বলিব যে, ফলে যাহাই হউক না কেন, জ্ঞান বিস্তার করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতের অধিবাসীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন রাখিয়াই যদি ইহাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীভূত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব এদেশের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইবে, সুতরাং তাহার বিলোপ হওয়াই উচিত। * * * * আমরা যে কেবল দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার ও তদ্দ্বারা এই দেশ অধিকারে রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত এবং অনটন পড়িলে ঋণ করিয়া তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত এখানে আছি, ইহা কখনই হইতে পারে না। নিঃসন্দেহই ইহা অপেক্ষা বহু মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এখানে আছি। তন্মধ্যে একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দেশের সর্ব্বত্র ইউরোপের মার্জ্জিত জ্ঞান, সভ্যতা ও শিল্পবিজ্ঞান বিস্তার করিব এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার উৎকর্ষ বিধান করিব। এই সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।"

কলিকাতাবাসীরা এই মহোপকারের স্মরণার্থ ভাগীরথীর তীরে একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "মেট্‌কাফ্ হল্" রাখেন। যে উদ্দেশ্যে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, "ইহাতে একটি সাধারণ পুস্তকালয় থাকিবে এবং নানাপ্রকারে জ্ঞান-বিস্তার কল্পে ইহার ব্যবহার হইবে। ইহাতে এইরূপ একটী ক্ষোদিত লিপি থাকিবে যে, স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করেন; তদ্ভিন্ন উক্ত স্বাধীনতাদাতার অর্দ্ধ-প্রতিমূর্ত্তিও অট্টালিকা মধ্যে স্থাপিত হইবে।"

ইহার পর ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দুইবার অস্থায়িভাবে হরণ করা হয়। একবার ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহরূপ শোচনীয় ঘটনার সময়, এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে। পরন্তু এই দ্বিতীয়বারে কেবল দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতাই সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। পরে লর্ড রিপন মহোদয় ১৮৭৮ অব্দে এই বিষম পক্ষপাতমূলক অহিতকর আইন রহিত করিয়া দেন।

১৭৬৮ অব্দে বোল্টস্ নামক একজন সাহেব কাউন্সিল হাউসে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য

স্থানে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, যাহাতে প্রত্যেক লোকের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এরূপ অতি প্রয়োজনীয় অনেকগুলি কাগজ পত্র তাঁহার হাতে আছে; কোনও ব্যক্তি পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিতে দিবেন, আর মুদ্রণকার্য্যে অভিজ্ঞ কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র চালাইতে চাহিলে তিনি সে বিষয়েও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং তদ্ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যক অক্ষর ও অন্যান্য সরঞ্জামও তিনি প্রদান করিবেন।" কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রের অভাব সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। বষ্টিড্ সাহেব এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় বলিয়াছেন;—"বোল্টস্ সাহেব প্রকাশ্যে এই অনুযোগ প্রকাশ করিলেও তাহার পর একাদশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐ অভাব অপূর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, কারণ মুদ্রিত আকারে সাধারণ সংবাদ প্রকাশ এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম ও ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের সামাজিক অভাবসমূহ প্রচার করিবার প্রধান উপায় মুদ্রাযন্ত্র। এই মুদ্রাযন্ত্র এশিয়ার সর্ব্বপ্রধান নগর (কলিকাতা) ১৭৮০ অব্দের পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয় নাই।" কলিকাতায় প্রচলিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম "বেঙ্গল গেজেট" উহা ১৭৮০ অব্দের ২ শে জানুয়ারি শনিবার (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "টাইম্‌স্" প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পূর্ব্বে) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রচারিত হইবার বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল; "রাজনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র, সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু কাহারও প্রভাব-পরিচালিত নহে।" দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৮ ইঞ্চি এইরূপ দুই খণ্ড কাগজে ইহার অবয়ব গঠিত হইত; তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিন কলম (স্তম্ভ) করিয়া মুদ্রিত "ম্যাটার" থাকিত, এবং তাহার অধিকাংশই বিজ্ঞাপনে নিয়োজিত হইত। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—"এই ক্ষুদ্র কাগজের অধিকাংশ স্থান কলিকাতার ও মফঃস্বলের পত্র-লেখকগণের পত্রে পূর্ণ হইত, তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ইউরোপ হইতে যে নূতন সংবাদ আসিত তাহাও উদ্ধৃত হইত। ইহার কাগজ এবং ছাপা অতি কদর্য্য ছিল।" জেম্‌স্ অগষ্টস্ হিকি নামক একজন সাহেব ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বষ্টিড্ সাহেবের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে হিকি সাহেবকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জীবন-সংগ্রামে তাঁহাকে নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বষ্টিড্ সাহেব আরও বলেন,—"প্রথমে যে সকল লেখকের নামের তালিকা বাহির হয়, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার সময় স্বত্বাধিকারী প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংবাদপত্ররূপ হিতকর অনুষ্ঠানটীকে তিনি যদি সৌভাগ্যক্রমে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিবেন, যে হেতু উহা অল্পকাল মধ্যে একটি অমোঘ পিত্তঘ্ন ঔষধরূপে পরিণত হইবে, কারণ তিনি আশা করেন যে, তাঁহার গ্রাহকেরা টিংচার অভ্ বার্ক, ক্যাষ্টর অয়েল বা কলম্বা রুট্ অপেক্ষা উহা হইতে অধিকতর প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।" এই নবজাত সংবাদপত্রের জীবনের প্রথম কয়েক মাস বেশ সুখশান্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা সাধারণতঃ নীরস ও অনেকটা ইতর প্রকৃতির হইলেও মোটের উপর নিরীহভাবেই চলিয়াছিল। প্রধানতঃ স্বাধীন বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জনগণ হইতে এবং বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ হইতে ইহার নিমিত্ত

গ্রাহক সংগ্রহ করা হইত। ইহার সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ ইউরোপীয় ও ভারতীয়দিগের প্রতিকূলে তুল্যরূপেই চালিত হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও সার ইলাইজা ইম্পের প্রতি আক্রমণের নিমিত্ত এই সংবাদপত্র বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সিস্ সম্বন্ধে বষ্টিড্ বলেন,—এমন কথা বলা যায় না যে, তাহার চরিত্র ও আচরণ সকল সময়েই এতদূর নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, নীতিপ্রিয় হিকি তাহার সমালোচনা করিবার সুযোগ কখনই প্রাপ্ত হন নাই; নিরপেক্ষভাবে চলিতে হইলে যে সকল স্থলে প্রকাশ্য মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত, সে সকল স্থলে হয় ত কোন কথাই বলা হয় নাই, অথবা তাঁহার অনুকূলেই বলা হইয়াছে। সমাজের সরকারী নেতাদিগের মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সিসই কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

আর এক স্থলে লিখিত আছে,—"সরকারী কার্য্যে বা সামাজিক হিসাবে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনেককেই যেরূপভাবে ও যে ভাষায় আক্রমণ করা হইত, তাহাতে বিদ্বেষপূর্ণ শত্রুতার ভাবই প্রকাশ পাইত; আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান, তাঁহাদিগকে সাধারণের নিকট নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তোলা হইত।"

হিকির সমালোচনার রীতি-প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—"বেঙ্গল গেজেট যাহাদিগকে সাধারণের নিকট বিদ্রূপ-পাত্র করিতে ইচ্ছা করিত, তাহাদিগকে কষাঘাত করিবার উহার এই একটী প্রিয় প্রথা ছিল যে, উহা একটি নাটক বা প্রহসনের অভিনয়ের বা কনসার্টের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিত (কারণ ঐগুলিই তৎকালে প্রচলিত আমোদ ছিল) এবং সেই সঙ্গে উহার লক্ষীভূত ব্যক্তিবর্গের এক এক জনকে অতি সামান্য ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত করিয়া কে কোন্ অংশের বা চরিত্রের অভিনয় করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিত।"

পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন;—"উহার লেখা ক্রমশঃ এরূপ জঘন্য হইয়া উঠিল যে, ১৭৮০ অব্দের ১৪ই নবেম্বর গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়া জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে উহার প্রচলন রহিত করিয়া দিলেন, কারণ কিছুদিন হইতে উহাতে এমন কতকগুলি কদর্য্য প্যারাগ্রাফ বাহির হইতেছিল যে, তাহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দাগ্লানি বিদ্যমান এবং তাহার লেখার ফলে উপনিবেশের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। হিকি তাঁহার কাগজ বিলি করিবার নিমিত্ত ২০ জন হরকরা নিযুক্ত করিলেন ও বলিলেন যে, যদিও তাঁহাকে হোমারের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা রচনা করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। এইরূপে দীর্ঘকাল বিবাদ করার পর তাঁহাকে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।"

"ওরিজিনাল ইন্‌কোয়ারি" নামক গ্রন্থের লেখক ভারতের স্বাধীন-মুদ্রাযন্ত্রের বর্ণন প্রসঙ্গে হিকির বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন;—স্থানীয় গভর্ণমেণ্টগুলি ১৭৯৩ অব্দের আইনের বিধানানুসারে নির্ব্বাসনদণ্ড দানের ক্ষমতাপন্ন হওয়ার সময় হইতে ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তের জন্যও ছিল না বটে, তথাপি কলিকাতার সেন্সরের পদ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে এবং উহা উঠিয়া যাইবার পরে কোন কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক সময়ে সময়ে নিজ দায়িত্বে রাজকীয় কার্য্যাবলীর ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার ও আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং তাহার ফলে

অনেক সময় আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এইরূপ কথার প্রচার দ্বারা কখনও যে কোন বিশেষ বা স্থানীয় ভাবের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথবা তাহা বিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও হেতু দৃষ্ট হয় না। পরস্পর বিসংবাদী বিধি ব্যবস্থা দ্বারা যে গুরুতর বিশৃঙ্খলাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৭৮০ অব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রচার দ্বারা যে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল বলিয়া সারজন্ ম্যাল্‌কম্ অনুমান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি একটিও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল পরীক্ষা করিলে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাদের ভাব ও প্রকৃতি এবং যাঁহারা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহাদের চরিত্রের অনেক তথ্যই অবগত হওয়া যায়; আর ঐরূপ সংবাদপত্র পাঠ ভিন্ন তদানীন্তন কালের অবস্থার প্রকৃত জ্ঞান লাভের অন্য উপায়ও নাই।”

বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, তদানীন্তন কালের ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাসঙ্কোচক বিধি ব্যবস্থাগুলি নিতান্ত কঠোর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের চরিত্র ও কার্য্যসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের আলোচনাই নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়মের লঙ্ঘনকারী দেশীয় হইলে তাহার প্রতি অর্থ ও কারাদণ্ডের এবং বিলাতজাত ইংরেজ হইলে তাহার প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তদানীন্তন কালের অবস্থানুসারে এই সমস্ত নিষেধবিধির আবশ্যকতা হইয়াছিল, অথবা তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের যথেচ্ছাচারিতা হইতে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, একথা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নয়। পরন্ত ইহাই কৌতুহলের বিষয় যে, দেশীয়দিগের অপেক্ষা ইংরেজদিগের প্রতিই অধিক দণ্ডের প্রয়োগ হইত। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালন ভার প্রায়শঃ ইংরেজদিগের হস্তেই ছিল। কিন্তু কতিপয় বর্ষ পরে, সম্ভবতঃ ১৮১৬ অব্দ হইতে, এতদ্দেশীয়েরা সংবাদপত্রপ্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

সুপ্রসিদ্ধ জেম্‌স্ সিল্ক বকিংহাম কর্ত্তৃক সম্পাদিত “কলিকাতা জর্ণাল” নামক সংবাদ পত্র লইয়া জন আডাম সাহেবের বিস্তর বিবাদ বিসংবাদ চলিয়াছিল। মাননীয় জন্ আডাম কিছু দিনের জন্য গভর্ণর হন। সম্পাদক অতি উদ্ধত ও বিদ্বিষ্টময় ভাবে গভর্ণরের ব্যক্তিগত চরিত্র আক্রমণ করিয়া দোষের কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্ত সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতি যে নির্ব্বাসনদণ্ডের প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে একমাত্র ইংরেজরাই সংবাদপত্র পরিচালন করিতেন এবং তাঁহার নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন। মাদ্রাজের অধিবাসীরা উক্ত মহাত্মাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, তদুত্তরে তিনি বলেন,—“আমি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক বিধিসমূহ অপনীত করিয়াছি এবং ভারতীয় ইংরেজগণকে মতামত প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি, কারণ আমার বিবেচনায় উহা ইংরেজজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার।” আর এক স্থলে উক্ত মহাত্মা বলেন, “নিজের সাধুতার জ্ঞান থাকিলে, সাধারণের সমালোচনাদ্বারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আত্মশক্তির কিছুই হ্রাস হয়

না; প্রত্যুত, তদ্দ্বারা তাঁহাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।" সুখের বিষয় এই যে, সে সময়েও কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রকাশ্য সমালোচনার শক্তি ও উপকারিতা অনুভব করিতেন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তদানীন্তনকালে উচ্চপদস্থ ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যে সমালোচনা করা অতি গুরুতর ব্যাপার ছিল, এবং গভর্ণমেণ্ট যে সময়ে সময়ে সংবাদপত্র সংক্রান্ত অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরন্তু ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র পরে যে ক্ষমতা লাভ করে, তাহা যে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উদার-হৃদয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রের মহিমা বেশ বুঝিতেন; এমন কি সিপাহী-বিদ্রোহের সেই নিদারুণ সঙ্কটকালেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। উক্ত মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদ্বারা যে ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা এরূপ সুস্পষ্ট ও সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, উহার অপব্যবহারদ্বারা যে অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা ইষ্টের গুরুত্ব অধিক—অনিষ্ট ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইষ্ট চিরস্থায়ী।"

ক্রমে আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র নগরে আবির্ভূত হইয়াছিল। "মনিটরিয়াল গেজেট" নামে একখানি সংবাদপত্র ছিল। পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন,* ১৭৮০ অব্দে কিয়ার্ণাণ্ডার সাহেবের একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল। বর্ত্তমান প্রধান প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে; এজন্য পশ্চাতে তাহা প্রকাশ করা গেল;—

জন্ বুল—ইহাই উত্তরকালে "ইংলিশম্যান্"রূপে আবির্ভূত হয়। বকিংহাম সম্পাদিত "কলিকাতা জর্ণাল" নামক সংবাদপত্রের প্রভাব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে ১৮২১ অব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। বকিংহাম সাহেব ১৮১৮ অব্দে "কলিকাতা জর্ণাল" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্রের পরিচালনার্থ প্রথমে ৩০,০০০৲ টাকা মূলধন নিয়োগ করা হয়, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে মূলধন যোগ করিতে করিতে কারবারটির মূল্য পরিণামে চারি লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়, এবং উহাতে বৎসরে ৬০ হইতে ৮০ হাজার টাকা লাভ হইত। প্রথম পাঁচ বৎসরে ইহা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। সকল শ্রেণীর লোকেই ইহার গ্রাহক মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু তাহার পর ইহা কর্তৃপক্ষীয়দিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে, এবং সম্পাদকের নামে কয়েকটি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। বকিংহাম সাহেবের মতে, তৎকালে কলিকাতায় আর ছয় খানি সংবাদপত্র ছিল। তন্মধ্যে "এশিয়াটিক মিরর" পাদরি-জন্ ব্রাইসের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। বর্ণিত আছে যে, মাননীয় আডাম্স্ সাহেবের সহিত তাঁহার ভয়ানক বাগ্‌যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে চটিয়া যায় এবং তাঁহার কাগজ ক্রমশঃ অবনতি পাইতে থাকে। এক্ষণে একমাত্র কলিকাতা জার্ণালই নিজ বিরাগভাজন কর্ম্মচারীদিগের প্রতিকূল সমালোচনা করিতে লাগিল। এই সময়ে "জন্‌বুল" পত্র উহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবতীর্ণ হইল। সৈনিক ও অসৈনিক রাজপুরুষেরাই ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উন্নতিসাধক

* বষ্টিড্ সাহেব সে কালের সংবাদপত্রের এইরূপ একটী তালিকা দিয়াছেন;—ইণ্ডিয়ান্ গেজেট (নবেম্বর ১৭৮০); কলিকাতা গেজেট এণ্ড ওরিয়াণ্টাল এড্‌ভার্টাইজার (সম্পাদক ফ্রান্সিস্ গ্লাড্‌উইন্, ফেব্রুয়ারি ১৭৮৪); বেঙ্গল জর্ণাল (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫); ওরিএণ্টাল ম্যাগেজিন্ (৬ই এপ্রেল ১৭৮৫); কলিকাতা ক্রনিকল্ (জানুয়ারি ১৭৮৬)।

হইলেন। সুতরাং ইহা অচিরকাল মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অতঃপর কলিকাতা জর্ণালের সম্পাদক জন্‌বুল্ সম্পাদকের নামে মানহানির এক নালিশ উপস্থিত করেন। বোধ হয়, সে সময়ের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির প্রকৃতি ও অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের পরস্পরের সহিত বাগ্‌যুদ্ধের তুলনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ইংলিশম্যান্—যে রাজনৈতিক ভাব লইয়া "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্" জন্ম গ্রহণ করে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া ইহা আবির্ভূত হয়। ১৮২১ অব্দে, অর্থাৎ যে বৎসর ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জ্জের সহিত তদীয় হতভাগা মহিষীর বিবাদ চরম সীমায় উপস্থিত হয়, সেই বৎসর "জন্ বুল্" রাজার পক্ষসমর্থনকারী এবং ব্যক্তিগত কুৎসাবাদের নিন্দাকারিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ব্যক্তিগত কুৎসাই এ পর্য্যন্ত কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের প্রধান অবলম্বন ছিল, কিন্তু জন্ বুল্ এক নূতন পথে চলিতে লাগিল। থিওডর হুকের পত্রের নামের অনুকরণে যে এই নাম রাখা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। ইহা অচিরকাল মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিল এবং কিছুদিনের মধ্যে সরকারী মুখপত্রস্বরূপ হইয়া পড়িল। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের দৃঢ় বিরোধী হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। অবশেষে যখন জে, এচ,, ষ্টকেলার সাহেব ১৮৩৩ অব্দে নামমাত্র মূল্যে ইহা ক্রয় করেন, তখন ইহার মুমূর্ষু-দশা। ষ্টকেলার সাহেবই ইহার নাম "ইংলিশম্যান্" রাখেন ও ইহাকে নব জীবন প্রদান করেন। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতৃব্য চার্লস্ থ্যাকারে ইহার অন্যতম বেতনভোগী লেখক কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে এরূপ লিপি-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় থ্যাকারে পরিবারের মধ্যে উক্ত ঔপন্যাসিকই যে একমাত্র সাহিত্য-রথী ছিলেন, এরূপ নহে। এই ইংলিশম্যান্ মুদ্রাযন্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ মেকলে তাঁহার ক্লাইভ ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি প্রথম মুদ্রিত করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর জে, ওবি, সাণ্ডার্স ইংলিশম্যানের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন। তাঁহারই পুত্র ইহার বর্ত্তমান প্রধান স্বত্বাধিকারী।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া—ইহা প্রথমতঃ "ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া" নামে মাসিক পত্রের আকারে ১৮১৮ অব্দের এপ্রেল মাসে আবির্ভূত হয়। ডাক্তার মার্শম্যান উহার উক্তরূপে নামকরণ করেন, এবং মিশনারিদিগের যত্নপ্রভাবেই ইহার জন্ম হয়। ভারতবর্ষের উন্নতি ও সংস্কার সংক্রান্ত নানা বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, লর্ড হেষ্টিংসের প্রভাবে দেশ মধ্যে যে সমস্ত নানাবিধ সভা-সমিতি উৎপন্ন হইতেছিল তাহাদের রিপোর্ট, এবং অন্যান্য দেশের বাইবেল, মিশনারি ও শিক্ষা সংক্রান্ত সমাজসমূহের কার্য্যাবলীর উল্লেখ ও সমালোচনা প্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ডাক্তার মার্শম্যান ১৮২০ অব্দের জুন মাসে ইহার এক ত্রৈমাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দেশের হিতাহিত সম্পর্কীয় বহু বিষয়ের আলোচনার জন্য ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার নিয়মিত প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। সেই জন্যই তিনি ভারত সংক্রান্ত বিষয়সমূহের প্রবন্ধ এবং ভারতের ইষ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে এরূপ যে কোন গ্রন্থ ইউরোপে বা ভারতে প্রচারিত হউক, তাহার সমালোচনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একখানি ত্রৈমাসিক পত্রের

সৃষ্টি করেন। প্রথম প্রথম কিছুকাল ইহা সতীদাহ-প্রথা নিবারণের পক্ষাবলম্বন করে, এবং মাননীয় আডাম সাহেব ইহার ঐ সমস্ত মর্ম্মভেদী প্রবন্ধ একটা বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে বলিয়া কাউন্সিলে আবেদন করিতে বাধ্য হন, কারণ উক্ত নিয়মানুসারে ঐ সময়ে, যেরূপ আলোচনায় দেশীয়দিগের মনে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে বা ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতে পারে, এরূপ আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। আডাম সাহেব ঐ আবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন যে, সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে যেন ভবিষ্যতে ঐরূপ আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস ঐ সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ আপত্তিজনক বিবেচনা না করায় তিনি আডাম সাহেবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু তিনি ডাক্তার মার্শম্যান্‌কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, সতীদাহ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র তৎকালে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। লর্ড হেষ্টিংস ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবং তাঁহার নিজ কাউন্সিলের সদস্যগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বাধা দিতেন, তিনি ভারতবর্ষে আসিবার সময় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে অতি উদার মত লইয়া আসিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসের পাঠকগণ বিদিত আছেন যে, ১৭৯৯ অব্দে যৎকালে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ সেন্সর প্রথার সৃষ্টি হয়। নিয়ম হয় যে, "প্রত্যেক প্রিন্টারকে নিজ কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় আপনার নাম সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে এবং তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার একখণ্ড অনুলিপি গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে প্রতিগমনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।" সেন্সর (পাণ্ডুলিপিপরীক্ষক) যে প্রবন্ধটি গভর্ণমেণ্টের বা সমাজের ক্ষতিকর হইতে পারে বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তিনি কলমের আঁচড়ে কাটিয়া দিতেন। এই হেতু তৎকালে সংবাদপত্রসমূহ প্রায়ই দুই একটি কলমে কেবল তারকা চিহ্নের (*) শোভা লইয়া প্রকাশিত হইত। লর্ড হেষ্টিংস তাঁহার কাউন্সিলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮১৮ অব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে কোনরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন না করিয়া উক্ত প্রকার পাণ্ডুলিপিপরীক্ষার প্রথা রহিত করিয়া দেন। সম্পাদকদিগের নিমিত্ত তিনি কতকগুলি নিয়মও বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইংল্যাণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের বিধিব্যবস্থা ও অন্যান্য কার্য্যের প্রতিকূল মন্তব্য, স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের রাজনৈতিক কার্য্যের আলোচনা, এবং কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের জজ, বা লর্ড বিশপের সরকারী কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন, দেশীয় প্রজাবর্গের মনে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ জন্মিতে পারে এরূপ ভাবের আলোচনা করা, অথবা ইংরেজী ও অন্যান্য সংবাদপত্র হইতে ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া পুনঃ প্রকাশ করা, এবং যাহাতে সমাজমধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও অনৈক্য জন্মিতে পারে, এরূপ ভাবের ব্যক্তিগত কুৎসা বা চরিত্র-সমালোচনা প্রচার করাও নিষিদ্ধ হইল। আরও বিধান হইল যে, কেহ এই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে সুপ্রীম কোর্টে

মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা অপরাধীর লাইসেন্স (অনুমতিপত্র) রহিত করিয়া তাঁহাকে ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। ফলতঃ এই সমস্ত নিয়ম এরূপ কঠোর হইয়াছিল যে, সে গুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন সমালোচনাই একেবারে অন্তর্হিত হইত। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা সাধারণতঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং ঐ সকল নিয়ম জারি হইবার পরও তাঁহারা একবার একটি ফৌজদারি মোকদ্দমা অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হন। লর্ড হেষ্টিংসও আপনার শাসনকালকে সংবাদপত্র-সম্পাদকের নির্ব্বাসনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এই সমস্ত কারণে নিয়মগুলি শীঘ্রই মৃতপ্রায় অকার্য্যকর এবং মুদ্রাযন্ত্র কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া পড়িল।

১৮৩৫ অব্দে "ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া" পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। মার্শম্যান্,ম্যাক্ ও লীচ্‌ম্যান এই তিন জন উদার ব্যক্তি ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এতৎসম্বন্ধে লিখিত আছে ;—"স্থির হয় যে, রাজনীতি অপেক্ষা এই পত্রিকা ধর্ম্মের ভাবে অধিক পরিচালিত হইবে, এবং ইহাকে ভারতের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধক বিষয়সমূহের আলোচনার যন্ত্রস্বরূপ করা হইবে। যৎকালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এইরূপ বিষয়সমূহের আলোচনা গুলিকে অতীব উদারভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন, সেই অনুকূল সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা তাঁহার শাসন কাল সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যেভাবে ইহা পরিচালিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে আপনার সন্তোষ জ্ঞাপন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মবিষয়ক নহে, অথচ সকল বিষয়েরই আলোচনা ধর্ম্মের ভাবে করিতে প্রস্তুত, এরূপ একখানি কাগজের আবির্ভাবে সর্ব্বশ্রেণীর মিশনারীরা আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি দেখা গেল, প্রথম বৎসরের অন্তে ইহার গ্রাহকসংখ্যা দুইশতের অধিক নহে।"

১৮৭৪ অব্দে (কেহ কেহ বলেন ১৮৭৫ অব্দে) রবার্ট নাইট্ সাহেব ৩০,০০০৲ টাকা মাত্র মূল্যে এই কাগজের লাভালাভের স্বত্ব ক্রয় করেন। "ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" এই নামে ইহার দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে "ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া" ইহার সহিত মিলিত হয়। ইহার বর্ত্তমান সাপ্তাহিক সংস্করণ "ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া এণ্ড ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" নামে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক রবার্ট নাইটের জীবনচরিতের আলোচনা যেমন কৌতুকাবহ, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষাবলম্বী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং বোধ হয়, পরে ভারত গভর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।* পরন্তু সবিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন

* রবর্ট নাইটের বোম্বাই জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ,—তিনি বোম্বাই টাইম্‌স্ পত্রের এক জন সাময়িক লেখক ছিলেন। ডাক্তার বুইষ্ট অবসর গ্রহণ করিলে তিনিই উহার সম্পাদক হন। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৭ বৎসরকাল তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং প্রভূত পরিশ্রম করিয়া কাগজখানিকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলেন। দেশীয় স্বত্বাধিকারীরা এবং অপরাপর যাঁহাদের উহাতে অংশ ছিল, সকলেই ১৮৬০ অব্দে উহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পাদকের নিকট উহা বিক্রয় করেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে বোম্বাই টাইম্‌স্ স্বীয় নামের

লেখক বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ষ্টেটস্‌ম্যানের সহিত সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে তিনি "ইণ্ডিয়ান একনমিষ্ট" নামক কলিকাতায় আর একখানি পত্র সম্পাদন করেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে একটি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। উহা আপোষে মিটিয়া যায়, এবং নাইট সাহেব নগদ ২০,০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ইণ্ডিয়ান একনমিষ্ট পত্রের লাভালাভের স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন। তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে সংবাদপত্র-সম্পাদনপটুতায় তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি না সন্দেহ। অর্থনীতিঘটিত বিষয়সমূহের আলোচনায় তিনি সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা, উদার সহানুভূতি ও লিপিকৌশলের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত এবং তজ্জন্য তাঁহার কাগজখানি দেশমধ্যে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ও দেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়ে। তিনি প্রকৃতই ভারতের হিতৈষী মিত্র ছিলেন। ভারতবাসীরা তৎকৃত উপকারসমূহ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এই সংবাদপত্রখানিকে নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে ইহাকে বিলক্ষণ লাভজনক কারবার করিয়া আপনার উত্তরাধিকারীদিগকে দিয়া গিয়াছেন। অধুনা ইহা ভারতের মধ্যে একখানি সমধিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্র।

পরিবর্ত্তন করিয়া "টাইমস্ অভ্ ইণ্ডিয়া" এই নাম ধারণ করে। তাঁহার সম্পাদকত্বের শেষভাগে আমেরিকার যুদ্ধজন্য তুলার বাজারে দুর্ভিক্ষ ঘটায় বোম্বাই-এর অসম্ভব অত্যদ্ভুত সমৃদ্ধি ঘটে। কোটি কোটি টাকা নগরে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই সমৃদ্ধি প্রবাহের সর্ব্বোচ্চ তরঙ্গের সময় নাইট্ সাহেব অবসর গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণ তৎকৃত মহোপকারসমূহ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে এককালীন ৭৫,০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্—জেমস্ উইল্‌সন্ সাহেবের সম্পাদকত্বকালে ইহা বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ১৮৬৪ অব্দের ১৮ই আগষ্ট ডেলি নিউস্ পুরাতন "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের সহিত মিলিত হয়। এই পত্রখানি ১৭৯৫ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাপ্তেন ফেন্উইক্ যৎকালে ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউস পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে জেমস্ উইল্‌সন্ সময়ে সময়ে সহকারি সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেন। উইল্‌সনের সহিত পার্কার নামক একজন সাহেবও ইহার স্বত্বাধিকারী হন। কিন্তু পরে উইল্‌সন্‌ই ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। প্রথমে ইহার নিজের মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। তৎকালে ইহা বেঙ্গল প্রিণ্টিং কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কিন্তু ক্রমে কাগজের উন্নতি হইলে, ইহার নিজেরই একটি মুদ্রাযন্ত্র হয়। জেমস্ উইল্‌সন্ যৎকালে এদেশ পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে তিনি একটি লিমিটেড্ কোম্পানির নিকট কারবারটি বিক্রয় করিয়া যান। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদকের নাম জে, সি, উইল্‌সন্ এবং ইহার অন্যান্য কার্য্যপরিচালনভার অধুনা একটি লিমিটেড্ কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত।

শিক্ষিত ভারতবাসীরাও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টগুলি ইউরোপীয়দিগের পরিচালিত পত্র অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে। শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ,

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব চন্দ্র সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে প্রভৃতি বাঙ্গালীরা সংবাদপত্রে লিখিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদপত্র-সম্পাদক-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" নামক পত্রের সম্পাদক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। উহা ১৮৪০ অব্দে বা তৎসমকালে প্রচারিত হয়। কথিত আছে যে, দেশীয়দিগের পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে উহাই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাশীপ্রসাদ গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসনের একজন প্রসিদ্ধ ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রামবাগানের দত্তবংশীয় ঈশানচন্দ্র দত্ত "হিন্দু পাইওনিয়ার" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। পরন্তু সে সময়ের দেশীয়-পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে প্রধান·

হিন্দু পেট্রিয়ট—পত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রাম গোপাল সান্যাল কৃত কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিতে লিখিত আছে যে, শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। বড়বাজারবাসী মধুসূদন রায় নামক এক ব্যক্তি এইরূপ একখানি পত্র প্রকাশের কল্পনা করেন। কালাকার ষ্ট্রীটে তাঁহার একটা মুদ্রাযন্ত্র ছিল। সেই যন্ত্রেই হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম সংখ্যা ১৮৫৩ অব্দে মুদ্রিত হয়। ক্রাইন্ সাহেব "রেইস্ এণ্ড রাইয়ত" পত্রের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন বৃত্তান্তে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"যে সকল সাময়িক পত্র একটি জাতির সাহিত্যিক ভাবের উন্মেষণ ঘোষণা করে, তন্মধ্যে এক খানির নাম 'বেঙ্গল রেকর্ডার', এবং তাহারই চিতাভস্ম হইতে হিন্দু পেট্রিয়টের জন্ম হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী এটিকে লোকসানের কারবার দেখিয়া ১৮৫৪ অব্দে অতি নামমাত্র মূল্যে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজের স্বত্ব বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হন। তৎকালে হরিশ্চন্দ্র ইহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত, সুতরাং তিনি ইহার ক্রেতা হইলেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার অতি গোপনে সমাহিত হইল, কারণ তাঁহার প্রভু মিলিটারি অডিটার জেনারেল আপনার অধস্তন কর্ম্মচারীকে সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইতে দিবেন এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। সুতরাং কার্য্যটা বেনামিতে হইল, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক খাড়া করা হইল। কিন্তু কাগজ সম্পাদন ও পরিচালনের সমস্ত ভার হরিশের উপর পড়িল। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক দিন কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল ; এমন কি, এক সময়ে এই দরিদ্র কেরানীকে ইহার ব্যয়সঙ্কুলনার্থ আপনার সামান্য বেতন হইতে মাসিক প্রায় ১০০৲ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইত। তিনি বীরোচিত সাহসের সহিত অটলভাবে এই ক্লেশ সহ্য করেন, এবং অবশেষে তাঁহার কাগজের উন্নতির সহিত আয়েরও সচ্ছলতা ঘটে। পরন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার পরিজনবর্গকে একটি সুন্দর সাহিত্যিক সম্পত্তির লাভভোগে বঞ্চিত হইতে হয়। অতঃপর মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ কাগজখানি ক্রয় করিয়া লন এবং অতি সামান্য অর্থ দিয়া বেনামদারের দাবি

মিটাইয়া দেন।" রামগোপাল সান্যাল লিখিয়াছেন, মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০৲ টাকায় কাগজের স্বত্ব ক্রয় করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তে উহার পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণদাস পাল, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং নবীন কৃষ্ণ বসু ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত তাঁহাদের হস্তে ইহার পরিচালন ভার প্রদান করেন। অবশেষে কৃষ্ণদাস পালই ইহার একমাত্র সম্পাদক হন। ১৮৬২ অব্দে, হিন্দু সমাজের কতিপয় প্রধান ব্যক্তির অনুরোধে, কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কাগজের পরিচালন-ভার মহারাজ রমানাথ ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, মহারাজ বাহাদুর সার যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এই কয়েকজন ট্রষ্টির হস্তে অর্পণ করেন। এই ট্রষ্ট সংক্রান্ত দলিল ১৮৬২ অব্দে লিখিত পঠিত হয়। এই সময়ে পেট্রিয়টের অতি সামান্ত আয় ছিল। তৎকালে ইহার গ্রাহক-সংখ্যা আড়াই শতের অধিক ছিল না। ১৮৬৩ অব্দে ইহার সাফল্যলাভবিষয়ে সন্দেহ অনেক পরিমাণে অপনীত হইল। এত দিন পেট্রিয়ট প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত, কিন্তু এখন হইতে সোমবারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাসের সময়ে ইহা সাপ্তাহিক ছিল, কিন্তু এক্ষণে দৈনিক হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পালের রচনার রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এন্, এন্, ঘোষ মহোদয় লিখিয়াছেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টে তাঁহার লেখায় সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, মতের উদারতা এবং তর্কশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে উচ্চ অঙ্গের লিপিকুশলতার অতি কদাচিৎ প্রকাশ পাইত।" কৃষ্ণদাস পাল বেশ সামাজিক লোক ছিলেন এবং শাসনকর্তাদিগের ও তাঁহার স্বদেশীয়দিগের এই উভয় শ্রেণীরই শ্রদ্ধা বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি দেশীয় সমাজের অনেকেরই প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। তিনি পেট্রিয়টে আপনার স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও ধীরতা অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মন প্রকৃত কার্য্যপ্রবণ ছিল। তাঁহার মনের ছায়া তাঁহার লেখায় সুপরিস্ফুট হইত। তিনি স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিলে, সে গুপ্ত কথা তিনি কখনই ব্যক্ত করিতেন না, এবং কখনও কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া কটূক্তি বর্ষণ করেন নাই। তাঁহার এই এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি অতি সহজে প্রকৃত ব্যাপার আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু নিজ মনোভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া তিনি কখনও বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিতেন না।

ইণ্ডিয়ান্ মিরর্—সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষের দেশহিতৈষিতায় ও ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে ১৮৬১ অব্দে পাক্ষিক পত্ররূপে ইহার আবির্ভাব হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনও ইহাতে লিখিতেন। কিছুদিন পরে মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিলে ইহার পরিচালনভার নরেন্দ্রনাথের হস্তে পতিত হয়। তাঁহার সুদক্ষ সম্পাদনে ইহা সাপ্তাহিক আকার ধারণ করে। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন ইহাকে দৈনিক করিবার কল্পনা করেন। অবশেষে অন্যতম বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক ও বর্ত্তমান সম্পাদকের পিতৃব্যপুত্র কৃষ্ণবিহারী সেনকে সহসম্পাদক করিয়া কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৮ অব্দে

কয়েক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ইহাই একমাত্র দেশীয় পরিচালিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র ছিল। ১৮৭৯ অব্দে নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তৎপূর্ব্বে ইহা কয়েকজনের মিলিত সম্পত্তি ছিল। কয়েক বৎসর ইহার একটি বিশেষ রবিবারের সংস্করণ বাহির হইয়াছিল; তাহাতে কেবল ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা হইত। রবিবারের কাগজখানি কৃষ্ণবিহারী সেন সম্পাদন করিতেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—ইহার জন্মস্থান যশোহর জেলা। প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতৃগণের যত্নে ইহার জন্ম হয়। তাঁহাদের জননীর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহারই নামের অনুকরণে ইহার নামকরণ হয়। ইহা প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত; তৎপরে বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত। শিশিরকুমার ঘোষ কৃত "ইণ্ডিয়ান্ স্কেচেস্" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, "লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্রের মুখরোধক আইনের যখন প্রথম সূচনা হইল ও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহ অল্পাধিক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, সেই সময়ে ঘোষ-ভ্রাতারা স্থির করিলেন যে, অতঃপর তাঁহাদের অমৃতবাজার পত্রিকা একমাত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইবে।" নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ইহা এক্ষণে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীবনসংগ্রামের সেই প্রথম অবস্থায় ইহার স্বত্বাধিকারীরা মাননীয় রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুর, মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকট যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ বা ১৮৯০ অব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরামর্শে কাগজখানিকে দৈনিকরূপে প্রকাশ করার কথা স্থির হয় এবং তাহা কার্য্যেও পরিণত হয়। তৎকালে রাজা বাহাদুর নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নানাপ্রকারে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সময়োপযোগী হইয়াছিল।*

ক্রমশঃ।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

গীতা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি-যোগ।

অর্জ্জুন :—

'যোগযুক্তভাবে হেন অনিবার
উপাসনা কৃষ্ণ! করে যে তোমার
অব্যক্ত-অক্ষরে পূজে যে আবার,
শ্রেষ্ঠ কোন্ জন এদের মাঝে॥ ১

ভগবান্ :—

মচ্চিত্ত যে জন অনন্ত-অন্তরে
শ্রদ্ধাসহ মম উপাসনা করে
যুক্ততম সেই জগৎ ভিতরে
শ্রেষ্ঠতা হে পার্থ! তাকেই সাজে॥ ২

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কৃত The Early History and Growth of Calcutta নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

আর যারা পার্থ! অচিন্ত্য অব্যক্ত
কূটস্থ অচল নিত্য সর্ব্বগত
অনির্দ্দেশ্য সেই অক্ষরে সতত
সংযত-ইন্দ্রিয় হইয়া ভবে।
সর্ব্বত্র সমান বুদ্ধিতে ভারত!
উপাসনা মোরে করেন সতত
নিখিল ভূতের হিত কার্য্যে রত
তাহারা নিশ্চিত আমায় লভে ॥ ৩—৪
অব্যক্তে আসক্ত-চিত্ত জনগণ
সমধিক ক্লেশ লভে অনুক্ষণ
অব্যক্তেতে নিষ্ঠা হে কুন্তিনন্দন!
দেহধারিগণ দুঃখেতে লভে ॥ ৫
সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পিয়া
অবিরাম যা'রা মন্নিষ্ঠ হইয়া
অনন্য ভক্তির শরণ লইয়া
ধ্যানযোগে মোরে উপাসে ভবে ॥ ৬
মরণ-সঙ্কুল সংসার-সাগর
হইতে অচিরে হে কুরুপ্রবর!
আমাতেই সদা নিবিষ্ট-অন্তর
তাহাদিগে' আমি উদ্ধার করি ॥ ৭
আমাতেই মন করহ স্থাপন
নিবেশহ মোতে বুদ্ধি অনুক্ষণ,
অন্তিমে তা'হলে হে কুন্তিনন্দন!—
লভিয়া আমায় যাইবে তরি' ॥ ৮
স্থিরভাবে যদি মোতে তব মন
নার' সমাহিতে হে কুন্তিনন্দন!
তা' হ'লে অভ্যাস-যোগে অনুক্ষণ
লভিতে আমায় সচেষ্ট হ'বে ॥ ৯
অভ্যাসেও যদি হও অসমর্থ
মম কর্ম্মপর হও তুমি পার্থ!
করিলেও কর্ম্ম সতত মদর্থ
সিদ্ধিলাভে তুমি সমর্থ হ'বে ॥ ১০
ইহাতেও যদি সামর্থ্য না হয়
লইয়া তা' হ'লে আমার আশ্রয়
ত্যজি কর্ম্মফল—সংযত-হৃদয়
হইয়া করহ কর্ম্ম এ ভবে ॥ ১১

অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ পার্থ! জ্ঞান
জ্ঞান হ'তে পুনঃ শ্রেষ্ঠতর ধ্যান
ধ্যান হ'তে কিন্তু ত্যাগই সে মহান্
যাহা হ'তে শান্তি যোগীরা লভে ॥ ১২
সবাতে অদ্বেষ্টা যে ভক্ত আমার
মিত্রভাবাপন্ন—শূন্য অহঙ্কার
মমতা-রহিত কারুণ্য-আধার
ক্ষমাশীল—সুখ-দুঃখেতে সম ॥ ১৩
সদা তুষ্ট যিনি যোগে সমাহিত
জিতেন্দ্রিয় দৃঢ়-নিশ্চয় নিশ্চিত
মন বুদ্ধি যাঁ'র আমাতে অর্পিত
প্রিয়জন তিনি সতত মম ॥ ১৪
যাঁ'হতে কেহই উদ্বেজিত নয়
অনুদ্বিগ্ন যিনি সকল সময়
বিমুক্ত-উদ্বেগ হর্ষামর্ষ ভয়
প্রিয় পার্থ! তিনি সতত মম ॥ ১৫
অনপেক্ষ শুচি দক্ষ যেই জন
গতব্যথ আর অনাসক্ত মন
সর্ব্বারম্ভত্যাগী মদ্ভক্ত সে জন
প্রিয় অতি পার্থ! সতত মম ॥ ১৬
হর্ষ-শোক-দ্বেষ নাহিক যাঁহার
নহেন যে জন দাস কামনার
শুভ ও অশুভ যাঁ'র পরিহার
হেন ভক্তিমানই প্রিয় আমার ॥ ১৭
শত্রু মিত্রে যাঁ'র নাহি ভেদজ্ঞান
মান-অপমান যাঁহার সমান
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান
সঙ্গ-বিবর্জ্জিত যে জন আর ॥ ১৮
সমজ্ঞান যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে
মত বাক্-তুষ্ট—যদৃচ্ছা প্রাপ্তিতে
স্থিরচেতা অনাসক্ত গৃহাদিতে
হেন ভক্তিমানই আমার প্রিয় ॥ ১৯
যাঁহারা এযুক্ত মুক্তির সাধন
হেন ধর্ম্ম পার্থ! মৎপরায়ণ
হইয়া শ্রদ্ধায় করে আচরণ
সে ভক্তেরা মম অতীব প্রিয় ॥ ২০

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ।

অর্জ্জুন ঃ—

সম্বোধি কেশবে কহিলা কৌন্তেয়
প্রকৃতি-পুরুষ-ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞেয়
ক্ষেত্র-জ্ঞান কা'রে কহে হে বার্ষ্ণেয়
জানিতে এ তত্ত্ব বাসনা মনে॥

কহিলা কেশব ;—হে কুন্তিনন্দন!
কহেন দেহকে "ক্ষেত্র" বুধগণ
দেহতত্ত্ব যিনি অবগত হ'ন
"ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া জানিবে তাঁর॥ ১

সর্ব্বক্ষেত্রে তুমি আমাকে সতত
"ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া হ'বে অবগত
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান ভারত!
মোর মতে শ্রেষ্ঠ জানিবে তা'য়॥ ২

হয়ে সেই "ক্ষেত্র" পার্থ! কি প্রকার
কে কারণ তা'র কিরূপ বিকার
কিবা সে "ক্ষেত্রজ্ঞ" কি প্রভাব তা'র
সজ্ঞেপে তোমায় কহি তা' এবে॥ ৩

নানাবিধ ছন্দে হে কুন্তিনন্দন!
ব্রহ্মসূত্র পদে তাহা ঋষিগণ
করেছেন বহু মতেতে কীর্ত্তন
হেতুযুক্ত বহু সিদ্ধান্ত ভাবে॥ ৪

ক্ষিতি-অপ্-তেজ-বায়ু ব্যোম আর
দশেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার
অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়-গোচর সবার
তন্মাত্র* পঞ্চক—এ কয় তত্ত্ব॥ ৫

বাসনা-বিদ্বেষ-সুখ-দুঃখ আর
শরীর-চেতনা-শক্তি—ধারণার
প্রকার সপ্তক এই সবিকার
ক্ষেত্রের রহস্য হইল উক্ত॥ ৬

অমানিত্ব আর দম্ভ-বিহীনতা
অহিংসা-স্বভাব ক্ষান্তি সরলতা।
শৌচ-গুরু সেবা চিত্তের স্থিরতা
আর অবিরাম আত্ম-দমন॥ ৭

বৈরাগ্য হে পার্থ! বিষয় মাত্রেতে
অহঙ্কার পরিশূন্যতা মনেতে
জন্ম-মৃত্যু জরা আর সে রোগেতে
দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন॥ ৮

আসক্তি-শূন্যতা পুত্র দারাদিতে
তাহাদের সুখ অথবা দুঃখেতে
"আমি সুখী" "দুঃখী" না ভাবা মনেতে
ইষ্টানিষ্ট পাতে সমতা আর—॥ ৯

আমাতে হে পার্থ! অনন্য যোগেতে
অব্যভিচারিণী-ভক্তি অন্তরেতে
অবস্থান সদা নির্ব্বাণ-স্থানেতে
জনসমাজের প্রতি বিকার॥ ১০

অধ্যাত্ম-জ্ঞানের নিত্যত্ব বিজয়!
তত্ত্বজ্ঞান হেতু যেই দৃষ্টি হয়
জ্ঞান ব'লে উক্ত সেই সমুদয়
উহা ছাড়া সব অজ্ঞান আর॥ ১১

জ্ঞেয় তত্ত্ব এবে করিব বর্ণন
জ্ঞানেতে যাহার মোক্ষ-সংঘটন
অনাদি ও মদাশ্রিত তিনি হ'ন
সদসদাতীত সবার সার॥ ১২

সর্ব্বদিকে তাঁ'র কর ও চরণ
সর্ব্বত্রই তাঁ'র শির ও নয়ন
সর্ব্বত্রই তাঁ'র শ্রুতি ও বদন
সর্ব্বভূতে নিত্য ব্যাপিয়া তিনি॥ ১৩

নিখিল ইন্দ্রিয় গুণসমন্বিত
নিখিল ইন্দ্রিয় হে পার্থ! বর্জ্জিত
সর্ব্বভূত সদা আসক্তিরহিত
সগুণ আবার নির্গুণ(ও) তিনি॥ ১৪

চরাচর সব ভূতের ভারত!
অন্তরে বাহিরে ইনি অবিরত
দুর্ব্বিজ্ঞেয় তিনি সূক্ষ্মতঃ বশতঃ
সমীপে জানীর—মূঢ়ের দূরে॥ ১৫

* রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র।

অবিভক্ত ইনি হ'য়েও ভারত!
ভূতগণ মাঝে বিভক্তের মত
অনুভূত যেন হ'ন অবিরত
সৃষ্টি স্থিতি লয় জানিও এঁ'রে॥ ১৬

প্রকাশক জ্যোতিগণেরও সে জন
নিখিল-আঁধার হ'তে দূরে র'ন
জ্ঞান-জ্ঞেয় তিনি হে কুন্তিনন্দন
জ্ঞান গম্য আর সবাতে স্থিত॥ ১৭

"ক্ষেত্র" "জ্ঞান" "জ্ঞেয়" হে কুন্তিনন্দন
সঙ্ক্ষেপতঃ আমি করিনু কীর্ত্তন
জ্ঞাত হ'য়ে ইহা মম ভক্তগণ
লভেন আমার ভাব নিশ্চিত॥ ১৮

প্রকৃতি-পুরুষ দুয়েরে ভারত!
অনাদি বলিয়া হ'বে অবগত
গুণরাশি আর বিকার তাবত
প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়॥ ১৯

কার্য্য ও কারণ কর্ত্তৃত্বেতে আর
প্রকৃতিই হেতু হে কুন্তিকুমার!
সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে আবার
পুরুষই কারণ কথিত হয়॥ ২০

প্রকৃতিস্থ জীব হে কুন্তিনন্দন!
ভুঞ্জেন প্রাকৃত গুণ অনুক্ষণ
সে গুণের সহ সঙ্গনিবন্ধন
যোনী* ভেদে তাঁর জনম হয়॥ ২১

অনুমন্তা তিনি সাক্ষী মাত্র আর
ভর্ত্তা-ভোক্তা শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব দেবতার
পরমাত্মা রূপে তিনি অনিবার
র'ন বিরাজিত দেহে বিজয়!॥ ২২

এরূপে পুরুষে প্রকৃতিকে আর—
গুণ সহ যেই জানে অনিবার
নহে জাত সেই ভবে বারবার—
হইলেও সব কর্ম্মেতে রত॥ ২৩

ধ্যান-যোগে কেহ হে কুন্তিনন্দন!
করে আপনায় আত্ম-দরশন
সাংখ্য-যোগে পুনঃ হেরে কোন জন
হেরে কেহ কর্ম্ম-যোগেতে রত॥ ২৪

হেনরূপে অন্যে না জানি আমায়
লভি উপদেশ ভজেন তাঁহায়
শ্রুতিপরায়ণ তাঁরাও ধরায়
অনায়াসে মৃত্যু লঙ্ঘন করে॥ ২৫

স্থাবর জঙ্গম পদার্থ-নিচয়
জনমে যা' কিছু হে কুন্তিতনয়!
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে তাহা হয়
বিনশ্বর এই বিশ্ব ভিতরে॥ ২৬

ধ্বংসশীল যত ভূতের ভিতরে
সমভাবে স্থিত পরম ঈশ্বরে
অনশ্বর যেই দরশন করে
তত্ত্বদর্শী পার্থ! সে জন ভবে॥ ২৭

সর্ব্বত্র সমান ভাবে অবস্থিত
ঈশ্বরে নিরখি হ'য়ে তৃপ্তচিত
না করে কভু সে আত্মাকে পাতিত
শ্রেষ্ঠ গতি তাই অন্তিমে লভে॥ ২৮

"সমুদয় কর্ম্ম প্রকৃতিই করে"
যে বিবেকী ইহা বুঝিয়া অন্তরে
অকর্ত্তা বলিয়া বুঝেন আত্মারে
তিনিই সম্যক্ দর্শী এ ভবে॥ ২৯

ভূতগত ভিন্ন ভাব অনিবার—
হেরে যে আত্মায়—তাঁ হ'তে আবার
নিরখয়ে সব ভূতের বিস্তার
ব্রহ্মলাভ তাঁর নিশ্চয় হ'বে॥ ৩০

এই পরমাত্মা হে কুন্তিনন্দন!
যদিও এ দেহে স্থিত অনুক্ষণ,
না করেন কিছু কিংবা লিপ্ত নন
অনাদি অব্যয় নির্গুণ ব'লে॥ ৩১

হ'য়েও আকাশ যথা সর্ব্বগত
লিপ্ত না কিছুতে সূক্ষ্মত্ব বশতঃ
দেহে-স্থিত আত্মা তথা অবিরত
লিপ্ত না কিছুতে নির্গুণ বলে॥ ৩২

* সদসৎ যোনীবিশেষে।

যথা একমাত্র সূর্য্য ধনঞ্জয়!
করে প্রকাশিত লোক সমুদয়
ক্ষেত্রবেত্তা জীবও সকল সময়
ক্ষেত্র সব তথা প্রকাশ করে॥ ৩৩

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই ভেদজ্ঞান
পুনঃ প্রাকৃতিক ভূতের নির্ব্বাণ
জ্ঞান-আঁখি বলে জ্ঞাত যে ধীমান্!
লভে ব্রহ্মপদ সে জন পরে॥ ৩৪

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী।

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত কায়রো নগরের আল্ অজ্হর্ নামধেয় সুপরিচিত বিরাট বিদ্যামন্দির পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়। এই অত্যদ্ভুত বিদ্যামন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ, আমি কতিপয় বর্ষ কাল পূর্ব্বে কলিকাতার "ভারতী" পত্রিকায় এবং বোম্বা-ইয়ের "টাইম্স্ অব ইণ্ডিয়া" সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা আমার "প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আরও নব নব বিষয় সংযুক্ত হইয়া বিপুলাকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আল্ অজ্হর্ নানা কারণে বিদ্বজ্জনগণ সমাজে প্রকৃষ্ট প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত তুলনায় ইহা অপকৃষ্ট। বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা মহাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির। ইংলণ্ডের শিক্ষা-প্রণালী আমেরিকা হইতে শতাধিক নিম্নতর স্তরে অবস্থিত; অধিক কি, যে জর্ম্মনি দেশের শিক্ষা-প্রণালীর কথা লইয়া জর্ম্মণ-সন্তানগণ পুরাকাল হইতে গর্ব্বান্ধ হইয়া থাকেন, যাঁহারা সংস্কৃত, আরব্য, প্রাকৃত প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষাসমূহের উপরেও অসাধারণ অধিকার অর্জ্জন করিয়া "অজিত পণ্ডিত" উপাধি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না, তথাকার শিক্ষাপ্রথাও আমেরিকা হইতে নিকৃষ্টতর। ইংলণ্ডের বিদ্যা-শিক্ষা-প্রণালী জর্ম্মনী হইতে নিম্নতর। নিরপেক্ষভাবে কহিতে হইলে, আমেরিকা দেশই বর্ত্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রথায় পৃথিবীর সর্ব্ব দেশকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, রসায়ণ, চিকিৎসা, পূর্ত্তকার্য্য, ভাস্কর্য্য, সংগীত-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণিতত্ব, অর্থব্যবহার, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, ইতিহাস, প্রত্নতত্ব প্রভৃতি যে কোন গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে, আমেরিকা মহাদেশের লোকেরা অমিত অধ্যবসায়, অসাধারণ শ্রমপটুতা, অত্যদ্ভুত উদ্যম, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষিতা এবং সদা প্রশংসনীয় স্বয়ম্ভূসমুত্থানশক্তিগুণে মানব-জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়েই অসামান্য অধিকার অর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, পর্টুগাল, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, রুসিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও যশস্বী মানবসমাজে যতটা জ্ঞানরত্ন বিদ্যমান আছে, তাহার সমুদয় একত্র করিলে যে জ্ঞানসমষ্টি দেখা যায়, অধুনাতন আমেরিকা মহাদেশে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানরাশিকে বিদ্যমান দেখিতে পাই। অতি অল্প কাল মধ্যে এমন অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বিদ্যোন্নতি এবং ধনাগম-প্রথা, পৃথিবীর আর কোন দেশে বা আর কোন জাতিতে কখন

হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকা নানা বিষয়ে ও নানা কারণে আদর্শ মহাদেশ। মুসলমানেরা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বকাল হইতে শিক্ষা ও দীক্ষার সম্যক্‌প্রকারে আলোচনা করিয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্ত পৃথিবীর বহু জনপদে বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, শিল্পাগার, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মুসলমান সন্তানেরা শিক্ষা-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া মুসলমানেরা যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, আমেরিকার লোকেরা অতি অল্পকাল মধ্যে তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান অপেক্ষা আমেরিকার লোকেরা সকল বিষয়েই শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর। মুসলমানের শিক্ষাপ্রণালীতে হৃদয় বা মস্তিষ্ক নাই (Neither heart nor brain); আমেরিকার শিক্ষাপ্রথায় হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই দুইটিই বিদ্যমান আছে। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী স্বাস্থ্যসুখভোগী সুঠামদেহী যুবকের যৌবন; মুসলমানের শিক্ষা-প্রণালী শয্যাশায়ী, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, মহারুগ্ন বালকের জীর্ণ শীর্ণ কদাকার দেহমাত্র। সুতরাং আমরা মুসলমানের শিক্ষা-প্রণালীকে কখনই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, কেবল খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব (Theology) শিক্ষা দিবার জন্ত, সমগ্র আমেরিকায় ৬৮৭টা স্কুল এবং ৫৯টা কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিদ্যামন্দিরে কেবল তদ্দেশীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়; অবান্তরভাবে অন্ত দেশীয় ধর্ম্মের আলোচনাও হইয়া থাকে। দেশরক্ষার জন্ত সমরবিদ্যার সাধনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সুতরাং আমেরিকায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্ত ৩১টা কলেজ আছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সঙ্গীত বিদ্যা শিখাইবার জন্ত ১২৪টা বিদ্যামন্দির; শারীরিক উন্নতির জন্ত ব্যায়াম-কলেজ প্রায় দুই শত; পাকপ্রণালী শিখাইবার জন্ত একশতাধিক উচ্চশ্রেণীর স্কুল; ফুল, ফল, তরু, লতা, উদ্যান প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্ত চতুর্দ্দশটি কলেজ; বক্তৃতা শিক্ষা দিবার জন্ত ৬৭টা কলেজ এবং কেবল রাজনীতি শিখাইবার জন্য অর্দ্ধ শতাধিক বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন কত প্রকারের কত যে কলেজ ও স্কুল আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও দীক্ষা-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কৃষিঘটিত সর্ব্ব বিষয়েই এখন মার্কিণ অদ্বিতীয়। ইউরোপের ফরাসী দেশ কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম পারদর্শী দেশ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ফরাসী, বিলাত, বেলজিয়ম, হলন্দ প্রভৃতি দেশ আমেরিকা হইতে এ বিষয়ে নিকৃষ্ট। মার্কিণ রাজ্যের কৃষি কলেজ দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স রাজ্যের পঞ্চাল্লিশটি প্রদেশে ৪৫টি বিরাট বিশ্বস্তর কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। যেরূপ কলেজ, সেইরূপ কলেজ-ভবন, সেইরূপ কলেজ-প্রাঙ্গণ, সেইরূপ পুস্তকালয় এবং তদনুরূপ ধনসম্বল। এক একটা কলেজে এক বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। জেলায় জেলায় নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে কত যে কৃষি-বিদ্যালয় আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুষা প্রভৃতি কৃষি কলেজগুলিকে যদি আমেরিকার কৃষি-কলেজের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে পাঠক বুঝিবেন, পুষা কলেজ খদ্যোত, আমেরিকার কলেজ মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড; পুষা কলেজ কদলীগাছের ভেলা, আর আমে-

রিকার অলেজ বিশাল বারিধির বিরাট জাহাজ॥

কৃষিঘটিত জ্ঞানবিস্তারে মার্কিণ দেশ অদ্বিতীয়; কৃষিঘটিত প্রাত্যহিক সমাচার বিতরণে মার্কিণ অদ্বিতীয় অপেক্ষাও অদ্বিতীয়। আমেরিকা রাজ্যের সংবাদবিতরণ-ব্যবস্থা দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। রাজ্যের ৮ কোটি লোকের ভিতর এমন একটি লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি প্রত্যহ সরকারী সংবাদে কৃষির অবস্থা, শস্যের অবস্থা, বৃষ্টিবায়ুর অবস্থা, আমদানী-রপ্তানীর অবস্থা, সঞ্চিত শস্য বা শস্যভাণ্ডারের অবস্থা জানিতে না পারেন। কৃষকদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা প্রত্যহ ১২ ঘণ্টায় ২৪ বার কৃষিঘটিত বিবরণ-পত্র হাতে পাইয়া থাকেন। এই সকল বিবরণ-পত্রিকায় কেবল মার্কিণ রাজ্যের শস্যবৃষ্ট্যাদিঘটিত অবস্থা বিবৃত হয় এমন নহে, সমগ্র জগতের অবস্থা পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়া থাকে। তারযোগে প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর সমুদয় দেশ হইতে প্রয়োজনীয় ঘটনা সমূহ আমেরিকায় প্রেরিত হয় এবং এতাদৃশ সমাচারপ্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও বণিক্-সভা কর্তৃক বিশেষ বন্দোবস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বন্দোবস্তের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ভারতবর্ষীয় পুরাণশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, অতি প্রাচীনকালে হিন্দু-সন্তানগণ আমেরিকা মহাদেশে গমনাগমন করিতেন; সুদূর আমেরিকা তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত বা অপরিচিত ছিল না। পরিব্রাজক-কেশরী কলম্বস কিংবা নাবিককুলগৌরব কাপ্তেন আমেরিগো যখন আমেরিকায় সর্ব্ব প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন এই দেশে অসভ্য, অশিক্ষিত, বর্ব্বর, দুর্দ্দান্ত ও নরঘাতী রাক্ষসসমতুল্য মানবদেহধারী জীবপুঞ্জের বসতি ছিল। এখন সেই আমেরিকা বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, সাহস, ঐশ্বর্য্য, স্বাধীনতা, প্রভুত্ব প্রভৃতিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর "দিগ্বিজয়ী বরপুত্র" বলিয়া পরিগণিত। এই অসাধারণ উন্নতি অধিক কালের নহে; অল্পকাল মধ্যে আমেরিকার এই অত্যদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বা যে জাতি অথবা যে দেশের ভাগ্যে ভগবানের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ থাকে, তাহার উন্নতি একদিনেই (স্বল্প কালেই) সাধিত হয়। উন্নতি, উন্নতিরই অনুগামী। আর যাহার অদৃষ্টে অগ্নি লাগে, তাহা ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিলেও এক অহোরাত্র মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়, কারণ অধঃপতন অধঃ-পতনের অনুগামী।" ধর্ম্ম ভিন্ন স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। এই মহা প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্ম্ম আমেরিকার অধিবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে; তাহাতেই আমেরিকার শ্রী-বৃদ্ধির ও সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকেরা ধর্ম্মের ভাণ করিলেও প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং বৃটিশ জাতির উন্নতি সদা সর্ব্বদা নলিনীদলগত জল-বৎ তরল এবং স্ত্রীলোকের যৌবনের ন্যায় চঞ্চল। আফ্রিকার আল্ অজহর নামধেয় জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানজাতির মহাগৌরব ও মহাসৌরভের অতীব উৎকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু মুসলমানের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালীর মধ্যে কুসংস্কার-কালিমা এবং অনুদারতার আবর্জ্জনা এত অধিক যে, উন্নত ও উদার মানবসমাজে তাহা কখনই আদর্শ শিক্ষা-প্রথা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

নিউ ইয়র্ক নগর হইতে প্রায় সার্দ্ধৈক শত ক্রোশ অন্তরে ইথিকা নগরী মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ করণেল বিশ্ববিদ্যালয় (Cornell University) দর্শন করিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান

থাকিতে হয়। আমেরিকাবাসীদিগের ধন-বল ও বিদ্যোৎসাহিতার ইহা অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই বিরাট ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যা-মন্দিরের ইতিবৃত্ত শ্রবণ বা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রায় চল্লিশ বর্ষকাল পূর্ব্বে এজ্‌রা করণেল নামে আমেরিকার এক কৃষক ছিল। একদা এ ব্যক্তি অতিরিক্ত হলচালনায় ক্লান্তিবোধ করিয়া শান্তি লাভের জন্য এক বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, "কৃষিবিদ্যাশিক্ষার জন্য এক মহা আদর্শ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। আমাদের পল্লীতে এরূপ বিদ্যালয় নাই; অন্যান্য বিদ্যাগারসমূহ অধিক দূরে অবস্থিত, সুতরাং এই পল্লীতেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।" ইহার দুই সপ্তাহকাল পরে একদিন এই দরিদ্র কৃষক বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, কেবল কৃষি-শিক্ষার জন্য আদর্শ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যথেষ্ট হইবে না, পরন্তু এমন একটি মহা আদর্শ-বিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক, যাহাতে মানববিদিত সমুদয় বিদ্যার আদর্শ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, কৃষক এজ্‌রা করণালের মনোবাঞ্ছা তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই দরিদ্র ও একদা অপরিচিত কৃষকের যত্নে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, অকৃত্রিম দেশহিতৈষিতায়, পরকল্যাণকামনায় এবং সাধু ব্যবহারে ইথিকানগরস্থ কর্ণেল বিশ্ববিদ্যামন্দিরের প্রকাণ্ড চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া সগৌরবে নগরীর শোভাবর্দ্ধন, আমেনিকার বিদ্যোৎসাহিতা গুণের প্রশংসা কীর্ত্তন এবং এজ্‌রা করণেল সাহেবের অমরত্ব ঘোষণ করিতেছে। এই বিরাট বিশ্ববিদ্যামন্দির বিংশ অংশে বিভক্ত; এক একটা অংশ এক একটা বিপুলাকার অট্টালিকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সম্পত্তির মূল্য সার্দ্ধ চারি কোটি টাকা। বার্ষিক আয় চল্লিশ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা। তিন লক্ষ ত্রিশ সহস্র পুস্তক এই বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে; পৃথিবীর অতি পুরাকালের অনেক দুর্লভ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া এখানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে; কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানে সবিশেষ যত্ন করা হয়, তজ্জন্য অতীব উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা আছে।

অনন্তর আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠ করুন। কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যা-মন্দিরের নাম "লিলাণ্ড ষ্টাণ্ডার্ড ইউনিভার-সিটি," ইহার সম্পত্তির মূল্য দশ কোটি রৌপ্য মুদ্রা। দুঃখের বিষয়, অতি অল্প দিন গত হইল, প্রবল ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্যামন্দির হইতে একাল পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ সহস্র বিখ্যাত পণ্ডিত নিঃসৃত হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা স্থানে নানা বিবরিণী বিদ্যার শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিদ্বানের সংখ্যার সীমা নাই। ইউরোপের প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শত সমরকুশল সেনাপতি এবং প্রায় এক সহস্রাধিক অতুলনীয় বীরবর এই বিশ্ববিদ্যামন্দিরে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলম্বিয়া, ইয়েল ও হার্‌ওয়ার্ড নগরত্রয়ের বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ধনবান্, তেমনি বিদ্যাবিভবে গৌরবান্বিত। আমেরিকার বিদ্যামন্দিরসমূহের ধনের সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল নিউইয়র্ক নগরের বালকবালিকাদিগের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে; আবশ্যক হইলে অধিক টাকা ব্যয় করিতে প্রজাপুঞ্জ বা তথাকার রাজা অসমর্থ বা সঙ্কুচিত হন না। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে

পাইবেন, ইহাদের অধিকাংশ তথাকার ধনবান্ ও বিদ্যোৎসাহী লোকদিগের প্রদত্ত অর্থে বা সম্পত্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে; রাজা বা রাজকীয় কোষের সহিত সম্পর্ক থাকে না। আমাদের হতভাগ্য বঙ্গদেশের ধনবান্ জমিদারগণ অথবা অন্য প্রকারের ঐশ্বর্য্যশালী "বড় লোক"গণ আমেরিকা দেশের বিদ্যোন্নতির এই অসাধারণ অবস্থা আলোচনা করিয়া তদ্দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের চরিত্র, স্বভাব, দেশহিতৈষিতা, বিদ্যোৎসাহ, ধনের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি অনুকরণ করিলে বাঙ্গালা দেশ এত দিনে "সোনার বাংলা" হইয়া যাইত।

বর্ত্তমান বৎসরে ইথিকা নগরীর করণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ষোড়শ জন আসিয়াবাসী বিদ্যার্থী নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহার মধ্যে ছয় জন ভারতবর্ষবাসী। এই ছয় জনের মধ্যে একজন কৃষিবিদ্যার্থী, ইহাদের চারি জন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারী এবং একজন কলিকাতার কৃষি-বিজ্ঞান সভার সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্র। অবশিষ্ট এক জন মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবা, তাঁহার নাম প্রভাকর সদাশিব শ্রোত্রী। এই অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও প্রতিভশালী ছাত্র, একটি বন্ধুর নিকট হইতে কেবল চারি শত টাকা মাত্র দান প্রাপ্ত হইয়া, ভগবানের উপরে ভরসা করিয়া, আমেরিকা গমন করেন; তদ্দেশে উপনীত হইয়া দেখেন, তাঁহার নিকটে আর এক দিনের আহার্য্য দ্রব্যের মূল্যও নাই। এই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক মহারাষ্ট্র যুবা অসামান্য অধ্যবসায়, অমিত পরিশ্রমপরায়ণতা এবং সাধু স্বভাবগুণে একাল পর্য্যন্ত নিজের সমুদয় প্রকার খরচ যোগাইয়া আসিতেছেন। ধন্য প্রভাকর!

আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাপ্রণালীর সহায়তায় ছাত্রেরা আত্মনির্ভর, সদাচারী, ঈশ্বরভক্ত, পরোপকারী, বিনয়ী এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া থাকে। ভারতের বিশেষতঃ হতভাগ্য বঙ্গদেশের—ইংরাজি স্কুলের ছাত্রগণ যেমন দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্দান্ত, কদাচারী, অবিনয়ী ও গঞ্জভুক্ত কপিত্থবৎ অসার হয়, আমেরিকার ছাত্রগণ সেরূপ হয় না। বঙ্গদেশের মেডিকেল কলেজের ছাত্র প্রায়ই নাস্তিক হইয়া উঠে, ইহারা যেমন কুস্বভাবসম্পন্ন, তেমনি অসদাচারী। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন ভয়ানক দুষ্ট, ইহাদের আদৌ চরিত্রবল নাই। ইহাদের দেহে হৃদয় বা মস্তকে মস্তিষ্কের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর গুণে তথাকার মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর এ দেশের লক্ষ্মীছাড়া যুবারা পিতামাতাকে মানে না, ভগবানে বিশ্বাস করে না, গুরু বা ব্রাহ্মণের সম্মান করে না, দেশ বা সমাজ অথবা জাতির সহিত বিচ্ছিন্ন হয় এবং অতি অল্প বয়স হইতেই মিথ্যা কথা, সুরাপান, গাঁজা, সিদ্ধির ব্যবহার, চা ও কাফির শ্রাদ্ধ, পরনিন্দা, কুস্বভাব, অসচ্চরিত্রতা, ধর্ম্মহীনতা, অবিনয়, অভদ্রতা প্রভৃতি চূড়ান্তরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে। মার্কিন দেশের যে কোন স্কুল বা কলেজে যে কোন প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করা যাউক, অধ্যাপকেরা সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যার্থীদিগের সুনীতিপরায়ণতা ও স্বভাব-চরিত্র এবং আচারব্যবহারের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। অল্পমাত্র লেখা পড়া শিখিয়া যে সকল ছাত্র তদ্দেশে টাইপ রাইটাং অথবা সর্টহাণ্ড শিক্ষা করে, তাহাদিগেরও স্বভাব ও চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় এবং যাহাতে তাহারা সমাজের অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র ত্রুটি করা হয় না। বঙ্গদেশে যে সকল অবঃসারশূন্য যুবক, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-

নয় হইতে তাড়িত অথবা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অবশেষে সর্ট হ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটীং শিখিতে যায়, তাহাদের শতকরা ৯৯ জনকে আমরা আমাদের সমাজের কলঙ্ক বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ এই যে, এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বভাব সম্বন্ধে আদৌ অনুসন্ধান করা হয় না। কেবল এই প্রকার স্কুলে যে চরিত্রের অনুসন্ধান করা হয় না তাহা নহে, বস্তুতঃ কোথাও হয় না। এদেশে স্কুলের ভিতরে কিংবা স্কুলের বাহিরে, ঘরে কিংবা গৃহসীমার বহির্দ্দেশে, গৃহস্থ নরনারীর দ্বারা অথবা শিক্ষকবর্গ দ্বারা, অথবা অন্য কাহারও দ্বারা স্বদেশীয় ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে উৎকর্ষ বিধান হয় না। এ দেশের সর্ট হ্যাণ্ড স্কুলের অনেক ছেলে যেন ভাগলপুরের আস্ত গরু অথবা কোচবিহারের কচুবনের কুম্বরসম্পন্ন "কটাহ" নামক বিকট কীট!

আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর একটা চমৎকার বিশেষত্ব এই যে, এখানে শিক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সহৃদয়তা প্রদর্শিত হয়, অন্য কোন দেশে তাহা হয় না। আমেরিকায় প্রকৃত কার্য্যকরী জ্ঞানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি; কণ্ঠস্থ বিদ্যা বা গ্রন্থগত জ্ঞানের জন্য বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে পিতাপুত্রের ঘনিষ্ঠ স্নেহময় সম্বন্ধ থাকে; শিক্ষকেরা ছাত্রগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চপদস্থ ভাবিয়া বিদ্যার্থিবৃন্দকে কখন উপেক্ষা করেন না। ছাত্রেরা শিক্ষকগণকে যেন সমপাঠী বলিয়া জ্ঞান করে। দেশহিতৈষিতা, আত্মনির্ভরতা, ভগবদ্ভক্তি, পরিশ্রমপরায়ণতা, স্বার্থত্যাগ, কার্য্যকরী বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, বিনয়, প্রভৃতি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান নীতি। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত আছে। বিদেশী ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষিত আচার্য্য, অধ্যাপক ও উপাধ্যায়গণ যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড দেশে তাহা দেখা যায় না; বঙ্গদেশে ইহা স্বপ্নের অতীত; এখানে স্কুল কলেজেও 'নেটিব' 'নিগার' উপাধির অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে নামক এক বাঙ্গালী ছাত্র আমেরিকার 'করণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে' এম্, এ, উপাধি লাভ করিয়া, কৃষিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক "কশ্মপলিটান ক্লব" নামক সভার সহকারী সভাপতির পদে বরিত হইয়াছেন। মেদিনীপুর ও কলিকাতা হইতে এই সভার জন্য কিছু টাকা সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—"আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর সহিত তুলনায় ভারতের ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী অতীব নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে বিদ্যার্থীরা প্রকৃত মানুষ হইয়া আইসে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার হইয়া নিঃসৃত হয়। বঙ্গের ইংরাজি স্কুল ও কলেজের বাবু যুবকেরা আরও অসার, আরও কদাচারী।"

আমেরিকার অধিবাসীরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তথাকার পণ্ডিতেরা ও জনসাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যসমূহ অবশ্য পরিচালিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহারা বিদেশীয় ছাত্রদিগের ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন না। আমেরিকার ধর্ম্ম-কলেজসমূহে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মের আলোচনা করা হয়; ছাত্রেরা স্বধর্ম্ম ভিন্ন পরকীয় ধর্ম্মসমূহেও জ্ঞান লাভ

করিতে পারে। ইংলণ্ডের পণ্ডিত ও ইংলণ্ডের লোকদিগের স্থায় আমেরিকা দেশ কুসংস্কারসম্পন্ন ও অনুদার নহেন। শিকাগো নগরের "পার্লামেণ্ট অব রিলিজন" ইহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ কর্তৃক আমেরিকার নানা স্থানে বিশেষতঃ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো নগরে বেদান্তসভা-স্থাপন ও বেদান্ত চর্চ্চা এবং তদ্বিষয়ে উপদেশদান ইহার অন্যতম বিশিষ্ট প্রমাণ। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার আর একটা চমৎকার প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ড যতটা বিলাসী এবং যতটা ঘোরতর সাংসারিক ও স্বার্থপর, আমেরিকা ততটা নহে। ইংলণ্ডের নীতি এইরূপ—"সঙ্গে যদি টাকা থাকে, তবে ইংলণ্ডে বাস কর এবং সুখে বিচরণ কর, নতুবা মরিয়া যাও; তোমার মুখে কেহ এক বিন্দু জলও দিবে না। যদি ভিক্ষা দ্বারা গৃহস্থকে বিরক্ত কর, জেলখানা আছে, আইন আছে, তোমাকে কারাগারে যাইতে হইবে। বাবুগিরির দ্বারা যদি স্ত্রীলোক ও পুরুষের মোহ উৎপাদন করিতে পার, যদি খুব ধুমধামে পোষাক পরিয়া হরিঘোষের গোয়ালের কর্তার স্থায় টাকা ছড়াইতে পার, তাহা হইলে ইংলণ্ডে তুমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে, নতুবা মরিয়া গেলেও কেহ তোমার দিকে চোক চাহিয়া দেখিবে না।" এইরূপ ইংলণ্ডের সমাজ! ধর্ম্মের শৌথিলতা, বাবুগিরি, ধুমধাম, জাঁক জমক, বিলাস, বৃথা নবাবী প্রভৃতিতে ইংলণ্ড এত ব্যতিব্যস্ত যে প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্বে দৃষ্টিপাত করিবার ইহার আদৌ অবকাশ নাই। ধর্ম্ম একটা ভাণ; বাইবেল একটা বাঁধা বুলি। স্বার্থে আঘাত পড়িলেই ধর্ম্ম আর ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা ধর্ম্মনীতি একেবারে উঠাইয়া যায়। ইংলণ্ডের পাদ্রী অপেক্ষা আমেরিকার পাদ্রী শ্রেষ্ঠতর; তবে ভারতবর্ষে আসিয়া মার্কিন মুলুকের অনেকগুলা পাদ্রী যে অমানুষত্ব দেখায়, তাহা কেবল ভারতবাসী বিলাতী পাদ্রীর সংসর্গদোষে জন্মে, অথবা ইতর বংশের লোককে পাদ্রী করিয়া যিশু নাম প্রচার করার জন্ত প্রেরণ করা হয়। নিয়ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা, মন্ত ও মাংস সেবায় প্রবৃত্তি, ব্যভিচারে অনুরাগ, স্ত্রীলোকের মনস্তুষ্টির জন্ত যত্ন, পশুহত্যা, শিকার, বিবিধ প্রকার তমগুণোৎপাদক ক্রীড়া ও আহার, নিজের তামসিক বৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার জন্ত পরিশ্রমস্বীকার প্রভৃতিতে ইংলণ্ড সদাসর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিবৃন্দ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রায় অদ্ভুত ধরণের হইয়া থাকে; বিলাতপ্রত্যাগত অনেক বঙ্গীয় যুবক ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এই অকালকুষ্মাণ্ডগণের বর্ণনা না করাই ভাল। আমেরিকায় তাহা নহে, আমেরিকায় দয়া ধর্ম্ম বদান্ততা প্রভৃতি আছে। পকেটে পয়সা না থাকিলে ভারতবর্ষীয় ছাত্র বুদ্ধি, বিনয় এবং চরিত্রবলে আমেরিকায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, বিলাসী বিলাতে তাহা হয় না, এখানে স্বার্থপরতা ঘোরতররূপে প্রবল। জাপানেও নানা কারণে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আমেরিকায় আমাদের পূর্ণ সুবিধার যথেষ্ট উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমেরিকা একণে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-বিদ্যামন্দির ও কর্ম্মক্ষেত্র। আমার বিবেচনায় ইংলণ্ডে না যাইয়া আমাদের দেশের বিদেশগমনেচ্ছু যুবকদিগের পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ আমেরিকায় গমন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

গ্রহণীর স্থান কোথায় ?

অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী নাড়ীকে গ্রহণী কহে। এই অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী নাড়ী অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী হইয়াছে। দেহের মধ্যে আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থ যে' পিত্ত-ধরা কলা' আছে, তাহাকে গ্রহণী বলা হয়। আহারের পরিপাকক্রিয়া আমাশয়েও হয়, পক্কাশয়েও হয়। আমাশয়ে অধিকাংশ অন্ন আম অর্থাৎ অপক্কাবস্থায় থাকে বলিয়া ইহার নাম আমাশয়। পক্কাশয়ের অনেক স্থলে অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম পক্কাশয়। এই আমাশয়কে ইংরাজীতে Stomach বলে এবং পক্কাশয়কে Small Intestine বলে। আমাশয়ের ও পক্কাশয়ের ভিতর পিত্তধরাকলা আছে এবং আমাশয় ও পক্কাশয় উভয়ের মধ্য হইতেই রস গৃহীত হয়। Deodenumকে গ্রহণী বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিশেষ বিবেচ্য। প্রত্যেক লোকেরই Deo-denum নাড়ীর অংশ আপনার হাতের ১২শ অঙ্গুলী পরিমিত। এই ১২শ অঙ্গুলী পরি-মিতস্থান আমাশয়ের (Stomachএর) শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া Jejunumasএ শেষ হইয়াছে। এই Deodenumএর মধ্যে পিত্তনিঃসরণমার্গ অর্থাৎ যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া এই স্থলে আসিয়া পড়ে; Pancrens হইতেও ঐ যন্ত্রের রস আসিয়া এই Deodenumএ আসিয়া মিলিত হয়।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ু দ্বারা রস প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে উপনীত হয়। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পাচকাখ্য পিত্তের দ্বারা আহার পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পাচকাখ্য পিত্তই অগ্নির অধিষ্ঠান সেই পিত্তকে ধারণ করে বলিয়া গ্রহণীকে পিত্তধরাকলা কহে। ইংরাজী শাস্ত্রমতে Gastric juice, Pan-creatic juice, পিত্ত (Bile) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের রস,—এই কয়প্রকার পদার্থ হইতে অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যে যে স্থান হইতে এই সকল রস নিঃসৃত হয়, সেই সেই স্থানকেই আয়ুর্ব্বেদে পিত্তধরাকলা বা গ্রহণী কহে।

"ষষ্ঠী পিত্তধরানাম যাকলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্কামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
গ্রহণী বলমগ্নিৰ্হি সা চাপিগ্রহণীমতা।
তস্মাদগ্নৌ প্রদুষ্টেতু গ্রহণ্যপি প্রদুষ্যতি॥"

(সুশ্রুতসংহিতা।)

সুশ্রুতসংহিতার মতে আমাদের দেহে সাত প্রকার কলা আছে; তন্মধ্যে পিত্তধরা নামক কলাকে গ্রহণী কহে। ইহা আমাশয় ও পক্কাশয়মধ্যস্থা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। গ্রহণীস্থ পরিপাক করিবার শক্তিরূপ অগ্নিকেও গ্রহণী কহে। পাচকাগ্নি প্রদুষ্ট হইলে গ্রহণীও প্রদুষ্ট হয়। সুশ্রুতে পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায়,—"ষষ্ঠী পিত্তধরানাম, যা চতুর্ব্বিধং অন্ন-পানমুপযুক্তং আমাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্কাশয়োপ-স্থিতং ধারয়তি।" এই পিত্তধরাকলা চতু-র্ব্বিধ—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার ভুক্তপদার্থ যখন আমাশয় হইতে নির্গত হইয়া পক্কাশয়ে আসিয়া পড়ে, তখন এই সকলের সম্যক্ পরিপাক হওয়া পর্য্যন্ত পিত্তধরাকলা ধারণ করিয়া রাখে; পরে এই বিপক্ক আহারের সারভাগের যে রস, তাহা সমান বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে যায় এবং গ্রহণীস্থ অবশিষ্ট ভাগ মলদ্রব বলিয়া অভিহিত হয়। সেই মলদ্রবের জলভাগ বস্তিতে নীত হইয়া মূত্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং

অবশিষ্ট কীট্ট অর্থাৎ মলভাগ পুরীষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই পুরীষ সমান বায়ু কর্ত্তৃক নীত হইয়া মলাশয়ে (Large Intestineএ) গিয়া উপস্থিত হয়।

"অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্‌গ্রহণীমতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥
অপক্বং ধারয়ত্যন্নং পক্বং ত্যজতি চাপ্যধঃ॥"
(চরকসংহিতা।)

গ্রহণী অগ্নির অধিষ্ঠান অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী; ইহা নাভির উপরে অবস্থিত, পাচকাগ্নি ও বলের আশ্রয়, অপক্ব-অন্নকে ধারণ করে এবং পক্ব অন্নকে অধোদিকে প্রেরণ করে। চরক ও সুশ্রুতের মতে গ্রহণী পিত্তধরাকলা অর্থাৎ পাচকাগ্নির স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়া জীবের পরিপাকশক্তি (বৈশানর-অগ্নি) রহিয়াছে।

অন্ন গ্রহণ করা গ্রহণীর একটী ক্রিয়া। এই ক্রিয়া আমাশয় এবং পক্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা সাধিত হয়, অর্থাৎ এই ঝিল্লীতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবাহিনী শিরা (Lacteals) এবং Portal Veinএর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা রস গৃহীত হইয়া সমান বায়ুর দ্বারা হৃদয়ে নীত হয়। ১২শ অঙ্গুলি পরিমিত Deodenumকে গ্রহণী কহিলে চরক ও সুশ্রুতের কোনও মতের সহিতই মিল রাখা যায় না। আমাশয় এবং পক্বাশয় এই উভয় স্থলেই অন্ন পরিপাক হয় এবং এই উভয় স্থল হইতেই অন্নরস গৃহীত হয়। যদি Deodenumএ সমস্ত পরিপাকের কার্য্য হইত এবং এই Deodenumই যদি আহারের অসার অংশকে মল ও মূত্রভাবে অধঃপাতিত করিতে পারিত, তাহা হইলেও না হয় Deodenumকে গ্রহণী বলা শোভা পাইত। কেহ কেহ আমাশয়ের Pyloric প্রান্তকে প্রমাদবশতঃ গ্রহণী বলেন। এই স্থান সমস্ত পাচক পিত্তের আধার এই কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? চরকের মতে গ্রহণী অন্নরস গ্রহণ করে,—তাহা কি কেবল এই Pyloric প্রান্ত হইতে হয়, না, সমস্ত আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে হয়? সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আমাশয় ও পক্বাশয় এই উভয় স্থল হইতেই অন্নের সার ভাগ অর্থাৎ রস গৃহীত হয়। গ্রহণী অপক্ব অন্নকে ধারণ করে এবং পক্ব অন্নকে অধোদিকে প্রেরণ করে। চরকের বাক্যে এই বুঝায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন সম্যক্ পরিপক্ব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অপক্ব অন্নকে আমাশয় ও পক্বাশয়ের ঝিল্লীর সংস্পর্শে গ্রহণী ধারণ করিয়া রাখে। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে,—অন্ন গ্রহণীস্থ পাচকাগ্নির প্রভাবে পরিপক্ব হয় এবং পরিপাকের পর সারাংশ গৃহীত হইয়া অসারাংশ অধোদিকে প্রেরিত হয়। অন্ন পরিপাক করা, সারাংশ গ্রহণ করা এবং অসারাংশকে অধোদিকে প্রেরণ করা—এ সমস্তই গ্রহণীর কার্য্য। গ্রহণীতে যে বায়ু ক্রিয়া করে, তাহার নাম সমান বায়ু। যে ধমনীমণ্ডলীতে সমান বায়ুর ক্রিয়া প্রকাশ পায়, ইংরাজীতে তাহাকে Solar-plexces কহে।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

আমিত্ব-চিন্তা।

'তরতর' বেগে তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে। সূত্রগ্রথিত কুসুমাবলীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গরাশি অশান্ত বালকবালিকার মত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে, ছুটিতেছে, একের অঙ্গে অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে! আনন্দের বিরাম নাই, ঢলাঢলির বিশ্রান্তি নাই,—এবং একটানা চলিয়া যাওয়ায়ও নিবৃত্তি নাই! এক যাইতেছে, অন্য আসিতেছে,—অন্যও যাইতেছে; আবার শত সহস্র আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া দিতেছে; যেন তরঙ্গরাজ্যের মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে! আমি নদীতীরে একটী স্নিগ্ধচ্ছায় বকুলপাদপের মূলে বসিয়া নীরবে তরঙ্গরাজ্যের সুশৃঙ্খল অথচ উদ্দাম নৃত্য দেখিতেছিলাম। শীতল শীকরপরিবাহী মৃদু পবন আমার শরীরের সমস্ত তাপ দূর করিয়া দিল,—মনে এক অপূর্ব্ব শান্তির নির্ঝর বহাইয়া দিল! আমি কেবলি একমনে দেখিতে লাগিলাম—অফুরন্ত তরঙ্গাবলীর সনৃত্য গমনাগমন! আর ভাবিতে লাগিলাম—এ অনন্ত তরঙ্গরাশির এমন দিবারাত্র গতিবিধি চলিতেছে, এমন কোটি কোটি তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে তরল সলিলের অঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে, আবার কোটি কোটি তরঙ্গের আবির্ভাব হইতেছে; তাহারাও একই নিয়মে নাচিয়া নাচিয়া জলের সঙ্গেই এক হইয়া যাইতেছে,—এমন আজি বা কালি ধরিয়া নহে, মাস বৎসর যুগ ধরিয়াও নহে, এ প্রবাহ অনন্ত কাল অনন্ত যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবু ইহাদের নির্ম্মূল ধ্বংশ হয় না কেন?—এ তরঙ্গধারার পরিসমাপ্তি হয় না কেন?—কত যুগযুগান্তরের কীর্ত্তিকাহিনী গান করিয়া এ তরঙ্গপ্রবাহ চলিয়াছে, তাহা কে বলিবে? আর কেই বা বলিয়া দিবে এ তরঙ্গরাজ্যের প্রথমই বা কোথা, আর চরমই বা কোথা? এ তত্বের মীমাংসা সংসারের কেহ করিতে পারে না।

এমনি ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, বুঝিবা বিধাতার সৃষ্টিমাত্রই তরঙ্গের মত। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-সমুদ্রের ক্ষুদ্রবীচিমালার মত অনন্ত সৃষ্টি-শ্রেণী নাচিয়া বেড়াইতেছে,—ঢুলিয়া পড়িতেছে এবং এমনি নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! প্রথমে আমারই প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু সাধারণ নিয়মানুসারে তরঙ্গিণীর তরঙ্গাবলীর রহস্যভেদ করা আমার যতটুকু সাধ্য ছিল,—এ অচিন্তিত, অজ্ঞাত, অননুশীলিতপূর্ব্ব আত্মবিষয়ক চর্চ্চা আমাকে কিছুমাত্র আলোকে আনিতে পারিল না, আমি তেমনি আঁধারে পড়িয়া রহিলাম,—আমার আমিত্বটুকু বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-সিন্ধুর কোন্ অজ্ঞাত আবর্ত্তে ডুবিয়া রহিয়াছে, শত চেষ্টাতেও তাহাকে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না,—আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিলাম,—এ 'হারাইয়া ফেলা' নূতন নহে, কত কোটি কোটি যুগ ধরিয়া এমন কত শত কোটি 'আমি'র আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও দিন আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নাই বলিয়া হয় ত অনুসন্ধান করি নাই, আজ এ তরঙ্গরাজ্যের বিচিত্র খেলা আমাকে আপন বুঝিবার প্রবৃত্তি আনিয়া দিয়াছে বলিয়া আপনাকে খুঁজিতে গিয়া তবে বুঝিতে পারিয়াছি যে অনেক যুগ ধরিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছি, বা আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি!—হা অদৃষ্ট!

অনেক সন্ধান করিয়া দেখিলাম,—আমিও এমনি সংসারসিন্ধুর তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহি, অতীতকালের অসীম জলরাশির বক্ষে বুদ্বুদ্টুকু বৃদ্ধি চলে, আমি কেবলি দেখিতে পাইলাম, এই তরঙ্গিণীর কোটি কোটি তর-

ঙ্গের মত আমারও "আমিত্ব" অর্থাৎ উদ্ভব বা আবির্ভাব তরঙ্গরাশি এমনি শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়া আসিতেছে। বিশাল প্রশান্ত কাল। সমুদ্রের ধূমায়মান সুদূর দৃশ্য যতই দেখিতে লাগিলাম, ততদূরই দেখিতে পাইলাম, কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় আমার আমিত্ব তরঙ্গ নাচিয়া উঠিয়া আবার জলের সঙ্গেই মিশাইয়া যাইতেছে, আবার কোথাও দেখিতে পাইলাম, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতম কণায়মান আমার আমিত্ব বীচিটুকু—ফুটিতে না ফুটিতে জলের সঙ্গেই লীন হইয়া যাইতেছে। আবার তরঙ্গ—আবার বিলয়, পুনরপি তরঙ্গ, পুনরপি বিলয়, এ কেমন রহস্য, এ কেমন লীলা-খেলা, দেখিতে দেখিতে বিস্মিত মুগ্ধ এবং পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম।

আমার মনে হইতে লাগিল, এ তরঙ্গের বুঝি শেষ নাই, এ অনন্ত তরঙ্গরাজ্যের ধ্বংসকাল বুঝি বিধাতার নিয়মেই অনাগন্তা, আরও মনে হয়, এ তরঙ্গরাশির সহিত জলের যে সম্বন্ধ, তাহাতে এ তরঙ্গরাজ্যের ধ্বংস হওয়া অসম্ভব, তবে যদি কোনও দিন মা প্রলয়ঙ্করী ভবানী "কালী করালবদনী, বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী"—অগস্ত্যরূপে নিখিল সমুদ্র প্রলয়ব্যপদেশে এক গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলেন, তবে বুঝিবা এ তরঙ্গমালার সাময়িক পরিসমাপ্তি হইবে, 'সাময়িক' কেন না, লীলাময়ী মা আমার যদি আবার তাঁহার সৃষ্টির সাধ জাগিয়া উঠে, তবে পীত জলরাশি উদগীর্ণ করিয়া দিলেই ত নিয়তির বাতাসে আবার সেইরূপ তরঙ্গরাজ্যের মহোৎসব পড়িয়া যাইবে। এমন করিয়াইত সংসারের "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়" চির যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তরঙ্গ ত সলিল ব্যতীত আর কিছুই নহে ; যে তরঙ্গটী চন্দ্র সূর্য্য করস্পর্শে উলসিয়া উঠিয়া নাচিতে নাচিতে লীন হইয়া গিয়াছে, সেইটা যেমন জলেরই অংশ ছিল, তেমনি জলেরই অঙ্গে মিশাইয়া গেল। যতদিন বাতাস থাকিবে, ততদিন সেই বিলীনোদ্ভূত তরঙ্গ জলরাশি প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন রঙ্গে নূতন অঙ্গে তরঙ্গের সৃষ্টি করিবে। সেই তরঙ্গ নূতন তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া পুনরপি নৃত্য করিবে, নির্দ্দিষ্ট কালের পরক্ষণেই যেমন জল তেমনি জল হইয়া যাইবে।

জল যেমন এক, কিন্তু তরঙ্গ অনন্ত, সেইরূপ আমিও এক—আমিত্বের আবির্ভাব তিরোভাব অনন্ত! আমার মনে হয়, সমুদ্রের যে অংশে যেমন বায়ুপ্রবাহ হইবে, সেই অংশেই সেইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গমালার উৎপত্তি হইবে, এমনি হইয়াও থাকে ;—আমার পক্ষেও ঠিক ঐই মত ব্যবস্থা, আমি এক অনন্ত "অবাঙ্মনসগোচর" আকাশ কল্প,—আমাতেও যখন যেরূপ অদৃষ্ট-বায়ু প্রবাহিত হইয়াছে, দেশকালপাত্রবিশেষে আমাতে তেমনি শত শত তরঙ্গ সমুদ্ভূত হইয়াছে! অর্থাৎ আমিও সেই মত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সীমাবদ্ধ জীবে পরিণত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পাপপুণ্যের ফল ভোগ ও নূতন কর্ম্মরাশির সৃষ্টি করিয়া পরজন্মের বীজ সঞ্চিত রাখিয়া ধ্বংস নহে,—তরঙ্গেরই মত জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছি, আশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন তরঙ্গের ন্যায় পুনরপি দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছি। এমনি চলিয়াছে কত যুগ! চলিবেও কত যুগ তাহা কে জানে?

পৃথগাভাসমান তরঙ্গায়িত জল যেমন বাস্তবিক জলরাশি হইতে পৃথক্ নহে, আমিও তেমনি সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু আধি ব্যাধি দেশ কাল পূর্ব্ব পশ্চিম ও পাপ পুণ্য প্রভৃতি দ্বারা শান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবরূপে প্রতিভাসমান হইলেও সেই সর্ব্বব্যাপী বিশাল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই

নহি। চন্দ্র সূর্য্য কিরণজাত লোহিত্যাদিরাগ যেমন জলের বা তরঙ্গের ধর্ম্ম নহে, আমারও তেমনি সুখ, দুঃখ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃত ধর্ম্ম নহে, উহারা আগন্তুক, যাহারা আগন্তুক তাহারা চিরকাল থাকে না, সুতরাং উহারাও কোনদিন চলিয়া যাইবে। জানি না সে দিন কবে আসিবে?

যে ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে নীরবে বসিয়া এমন বীচিরহস্য চিন্তা করিতেছিলাম, আমার যেন তাহাকে বড় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! আমার মনে হইতে লাগিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমার তুলনায় ইহা ধূলিকণা হইতেও ক্ষুদ্রতর। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যদি এমনি মহান্ এমনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, হায় বিধাতঃ কোন্ পাপে আমাকে সেই ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া এ ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গোষ্পদে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে? তোমার এমনি প্রতারণা, এমনি মায়া, যে একদিনের জন্যও আমাকে আমার স্বরূপ বোধ করিতে দিতে চাও নাই?—ধিক্ তোমার!

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার প্রাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল অনুভূতি ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, কর্ণে মধুবর্ষণ হইতে লাগিল, দিব্য গন্ধে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল, পূর্ণ আনন্দে আমি সীমাহীন সমুদ্রের মত পূর্ণচন্দ্রকিরণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলাম। পৃথিবীর স্তরে স্তরে, প্রাণিসকলের অঙ্গে অঙ্গে, বৃক্ষলতাপত্র পুষ্পফল সমূহের অণুতে অণুতে, আকাশ পাতাল সমুদ্র শৈলাবলীর, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জের প্রত্যেক অংশে আমার চিরন্তন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠিল, আমি বিস্মৃত হইয়া গেলাম, জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ইত্যাদি কাহাকে বলে।

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম,—যাহাকে ইতঃপূর্ব্বে ক্ষুদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম, যাঁহার বক্ষে ইতঃপূর্ব্বে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, যাঁহার মুখগ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য নির্ম্মমহস্ত প্রসারিত করিয়াছিলাম—হা বিধাতঃ! সে সমস্ত বস্তুতেই আমার পূর্ণতম অস্তিত্ব! প্রাণাধিক ভালবাসার পাত্র যাহাকে কালের নিষ্ঠুর হস্তে সমর্পিত করিয়া অশ্রুসাগরে ভাসিতেছিলাম, দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম, সে আমার নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তাহার সঙ্গে আমার তেমনি সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, দুদিন পরে আবার সে আমারই এ বিশাল অঙ্গে ফুটিয়া উঠিবে। আকাশের বিশাল দেহে নক্ষত্র যেমন সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে, তথাপি নিশাসম্বন্ধ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না, আমাদের যাহারা মরিয়া যায়, তাহারাও ধ্বংস হয় বলিয়া মনে হয় না,—তাহারাও নিয়তিরূপে সন্ধ্যা বা নিশা সম্বন্ধের অপেক্ষা করিয়া অদৃশ্য হইয়া থাকে, আবার যেমন যখনি সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সূর্য্যদেব অস্ত চলিয়া যান, অমনি তারামণ্ডলী বিকশিত হইয়া যেমন ছিল তেমনি ভাবে হাসিয়া উঠে, পৃথিবীর নীরপূর্ব্ব তাবৎ বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ একই নিয়ম বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল,—আমি ভূমানন্দ সাগরে কেবলি ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম, এমন আনন্দধারা জীবনে কখনও লাভ করি নাই। * * *

আবার আমার মনে হইতে লাগিল, সংসার যদি আমার এত আত্মীয়, সংসারের প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গেও যদি আমার এমনি মধুর সম্পর্ক, তবে কোন্ পাপে অহরহঃ এমন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, দুঃখ, অশান্তি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অবমাননা দ্বারা জগৎকে উৎপীড়িত করিতেছি, এবং আপনিই বা এমন সর্ব্বসুখের সর্ব্বসম্পদের আকর হইয়া অহর্নিশ এমন অভাব অভিযোগ পাপ শোক তাপ ও তথাকথিত হিংসা-দ্বেষাদি দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক এরূপ লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত ও উৎপীড়িত হইতেছি? কে আমায় বলিয়া দিবে, আমার তেমন সর্ব্বানুভাবিকা, নিখিলপ্রসৃতা সার্ব্বজনীন প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিসমুদায়কে, কে এমন ক্ষুদ্র গণ্ডীতে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিল? আমি যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে চাহি—কোন্ বৃত্তি আমাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দেয়?—যাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে সময়ে সময়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে, কোন্ নিষ্ঠুর বিধাতার ততোধিক নির্ম্মম নিয়ম আমার হাতে ধরিয়া তাহাকে মুষ্টিভিক্ষা দিতেও নিষেধ করিয়া 'খলখল' হাসিয়া উঠে?—কেবল আমারি পদরেণু স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় যে তাহার সমস্ত বক্ষটাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে—তাহারই উন্মুক্ত উচ্ছ্বসিত প্রেমময় হৃদয়ে নিষ্ঠুরের মত পদাঘাত করিবার জন্য কে

আমার কাণে চুপি চুপি পরামর্শ দিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়, কে আমায় বলিয়া দিবে?—পৃথিবীর যখন তাপ বৃদ্ধি হয়—পৃথিবীর বুক যখন তাপদগ্ধ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে, তখন আকাশের মেঘ তাহার দগ্ধ বুক শীতল করিবার জন্য রোদন করে, অজস্র ধারায় নয়নজল বর্ষণ করিয়া পরদুঃখকাতরতা ব্যক্ত ও পরের দুঃখ প্রকৃতই দূর করে। একটা জলের পদ্ম নৈশ শিশিরের অত্যাচারে যখন ম্লান হইয়া পড়ে, তখন প্রাতঃকালের সূর্য্যসঞ্জীবন কর-স্পর্শে তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইয়া দিয়া তবে জগতের অন্য কাজে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ অনেক পদার্থকে দেখিতে পাই, তাহারা বেশ কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য কোনও নির্ম্মম বিধাতার কঠোর নিয়ম সৃষ্ট হয় নাই! কিন্তু তুমি শত চেষ্টা করিলেও সেই যে ক্ষুদ্রগণ্ডীর ক্ষীণালোকে নিজেকে চিররুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ তাহা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বাহির হইতে পার না কেন? আমাদের এ স্বাধীনতা-হননকারী অত্যাচারপরায়ণ কোনও বিধাতা যদি থাকে, তবে তাহার স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা অন্য কোনও মারাত্মক বস্তু সংসারে আছে কি না জানি না!

মনে ভাবি,—আমার ভিতরে এতগুলি বিসংবাদিনী বৃত্তি কেন আসিল?—একমাত্র চৈতন্য লইয়া, একমাত্র প্রেম লইয়া—যদি এবারেও (মনুষ্য জন্মে) সংসারে আসিতাম, তবে না জানি কতই ভালবাসিতে পারিতাম, না জানি তবে জগতের সঙ্গে বড় প্রীতি বন্ধনেই বদ্ধ থাকিতে পারিতাম!—পরের দুঃখে অপরের রোদনে পরের আনন্দে পরের বিষাদে কত খানি সহানুভূতিই না দেখাইতে পারিতাম!—হায় বিধাতঃ! তুমি আমায় জড় করিলে না কেন?—আমায় মানুষ করিলে ত মানুষের জন্য মানুষ করিলে না কেন?—আমারত কতশত জড় জন্ম বহিয়া গিয়াছে, কৈ—তাহাতে ত এমন আত্মনিষ্ঠতার ক্ষুদ্র আবরণে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না!—"অনন্ত প্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু হইয়াছি—লোকে বলে বা অনুভব হয়, তাহাদের প্রত্যেক বারেই ত নিজের দেহ নিজের সর্ব্বস্ব পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া আকাশের মত নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছি! যে দিন সংসারে মৃত্তিকারাশির অঙ্গে সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া রহিয়াছিলাম,—আমার উন্মুক্ত বক্ষঃস্থল ত সংসারের পদতলেই পাতিয়া রাখিয়াছিলাম, সংসারের যাহা বস্তু আমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত, তাহাদের প্রত্যেক পাদস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতাম,—স্পর্শের সাহায্যে সকলের মনের সঙ্গে সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হইয়া—পরের জন্য হাসিতে কাঁদিতে পারিতাম, মানুষ হইয়া তাহা ভুলিয়া গেলাম কেন? যে দিন বৃক্ষ লতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম,—শাখাপত্রে ফুলে ফলে সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া সাধ্বী রমণীর স্বামিমুখের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় কেবল অন্যের সুখতৃপ্তির জন্যই সারা দিনরাত্রি দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কেহ যদি ফুল তুলিয়া দিত, কেহ যদি ফল পাড়িয়া খাইত, কেহ যদি আতপদগ্ধ শাখাগ্রভাগ ভগ্ন করিয়াও ছায়া-সুন্দর তলদেশে মুহূর্ত্তের জন্য উপবেশন করিত, তখন তৃপ্তিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। আমার এ পরার্থপরতা এ বিশ্বপ্রেম কে চুরি করিয়া লইল কে আমায় বলিয়া দিবে?—জড়জীবনে যাহা করিলাম, উন্নত মানব-জীবনে তাহা করিতে পারি না কেন?—আমার সত্তা সকলের সত্তাতে মিশাইয়া দিয়া আমার প্রয়োজন,—আমার স্বার্থ সংসারের প্রয়োজনে সংসারের স্বার্থে মিশাইয়া দিয়া কেন সুখ দুঃখ হাসি কান্না এমন কি জীবন মরণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ব্রহ্মাণ্ডে সমর্পিত করিয়া আমি নিষ্কামতার ছায়া স্পর্শেও অধিকারী নই কেন? আমি কেন সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া আসক্তিশূন্য হৃদয়ে জগতের হিতে আত্মবিসর্জন করিয়া আমিত্বের অসীম প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারি না? চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া গ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশ-পটে গ্রহনক্ষত্রপ্রতিবিম্বিত তটিনী-সলিলে,—আমার চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে অনেকবার দৃষ্টিপাত করিয়া এ প্রশ্ন করিয়া তথাপি উত্তর পাইলাম না! মনে বড় রাগ হইল,—নদী-তীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম,—কোথায়?—আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনুরূপ ক্ষুদ্র কুটীরে!—যেমন কীট তেমনি থাকি,—উন্নতজীবন আমার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা!—জগদীশ্বর! তুমি আমায় মাটী করিলে না কেন?

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে আর্য্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রন্থাবলী অতুলনীয়—বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-বিষয়ক।

১। সাহিত্য-চিন্তা। এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। কাব্যচিন্তা। রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। কাব্যসুন্দরী দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সৃষ্টিচাতুর্য্য এবং সুন্দরীগণের চরিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সামাজিক।

৪। সমাজতত্ত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

৫। সমাজচিন্তা। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ধর্ম্মবিষয়ক।

৬। দেবসুন্দরী। হিন্দু দেবদেবীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৭। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হওয়াতে এই গ্রন্থ সর্ব্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১।০ মাত্র।

৮। সৃষ্টিবিজ্ঞান। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ২০১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

সপ্তম খণ্ড]　　১৩১৩ সাল, অগ্রহায়ণ।　　[৮ম সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,

এফ, আর, জি, এস।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'সাহিত্য-সভা' কর্তৃক প্রকাশিত।

☞ সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন

সাহিত্য-সভা।

PATRON:

SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.—*Lieutenant-Governor, Bengal.*

VICE-PATRONS:

THE HON'BLE MR. H. H. RISELEY, C. I. E.—*Secy. Government of India*
THE HON'BLE MR. A. EARLE, I. C. S.—*Director of Public Instruction, Bengal.*

SIR A. PEDLER, ESQ., F.R.S. C.I.E.

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র,
সহযোগী সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য সভার সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা।

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা

কলিকাতার ইতিহাস।

হিন্দু-সমাজ।

দশম অধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি যেরূপ গুরুতর এবং ইহার সকল তত্ত্বের সম্যক্ অনুধাবন অধুনা যেরূপ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, অন্য কোন বিষয় সেরূপ নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ের গুরুত্ব সাধারণতঃ স্বীকৃত হয় না। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া সামাজিক প্রশ্নসমূহের আলোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সামাজিক গঠন এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই সমস্ত বিষয়ের ও বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, আমাদের সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভাবী ঘটনাবলী পূর্ব্বাহ্ণেই আপনাদের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত ছায়া হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, যে সকল ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি বস্তুতই অত্যন্ত ভীতিজনক। তাহাতে উন্নতির আভাস কিছুই পাওয়া যায় না। একটা ইংরেজী প্রবাদবাক্য আছে,—'চক্‌চক্ করিলেই সোণা নয় না।' এই বাক্যটি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বেশ খটে। আরামদায়ক বর্ত্তমান অবস্থা আপাত-মনোরম ও সুখকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভাবী ফল শুভজনক হইবে না। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার গুরুতর ভাব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশের তথা-কথিত উৎকৃষ্ট সভ্যতার আড়ম্বর ও প্রখর দীপ্তি আমাদের নয়নকে এমন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং মনোহর বর্ত্তমান ভাবে আমরা এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের সামাজিক জীবনের যাবতীয় গুরুতর প্রশ্নই আমরা নিতান্ত তাচ্ছীল্যের সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলি। হিন্দুসমাজ যে উত্তরোত্তর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দিন দিন ইহার সংগঠন প্রবল ধাক্কা খাইতেছে। যে বিষম ঝঞ্ঝাবাতে ইহা পর্য্যুদস্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। আমাদের পশ্চাদ্ভাগে নীরবে এক বিষম বিপ্লব চলিতেছে, এবং অতি পুরাকালে যাহা কিছু সংগঠিত ও যুগে যুগে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, এই বিষম বিপ্লবের প্রবল স্রোতে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিপ্লবের প্রকৃতি এবং ইহার

অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এক কথায় বলিতে হইলে, ইহাকে অরাজকতা বলা যাইতে পারে, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বিনাশ।

হিন্দুসমাজ আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে আর সন্তুষ্ট নহি। যে কোন বৈদেশিক আদর্শ দেখিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহারই অনুসরণ করিবার নিমিত্ত আমরা সর্ব্বপ্রকার কৌশল সাগ্রহে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করি। আমাদের মনের ভাব-সকল যেন কেমন গুলাইয়া গিয়াছে। সমাজের বন্ধন দিন দিন শিথিল হইতেছে। পরন্তু সাহসের সহিত এই অনিষ্টকর অবস্থার গতিরোধ করিতে হইবে। যে দিন সামাজিক বন্ধনসমূহ অন্তর্হিত হয় এবং লোকে সমাজের প্রতি অনুরাগবিহীন ও সমাজের হিতার্থে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিহীন হইয়া পড়ে, সে দিন মানুষের সুখের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। আমাদের এখন সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে। সমাজের একতা ব্যাহত হইয়াছে। স্বাধীনতাবলম্বনপ্রবৃত্তির নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। সময়ে সময়ে উহাদ্বারা মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনুষ্যমাত্রেরই স্বদেশের প্রতি প্রীতি এবং স্বসমাজের আচারব্যবহারের প্রতি অনুরাগ থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তিই প্রকৃতার্থে বিশ্ববাসী হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বিশেষ ভাব ও প্রকৃতি আছে, তদ্দ্বারা উহাকে অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। বিশাল মানবজাতির এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধন সকল জাতিরই চরম লক্ষ্য বটে এবং তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল জাতি কার্য্য করিতেছে বটে, তথাপি কিন্তু প্রত্যেক জাতি আপনার অবস্থা ও জ্ঞানের পরিমাণ ও উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে এক এক নির্দ্দিষ্ট পথে কাজ করিয়া যাই-তেছে। এই জন্যই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পাশ্চাত্য জগতে একটি মহৎ গুণ, এ দেশে তাহাই অনেক সময়ে ঘোর স্বার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে। যে ভোগবিলাসময় জীবনযাপন-প্রণালী পাশ্চাত্য জগতে বহু উৎকর্ষসাধক গুণের উত্তেজক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সম্বন্ধে তাহাই বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে। বিভিন্ন জাতির বিশেষ বিশেষ ভাব কিরূপে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহারা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নীরবে উৎপন্ন হইয়া আসিয়াছে। এক এক জাতির ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও বৃত্তিব্যবসায় দ্বারা উহারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহাদের নির্দ্ধারণ পক্ষে দেশের জলবায়ুর অবস্থাও সামান্য কারণ নহে। বক্‌ল্ সাহেবও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জাতিমাত্রেরই নিজের এক একটী ধর্ম্ম আছে; সে ধর্ম্মটি তাহার সবিশেষ উপযোগী এবং তাহাতেই সেই জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি। আদি নিবাসীদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারেও তাহাদের মধ্যে সভ্যতাবিস্তার হয় নাই। তাহাতে ঐ সকল অসভ্যজাতির নৈতিক অবস্থা বা জ্ঞান বুদ্ধি উন্নত করিতে পারে নাই। এই সমস্ত অসভ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপীয়দিগের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা তদনুপাতে কোন বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কথিত

আছে যে, ভগবানের আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত,—কোনও সুমহান্ ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত,—জাতিসমূহের জন্ম হইয়াছে,—অথবা প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, তাহারা সেই ভগবান্কর্ত্তৃক এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছে। সেই সুমহান্ উদ্দেশ্য তাহাদের যাবতীয় জাতীয় মনোভাব ও কার্য্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ গুরুতর ব্যাপার উপলক্ষে জাতীয় জীবনে প্রকাশ পায়। হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মই ভগবানের সেই মহদুদ্দেশ্য। এই ধর্ম্ম কথাটীর ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই, কারণ 'ধর্ম্ম' বলিলে হিন্দু যাহা বুঝে, ইংরেজী কোন শব্দদ্বারাই তাহা প্রকাশ করা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম শব্দে যে ভাব বুঝায়, তাহা মানুষের চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ পায়, এবং যতকাল আত্মার মুক্তি না ঘটে, ততকাল জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহা প্রকৃতির কার্য্যকরী শক্তিরূপে তাহার ক্রিয়াসমূহকে নিয়মিত করে। হিন্দুজাতির বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, মানুষের মুক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবান্ যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে। মানুষ যে আত্মোন্নতিসাধনে ভগবান্কে আত্মার ভিতর উপলব্ধি করিতে পারে, ইহা তাহারা আপনাদের জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছে, এবং যে পথে চলিলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, সে পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে। তাহাদের চরম লক্ষ্য সাধন করে চেষ্টা করিতে করিতে হিন্দুজাতি এমন একটি দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহা জগতে অদ্বিতীয়। বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত তাহারা আপনাদের মনোবৃত্তিনিচয় যথাসম্ভব বিকশিত করিয়াছে, এবং সাধারণতঃ 'যোগ' নামে খ্যাত বিশেষ প্রণালী দ্বারা সুস্পষ্ট অন্তর্দর্শনশক্তি লাভ করিয়াছে। এই যোগবলে তাহারা কাল ও স্থানের দূরত্ব বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে,—ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান তাহাদের নিকট মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে।

উচ্চতর নীতিজ্ঞান সহ এই অদ্ভুত শক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ হওয়ায় ঋষিরা অবিমিশ্র সুখময় স্থান যে স্বর্গ তাহাও ত্যাগ করিয়াছেন এবং মানবজাতির গুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হইয়াছেন। তাঁহারাই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধনের উপযোগী করিয়া ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্ম্মের বাহ্যাবয়ব সংগঠিত করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্তই যে এক ও অদ্বিতীয়, ইহাই হিন্দুদের বিশ্বাস; তাহারা মানুষ ও খনিজ ধাতুতে প্রকৃত পক্ষে কোনও প্রভেদ দেখিতে পায় না, কারণ বিশ্বের তাবৎ বস্তুই সেই অদ্বিতীয় পুরুষের বিকাশমাত্র। এইরূপ জ্ঞানবশতঃ হিন্দুরা সামান্য কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষের প্রতি সমভাবে দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং হিন্দুদের লক্ষ্য অতি উচ্চ হইলেও তাহারা অতি নীচের প্রতি লক্ষ্য রাখারও অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছে, এবং তদনুসারে যে ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা 'সনাতন ধর্ম্ম' অর্থাৎ সর্ব্বকালের উপযোগী ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে; এই ধর্ম্ম সর্ব্বাবস্থাতেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ। হিন্দুরা ইহাও বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবান্কে প্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে যে অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতে হইবে, বর্ত্তমান জীবন সেই সুদীর্ঘ জীবনশৃঙ্খলের একটী কড়া মাত্র। এই হেতু তাহারা সংসারিক তাবৎ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে, এবং চিত্তের প্রশান্ততা রক্ষা করিয়া,—

অর্থাৎ সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত বা দুর্ভাগ্য-দুঃখে ভগ্নোদ্যম না হইয়া—ক্রমাগত আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে যত্নশীল থাকে। হিন্দুদের পাপপুণ্যের ধারণা কিছু বিশেষ রকমের। মানুষের ধর্ম্মের সহিত সংস্রব না থাকিলে কোন কার্য্যই তাহাদের নিকট পুণ্য-জনক বা পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানুষের ধর্ম্মই তাহার উন্নতির অবস্থার পরিচায়ক। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, জাতিবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষ তাহাদের উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; আর যে কাজ একের পক্ষে হিতকর, তাহাই অন্যের পক্ষে অহিতকর বিবেচিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতির এই নীতিসূত্র অবগত থাকায় প্রাচীন ঋষিরা সমগ্র হিন্দুজাতিকে চারি প্রধান ভাগে অর্থাৎ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

জন্মদ্বারাই মানুষের জাতি নির্দ্ধারিত হয়; আর হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মানুষের 'কর্ম্ম' (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কার্য্যাবলী) অনুসারে বিধাতা তাহার জাতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। হিন্দু জানে, কর্ম্মানুসারে ফলভোগ-নীতি কেবল সাংসারিক বিষয়ে নহে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তুল্যরূপ সত্য। সুতরাং এই কর্ম্মনীতিই হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্র। এই নীতির মর্ম্ম এই যে, কর্ম্ম-মাত্রেই (মনের চিন্তা এবং অভিলাষও কর্ম্মের অন্তর্গত) উপযুক্ত ফল প্রসব করে, এবং যত দিন মানুষের কর্ম্মে আসক্তি থাকে, তত দিন সেই ফল তাহাকে ছাড়ে না,—ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, সেই কর্ম্মফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। মানুষ ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু ভোগ করে, তাহার যথোপযুক্ত কারণ আপাততঃ দেখা না গেলেও বুঝিতে হইবে, তাহা উহার পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্মের ফল। যত দিন কর্ম্মফলে মানুষের আসক্তি থাকে, তত দিন সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আসক্তি-শূন্য হইয়া অর্থাৎ ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যখন কর্ম্ম করিতে পারা যাইবে, তখনই কর্ম্ম এবং কর্ম্মকর্ত্তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। আর ইহা করিবার একমাত্র উপায়, নিজের স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান বর্জ্জিত হওয়া ও আত্ম-জ্ঞান লাভ করা। এইভাবে কর্ম্ম করিলে তাহার ফল মানুষের নিজের উপর না পড়িয়া সমস্ত বিশ্বের উপর পতিত হয়, সুতরাং অধিকতর কার্য্যকর হয়। এইরূপ মুক্তি-লাভই হিন্দুর চরম লক্ষ্য, এবং হিন্দুশাস্ত্র-সমূহ এই মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিতেছে। এ বিষয়ের যথোচিত উপদেশদানই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারা যে ভাবে জীবন যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাই এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কর্ম্ম-ফলে বিশ্বাসের দৃষ্ট ফল সন্তোষ, কারণ হিন্দুমাত্রেই জানে যে, তাহার অদৃষ্ট সে নিজেই করিয়া লইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান কয়েকটি ভাবের কথাই এস্থলে সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত এন্, এন্, ঘোষ স্বপ্রণীত মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন;—"হিন্দু ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি নীতির সংগ্রহমাত্র নহে, প্রত্যুত ইহা অদৃষ্টের ব্যাখ্যা। ইহা মানুষের উৎপত্তি ও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক বিশেষ কথাই আমাদিগকে বলিয়া দেয়। ইহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ লাভ করিবার ও পরলোকের সহিত সংযোগসাধন করিবার উপায় প্রদর্শন করে।" হিন্দুর চরম লক্ষ্য সুখ নহে,—মুক্তি; সুতরাং হিন্দুর নিকট ইহজীবন সেই পরিমাণে মূল্যবান্, যে পরিমাণে ইহা তাহাকে মুক্তিলাভকাল

পর্য্যন্ত জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া সেই মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। চারি জাতির কর্ত্তব্য ও জীবনযাপনের নিয়মাবলী প্রধানতঃ সংহিতাসমূহে নিবদ্ধ আছে। যে সকল ঋষি ঐ সকল সংহিতা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের নামানুসারে উহাদের নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে উহারা 'স্মৃতি' নামে পরিচিত।

কখন্ কি ভাবে জাতিভেদ প্রথম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।* হিন্দুধর্ম্ম কর্ম্মসাধন বিষয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত এন্. এন্, ঘোষ লিখিয়াছেন;—"হিন্দুজাতির প্রথম চারি শ্রেণী বিভাগের সময় ব্যবসায়ের বিভিন্নতা অপেক্ষা নৈতিকপ্রকৃতির বিভিন্নতার উপরই অধিক নির্ভর করা হইয়াছিল। জাতিভেদের বাহ্যভাব দেখিলে, ব্যবসায় ভেদই ইহার মূল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও চরিত্রের ভিন্নতাই ইহার মূল। বিভিন্ন জাতির ভেদসূচক রেখা অতীব দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পিতার জাতিই পুত্রের জাতি। পুরাকালে যখন হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন, এবং ঋষিরা বিধিপ্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতেন, সে সময়ে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, আজি কেহই এক জাতি হইতে অন্ত জাতিতে নীত হইতে পারে না, বা কেহ স্বয়ং ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া এক জাতি হইতে অন্ত জাতিতে যাইতে পারে না। হিন্দুরা মনে করে, মানুষের জাতি তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ ইহজন্মে যে ভাবে জীবনযাপন করিবে, তদনুসারে পরজন্মে তাহার জাতি নির্দ্ধারিত হইবে। জাতিভেদই হিন্দু-সমাজনীতির মূল।

মোটামুটি বলিতে হইলে, এমন কোনও রাজ্য এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, যেখানকার অধিবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান ও সভ্যতা লাভ করিয়া পরিণামে আপনাদের শ্রেণীবিভাগের বা জাতিভেদের উপকারিতা উপলব্ধি করে নাই। ধর্ম্মই সকল স্থলে এরূপ শ্রেণীভেদের মূল নহে। মূল যাহাই হউক না কেন, শ্রেণীবিভাগ বা জাতিভেদ সর্ব্বত্রই যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকের প্রবৃত্তি বা অবলম্বিত বৃত্তিই এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান কারণ। রাজাও এই শ্রেণীবিভাগের সামান্ত কারণ নহে, যেহেতু স্বীয় প্রজাবর্গের সামাজিক ভাবের পরিবর্ত্তন করিবার রাজার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা আছে। রাজার এই বিশেষ ক্ষমতার পরিচালন দ্বারা ইউরোপীয়সমূহের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান ও বর্ণনা করিতে হইলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আকার আয়তন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হইতে হইল। হিন্দু ও অন্যান্য সভ্য জাতি সৎকার্য্যের সমাদর করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের পুরস্কার নির্দ্ধারণে তাঁহাদের বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দু মতে, মানুষ সৎকার্য্য দ্বারা পরজন্মে (ইহজন্মে নহে) উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর পদলাভের অধিকারী হয়। সেইজন্যই অদ্যাপি দেখা যায় যে, শূদ্র অতি উচ্চ পদ ও ধন সম্ভোগ করিলেও সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হয় না।

রুশিয়ার নিহিলিষ্টদিগের উত্থান, ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সের বলক্ষয়কর সামাজিক বিপ্লব ও অরাজকতা প্রভৃতি

---

* ঋগ্বেদে জাতিভেদপ্রণালীর উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, ইহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ইউরোপের বিষম সমাজবিপ্লবের ন্যায় কোনরূপ বিপ্লবসূচক গোলযোগ যে আমাদের দেশে ঘটে নাই, ইহাই সুখের বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজনীতির গুণ ইউরোপের সামাজিক জীবনের বিবিধ জটিল অবস্থায় ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিল্পবিজ্ঞানের সহায়তায় ও ধনদ্বারা লভ্য সর্ব্বপ্রকার সুখ ও ভোগবিলাস সংগ্রহ করাই পাশ্চাত্যদিগের চরম লক্ষ্য। প্রাচীন হিন্দুদিগের লক্ষ্যের সহিত কি বৈষম্য! হিন্দু সাংসারিক সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, কিরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিরূপে পরব্রহ্মের সহিত যোগসাধন করা যায়,—এই সমস্তই তাহার চরম লক্ষ্য। এই প্রাচীন আদর্শ হইতে অধঃপতনের কথা ভাবিতে চিত্ত বিষাদময় হইয়া উঠে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের মূলভিত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। বর্ক্ সত্যই বলিয়াছেন ;—"যে আঘাতে প্রাচীন আচারব্যবহার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা ভয়ের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাচীন মত ও সংসার-নীতি অপনীত হইলে যে ক্ষতি হয়, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদিগকে শাসনে রাখিবার যন্ত্র আমরা হারাইয়া বসি।"

প্রকৃত হিন্দুর জীবনে কি উচ্চ আদর্শ, কি মহান্ আত্মত্যাগ, কি উদার ও স্বর্গীয় চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিময়ী ভাষায় বলিয়াছেন ;—"রাম ও যুধিষ্ঠির অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র আমরা কোথায় পাইব? রামায়ণ ও মহাভারতে যে নীতি-উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আমরা কোথায় পাইব? সত্যপালনের পুণ্য, মাতাপিতার আদেশপালনের কর্ত্তব্যতা, অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের সম্পাদনের আবশ্যকতা, পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনকত্ব, সত্যের পবিত্রতা, মিথ্যা-কথনের উৎকট পাপ, এই সমস্ত বিষয় এরূপ চিত্তদ্রাবকভাবে ওজস্বিনী ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যাহারা নিতান্ত অমনোযোগের সহিত রামায়ণ পাঠ করে, তাহাদের মনেও উহাদের ভাব গভীররূপে অঙ্কিত হইবেই হইবে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "সংসারে মিথ্যাবাদীর স্থান হয় না।" রামায়ণকার ইহার অনুমোদন করিয়া স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাম অগস্ত্যমুনির আশ্রমে যাইয়া যৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়ে মহর্ষি তাঁহাকে বলেন যে, মিথ্যাবাদী পরলোকে আপনার মাংস আপনি খাইয়া থাকে।"

এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেব যৎকালে স্বীয় আশ্রমে ধ্যানমগ্ন, সেই সময়ে একটী বিধবা তাঁহার নিকট যাইয়া আপনার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করে। বুদ্ধ বৃদ্ধাকে উত্তর করেন, যে বাটীতে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই, সেই বাটী হইতে তুমি যদি কিঞ্চিৎ তিল আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্রের পুনর্জীবন লাভের উপায় হইতে পারে। বৃদ্ধা সানন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু সেরূপ বাটী কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া বুদ্ধের নিকট প্রত্যাগত হইল এবং নিবেদন করিল যে, যে বাটীতে কেহ কখনও মরে নাই, এরূপ বাটী সংসারে নাই। যেরূপ মৃত্যু-বর্জ্জিত বাটী নাই, সেইরূপ দোষ-বর্জ্জিত সমাজও নাই। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে সকল সমাজেই দোষ বাহির করিতে পারা যায়। পরন্তু

ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা গুণগ্রাহিতা অধিকতর হিতকর।

যে সমাজ নানাপ্রকার বিপ্লব ও কালের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং যে সমাজে সংসারের সকল বিভাগেই বহু সুপ্রসিদ্ধ লোকের উদ্ভব হইয়াছে, সে সমাজ নিতান্ত হেয় হইতে পারে না। হিন্দু সমাজ বহু অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি বহুপরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল। পরন্তু ঐ সকল আক্রমণ সত্বেও হিন্দু সমাজ আপনার জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ধর্ম্মের বিশেষত্বই ইহার জীবনধারণশক্তির মূল। ধর্ম্মই এ দেশের সমাজ গঠনের মূলভিত্তি,—ধর্ম্মই হিন্দুজাতিকে প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যেও অতুলনীয় ও স্বতন্ত্র করিয়াছে। সুতরাং আমাদের সমাজতত্বের আলোচনা করিতে হইলে ধর্ম্মতত্বের আলোচনা স্বতই আসিয়া পড়ে। ভারতের ইতিহাসের একটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল ও হিন্দুধর্ম্ম আপনার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মুসলমানদিগের অভ্যুদয় ও উন্নতি জগতের ইতিহাসে একটী মহা সঙ্কটকাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কারণ প্রাচীন ও আধুনিক জগতের মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারময় যুগের প্রারম্ভ মুসলমানদিগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বিষম সঙ্কটকালে ভগবৎ প্রেরিত কয়েকজন মনীষী হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুদের আচারব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রেস্কট্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, মুসলমানেরা "বন্যার ন্যায় আপতিত হইয়া প্রাচীন সভ্যতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ও তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছিল।" ঐ সময়ে প্রাচীন ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। একমাত্র ভারতবর্ষই অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাতিভেদপ্রণালীর গুণে গ্রাম্যসমিতিসমূহ সমাজে এক একটী ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। মুসলমানধর্ম্মের শক্তি এই সুদৃঢ় গঠনপ্রণালী ভেদ করিতে পারে নাই। এই প্রথার গুণে যে সহিষ্ণুতাশক্তি বিকশিত হয়, তাহাই হিন্দু চরিত্রের মূল; উহারই বলে হিন্দুরা অগ্নি ও তরবারির গতিরোধে সমর্থ হইয়াছিল। হিন্দুকে 'মৃদুপ্রকৃতি' বলা হয় বটে, কিন্তু উহা নিন্দাসূচক নহে। কারণ হিন্দু পরদ্রোহী নহে,—হিন্দু স্বধর্ম্মে অটল ও ক্লেশসহিষ্ণু।

ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুকরণ সকল স্থলে সমাজের উন্নতি ও সুখসাধনের কারণ হয় না,—উহা সকল সময়ে আমাদের উপকারজনক হইতে পারে না। লেকি যথার্থই বলিয়াছেন,—"বীজ উপযুক্ত মৃত্তিকা পাইলেই অঙ্কুরিত হয়; মনোমুগ্ধকর নীতি ও সিদ্ধান্ত পাইলেই লোকে অনেক সময় তাহা অবলম্বন করিয়া বসে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে বলিবার যে অনেক কথা আছে, তাহা ভুলিয়া যায় এবং যে সমস্ত সুযুক্তি দ্বারা তাহারা রক্ষিত ছিল তাহা অগ্রাহ্য করে।" অতএব কোনও নূতন বিষয়ই সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, পরন্তু সমাজের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলি প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা আপনাদের অতীত ইতিহাসে ও সাহিত্যে গৌরব

বোধ না করে, তাহারা আপনাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হারাইয়া বসে।”

অন্যান্য সকল সমাজের ন্যায় আমাদের সমাজেরও কতিপয় বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক। পরন্তু, আশা করি, এই সংস্কার-সাধনে, এ স্থলে যে সকল মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইবে না, অথবা এ বিষয়ে কোনরূপ হঠ-কারিতা প্রদর্শিত হইবে না, কিংবা অবস্থার কথা সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ের ধ্বংসসাধন করা হইবে না।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সমাপ্ত।

পদ্যগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষযোগ।

কহিলা কিরীটি, হে কেশি-সূদন!
সন্ন্যাস ও ত্যাগের রহস্য এখন
পৃথক্ রূপেতে বুঝিতে মনন
পূরাও কামনা সে তত্ত্ব ব'লে॥ ১

ভগবান্ঃ—

সমুদয় কাম্য কর্ম্মের বর্জ্জন
“সন্ন্যাস”-আখ্যাত হে কুন্তিনন্দন!
আর সর্ব্ব কর্ম্ম-ফলের বর্জ্জন
"ত্যাগ” অভিহিত অবনি-তলে॥ ২

দোষযুক্ত ব'লে কোন কোন জন
কহেন কর্ম্মকে ত্যাজ্য অনুক্ষণ—
কেহ বা আবার কহেন এমন
দান-যজ্ঞ-তপ ত্যাজ্যই নয়॥ ৩

কর্ম্মের বর্জ্জনে হে কুন্তিনন্দন!
আমার সিদ্ধান্ত করহ শ্রবণ
সাত্ত্বিকাদি ভেদে হে নর-রতন!
সে ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হয়॥ ৪

দান-যজ্ঞ-তপঃ কর্ম্ম ধনঞ্জয়!
কর্ত্তব্য সবারই কভু ত্যাজ্য নয়
নিঃসন্দেহ ওই কর্ম্ম সমুদয়
মনীষিগণেরে পবিত্র করে॥ ৫

আসক্তি ও ফল করিয়া বর্জ্জন
কর্ত্তব্য জ্ঞানেই হে কুন্তিনন্দন!
বিহিত সতত কর্ম্ম-আচরণ
যাহাতে মানব অনা'সে তরে॥ ৬

নিত্য কর্ম্ম যাহা তাহার বর্জ্জন
নহে শ্রেয়ঃ কভু হে কুন্তিনন্দন!
নিত্য কর্ম্ম-ত্যাগ মোহ-নিবন্ধন—
তামস বলিয়া কথিত হয়॥ ৭

দৈহিক ক্লেশের ভয়ে যেই জন
করে দুঃখ জ্ঞানে কর্ম্মের বর্জ্জন
রাজসিক ত্যাগ হেতু সেইজন
ত্যাগ-ফল-লাভে সমর্থ নয়॥ ৮

কর্ম্ম সঙ্গ আর ফলাশা ত্যজিয়া
নিত্য কর্ম্ম যাহা—কর্ত্তব্য ভাবিয়া
সেই ত্যাগ পার্থ! সাত্ত্বিক বলিয়া—
হয় অভিহিত সংসার-মাঝে॥ ৯

মেধাবান্ আর বিচ্ছিন্ন-সংশয়—
সাত্ত্বিক ত্যাগীর দ্বেষ নাহি র'য়—
দুঃখের কর্ম্মেতে,—কিম্বা সুখময়—
কর্ম্মেও আসক্তি তাঁ'র না রাজে॥ ১০

দেহধারী জীব হে কুন্তিনন্দন!
নারেন ত্যজিতে কর্ম্ম কদাচন
কর্ম্মফলত্যাগী কিন্তু যেইজন
তাঁহারই প্রকৃত ত্যাগ এ ভবে॥ ১১

অত্যাগী যাহারা অবনী-ভিতরে
মরণের পরে তা'রা লোকান্তরে
ইষ্টানিষ্ট মিশ্র ফল ভোগ করে
না ভুঞ্জেন যাহা সন্ন্যাসী সবে॥ ১২

কর্ম্ম সকলের সিদ্ধির কারণ
বর্ণিত বেদান্তে যে পঞ্চ কারণ
আমার সকাশে হ'য়ে একমন
সে তত্ত্ব-পঞ্চক শুনহ এবে॥ ১৩

অধিষ্ঠান(১) পার্থ! আর অহঙ্কার(২)
সাধন-উপায়(৩) বিবিধ প্রকার
প্রাণাপানাদির(৪) বহুল-ব্যাপার
দৈব এই পঞ্চ কারণ ভবে॥ ১৪

কায়-মন আর বাক্যযোগে নর
ন্যায্য বা অন্যায্য হে কুরুপ্রবর!
যাহা কিছু ভবে করে নিরন্তর
হয় এই পঞ্চ কারণ তা'র॥ ১৫

থাকিতেও পার্থ! এ পঞ্চ কারণ
আত্মাকেই কর্ত্তা ভাবে যেই জন
দুর্ম্মতি অকৃত-বুদ্ধি সেইজন
অন্ধ নিঃসন্দেহ জানিও সার॥ ১৬

অহঙ্কার শূন্য নিষ্কাম যে জন
নিখিল প্রাণীকে ক'রেও হনন
না করেন নাশ কা'কেও সেজন
কিংবা বদ্ধ ন'ন কর্ম্মের জালে॥ ১৭

জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাতা আর
কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয় সবাকার
কর্ত্তা-কর্ম্ম পার্থ করণ সে আর
জানিবে কর্ম্মের আশ্রয় ব'লে॥ ১৮

গুণ-নিরূপক শাস্ত্রে ধনঞ্জয়
কর্ত্তা-কর্ম্ম-জ্ঞান ত্রিধা উক্ত হয়
গুণভেদে তাহা যে পার্থক্যময়
যথাবৎ তাহা শুনহ এবে॥ ১৯

যে জ্ঞানে বিভক্ত হে কুন্তিকুমার!
নিখিল ভূতেতে এক নির্ব্বিকার
অবিভক্ত ভাব দৃষ্ট অনিবার
সাত্ত্বিক সে জ্ঞান জেনো এ ভবে॥ ২০

পৃথকত্ব হেতু ভূত-নিবহেতে
জ্ঞানযোগে যেই হে পার্থ লোকেতে
ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝয়ে মনেতে
রাজস বলিয়া ঘোষিত তাহা॥ ২১

লৌকিক কর্ম্মই যাহে ধনঞ্জয়!
সারবান্ ব'লে বিবেচিত হয়
আসক্তি যাহার ক্রমে উপজয়
তত্ত্বজ্ঞানহীন তামস তাহা॥ ২২

স্ব স্ব বর্ণ আর আশ্রম-বিহিত,
কর্ত্তৃত্বেতে অভিনিবেশ-রহিত,
রাগ-দ্বেষ-হীন নিষ্কামানুষ্ঠিত—
কর্ম্মকে হে পার্থ সাত্ত্বিক বলে॥ ২৩

অহঙ্কার সহ ফলের আশায়
বহ্বায়াসে যেই কর্ম্ম সমুদায়
অনুষ্ঠিত পার্থ! হয় এ ধরায়
সুধীরা তাহায় রাজস বলে॥ ২৪

ভাবী শুভাশুভ ধর্ম্মাদির ক্ষয়
হিংসা ও পৌরুষ হে কুন্তিতনয়!
না বিচারি' মনে মোহে যাহা হয়
তামসিক তাহা মরত-তলে॥ ২৫

(১) অধিষ্ঠান=দেহ।
(২) অহঙ্কার=কর্ত্তা।
(৩) সাধন-উপায়=ইন্দ্রিয়সমূহ।
(৪) প্রাণাপানাদির বহুল ব্যাপার=চেষ্টাসমূহ।

অহংভাবহীন আসক্তি-রহিত
সহিষ্ণুতাশীল উৎসাহপূরিত
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার চিত—
কর্ত্তাকে সবাই সাত্ত্বিক বলে॥ ২৬

কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ভোগাসক্ত চিত
লুব্ধ হিংস্র আর শৌচ-বিরহিত
লাভালাভে সদা হর্ষ শোকান্বিত—
কর্ত্তাকে হে পার্থ! রাজস বলে॥ ২৭

অন্যায় আচারী জড় চেষ্টান্বিত
পরলাঞ্ছনক শঠ বিষাদিত
দীর্ঘসূত্রী সদা অলস-গর্ব্বিত—
কর্ত্তাকে সংসারে তামস বলে॥ ২৮

বুদ্ধি আর ধৃতি হে কুন্তিতনয়!
ত্রিবিধ বলিয়া অভিহিত হয়
পৃথক্ ভাবেতে সে তত্ত্ব-নিচয়
আমার সকাশে শুনহ এবে॥ ২৯

যেই বুদ্ধিযোগে নির্ব্বাণ-অভয়
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কার্য্যাকার্য্য ভয়
বন্ধের ভিন্নতা বিনিশ্চিত হয়
সাত্ত্বিক কথিত তাহা এ ভবে॥ ৩০

যেই বুদ্ধিবলে হে কুন্তিনন্দন!
ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য অনুক্ষণ
যথাবৎ জ্ঞাত নহে কোন জন
সুধীরা তাহায় রাজস বলে॥ ৩১

অধর্ম্মকে যাহে ধর্ম্মবৎ জ্ঞান;
আর আর যত পদার্থ ধীমান!
বিপরীতভাবে দৃষ্ট ভাসমান
তমোময়ী বুদ্ধি তাহায় বলে॥ ৩২

অব্যভিচারিণী যে ধৃতিতে মন—
প্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া হে কুন্তিনন্দন!
দেহের মাঝারে করয়ে ধারণ—
জানিবে তাঁহায় সাত্ত্বিক ব'লে॥ ৩৩

যেই ধৃতিযোগে হে কুন্তিনন্দন!
ফলাকাঙ্ক্ষা সহ ভবে নরগণ
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম করয়ে ধারণ—
জানিবে তাহায় রাজস ব'লে॥ ৩৪

যেই ধৃতিযোগে স্বপ্ন-শোক-ভয়
মদ ও বিষাদ হে কুন্তিতনয়—
করেনা বর্জ্জন মূঢ়সমুদয়
সে ধৃতির নাম তামসী জেনো॥ ৩৫

যে সুখে আসক্তি অভ্যাস বশতঃ
লাভ হ'লে যাহা দুঃখ অপগত
সুখের ত্রিবিধ সে তত্ত্ব ভারত।
আমার সকাশে একান্তে শুন॥ ৩৬

আদিতে যে সুখ সদা বিষোপম
পরিণামে কিন্তু অমৃতের সম
আত্মতৃপ্তিমূলা হে কুরুসত্তম!
সে সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাত॥ ৩৭

বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগে ধীমান্!
যে সুখ আদিতে অমৃতসমান
পরিণামে কিন্তু হলাহল জ্ঞান,
রাজস বলিয়া সে সুখ খ্যাত॥ ৩৮

কি আদি কি অন্তে যে সুখ নিশ্চিত
করয়ে বুদ্ধিকে মোহ-বিজড়িত
নিদ্রালস্য আর প্রমাদ-জনিত—
সে সুখ তামস বলিয়া জেনো॥ ৩৯

নরগণ মাঝে এ মর-সংসারে
অথবা স্বরগে ত্রিদশ-নিকরে
নাহি হেন কেহ হ'তে যেই পারে—
মুক্ত—প্রকৃতির ত্রিগুণ হেন॥ ৪০

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ধনঞ্জয়!
আর শূদ্রদের কর্ম্ম সমুদয়—
হ'য়েছে বিভক্ত জানিও নিশ্চয়
স্বাভাবিক গুণ-বিভেদ মতে॥ ৪১

শম-দম-শৌচ-আর্জ্জব-বিজ্ঞান
আস্তিক্য তপস্যা ক্ষমা আর জ্ঞান
ব্রাহ্মণগণের একটি ধীমান!
স্বভাবজ-গুণ হয় জগতে॥ ৪২

ধৃতি শৌর্য্য-তেজ আর সে দক্ষতা
লোক-নিয়ন্তৃত্ব বিমুক্তহস্ততা
অমর-প্রাঙ্গনে অপরাঙ্মুখতা
স্বভাবতঃ কর্ম্ম-ক্ষত্রিয়গণে॥ ৪৩

কৃষি ও বাণিজ্য গো-জাতি রক্ষণ
বৈশ্যদের কর্ম্ম হে কুন্তিনন্দন!
আর ত্রিবর্ণের সেবা শুশ্রূষণ
স্বভাবজ কর্ম্ম শূদ্র-জীবনে॥ ৪৪

স্বকর্ম্ম-নিরত মানব-নিকর
রহিয়া স্বকর্ম্মে নিবিষ্ট-অন্তর
লভয়ে যেরূপে সংসিদ্ধি* দুস্তর
শুন তা' আমার সকাশে এবে॥ ৪৫

যাঁ' হ'তে সবার প্রবৃত্তি সঞ্চার
ব্যাপ্ত যিনি পার্থ! নিখিল সংসার
স্বকর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চনা তাঁহার—
করিয়া মানব নির্ব্বাণ লভে॥ ৪৬

পূর্ণ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে
সদোষ-স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ জগতে
স্বভাবজ কর্ম্ম করি' কোন মতে—
পাপভাগী পার্থ! কেহ না হয়॥ ৪৭

হ'লেও স-দোষ হে কুন্তিনন্দন!
স্বভাবজ কর্ম্ম ক'র না বর্জ্জন
ধূমাচ্ছন্ন হুতাশনের মতন
কর্ম্মমাত্র দোষে আবৃত রয়॥ ৪৮

অনাসক্ত বুদ্ধি সর্ব্বত্র যে জন
—যতচিত্ত বীতস্পৃহ অনুক্ষণ
সন্ন্যাসের দ্বারা হে কুন্তিনন্দন!
অন্তিমে পরমা সিদ্ধি সে লভে॥ ৪৯

লভি' সিদ্ধি শেষে যাহে জীবগণ—
পরানিষ্ঠারূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন
সঙ্ক্ষেপতঃ তাহা হে কুন্তিনন্দন!
আমার সকাশে শুনহ এবে॥ ৫০

সত্ত্ব-বুদ্ধিশালী জনেরা ভারত!
ধৃতিবলে নিজে হইয়া সংযত
ত্যজিয়া শব্দাদি বিষয় তাবত
রাগ ও বিদ্বেষ রহিত হ'বে॥ ৫১

পূতস্থানবাসী মিতভোজী জন
কায়-বাক্য-মন করি' সংযমন
বৈরাগ্য আশ্রয় করি' অনুক্ষণ
যোগ ও ধ্যানেতে নিরত র'বে॥ ৫২

কাম-ক্রোধ-বল-দর্প-অহঙ্কার
পরিগ্রহ মাত্র করি' পরিহার—
লভেন মানব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার
হইয়া নির্ম্মল প্রশান্ত মন॥ ৫৩

ব্রহ্মভূত আর প্রসন্নাত্মা জন,
শোক-আকাঙ্ক্ষার বশীভূত নন;
ক্রমে সর্ব্বভূতে সমত্ব যখন,
মদ্ভক্তি তখন সে জন পা'ন॥ ৫৪

নির্গুণ-ভক্তিতে জীব ধনঞ্জয়!
স্বভাব-স্বরূপ—মম জ্ঞাত হয়;
অন্তে জীব মোতে পশয়ে নিশ্চয়
লভে যদি ভবে আমার জ্ঞান॥ ৫৫

আমার একান্ত ভক্ত ধনঞ্জয়!
করিয়াও সদা কর্ম্ম-সমুদয়
আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয়—
পদ অন্তকালে নিশ্চয় পান॥ ৫৬

চিত্তযোগে তুমি কর্ম্ম-সমুদয়
অর্পিয়া আমায় মন্নিষ্ঠ হৃদয়—
হইয়া বুদ্ধিকে করিয়া আশ্রয়,
সতত হে পার্থ! মচ্চিত্ত হ'বে॥ ৫৭

হইলে মচ্চিত্ত প্রসাদে আমার
দুঃখরাশি হ'তে হ'বে তুমি পার,
না শুনিলে দম্ভে বচন আমার
লভিবে বিনাশ তুমি এ ভবে॥ ৫৮

অহঙ্কার বশে "করিব না রণ"
হয় যদি তব মনন এমন
মিথ্যা সে ধারণা হে কুন্তিনন্দন!
নিয়োজিবে তোমা স্বভাবই তা'র॥ ৫৯

* সংসিদ্ধি = নির্ব্বাণ বা মোক্ষ।

স্বাভাবিক কর্ম্মে হে কুন্তিনন্দন!
বদ্ধ তুমি ভবে; মোহ-নিবন্ধন—
যাহে তব নাহি হ'তেছে মনন
অবশে নিরত হইবে তা'য় ॥ ৬০

সর্ব্বভূত হৃদে হে কুন্তিনন্দন!
ঈশ্বর নিরত বিরাজিত র'ন,
যন্ত্রারূঢ় সম এই ভূতগণ—
তাঁহারই মায়ায় ভ্রামিত ভবে ॥ ৬১

সর্ব্বতোভাবেতে হে কুন্তিনন্দন!
সে ঈশ্বরে তুমি মাগহ শরণ
তাঁহারই প্রসাদে শান্তি সুপরম—
নিত্য ধাম আর, তা হ'লে পা'বে ॥৬২

গুহ্য হইতেও অতি গোপনীয়
এ জ্ঞান তোমায় কহিনু কৌন্তেয়!
বিচারি' বিশেষ যাহা বুঝ শ্রেয়ঃ
সেই মত তুমি করহ এবে ॥ ৬৩

সকলের চেয়ে অতি গুহ্যতম
শুন বাক্য মম আবার পরম
তুমি হে আমার অতি প্রিয়তম
কহি তাই এবে হিতার্থিভাবে ॥ ৬৪

মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত হও অনিবার
হ'য়ে পূজি' মোরে কর নমস্কার
প্রিয় তুমি মোর তাই অঙ্গীকার—
—আমাকেই তুমি তা' হ'লে পা'বে॥৬৫

সমুদয় ধর্ম্ম করি' পরিহার
মাত্র লহ তুমি শরণ আমার
করিও না পার্থ বৃথা শোক আর
আমা হ'তে তুমি বিমুক্ত হ'বে ॥ ৬৬

তপঃ-ভক্তি-সেবা-বিহীন যে জন
অসূয়া আমার করে সর্ব্বক্ষণ—
এ গীতার তত্ত্ব তাঁ'হে কদাচন
কহিও না তুমি—বুঝিয়া সার ॥ ৬৭

গুহ্য এ পরম শাস্ত্র যেই জন
ভক্ত কাছে মম করিবে কীর্ত্তন
পরাভক্তি মোতে লভি' সেইজন
লভিবে নিশ্চয় ধাম আমার ॥ ৬৮

মানুষের মাঝে তাঁর চেয়ে আর
প্রিয়কারী কেহ নহেক আমার
তাঁহা হ'তে কভু কেহই আবার
হ'বে না আমার প্রিয় এ ভবে ॥ ৬৯

আমাদের ধর্ম্ম্য এ বার্ত্তা যে জন
করিবেন সদা যত্নে অধ্যয়ন
জ্ঞান-যজ্ঞে তাঁ'র হে কুন্তিনন্দন!
আমারই অর্চ্চনা-সাধন হবে ॥ ৭০

অসূয়া-রহিত যেই জনগণ
শ্রদ্ধাসহ ইহা করেন শ্রবণ
সর্ব্বপাপ-পাশ করিয়া ছেদন
শুভলোক তাঁ'রা লভেন সবে ॥ ৭১

একান্ত-অন্তরে হে কুন্তিনন্দন!
করিলে ত তুমি এ গীতা শ্রবণ
অজ্ঞান-সম্ভূত মোহের বন্ধন
গেল ত টুটিয়া তোমার এবে ॥ ৭২

উত্তরিল পার্থ—"প্রসাদে তোমার
মোহ নষ্ট—স্মৃতি-সঞ্চার আমার
গেল টুটে মোর সংশয়-আঁধার
পালিব এখন আদেশ তব" ॥ ৭৩

কহিলা সঞ্জয়—"শুন হে রাজন্!
মহাত্মা কৃষ্ণ ও পার্থের এমন
অত্যদ্ভুত ঘোর রোম-হরষণ—
সংবাদ শ্রবণ করেছি সব ॥ ৭৪

শ্রীবেদব্যাসের প্রসাদে রাজন!
যোগেশ্বর ধাতা কৃষ্ণের আপন—
মুখ-হ'তে গুহ্য পরম-বচন
যোগতত্ত্ব আর শুনিনু কাণে ॥ ৭৫

কৃষ্ণ ও পার্থের অদ্ভুত এমন
পবিত্র সংবাদ যতই রাজন!
করিতেছি আমি অন্তরে স্মরণ—
ততই পুলক-সঞ্চার প্রাণে ॥ ৭৬

শ্রীহরির সেই শুনহে রাজন!
অত্যাশ্চর্য্য রূপ করিয়া স্মরণ—
পুনঃ পুনঃ আমি বিস্ময়ে মগন
অন্তরে সুখের প্রবাহ বহে ॥ ৭৭

যে পক্ষে স্বয়ং কৃষ্ণ যোগেশ্বর
রাজেন যথায় পার্থ-ধনুর্দ্ধর
শ্রী-বিজয়-নীতি-ভূতি নিরন্তর
ধারণা তথায়—আমার রহে ॥ ৭৮

শ্রীহরিগোপাল বসু।

সম্পূর্ণম্।

সিংহলরাজ শ্রীশ্রীবিমলধর্ম্ম।

মধ্য সিংহলের খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্ব সময়ে, তাঁহার অধিকার মধ্যে, নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সংঘটন হইয়াছিল। তৎকালে সিংহলদ্বীপের অপরাপর প্রদেশের নরপতিগণও অল্পাধিক অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হওয়ায়, প্রায় সমগ্র সিংহলদ্বীপেই অত্যন্ত অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। বিশেষতঃ, সেই সময়ে, ওলন্দাজদিগের নানারূপ অত্যাচারে, সিংহলনিবাসিগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। রাজা ধর্ম্মপাল, ওলন্দাজ মিশনারীদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিতেন এবং যথেষ্ট ভয়ও করিতেন। ওলন্দাজ মিশনারীগণের প্ররোচনায়, তিনি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর হইতেই তিনি সকলকেই খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণের নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেন। রাজা ধর্ম্মপালের এই অত্যাচারে নিরতিশয় উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহার অধিকারভুক্ত স্থানসমূহের অধিকাংশ অধিবাসীই উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছিল। ইঁহার রাজত্ব সময়ে কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি পারিবারিক, সকল বিষয়েই ঘোরতর বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। এই ঘোর অশান্তির সময়ে, সিংহলদ্বীপের উত্তরপ্রান্তস্থিত জাফনা (Juffna) দ্বীপের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজা, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও সুনিয়মে রাজকার্য্য-পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি ৬০০ ছয় শত খ্রীষ্টিয়ানকে সিংহল হইতে বিতাড়িত করিয়া কঠিন আদেশ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন খ্রীষ্টিয় মিশনারী যেন মান্নারে প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। সে সকল কাহিনী প্রবন্ধান্তরে বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

১৫৯২ খ্রীষ্ট অব্দে, যখন মহামতি বিমল ধর্ম্ম, রাজা প্রথম রাজসিংহকে পরাজিত করিয়া, স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কান্দি (Candy) নগরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময়ে তদ্দেশবাসিগণ আনন্দ-উৎফুল্লচিত্তে রাজা বিমল ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিল। এই নরপতি, রাজদণ্ড গ্রহণানন্তর, দুরাচারদিগকে দমন করিয়া স্বধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। ইনি পরম ন্যায়নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ইনি হিন্দুর দেবদেবী মানিতেন ও স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি পূজা করিয়া, পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি ও উন্নতি কল্পে, তিনি অপরিসীম যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মকেও ইনি ঘৃণা করিতেন না। পলায়িত

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে সাদরাহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ অধিকার-মধ্যে বাস করাইলেন। তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত যথোপযুক্ত মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থ ও ব্যবহারনীতির সম্যক্ সংস্কার করিয়া, যাহাতে রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, তাহার প্রতিবিধান করিলেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে প্রতিপালন করিয়া, স্বীয় রাজ্য-মধ্যে পরম শান্তি-স্থাপন করিলেন। রাজা বিমলধর্ম্মের অপরিসীম সদ্‌গুণে প্রজাসমূহ সম্যক্ বশীভূত হইয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

সিংহলদ্বীপ মধ্যে কান্দির রাজগণই চিরকাল প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। এই স্থানের রাজবংশের নিকট বুদ্ধদেবের যে প্রকৃত দন্তটী ছিল, ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে, বৌদ্ধবর্গের পরম পূজ্য, বুদ্ধদেবের সেই প্রকৃত দন্তটী, পর্টুগীজেরা গোয়ায় (Goa) লইয়া গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। কান্দির অধিবাসিবৃন্দের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, যে ব্যক্তির নিকট বুদ্ধদেবের সেই অমূল্য দশনটী থাকিবে, তিনিই সিংহলদ্বীপের প্রকৃত অধীশ্বর হইবেন।

রাজা বিমলধর্ম্ম, একটী দন্ত বাহির করিয়া তাহা সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, "এইটীই শাক্যসিংহের প্রকৃত দন্ত। এই পবিত্র বস্তুটী, অতীব যত্নসহকারে এতদিন সবরগমুবতে অতি সংগোপনে সংরক্ষিত হইয়াছিল।" এই দন্ত দৃষ্টে, সকলেই চমৎকৃত হইয়া ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীশ্রীবিমল ধর্ম্মকেই সিংহল দ্বীপের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল।

রাজা বিমলধর্ম্মের অশেষ গুণ ছিল। প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলার্থ তিনি না করিয়াছিলেন, এরূপ কার্য্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বরাজ্য মধ্যে সরোবর ও খাল খনন, নূতন নূতন রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ, দেবালয়, মঠ ও বিহারাদি নির্ম্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত, সাধারণ পাঠাগার সংস্থাপন, প্রজাবর্গের কর-ভার-লাঘব, বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির ব্যবস্থা, প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলকর কর্ম্মের দ্বারা, প্রভূত যশঃ-সুখ্যাতি ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া, পরম মঙ্গলময় শান্তিধামে গমন করেন। এই মহাত্মার মৃত্যুতে তদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মহাশোকে অভিভূত হইয়াছিল।

রাজকুলতিলক শ্রীশ্রীবিমলধর্ম্মের পরলোক প্রাপ্তির পর, তাঁহার ভ্রাতা সেনারত রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পর্টুগীজদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া, কলম্বো (Colombo) নগর করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত তিনি কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সেনারতের মৃত্যু হয়। সেনারতের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রাজসিংহ স্বীয় পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবন ও রাজত্বকাল বহুবিধ বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ। প্রস্তাবান্তরে সে সকল অদ্ভুত কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

বাহন-তত্ত্ব।

অভ্যুত্থানের পর পতন, অত্যুন্নতির পর অবনতি এবং অত্যুত্তেজনার পর অবসাদ— যেন অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক। জড় নরের উপাসনা এবং যাগ যজ্ঞ হোম ও বলির একটা মহা-কুজ্ঝটিকা বহিয়া যাইবার পরেই ভারতে এক মহা-আলোকের যুগ দেখা দিয়াছিল। তখন গৃহে গৃহে সামগান ও যত্র তত্র বেদধ্বনি কুহরিত হইয়া ভারতকে আনন্দ-বিনিকেতনে পরিণত করিতেছিল। ঋষিতনয়গণ, ব্রহ্মচারী, ঋষিকন্যকাগণ, ব্রহ্মচারিণী এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিবৃন্দ ব্রহ্মপূজা ও ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া অধ্যাত্মজগতের বেলোর্দ্ধসীমায় আরোহণ করিয়া সমস্ত জগৎকে বিস্ময়াকুলিত করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তভাণ্ডার পরাবিদ্যা উপনিষৎসমূহের পঠন-পাঠনাদ্বারা ভারতবাসী মর্ত্ত্য হইয়াও অমরত্বলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু দিন কাহারও সমান যায় না, চক্রনেমির ন্যায় সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া জগৎকে দর্শন দিয়া থাকে। আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলোর সমাগম অনিবার্য্য। সেই উপনিষদ্যুগের অত্যুন্নতির পর জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতাভব্যতার আদিনিদান ভারতে এমন একটা মহা-কৃষ্ণযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাহার প্রভাব ও মোহমাহাত্ম্যে অত্যুত্থিত ভারতের পতন ঘটিল। ভারতবাসী প্রমাদ, কুসংস্কার ও নানা উপধর্ম্মের দাসানুদাস হইয়া অকল্যাণের পদে বিলুণ্ঠিত হইলেন, মোহের একটা মহান্ধকার আসিয়া ভারতকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভারত আপনার সত্তা আপনি ভুলিয়া গেলেন। বিবেক ও যুক্তি দূরে গেল, বেদ, উপনিষৎ ও স্মৃতিপ্রভৃতির পঠন-পাঠনা বিলুপ্ত হইল, কুসংস্কার আসিয়া সত্যের সিংহাসন যুড়িয়া বসিল। তাই ভারতে সতীদাহরূপ করাল-দংষ্ট্র মহারাক্ষস দেখা দিল এবং বাল্য-বিবাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপরূপ ভীষণ বর্ব্বরতা আসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে ভারত গোলকাহত অর্ণবযানের ন্যায় অধঃপাতের মহাসাগরে ডুবিয়া গেল। সেই মহামোহের তরঙ্গাভিঘাতেই ঘূর্ণিতমূর্দ্ধা হইয়া আজি আমরা কপোলকল্পিত উপকথা, সাবিত্রীসত্যবানের পুস্তির গল্প সত্য বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইলাম ও ব্রহ্মার বাহন হংস, শিবের বাহন বৃষ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, গণেশের বাহন ইন্দুর, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর এবং যমের বাহন বিলম্বিতগলঘণ্ট বন্য মহিষ স্থির করিলাম। মহীয়ান্ শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া লঘীয়ান্ ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বলিতেছেন ;—

ইদানীং চেৎ ভীতো মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ।

শঙ্করাচার্য্যঃ।

"ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥"
"বড় পুত্র গজানন, চারি হাতে খান"।
"তাঁহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর"।
"ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয়, ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই, ময়ূরে উড়ায়"॥

ভারতচন্দ্র।

বস্তুতই কি এই সকল কথা প্রকৃত? বস্তুতই কি ব্রহ্মা হংসে চড়িয়া বেড়াইতেন? বস্তুতই কি নরকের রাজা যম মহিষপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাড়ী বাড়ী মড়া কুড়াইয়া ফিরিতেন? বস্তুতই কি দেবদেব মহাদেব শিবের একটা বুড়া বলদ ভিন্ন আর কোন বাহন ছিল না? এই সকল সর্ব্বৈব মিথ্যা,

অলীক ও অমূলক। তবে কি আমাদিগের উপাস্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হংসবাহন নহেন? অবশ্যই একজন ব্রহ্মা "হংসবাহন" আখ্যার বিষয়ীভূত ছিলেন, কিন্তু উহার অক্ষরার্থ ও পদার্থগ্রহ এরূপ করিতে হইবে না যে, সে ব্রহ্মা বড় একটা পাটনাই রাজহাঁসের পিঠে চড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেন, তাহারই বাচ্চাকাচ্চার পুচ্ছে কলম গড়িয়া আমরা লিখিয়া থাকি। নয় কেন? এই ত সমগ্র ভারতের যাবতীয় নর নারী হাঁসের উপর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা গড়াইয়া পূজা করিতেছেন, এবং মহামহোপাধ্যায় শাব্দিকগণও "হংস-বাহনঃ" শব্দের নিরুক্তি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন ;—

হংসো বাহনং যস্য স হংসবাহনঃ ?

সমগ্র ভারতে এত অসংখ্য সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী নিত্য বিরাজমান, তাঁহারাও কি শাস্ত্রের প্রকৃতার্থের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই? তাঁহারাও কি তবে হংসবাহন প্রভৃতি শব্দের পদার্থগ্রহবিষয়ে অসমর্থ?

একথা শুনিতে এইরূপই অসম্ভব বটে, কিন্তু বেদের বহুকাল পরে ব্রাহ্মণগ্রন্থসকল বিরচিত হওয়াতে তত্তদ্‌গ্রন্থসমূহে নানা অলীক কল্পিত গল্পের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির ছায়া লইয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থের বহুকাল পরে পুরাণাদি বিরচিত হওয়াতে পুরাণসকলও ঐরূপে পুস্তির গল্পের ধাপা-বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত রামায়ণ-মহাভারত ও উক্ত অবকররাশির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি আমাদিগের দেশে বিকারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, আমরা বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে বিবাহের নির্ব্বন্ধপুরুষ প্রজাপতির পরিবর্ত্তে বনের পতঙ্গ ফড়িং প্রজাপতি আঁকিয়া দিতে আজিও লঘুহস্ত, এবং কাহার ঘরে ফড়িং প্রজাপতি বসিলে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া থাকি, সেই বাটীর কাহারও না কাহারও শীঘ্রই বিবাহ হইবে, না হয় তাঁহারা প্রভূত ধন লাভ করিবেন!! আমাদিগের বর্ব্বরতার মাত্রা এতদূর বেলোর্দ্ধসীমায় আরোহণ করিয়াছে যে, এই সকল কু-সংস্কারের উপর আমাদের একটা মায়া ও দখলি স্বত্বও জন্মিয়াছে এবং আমরা আজি ইহা সহজে পরিত্যাগ করিতেও অসমর্থ! কে জানে যে হতভাগধেয় আমাদিগকে আর কতকাল এই মহাভ্রান্তির জের টানিতে হইবে? ফলতঃ যখন এ পাশ্চাত্য মহা আলোকের যুগেও মানুষ মানুষ-চন্দ্রবংশকে Lunar Race ও সূর্য্যবংশকে Solar Race বলিয়া লিখিতে ব্যস্ত সমস্ত, তখন পতনের সেই মধ্যযুগে কেন এই সকল ব্যভিচার দেখা না দিবে? আবার বেদস্মৃতিরূপ মহান্ চন্দ্র সূর্য্য অস্তাচলগামী হইলে যখন কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ এদেশে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইতে লাগিল, তখন পৌরাণিক ভ্রান্তির উদ্বমনকারী ওঝা-পুত্রের মাহাত্ম্যে আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম—যে আকাশের চাঁদ, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পূর্ব্ব পিতামহ, তাঁহার জন্ম আবার সমুদ্রমন্থনে!

সাগর মন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ রচনা করিলা কবিবর॥

কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাসের কবিত্ব যে অতীব গভীর ও হৃদয়োন্মাদকর, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? কিন্তু তাঁহার এ বর্ণনা, প্রকৃত ঐতিহ্যের অপরিপন্থী নহে। ফলতঃ চন্দ্রবংশের প্রবর্ত্তয়িতা মানুষ চন্দ্র, অত্রিনন্দন। তাঁহার রাজ্য বা দেশ চন্দ্রমণ্ডল নামে বিশেষিত,

এবং উহা বর্ত্তমান মধ্য সাইবিরিয়ার প্রদেশ-বিশেষ। সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ অদিতি-নন্দন সূর্য্যের মণ্ডল বা সামন্তরাজ্যও উক্ত চন্দ্রমণ্ডলের অনতিদূরে স্বর্গোপরি সংস্থিত এবং উহাই আদি পিতৃলোকসনাথ আদি স্বর্লোক বা প্রথম ব্যোম। চন্দ্রমণ্ডল বা চন্দ্রের রাজ্য, আয়তনে সূর্য্যমণ্ডল বা সূর্য্যের রাজ্যের দ্বিগুণ। কিন্তু আমরা ভ্রান্তির দাস হইয়া আজি এই ভৌম চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্য-মণ্ডলকে আকাশে চড়াইয়া দিয়াছি ও এই মানুষ চন্দ্র সূর্য্যকে আকাশের জড় চন্দ্রসূর্য্য ঠিক করিয়া রসাতলের তলায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই মানুষ চন্দ্রসূর্য্যের সহিত দানবপতি বিপ্রচিত্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর রাহুর ঘোরতর শত্রুতা ছিল, তিনি অবসর পাইলেই চন্দ্র ও সূর্য্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আমরা আজি জড় চন্দ্রসূর্য্য-সমাচ্ছাদনকারিণী ছায়াবিশেষকে রাহু নামে সমলঙ্কৃত করিতে সিদ্ধহস্ত! হরিবংশ বলিতেছেন,—

> সিংহিকায়া মথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তদা॥ ৯৭
> রাহুর্জ্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ চন্দ্রসূর্য্যবিমর্দ্দনঃ॥১০১—৩অ

সিংহিকার গর্ভে দানবপতি বিপ্রচিত্তির ঔরসে বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহারাজ রাহু। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে সর্ব্বদা হিংসা করিতেন।

চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা ছিলেন; কিন্তু জড় বা দুই ভাই ছিলেন না। সূর্য্যের প্রকৃত নাম বিবস্বান্, সূর্য্য-উপাধি। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র যম, পিতৃলোকের (Father Land's) রাজা হয়েন, কনিষ্ঠ পুত্র মনু আসিয়া অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রাহু, দানব-সন্তান, মনুষ্য ও দেবগণ এক সঙ্গে থাকিয়া দৈত্য ও দানবগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন, রাহুর হস্তে চন্দ্র ও সূর্য্যকে বহুবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিকগণের মহাকবলে কবলিত হইয়া আজি মানুষ দেবতা চন্দ্রসূর্য্য জড়ে ও দানব রাহু ছায়াতে বিপরিণত! কেবল পুরাণ নহে, স্বয়ং ছান্দোগ্যও এই মহাকুহকের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে পারেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন,—

> "শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে
> অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহো
> র্মুখাৎ প্রমুচ্য ইত্যাদি।"

শঙ্করও বলিয়াছেন, "চন্দ্রইব চ মুখাৎ রাহুগ্রস্ত স্তস্মাৎ রাহো র্মুখাৎ প্রমুচ্য ইত্যাদি"। সুতরাং এই সকল পৌরাণিক ভ্রান্তি যে কতকাল ভারতে আসন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ভাবনারও অতীত পদার্থ। চন্দ্র ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী ও উচ্চৈঃশ্রবঃপ্রভৃতি যেন সমুদ্রমন্থনসম্ভব, কবির এই উৎপ্রেক্ষাগর্ভ বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়া ভারতবাসী আজি প্রমাদের দাস, এবং মানুষ চন্দ্রসূর্য্য আজি জড়ে পরিণত! কেবল ইহা নহে—আকাশের জড় সূর্য্য বেচারা আজি "আদিত্য" ও "কাশ্যপেয়" বিশেষণের হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি পাইতে অসমর্থ! মানুষ-বিবস্বান্ বা মানুষ-সূর্য্যই অযোধ্যাধিপতি বৈবস্বত মনুর পিতা এবং সেই বিবস্বান বা সূর্য্যই অদিতিনন্দন ও কশ্যপাত্মজ বটে, কিন্তু প্রমাদের দাস ভারতসন্তান আজি আকাশের জড়ে নরের মর্য্যাদা চড়াইয়া দিয়া বলিতেছেন;—

> জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
> ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥
> প্রাক্ঃ।

১ বস্তুতই কি আকাশের জড় সূর্য্য কশ্যপাত্মজ বটে? অমরও বলিয়া গিয়াছেন;—

> সূরসূর্য্যার্য্যমাদিত্যদ্বাদশাত্মদিবাকরাঃ। অমরঃ।

এবং মহামতি রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী আদিত্য শব্দের নিরুক্তিনির্দ্দেশচ্ছলে বলিতেছেন,—

"অদিতে রপত্যং পাঃ আদিত্যঃ।
আদিত্যশ্চ আদিদেবত্বাদিতি" মৎস্য পুরাণং।

ফলতঃ ইহার একটী কথারও কোন প্রকৃত নিদান নাই, ইহার নিদান প্রমাদ ও পৌরাণিক ভ্রান্তি। যখন মানুষ ভৌম স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেলেন, সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ মানুষ-সূর্য্যের কথাও বিস্মৃত হইলেন, তখন তাঁহারা আকাশের জড় সূর্য্যকেই সূর্য্যবংশের দাদা পরদাদা ঠিক করিয়া মানুষ দেবতা-সূর্য্যের ন্যায্য পৈতৃক বিশেষণগুলি আকাশের সূর্য্যে আরোপিত করিয়া ভ্রান্তির শেষ সীমা দেখিয়া-লইলেন। কিন্তু কেহই ভাবিলেন না যে, আকাশের জড় সূর্য্য কেমন করিয়া অদিতি-নন্দন ও কশ্যপের আত্মজ হইতে পারে? মহামতি সায়ণও এই ভ্রমের দাস হইয়া ঋগ্বেদের মার্ত্তণ্ড আখ্যানের কলুষিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলিবে, স্বয়ং ঋগ্বেদও ত আকাশের সূর্য্যকে "আদিত্য" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন;—

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্ মো অহং দ্বিষতে রধম্।
১৩—৫০ সূ—১ ম।

অয়ং পুরোবর্ত্তী আদিত্যঃ অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ, বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্। কিং কুর্ব্বন্? মহ্যং দ্বিষন্তং রন্ধয়ন্ মমোপদ্রবকারিণং রোগং হিংসন্ অপিচ অহং দ্বিষতে অনিষ্টকারিণে রোগায় মো রধম্ নৈব হিংসাং করোমি। সূর্য্য এব অস্মদনিষ্টকারিণং রোগং বিনাশয়তু ইত্যর্থঃ। সায়ণঃ।

ইহাও অভ্রান্তি নহে। ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে জড় নয় উভয় সূর্য্যই আদিত্য বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সুতরাং এ ভ্রান্তি যে আধুনিক, তাহা আমরাও বলি না।

অদিতিনন্দন সূর্য্য, সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ ও অযোধ্যাপুরীর স্থাপয়িতা বৈবস্বত মনুর পিতা। আকাশের জড় সূর্য্য, না অদিতিপ্রসূত, না উহা কশ্যপাত্মজ, সুতরাং যে কালেই উহা আদিত্য বা কাশ্যপেয় বলিয়া বিশেষিত হউক না কেন; উহা যে প্রমাদ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এখনও লোকে এ ভ্রমের সংশোধন করিতে পারেন। ঐরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা কার্ত্তিককে ময়ূরে, গণেশকে ইন্দুরে, ব্রহ্মাকে হংসে ও নিরপরাধ মহাদেবকে একটা বুড়া বলদে চড়াইয়া মহাভ্রমের মৌরশিপাট্টা পাইয়া বসিয়াছি।

আমরা প্রত্নতত্ত্ববারিধির প্রথম ভাগে দৈবত-কাণ্ডে ব্রহ্মার প্রকরণে বলিয়াছি, উত্তর কুরুবাসী সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাই "হংসবাহন" বিশেষণের বিষয়ীভূত ছিলেন। কিন্তু এই সকল হংস, ময়ূর ও মূষিকাদি বাহন, জলের হাঁস, বনের ময়ূর ও গর্ত্তের ইন্দুরাদি নহে। পূর্ব্ব-কালে মানুষেরা কেহ হংস, কেহ ময়ূর, কেহ মূষিক, কেহ বৃষ ও কেহ ঋক্ষবানরাদি নামে সংজ্ঞিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যদিগের আখ্যাবিশেষ। যেমন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখনও Hog, Pig, Fox, ও Partridge প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে, তেমনই আমাদের দেবলোকেও ঐরূপ মনুষ্যেরা জন্তু ও পশু-পক্ষীর নামে সংজ্ঞিত হইতেন। বিনতার সন্তানেরা গরুড়প্রভৃতি পক্ষি-উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন, কিন্তু ডানা বা পাখনাওয়ালা বনের পক্ষী ছিলেন না। বিনতা আমাদের মাতৃষসা। আমরা মানুষ, আর আমাদের মাতৃষস্রেয়গণ বনের পক্ষী ছিলেন, ইহা প্রকৃত কথা নহে। কদ্রুর গর্ভজাত সন্তানেরাও নাগ, সর্প ও তক্ষকাদি উপাধিতে বিমণ্ডিত ছিলেন, পরন্তু তাঁহারা গর্ত্তের সাপ ছিলেন না। বাসুকীর ভগিনী

জরৎকারুকে (মনসাদেবীকে) আমাদের মানুষ জরৎকারু মুনি বিবাহ করেন; স্বয়ং অর্জ্জুন নাগকন্যা উলুপীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরা কি তাহাতে ইহাই বুঝিতে বাধ্য হইব যে, তাঁহারা করালদংষ্ট্রা ঊর্দ্ধফণা সর্পী বিবাহ করিয়াছিলেন? ফলতঃ উঁহারা নাগজাতীয় মনুষ্য ছিলেন। পরিক্ষিতকেও তক্ষ তক্ষ শব্দকারী চতুষ্পদ তক্ষকে দংশন করে নাই, তক্ষক বা নাগজাতীয় লোকেরাই বধ করিয়াছিল, জনমেজয়াদি পিতৃবধামর্ষপ্রণোদিত হইয়া উঁহাদের অনেকেরই প্রাণবধ করেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহাই অলঙ্কারচ্ছলে সর্পসত্র নাম দিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন মাত্র। মহাভারতে স্বয়ং ব্যাসদেবই বলিয়াছেন,—

"পুত্রোয়ং মম সর্প্যাং জাতো
মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্নঃ"

অর্থাৎ মহর্ষি শ্রুতশ্রবাঃ এক নাগকন্যা বিবাহ করিলে তদ্গর্ভে সোমশ্রবানামে তাঁহার এক পুত্র হয়। তিনি অতি তপস্যাবান্ ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণ যে কালিন্দীর কাল জলে যাইয়া কালিয় সর্পকে দমন করিয়াছিলেন* যাঁহার ছবি সর্পরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে, সেই কালিয়ও গর্ত্তের বিষধর সাপ ছিলেন না, নাগজাতীয় মানুষ ছিলেন। আসামের নাগারা ও আমাদের দেশের নাগোপাধিক পিঙ্গলাদি মহাত্মারা কি মানুষ নহেন? বলিবে তবে কেন ভাগবত বর্ণনা করিলেন;—

ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং।
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।
৭—৩১ অ—৭ স্কন্ধ।

ভাগবতপ্রণেতা কুবিন্দ পণ্ডিত অথবা বোপদেব অতি আধুনিক ব্যক্তি। তিনি ত এই পৌরাণিক ভ্রান্তির দাস হইতে পারেনই? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড় বড় ঋষিরাও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার অপরাধ আর গুরুতর কোথায়? হরিবংশ বলিয়াছেন;—

দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেংথ নক্ষত্রাদ্যা দদৌ প্রভুঃ। ৪৮
তাসু দেবাঃ খগা নাগা গাবো দিতিজদানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরস শ্চৈব জজ্ঞিরে হন্যাশ্চ জাতয়ঃ। ৪৯—১অ

প্রজাপতি দক্ষ আপনার ষাট কন্যার মধ্যে সাধ্যাপ্রভৃতি দশটী কন্যা ধর্ম্মকে, অদিতিপ্রভৃতি ত্রয়োদশটী কন্যা কশ্যপকে ও অবশিষ্ট সাতাইশটী নক্ষত্রনামা কন্যা, চন্দ্রবংশের নিদান অত্রিনন্দন চন্দ্রকে প্রদান করেন। ইঁহাদিগের গর্ভেই দেবতা, মনুষ্য, খগ, নাগ, গাব, দৈত্য, দানব ও অন্যান্য জাতির উৎপত্তি হয়।

খগ কাহারা? গরুড়প্রভৃতি বিনতানন্দনেরা। জটায়ু ও সম্পাতিপ্রভৃতিও এই বংশের অনন্তরপুরুষ। গো ও বৃষও এক শ্রেণীর মানুষের আখ্যাবিশেষ ছিল। কবি যে বলিয়াছেন;—

খগচর নগধর ফণধর শরণ।

এই খগ শব্দ কোন বন্য পক্ষীর সূচনা করে না। বিষ্ণু গরুড়ের পৃষ্ঠেও চড়িতেন না। জরৎকারু মনসা ও বাসুকী-প্রভৃতি নাগবংশীয় লোক ছিলেন। দেবাসুরের ন্যায় নাগ ও পক্ষীদিগের মধ্যেও ঘোরতর শত্রুতা ছিল। মহাভারতে যে গরুড়ের চঞ্চু-ব্যাদানপূর্ব্বক নাগভক্ষণের কথা বিবৃত আছে তাহা আলঙ্কারিক বাক্য মাত্র। তাঁহাদের ভয়েই নাগেরা কতক আসাম ও পাতালে প্রবেশ করেন, তাই পাতালের নামান্তর নাগলোক। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন;—

বর্ত্তে তত্র দৈত্যপতেঃ কেশরেনগয়োত্তমম্। ৩৮

* "গিয়ে কালিন্দহের কাল জলে ভুজঙ্গ জয় করেছ।"—কবির গান।

তত্রান্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদাযুতঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ বাসুকির্নাম নাগরাট্। ৩৯
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্। ৪০
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্। ৪১
অসুরাশীবিষৈঃ পূর্ণং উদ্ধৃতৈ দেবশত্রুভিঃ। ৪২
তথৈব নাগনগরৈ র্ঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ। ৪৩
৫০ সর্গ।

তাহা হইলেই বুঝা গেল পুরাণের এই সকল ঋক্ষ,* ভল্লুক, বানর ও গো-নাগ প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যশ্রেণীবাচী, পরন্তু জন্তুসংসূচক নহে। রামায়ণে যে বানরগণকে নখদংষ্ট্রায়ুধ ও লাঙ্গুলধারী বলা হইয়াছে ও জটায়ুর পক্ষ-চ্ছেদের কথা বিবৃত রহিয়াছে, ঐ সকল উক্তি পৌরাণিক ভ্রান্তিকলুষিত। রামায়ণ এক স্থানে বলিতেছেন,—

সংস্তূয়মানো হনুমান্ ব্যবর্দ্ধত মহাবলঃ।
সমাবিধ্যচ লাঙ্গুলং হর্ষাদ্বলমুপেয়িবান্। ৪—৬৭স
কিষ্কিন্ধ্যা।

ফলতঃ ইহা কি অপ্রকৃত সংবাদ নহে? এই বানরগণ কি বানরাখ্য মানুষ ছিলেন না? পরবর্ত্তী পংক্তিকদশক কি উপরিধৃত বর্ণনার বিসংবাদবাহী নহে?

বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ। ৪
ভর্ত্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অভিসন্ধাতু মারেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ। ৫
৫৪ সর্গ—কিষ্কিন্ধ্যা।

এখানে বাল্মীকি হনুমানকে "সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ" বলিতেছেন, তবে কি আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইব যে এহেন হনুমান্ সলাঙ্গুল বানর ছিলেন? হনুমান্ স্বয়ংই বলিতেছেন;—

অহং হ্যতি তনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচং চোদাহরিষ্যামি মানুষী মিহ সংস্কৃতাং। ১৭
৩০ অ সুন্দরকাণ্ড।

যে মানুষদিগের ব্যবহার্য্য সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারে, সে কি মানুষবিশেষ নহে? কেবল ইহাই নহে; হনুমান্ ব্যাকরণজ্ঞও ছিলেন,—

পরাক্রমোৎসাহ মতি প্রতাপ
সৌশীল্য মাধুর্য্য নয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য সুবীর্য্য ধৈর্য্যৈ,
র্হনুমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে? ৪৩
অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরে রস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ ধারয়নপ্রমেয়ঃ। ৪৪
৩৬ সর্গ, উত্তরকাণ্ড।

যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, যিনি ব্যাকরণ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মানুষ ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? বালির শবশ্মশানে নীত হওয়া কালে শব শিবিকায় আরোহিত হইয়াছিল, অনুচরেরা অগ্রে অগ্রে ধনরত্ন ছড়াইতেছিল, বালির শ্রাদ্ধশান্তি হইল, ব্রাহ্মণভোজন হইল, ইহাও কি বনের বানরের কার্য্য? বলিবে তবে বাল্মীকি হনুমানাদির লেজ দিলেন কেন? কেনই বা উহাদিগকে নখদংষ্ট্রায়ুধ পঞ্চনখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাহার হেতু এই যে, বর্ত্তমান রামায়ণখানী বাল্মীকিকৃত নহে। আদি রামায়ণ কীটদষ্ট হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইলে যিনি ইহার সংস্কার সাধন করেন, তিনি আধুনিক লোক বলিয়া এই সকল বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। নাগপাশ অস্ত্রের নাগদিগকে যে বিষোল্বণ বলা হইয়াছে উহাও বিকৃত বর্ণনা। সম্ভবতঃ নাগেরা রাক্ষসপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকিবেন, গরুড়ের অনন্তর বংশ কেহ রামের সহায় হইয়া নাগদিগের পরাভব সাধন করিয়াছিলেন, অথবা নাগ-পাশের বিবরণ আদৌ কল্পনা-প্রসূত। যাহা হউক হনুমানাদি বানরদিগের যদি কোন

* অস্তি পৌরবদায়াদো বিদুরথসুতঃ প্রভুঃ। ঋক্ষৈঃ সংবর্দ্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথ পর্ব্বতে। মহাভারত

প্রকৃত সত্তা থাকে, যদি রামায়ণ কোন কল্পিত গল্প (Romance) না হয়, তাহা হইলে হনুমান্ ও সুগ্রীবপ্রভৃতি যে বানরাখ্য মানুষ ছিলেন, ইহাই প্রকৃত কথা।

শিব ও যম বলদ ও মহিষে চড়িতেন না, তপোলোকবাসী বিষ্ণুও গরুড়পক্ষীতে চড়িয়া বেড়াইতেন না। বিষ্ণু, পক্ষিজাতীয় মনুষ্য গরুড়াদির এবং শিব, বৃষোপাধিক মানুষদিগের নেতা বা দলপতি ছিলেন, তাই তাঁহারা বৃষবাহন ও গরুড়ধ্বজাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শ্রুতি বলিতেছেন;—

"গাবাবৈসত্র মাসত"

গো-উপনামধারী মনুষ্যগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যজ্ঞকারী গোগণ নিশ্চয়ই শৃঙ্গপুচ্ছবান্ গরু ছিলেন না। ইঁহারা কশ্যপাত্মজ ও মানুষ ছিলেন। (আশ্চর্য্য এই যে হাউগ ইহার অনুবাদে Cow করিয়াছেন), সামবেদ বলিতেছেন,—

প্রহংসাস স্তৃপলা বগ্নুমচ্ছা
মাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ। ৬০৩ পৃষ্ঠা।

তত্র সায়ণঃ—হংসাসঃ শত্রুভির্হন্যমানা হংসাইব আচরন্তোবা বৃষগণা এতন্নামকা ঋষয়ঃ।

তাহা হইলেই জানা গেল, এই হংস ও বৃষ শব্দ পক্ষী বা পশুবিশেষবাচী নহে। ভাগবতেও বিবৃত রহিয়াছে,—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।

ব্রহ্মাও এই হংসাখ্য দেবগণের নেতা ছিলেন। তাই তাঁহার বিশেষণ—"হংসবাহন" এবং তাই তাঁহারা স্ব স্ব বিমান, খোদিত গরুড় ও হংসাদির মূর্ত্তি দ্বারা চিহ্নিত করিতেন। বিমান দেখিলেই জানা যাইত এই বিমানখানী অমুকের। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিতেছেন,—

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তি রসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ। ১৩
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি র্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে। ১৪
৮৮ অ—

যে দেবতার যেরূপ রূপ, যেরূপ ভূষণ ও যে প্রকার বাহন, তিনি তাহা লইয়াই ভগবতীর সাহায্যার্থ অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। তৎপরেই বলা হইল,—

কৌমারী শক্তিহস্তাচ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যান্ অম্বিকা গুহরূপিণী। ১৬
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তি র্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ। ১৭
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা। ১৫—৮৮অ

কার্ত্তিকের পত্নী কৌমারী শক্তিহস্তে ময়ূর বাহনে, বিষ্ণুগৃহিণী লক্ষ্মী গরুড়বাহনে এবং মহেশ ঘরণী মহাদেবী মাহেশ্বরী বৃষবাহনে যুদ্ধ করিতে সমাগত হইলেন। এখানেও বুঝিতে হইবে ব্রহ্মাণী ও কুমারী হংস ও ময়ূরমূর্ত্তি বিলসিত বিমানে, লক্ষ্মী গরুড়মূর্ত্তি উপলক্ষিত বিমানে এবং মাহেশ্বরীও বৃষভাঙ্কিত বিমানারোহণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। কেবল স্বর্গে নহে ভারতবর্ষেও ময়ূরোপাধিক রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। রাজাবলী লিখিয়াছেন,—

"এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রাবল্য হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শকাদিত্যনামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর"। ৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল তখন ভিন্ন ভিন্ন বংশ সকল ময়ূর, মূষিক, ঋক্ষ, ভল্লুক ও বানর প্রভৃতি আখ্যাতে সংসূচিত হইত। কার্ত্তিকেয় উক্ত ময়ূর-বংশের নেতা ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ও তদীয় পত্নীর বিমান সম্

বতঃ কাষ্ঠময় ময়ূর মূর্ত্তিদ্বারা চিহ্নিত থাকিত। এবং অদিতিনন্দন তপোলোক- (মধ্য সাইবিরিয়া) নিবাসী বামন বিষ্ণু ও পক্ষী গরুড়ে এবং দেবদেব মহাদেব বলদে চড়িয়া বেড়াইতেন না। বলিবে বায়ুপুরাণ যে বলিতেছেন,—

অনন্তমনসো ভূত্বা প্রপন্না যে মহেশ্বরং।
তৈর্লব্ধং রুদ্রসালোক্যং শাশ্বতং পদ মব্যয়ম্॥ ৩১৪
তবন্ত রূপসাদৃশ্যং নীতাশ্চৈব হ্যনুত্তমং।
বৈশ্বানরমুখাঃ সর্ব্বে বিশ্বরূপাঃ কপর্দ্দিনঃ॥ ৩১৫
নীলকণ্ঠাঃ সিতগ্রীবা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাস্ত্রিলোচনাঃ।
অর্দ্ধচন্দ্র কৃতোষ্ণীষা জটামুকুট ধারিণঃ॥ ৩১৬
সর্ব্বে দশভুজা বীরাঃ পদ্মান্তর সুগন্ধিনঃ।
পিনাক পানয়ঃ সর্ব্বে শ্বেতগোবৃষবাহনাঃ॥ ৩১৭

৩৯ অ—উত্তরকাণ্ড।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

সন্ধ্যায়

গগন-প্রান্ত চুমে দিনমণি
আকাশে মেঘের রঙ্গ;
লালে লালে লাল গোলেলা মাখা—
গোধূলির সারা অঙ্গ।
শঙ্খ-মুখর নধর অধর,
অলকে রজনীগন্ধা,
যুবতীহস্তে ধূপ ধুনা দীপে—
বরিছে তরুণী-সন্ধ্যা।
শীকর-সিক্ত দখিণা বাতাস,
বহিতেছে মৃদুমন্দ;
বাগানে যূথিকা ফুটিয়া উঠি—
বিলায়ে দিতেছে গন্ধ
আকাশ হইতে নামিল ধীরি
নিবিড় আঁধার-পুঞ্জ,
ভ্রমর-বিরহে, নিরাশ বক্ষে—
কাঁদিছে কুসুম কুঞ্জ।
সন্ন্যাসি-মুখে ব্যোম ব্যোম হর—
ধ্বনিছে আরতি ঘণ্টা,
চেয়ে চেয়ে দেখি দুয়ার পানে;
দুঃখিনী আকুল-কণ্ঠা।
সাধনায় মোর ঢুকেছিল বুঝি,
পাপের কুটীরে পুণ্য!—
অন্তর মম উতলা যে হয়—
গৃহখানি হ'লে শূন্য।
দীপ জ্বালি ঘরে, একাকী কাঁদি,
কারে করি দুঃখ ব্যক্ত;
আঁধারে আড়ালে আলোক ঢাকি;—
কেহ যদি করে ত্যক্ত।
মিলন-গীতিকা স্মরণে আসে
সাঁঝের বেলায় নিত্য!
অতীত স্বপন উতলা করে
চঞ্চল ক্ষীণ চিত্ত।
এস এস এস বঁধুয়া মোর—
বিরহতাপিত বক্ষে;
আঁধার কুটীরে চন্দ্রবদন-
হেরিব তৃষিত চক্ষে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

যখন দ্বৈতবাদিভক্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া প্রভুর সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখনই তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম সোপানে উত্থিত হন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য ভগবদ্দর্শনসমভিব্যাহারে জগত দেখা। তিনি দ্বৈতবাদ অবস্থাতে যে হৃদয়-নাথকে জগত হইতে বহুদূরবর্ত্তী মনে করিতেন, দূরতিক্রমণীয় গিরিশৃঙ্গ, শ্বাপদ-সমাকুল অরণ্যানী ও দুর্গম বিশালমরু-প্রান্তরের তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানেও যাঁহার কোন সমাচার পান নাই, তাঁহাকে আজ সম্মুখেই অবস্থিত দেখেন, তাঁহাকে আজ হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করিয়া আনন্দনীরে স্নাত হইতে থাকেন। পূর্ব্বে যাঁহার দর্শনলালসা দৈনন্দিন বর্দ্ধিত হইয়া মন প্রাণ ব্যাকুল করিত, এই জন্য হা হতোস্মি আমার জন্ম বৃথা গেল ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অতি কষ্টে ভক্তের সময় অতিবাহিত হইত, এইক্ষণে সেই প্রভু তাঁহার নয়নের চির-অতিথি, সেই জীবন সর্ব্বস্বদেবের প্রাণ সন্তর্পণ কান্তিতে তাঁহার হৃদয় সদা আলো-কিত। ইহা অপেক্ষা আর সুখের অবস্থা কি হইতে পারে? প্রভুদর্শন অপেক্ষা ভক্তের পক্ষে সুখের বিষয় আর কি আছে? তপ, জপ, সাধন, ভজন সকলই ইহার জন্য। ইহা লব্ধ হইলেই মানবজন্ম সফল হয় ও নিখিল বস্তুই সুধাবর্ষণ করিতে থাকে। আরাধ্যদেবের অদর্শনকালে যাহা নয়নের শূল বলিয়া মনে হইত, তাহাই আজ ভক্ত-চক্ষুর অঞ্জনশলাকা স্থানীয়, তাহাই আজ ভক্ত-হৃদয়ের শান্তিপ্রদ ছবি। ইতঃপূর্ব্বে যে হৃদয়প্রান্তরে বিষাদের তপ্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে থাকিত, এক্ষণে তাহাতে নিশিদিন শান্তির হিমপ্রস্রবণ অবিরতধারে বহিতেছে, আর প্রেমকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। এই দিব্য-শোভা দর্শন করিবার জন্য যেন পূর্ব্বোক্ত মহর্ষি-বৃন্দ ঐ প্রান্তরে শুভাগমন করিয়াছেন— তৎপদদর্শী গুরুদেবও যেন আগমন পূর্ব্বক ঐ শোভা সন্দর্শনান্তে মনে মনে প্রসাদনীরে অবগাহন করিতেছেন ও সাবাস সাবাস বলিয়া শিষ্যের উৎসাহ বাড়াইতেছেন।

দ্বৈতবাদের প্রথম অবস্থার ন্যায় বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদে আরাধ্যদেব জগৎ হইতে পৃথক্ ও সুদূরস্থিত বলিয়া মনে হয় না। তখন ভক্ত-সমক্ষে প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে জীবিতেশ্বরেরই ললামকান্তি যেন খেলা করিতে থাকে। রবি শশী আদি জ্যোতিষ্ক, গঙ্গা যমুনাদি তটিনী, হিমালয় বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত ও কাশ্মীরদেশীয় উপত্যকা ইত্যাদি নিখিল মনোমোহন বস্তুই প্রভুর সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে সন্ত-রণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যে রমণীর যৌবনোদ্ধত কান্তি অবলোকন করিবামাত্র অসংযতমনা যুবকবৃন্দ অথবা বৃদ্ধাবস্থাপন্ন ভাবের পলিতকেশ মহোদয়েরাও কুসুমধন্বার ক্রীড়া-কুরঙ্গ হইয়া পড়েন, তাহাকেই দেখিয়া বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী ভক্ত ভগবদ্ভাবে অচেতন হইয়া থাকেন। কোন উপায় প্রয়োগ না করিলে তাঁহার অচৈতন্য দূর হয় না। অবিবেকী সমাজ—যে ব্যক্তিবিশেষের সৌন্দর্য্য উপ-লব্ধি করিয়া বিকৃত ভাবের ক্রীড়ণক হইয়া

পড়ে, ইহার কারণ তাঁহারা ঐ সৌন্দর্য্য ভগবৎ সৌন্দর্য্যোদধির তরঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, অথবা উক্ত সৌন্দর্য্যানুভবে ডুবিতে অক্ষম হয়; তাহারা কেবল উহার উপর উপরই ভাসিতে থাকে। সৌন্দর্য্যানুভূতিতে মন ডুবিলে কি আর কামতস্কর তাণ্ডব দেখাইতে পারে? সৌন্দর্য্যানুভূতি-জ্ঞান, সুতরাং সত্ত্বগুণের কার্য্য, এবং কাম রজোগুণোৎপন্ন, এজন্য উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মশালী। উভয়ের মধ্যে একের অভ্যুত্থানকালে অন্যের আবির্ভাব অসম্ভব, এই কারণে কামুক ব্যক্তিদিগকে প্রকৃত সৌন্দর্য্যসুধা পানে বঞ্চিত থাকিতে হয়। উহাতে একমাত্র সংযতেন্দ্রিয় মুনীশ্বরেরাই অধিকারী। তাঁহারাই গোমতীর জল ভাগীরথীসলিলে মিলাইতে সমর্থ। কি আশ্চর্য্য! অপ্রবুদ্ধ সমাজ শ্রীভগবানের বিশ্বগত অনাময় সৌন্দর্য্যকেও মদনোৎসবের উপাদান করিয়া লইয়াছে। যাঁহার অনুভবে বিলীন হইয়া কোথায় মন প্রসাদনীরে অবগাহন করিবে, না দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহারই দ্বারা প্রমাদধূলি সমাকীর্ণ হইতেছে। পরমার্থতঃ অপার্থিব নিষ্কলঙ্ক বস্তুও অজ্ঞানিসমক্ষে পার্থিব ও কলঙ্কযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্দ্দশা কি হইতে পারে? বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট ভক্তসমক্ষে যেন জগৎ অনির্ব্বচনীয় নবচিন্ময় পরিচ্ছদ পরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এই ব্যাপার এমন নৈপুণ্যের সহিত সুসম্পন্ন হয় যে, কখন ঐ পরিচ্ছদ তাহার অঙ্গ হইতে বিশ্লিষ্ট হয় না। ঐ কান্তিতে স্বকীয় কান্তি মিলাইয়া জগৎ এরূপ অপূর্ব্ব দ্যুতিসম্পন্ন হয় যে দেখিয়াই ভক্ত দর্শক ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, কোন প্রকারে সংজ্ঞা লাভ করিয়াও ক্ষণকাল পরেই পুনর্ব্বার ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হন। তাঁহার প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে একবার প্রকৃতির গুণময়ী ঊর্ম্মিমালা প্রতিভাত হয়, আবার স্ফটিকাবদাত শুদ্ধ চিন্ময় মহাতরঙ্গপুঞ্জ আসিয়া ঐ ঊর্ম্মিমালা ও দৃষ্টিকে আপনার অঙ্গে বিলীন করিয়া ফেলে। এই অবস্থাতেই বিশ্বসৌন্দর্য্যের মহিমা প্রকৃতরূপে অনুভূত হইতে পারে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের সমাহারে যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ, তাহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তই অনুভব করিয়া থাকেন। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া রসিকবৃন্দ ভাবনীরে ডুবিতে ও ভাসিতে থাকেন, তাহা যদি নিখিল সৌন্দর্য্যের জীবন ব্রহ্ম-সৌন্দর্য্য দ্বারা আবৃত ও অনুপ্রাণিত হয়, তবে যে আনন্দের সুধাপ্লাবনে চিত্ত ডুবিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ এই ভূমিকাতেই সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানশিক্ষার পূর্ণতা হইয়া থাকে। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লইয়া কালহরণ করিলে কদাপি সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের পূর্ণ শিক্ষা লাভ হইতে পারে না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম অবস্থায় অনুভব রঙ্গভূমিতে প্রশান্ত ব্রহ্মাভিনয় অপেক্ষা গুণোদ্ধতা প্রকৃতিরই অভিনয় অধিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ অধিক সময় মন জাগতিক সৌন্দর্য্য লইয়াই আবদ্ধ থাকে, কদাচিৎ ঐশ্বরিকভাবে নিবিষ্ট হয়, পরন্তু এই নিবিষ্টভাব জগৎসম্বন্ধ রহিত না হইয়াও অতুল সুখের নিদান। এই সুখের সহিত বিশাল রাজ্যেশ্বরের সুখও প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। যে বর্ত্তমানমুগ্ধ মানব এই সুখ উপভোগ করিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন, আর অগ্রসর হন না, তাঁহাকে কদাপি বিমৃশ্যকারী বা সৌভাগ্যশালী মনে করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি অমূল্য হীরকের খনি পাইয়াও লেশমাত্র হীরকযুক্ত প্রস্তরের প্রলোভনেই ভুলিয়া গেলেন। অধ্যাত্মরাজ্যে এইরূপ অনেকানেক প্রলোভন

রহিয়াছে। যিনি কুশাগ্রবুদ্ধি ও বাসনার ষড়যন্ত্রে অবিচলিতমনা হইতে পারেন, তিনিই ইহার অন্তিম সীমা ভেদ করিতে সমর্থ। তিনিই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়া অদ্বৈতবাদের চিদানন্দময় গোপুরে বিশ্রাম লাভ করিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও সাধনাধ্যবসায়ই উপযোগী, এবিষয়ে প্রজ্ঞা অন্যথা সিদ্ধ। দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই মহামায়ার মোহিনী লীলায় আত্মহারা হইয়া পড়েন। ইহার কারণ কি প্রজ্ঞার অভাব নহে? ধীমান ধর্ম্মবীরাগ্রণী উক্ত সুখ উপভোগ করিয়াও উহাতে হতচেতন হইয়া থাকেন না। যাহার প্রথম সোপানেই এইরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্যাস্বাদনের সুখ, তাহার অগ্রবর্ত্তী সোপানসমূহ স্বর্গীয় সুখের পণ্যবীথিকা-শ্রেণীতে সুসজ্জিত হইবে, অবশ্যই তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হন। আর সঙ্গে সঙ্গেই নব সৌন্দর্য্য, ভাব ও আনন্দের হিল্লোলে অবশ হইতে থাকেন। এইজন্য মন ও বদনের কান্তি যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া নিত্য নূতন পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গর্ব্বের সহিত জগৎকে আপন বৈভব দেখাইতে থাকে। ফলতঃ অধ্যাত্মশৈলের দ্বৈতবাদোপত্যকাস্থিত নরনারীর দৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপ অধিত্যকাধিরূঢ় যাবতীয় বস্তুই অপূর্ব্ব শোভাশালী বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যখন তাঁহারা শশিশেখরাবাদত, অদ্বৈতবাদরূপ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের উপকণ্ঠে উপনীত হন, তখন যে লোকান্তর বিস্তালোকময়ী শোভা নিরীক্ষণ করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখের উপভোগে অধিকারী হন, তাহা তদবস্থাপন্ন মহামুনিই বুঝিতে পারেন। আমার ন্যায় বচনসর্ব্বস্ব ব্যক্তি কেবল তৎসম্বন্ধিনী বাক্যরচনার সুখটুকুই লাভ করিতে অধিকারী। যাহা হউক ঐ অনাময় চিৎসন্দীপনী অবস্থা সম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ করাও সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা স্বকীয়া অথবা পরকীয়া রমণীর গুণানুবাদে কালহরণ করাই স্বর্গসুখ মনে করেন, তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া আমাদের বলিবার কিছু নাই; পরন্তু যাঁহারা আপনাকে ভজনানন্দী মনে করেন ও শাস্ত্রচর্চ্চাকে শুষ্কতর্ক বলিয়া উড়াইতে তৎপর হন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহাদের দক্ষিণহস্ত ব্যাপারসংক্রান্ত গোষ্ঠি অপেক্ষা কি জ্ঞানচর্চ্চা নিন্দনীয়? পক্ষান্তরে চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকাই কি ভগবদ্‌ভজনে ও তাঁহার গুণানুবাদে অতিবাহিত করেন? যদি না করেন, তবে কোন্ কার্য্য দ্বারা অবশিষ্ট সময় হৃত হইয়া থাকে, বিবেকের নির্জ্জন কুটিরে উপবিষ্ট হইয়া তাহা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বস্তুতঃ যিনি নিশিদিন ভগবদ্ভজনে নিবিষ্ট থাকিতে পারেন, এরূপ মহাপুরুষ অতীব বিরল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিন ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে,—(১ম) ভগবৎ সন্দর্শনী। ২য় ভগবদ্ব্যাপনী। ৩য় ভগবান্ ও জগতের অভেদ সম্বোধনী। ১ম ভূমিকায় উপনীত হইলে সময়ে সময়ে জগতের অভ্যন্তরে জগদীশ্বরের সন্দর্শন হয়, কিন্তু অদর্শনকালেও ভূতপূর্ব্ব দর্শনের স্মৃতি ভক্ত হৃদয়কে শান্তিবারি সেচন পূর্ব্বক সুশীতল করিয়া থাকে, তখনও ভক্ত জীবিতেশ্বরের লোকান্তর সৌন্দর্য্যমাখাচ্ছবির স্মরণ করিয়া নিস্পন্দপ্রণায়ানন্দে অচেতন হইয়া পড়েন। সেই অস্পষ্ট কান্তি, সেই হৃদয়নাথের অর্দ্ধবিকশিতস্বরূপ-প্রভা, তাঁহার মানসাকাশ আলোকিত করিয়া থাকে। যদিও এই আনন্দসন্দোহনী স্মৃতি চিরকাল স্থিতিলাভ করে না, অচিরেই

বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি উহা যে ভক্তকে দেবভাবে উপনীত করে, এই স্মৃতি যে পার্থিব ভাবের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে সুরক্ষিত রাখে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখনই বিষয়বাসনা মনোমোহনবেশে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অশেষ প্রলোভন দেখাইতে থাকে, তখন ঐ পুণ্যস্মৃতি উদিত হইয়া ভগবদনুরাগানল প্রজ্বলিত করে, আর তৎকালেই কলুষহৃদয়া উক্ত বাসনা দাহাতঙ্কে কম্পিত কলেবর হইয়া কোথায় যে পলায়ন করে, তাহার কোন সমাচারই থাকে না। বিষয়বাসনার অপ্রতিহত প্রভুত্ব কেবল অজ্ঞানিসমাজেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রবুদ্ধগণ জ্ঞানহুতাশনে উহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ঐ স্মৃতি ধারাবাহিকরূপে পরিণত হইলেই ১ম ভূমিকার উপসংহার হয়। দ্বিতীয় ভূমিকায় অধিরূঢ় হইলে সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন হইতে থাকে; পবিত্র, অপবিত্র, সুন্দর, অসুন্দর, শত্রু, মিত্র, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবন্ধু নিখিল পদার্থই ভক্তকে ভগবান্ দেখাইয়া প্রেমে বিভোর করিয়া তুলে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তহৃদয়ে মধুবর্ষণ আরম্ভ হইয়া থাকে। শৈলতনয়ার উত্তালতরঙ্গ মধুবর্ষণ করে, উন্নতশেখর ভূধরশ্রেণীও তাহারই অনুকরণ করে। নীলিমপূর্ণ অনন্ত আকাশ ও তদাশ্রিত অসংখ্য জ্যোতিষ্ক সকলেই ঐ কার্য্যে তৎপর। এমন কি নীরস তরুপর্য্যন্তও ব্রহ্মরসে সরস হইয়া যেন মধুবর্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সমীরণ ও সিন্ধুর ত কথাই নাই। কেননা বেদই সুধামাখাস্বরে উপদেশ দিতেছে "মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব।" এইরূপে ভগবদ্ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলে কোন প্রকার অসদ্ভাব মনে সমুদিত হয় না; কারণ অসদ্ভাব ভৌতিকব্যাভিনিবেশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু ভগবদ্ব্যাপ্তির প্রতি অভিনিবেশ করিলে উহার অবস্থিতিই অসম্ভব। সর্ব্বত্র ভগবদ্ব্যাপ্তির অনুভব দ্বারা ব্যষ্টি জগদুপলব্ধির পরাভবই এই ভূমিকার চরম উৎকর্ষ। তৃতীয় ভূমিকাবস্থিত ভক্ত, ভগবান্ ও জগতকে একত্ব সূত্রে সংবদ্ধ দেখেন। যদিও জগতকে বিস্মৃতির পাতালস্পর্শী বিলে নিক্ষেপ করিতে পারেন না, তথাপি মিশ্রিত বর্ণদ্বয়ের ন্যায় উভয়ের বিশ্লেষণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয় ভূমিকাতে যেরূপ ভিন্নভাবে জগৎ সংশ্লিষ্ট ভগবৎ সত্তা অনুভূত হয়, তৃতীয় ভূমিকাতে তদ্রূপ নহে। এই ভূমিকাতে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর একই ভাবাপন্ন। যেরূপ সরিত সাগর সঙ্গমে উভয়ের ভিন্নতা কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না, সেইরূপেই বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সঙ্গমে একত্বভাবের দৃঢ়তায় এই ভূমিকার সমাপ্তি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেরূপ জগৎ চিদানন্দময় করিয়া তুলে, তদ্রূপ ভক্তহৃদয়ে উদারভাব সঞ্চারিত করে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তকেশরী কখন মহানস সংক্রান্ত বিবাদে আত্মসমর্পণ করেন না। তিনি সকল নরনারীকেই সমভাবে অভিনন্দন করিয়া থাকেন। নিম্নশ্রেণীর নরনারীগণও তাঁহার সমতাকুসুম সুবাসিত করুণানীরে স্নাত হইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারে। তিনি যে সাম্য নন্দগোপবনে উপনীত হইয়াছেন, উহাতে বিষমতার দুর্গন্ধ কোথায়? স্বপ্নেও তাঁহার মনে এইরূপ কুৎসিতভাব আসিতে পারে না। অজ্ঞান সমাজ যাহাকে দেখিবামাত্র ঘৃণাপঙ্কলে নিপতিত হয়, তাহাই উক্ত ভক্তরাজকে ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলে। অধিক কি বলিব! হিংস্রজন্তুরাও তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া প্রকৃতির নৃশংসতা ভুলিয়া যায়। তাঁহার প্রেমজলধি এমন স্ফীত ও বিস্তারিত হইয়া পড়ে যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, চেতন, অচেতন সমস্ত বস্তুই যেন উহাতে ডুবিয়া যায়, একমাত্র প্রেমনীর

ও তাঁহার উত্তালতরঙ্গমালাই অবশিষ্ট থাকে। এই মহান্ প্রেমের তুলনা করিতে পারে, এমন অনাত্ম-প্রেম কোথায়? কোথায় অনন্তজ্যোতিষ্ক নিকেতন অনন্ত মহাকাশ! কোথায় কতিপয় কীটাণুর বিচরণক্ষেত্র ঘটাকাশ! কোথায় জগদুদ্ভাসক শারদ শর্ব্বরীশ্বর! কোথায় বর্ষাকালের অল্পদ্যুতি খদ্যোত! এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমাধি অবস্থা ব্যতিরেকে বৃত্তি নিরোধজনিত ব্রহ্মদর্শনই অসম্ভব, আর বিশিষ্ট জ্ঞানসমাধিই হইতে পারে না, যেহেতু "তদেববস্তুমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ" ধ্যানই ধ্যেয়রূপে পরিণত হইয়া আপন স্বরূপ ধ্যেয়-স্বরূপে বিলীন করিলে সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যোগসূত্র সমাধি অবস্থার শুদ্ধ স্বরূপাবস্থিতি ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং বিশিষ্টানুভূতিসম্বলিত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে পরাৎপর পরমেশ্বরের দর্শন কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার একমাত্র সমাধি-লভ্য, কিন্তু সগুণব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সমাধিব্যতি-রেকে পরিপক্ক ধ্যান দ্বারাও সুসম্পন্ন হইতে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মার দর্শন হয়, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। "অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানু মানাভ্যাং", তত্ত্বজ্ঞানীরা ধ্যানকালেও ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতিতে ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাস-সূত্র দ্বারাও ধ্যানকালীন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রমাণিত হয়। সমাধি অবস্থাতে বৃত্তি নিরোধ হয় বলিয়া শুদ্ধ চিদাত্মা ব্রহ্মের অনু-ভূতিতে কোন অন্তরায়ই থাকে না। ব্রহ্ম যদি বাহিরের বস্তু হইতেন, তবে চিদাত্মা জ্ঞানকে কদাপি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বলিতে পারা যাইত না। জ্ঞান যে অন্তরের অমূল্য রত্ন, এ বিষয়ে বাতুলসমিতির সদস্য ব্যতি-রেকে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। মনে কর, তোমার সকল বৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, একমাত্র জ্ঞানরবি প্রকাশিত রহি-য়াছে। পণ্ডিতেরা ঐ বৃত্তিশূন্য জ্ঞানকেই ব্রহ্ম আখ্যা দিয়া থাকেন। ঐ অবস্থাতে দ্বৈত বলিয়া কোন বস্তুই প্রমাণিত হয় না। কারণ দ্বৈতানুভূতির মূল উপাদান মম স্বকারণে লীন হইয়া গিয়াছে। কেবল ব্যুত্থান দশাতেই দ্বৈতানুভব হইয়া থাকে। এই বিষয়ের বিশিষ্ট সমালোচনা অদ্বৈতবাদ প্রকরণে করা যাইবে।

যেরূপ উত্তম বর্ণ আপন অপেক্ষা নিম্ন বর্ণে বিবাহ করিতে পারেন, পরন্তু নিম্নবর্ণ নিজ অপেক্ষা উচ্চবর্ণে তাহা করিতে অধি-কারী হন না, তদ্রূপ অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদে এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদে সাধনপ্রয়াস ব্যতিরেকেই অবতরণ করিতে পারেন, কিন্তু দ্বৈতবাদী বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদে এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী অদ্বৈতবাদে ইচ্ছামাত্র অনায়াসে উত্থিত হইতে পারেন না। ফলকথা উচ্চাবস্থাপন্ন সাধক নিম্নাবস্থাতে অনায়াসে অবরোহণ করিতে পারেন, পরন্তু নিম্নাবস্থাপন্ন সাধক সাধনপ্রয়াস ব্যতীত উচ্চ ভূমিকাতে উপনীত হইতে পারেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা মায়ার বন্ধন সম্যক্ ছিন্ন করিতে না পারি-য়াও দ্বৈতবাদীর ন্যায় তাহাতে জড়িত হইয়া পড়েন না। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রভাবে মলিন বাসনা আর তাঁহাদের সমক্ষে তাণ্ডব দেখাইতে সমর্থ হয় না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অর্থ রামানুজসম্প্রদায়ে এইরূপভাবে প্রচ-লিত আছে যথা—

"বিশিষ্টাভ্যাং মায়া জীবাভ্যাং সহ অদ্বৈতং
বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্ববাদঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদঃ।"

অর্থাৎ মায়া ও জীবের সহিত অদ্বৈত-বাদই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। পরন্তু রামানুজ

সম্প্রদায় মায়া ও জীবকে নিত্য স্বীকার করেন। এইজন্য এই মত যে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসিদেকমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করে। "মায়াভাসেন জীববৎসৌ-করোতি মায়া চাবিদ্যা স্বয়মেব ভবতি" বিদ্যারণ্যোদ্ধৃত এই শ্রুতি সুস্পষ্ট ভাষায় জীব ও ঈশ্বরের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দেয়। "আভাস এব চ" এই ব্যাসসূত্রও জীবকে আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বলিয়াছে। "অজামেকাং" এই শ্রুতির অর্থ যেরূপ ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্কর ও বেদান্ত মুক্তাবলিকার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা জীব ও মায়ার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। দ্বাসপর্ণা শীর্ষক শ্রুতিও ব্যবহার দশাতেই জীব ঈশ্বর ভেদ প্রতিপাদন করে, কিন্তু পরমার্থ অবস্থায় নহে, কারণ তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ভূত অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রামানুজ সম্প্রদায়ের উক্ত মত যে অসত্য, ইহা সমাধিই নিঃসন্দেহ রূপে বুঝাইয়া দেয়। ঐ অবস্থাতে চিদাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

যাঁহারা মহর্ষিপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতির অনুসরণ পূর্ব্বক অসদাগ্রহ ও সাম্প্রদায়িকভাব ভুলিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হন, অদ্বৈতবাদ যে সত্য ইহা বুঝিতে তাঁহাদের কালবিলম্ব হয় কৈ? শুষ্ক তর্কই যাঁহাদের দৈনিক ভোজ্য ও ললাট রঞ্জিত করাই যাঁহাদের একমাত্র সাধন, তাঁহারাই অদ্বৈতবাদের নামে জ্বলিয়া উঠেন ও "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই অদ্বৈত সিংহনাদ শুনিলে তাঁহাদেরই হৃদয়দাহ উপস্থিত হয়। দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এই মতত্রয় যে অবস্থাগত, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। যিনি কেদারনাথের অধিত্যকায় থাকিয়াই তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গের উপরিস্থ নীলপদ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হিমাচলের শিখরে নীলকমল হইতেই পারে না, তাঁহাকে কি ভ্রান্ত না বলিয়া থাকিতে পারা যায়? হে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি বৈষ্ণববৃন্দ! একবার মায়ার মোহিনী লীলাকে বিস্মৃতিপঙ্কে নিক্ষেপ করিয়া যোগী-ন্দ্রোপসেব্য সমাধিতে মগ্ন হউন, অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তিধনঞ্জন"। সমাধির লক্ষণ যাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ অবস্থাতে একমাত্র ব্রহ্মজ্যোতিই প্রকাশমান থাকে। জীব ও মায়াপ্রপঞ্চ কিছুই থাকে না। তবে আর কেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা প্রত্যক্ষ সত্য অধিকার করিয়া সমাজে বিসংবাদ আনয়ন করিতেছেন। তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যাহা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ দ্বারা সংসেবিত হইয়াছে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র পর্য্যন্ত আর্য্য শাস্ত্রসমূহ যাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সাম্প্রদায়িক ভাবে হৃতচেতন হইয়া তাহার নিন্দা করা কি ধীমানের বিধেয়? প্রত্যেক বস্তুই শ্রীভগবানের অঙ্গ, ইহা যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, তাঁহারা যে কিরূপে অন্য দেবতার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সিদ্ধান্ত বিষয়ে অবশ্যই তাঁহাদের কোন গোলযোগ আছে, কেননা দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যষ্টিভাবে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যদি উক্ত সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিতেন, তবে কদাপি তাঁহাদের মনে ব্যষ্টিভাব আসিত না এবং ঐ ভাবকে মূলভিত্তি করিয়া অহিনকুল নীতিতে গাত্র ঢালিয়া দিতেন না।

বিবাদ বিসম্বাদ কি কখন ভগবদ্দর্শন হইতে উৎপন্ন হয়? শাস্ত্রে যাহার ফল পরমাশান্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা কি অশান্তি আনয়ন করিয়া সামাজিক অবনতি সাধনে তৎপর হইতে পারে? ইহা অতীব অসম্ভব।

যাঁহারা কেবল অধরোষ্ঠবিকম্পনেই কালহরণ করেন না, কিন্তু ভগবদারাধনায় তৎপর, অবশ্যই তাঁহারা অদ্বৈতবাদের মহিমা অবগত হইতে পারেন। আর অদ্বৈতবাদের মহিমা জানিতে না পারিলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তিম ভূমিকায় উপনীত হওয়াই অসম্ভব। নিখিল জগতকে ভগবজ্জ্যোতিতে আবৃত করাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তিম ভূমিকা। এই ভূমিকায় উপনীত হইলে একত্বজ্যোতি যেন স্বয়ং আসিয়া সাধককে বরণ করিয়া থাকে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তিম ভূমিকা ও অদ্বৈতবাদের প্রথম ভূমিকার এই পার্থক্য যে, আদিম জগতের অস্পষ্ট জ্ঞানযুক্ত ও অন্তিম তৎশূন্য। জগৎ জ্ঞান সমূলে ভুলিতে না পারিলে অদ্বৈতবাদের কোন ভূমিকাতেই আরূঢ় হইতে পারা যায় না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে একমাত্র জ্ঞানী ভক্তই অধিকারী। যাঁহারা জ্ঞানের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন ও "পঢ়ন্তং তোভিমরন্তং নপঢ়ন্তং তোভি মরন্তং" এইরূপ সিদ্ধান্ত হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াও ইহাতে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অণু মন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ ধারণা করিতে অশক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কোন ব্যক্তিবিশেষকেই তাঁহারা মনের মানুষ করিয়া লন। এই জন্যই গীতা ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে জ্ঞানী ভক্তের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞানের আবির্ভাব না হইলে কখন প্রকৃত ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, ভক্তিভাজনকে সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও যে ভক্তবৃন্দ তাঁহার নাম করিতে করিতে গলদশ্রুধারায় আর্দ্রকলেবর হন, দৃষ্ট হইয়া থাকে তাঁহাদের ঐ ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সম্মুখে কোন প্রলোভন আসিলে বীরের ন্যায় স্খলিতপদ না হইয়া গন্তব্যমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন কৈ? অনন্তসৌন্দর্য্যের আকর শ্রীভগবানে অনুরাগ হইলে কি সাধক আর বিষয়-প্রলোভনে আত্মহারা হইতে পারেন?

যেরূপ ভক্তির উচ্চভূমিকায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী উত্থিত হন, সেইরূপ নিষ্কামধর্ম্ম করিতেও অধিকারলাভ করিয়া থাকেন। নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তির সমুচ্চয় বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত মশ্নুতে।" যে জ্ঞানী ভক্ত, উপাসনা ও নিষ্কাম কর্ম্মকে সহানুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা সংসার অতিক্রম করিয়া উপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তি প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কেবল প্রভুর শ্রীমুখসংক্রান্ত মহিমাকীর্ত্তনে রত হইয়াই জীবনযাত্রা সমাপ্ত করেন, কদাপি প্রভুর আদিষ্ট প্রিয়কার্য্যে ব্রতী হন না, তাঁহাদিগকে প্রভুভক্ত না বলিয়া তাঁহার বন্দী বলাই উচিত। ভগবানের কোটি কোটি সন্তান অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, অবিদ্যাতিমিরাচ্ছন্ন হইয়া সম্মুখস্থ রত্নভাণ্ডারও অবলোকন করিতে পারিতেছে না এবং দাসত্বকেই সম্মান ও সুখের উপকরণ করিয়া লইয়াছে, আর ভগবদ্ভক্তেরা ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন, ইহাকে কি বিষম দৃশ্য বলা উচিত নহে? এই শ্রেণীর ভক্তম্মন্যদিগকে কি ভক্তবন্ধু বলা যুক্তিবিরুদ্ধ? যে দেশে এইরূপ নৈষ্কর্ম্যপরায়ণ ঈশ্বরোপাসকের সংখ্যা অধিক, সেই দেশের অভ্যুদয়-আশা দুরাশা না হইলেও তাহার ফল যে ভবিষ্যতের সুদূরান্তরালবর্ত্তী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ যে প্রকৃত প্রভুভক্ত, সে কি প্রভুসন্ততি-

বর্গের এবংবিধ শোচনীয় দশা প্রত্যক্ষ করিয়া অবিচলিতচিত্ত বা ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারে? তাহার হৃদয় কি ঈদৃশ বিষময় পরিণামে বিদীর্ণ হয় না? লিখিতে শোক স্ফীত হইয়া উঠে যে, ভারতের পূজনীয় বেদ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজিবিষেচ্ছতং সমাঃ" কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপ সুধানিস্যন্দী উপদেশ করিতেছে। সেই ভারতে কেন আজ ঈদৃশ বিসম্বাদী নৈষ্কর্ম্ম্য-বাদের আগমন হইল? সেই পুণ্যভূমিতে কেন আজ আলস্য-তিমির ছাইয়া গেল। বুঝিয়াছি প্রারব্ধবাদই অবিবেকের সাহায্য লইয়া আর্য্যজাতির এই-রূপ অধোগতি বিধান করিয়াছে। তাহা না হইলে "ব্যাপারে মিশ্রতে অস্ত নিমেষোন্মেষয়োরপি তস্যালসধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ" এইরূপ বিসদৃশ শ্লোকের সৃষ্টি হইত না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের শরণ না লইলে কখন সমতা ভাগীরথীর সংস্পর্শে অথবা স্নানে জীব অধিকার লাভ করিতে পারে না, কারণ এই বাদযুগল ব্যতিরেকে কোন ধর্ম্মই জগৎকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম কলেবর বলিয়া উপদেশ দেয় না, আর এইরূপ ধারণা না হইলে ভিন্নতার আবরণ তিরোহিত হইতে পারে কৈ? যাঁহারা নীতির আশ্রয় লইয়া সমাজে সাম্য-সুধা বর্ষণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে নীতির উৎপত্তিস্থান কিরূপ এবং কোথা হইতে উহা আবির্ভূত হইয়াছে? আমাদের বিবেক ও স্বার্থকেই উহার জন্মভূমি বলিয়া উপদেশ করে। স্বার্থমূলিকানীতি যে বৈষম্যবাদ অপসারিত করিয়া সাম্যবাদ আনয়ন করিতে পারে না, এই বিষয়ে নীতিগর্ব্বোদ্ধত শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ব্যবহারই উদাহরণ। তাঁহাদের নৈতিকব্যাপ্তি এত বাড়িয়াছে যে, দৈনিক কৃত্যও উহার সংস্রব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু আজ পর্য্যন্তও কৃষ্ণাঙ্গ দেখিবা-মাত্র প্রভুদের মনে রাসভস্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্তও আভিজাত্যসংস্কার তাঁহাদিগকে গণ্ডির ভিতরেই রাখিয়াছে। তাঁহারা যদি মহর্ষিসেবিত উক্ত বাদযুগলের মধ্যে একটিরও সেবন করেন, তবে অবশ্যই বিবেকসলিলে ঐ বৈষম্যমলিনতা ধৌত হইয়া যাইবে। নিশ্চয়ই আর্য্যোপসেব্য সমতা সুধা পান করিয়া অভিনব শ্রীসম্পন্ন হইবেন। নীতি কেন সমতা আনয়ন করিতে পারে না, এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন করা যাইতেছে যে, যেহেতু রাম অন্য, শ্যাম অন্য, উভয় আমা হইতে অন্য, আমি উভয় হইতে অন্য, ইত্যাদি পুরাতন ভেদসংস্কার নীতিদ্বারা বিনষ্ট হয় না। পরস্পর বিভিন্ন স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে একতা সম্পাদন করাই নীতির অন্তিম ফল। সুতরাং ভেদবুদ্ধির অবস্থানে নীতিদ্বারা কোন প্রকা-রেই সমাজ সমতা সুধারস পান করিয়া অমরত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষিরা স্বার্থমূলিকা-নীতির আপাতরমণীয় চমকে আকৃষ্ট না হইয়া ধর্ম্মকেই জীবনের প্রধান সহায় করিয়া-ছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে নিয়োগ করিত। এমন কি যাহা নবসভ্য সমাজে আমোদের উপকরণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই রহস্যকার্য্যও তাঁহারা ধর্ম্ম অনুসারে সম্পাদন করিতেন। ফলকথা, ধর্ম্ম তাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। আবার ব্রহ্মাত্মার সন্দর্শনই সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম। এই সারধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত না হইলে কদাপি বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ ব্রহ্মদর্শনই জীবকে সন্তাপশিব করিয়া দেয়, ইহাই জীবের সাধ্যসার, ইহাই চিদানন্দ পূর্ণ পরমধাম। ব্রহ্মদর্শনই মনুর

মতে পরমধর্ম্ম। "অয়মেবপরোধর্ম্মো যদ্‌-যোগেনাত্ম দর্শনং।"

সগুণ ব্রহ্মদর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে হয়, এজন্য দ্বৈতবাদ অপেক্ষা তাহার মহিমা অধিক। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সর্ব্বাত্মক বিরাট ভগবানের উপাসনাই বর্ত্তমান ভারতকে অভ্যুদয় তুহিনাচলের উত্তুঙ্গশিখরে অধিরূঢ় করিবে। ভারতবাসিগণ এক্ষণে বিসংবাদী ধর্ম্ম ভুলিয়া ও পরস্পর সমবেদনাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সমস্বরে বলুন, "নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব। অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্তং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব" আর আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদের সময় নাই। এই যুগে দীন হীন ভাবও উপযোগী নহে। সাতশত বর্ষ হইতে আর্য্যজাতি দীন হীন হইয়া পড়িয়াছে, তবে আর কেন মসীর উপর মসী লেপন। ফলতঃ এই দীন হীন ভাবকে কালিন্দীনীরে ধুইয়া না ফেলিলে কোন উপায়েই আর্য্যভূমির গ্রহশান্তি হইবে না, কখনই আর্য্যগণ ভূতপূর্ব্ব গৌরবরবির উজ্জ্বল প্রভায় পুনর্ব্বার শোভায়মান হইতে পারিবেন না। এক্ষণে ভারতমাতা আপন সন্তানবৃন্দের তেজঃপূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠান অভিলাষ করিতেছেন। তিনি চাহিতেছেন যে, আমার নিখিল সন্তানই সিংহবিক্রম উদ্গীর্ণ করিতে থাকুক। জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করাই সুসন্ততির কর্ত্তব্য কার্য্য। সুতরাং আশা করি ভারতবাসিগণ জননীর কুসন্তান না হইয়া সুসন্তানই হইবেন। দেখুন ভারতবাসিগণ, আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বেদ কি উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ দিতেছে,—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য
ধারানিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি"।

"উঠ, জাগ তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মবীরের শরণে যাইয়া তত্ত্ব অনুভব কর, পণ্ডিতেরা ধর্ম্মমার্গকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয় বলিয়াছেন। তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছেন, মহাপুরুষের শরণে যাইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হউন, অচিরেই অমৃত ফলের উপভোগে অধিকারী হইবেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বৈদিক যুগের পর দার্শনিক যুগ, এবং তৎপরে বৌদ্ধযুগে আমরা নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তর বিবরণ দেখিতে পাই। বৌদ্ধগণের বিশ্ববলিনী চেষ্টা হিন্দুর রক্ষণশীল বিরাট সমাজশরীর ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া স্তরে স্তরে সঙ্করত্বের বীজ বপন করিলেও বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তর সুগম উপায় বিহিত করিয়াছিল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ দেখা যায়। তক্ষশিল ও নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ছাত্র অধ্যয়ন করিত যে, তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বড় বড় চৌবাচ্চায় কালী ঢালিয়া রাখা হইত। কাশী ও কান্যকুব্জ, গৌড় ও তাম্রলিপ্তও উপেক্ষণীয় নহে। বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রধানতঃ হেতু ও

চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না; সেইজন্য প্রাচীন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর সহিত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মপ্রণালীর বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলে নবদ্বীপে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গেরও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কালবশে ও কর্ম্মদোষে ইংরেজী শিক্ষার উপর ভারতবাসীর আস্থা ও যত্ন দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে, উল্লিখিত সংস্কৃত টোল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমে ক্রমে অবনতি ঘটিতেছে। নবদ্বীপের আর সে বিশ্ববিজয়িনী প্রতিষ্ঠা নাই। যে নবদ্বীপ এককালে গৌরব-গরিমায় ভারতীয় সমস্ত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজি তাহা বঙ্গের এক প্রান্তে প্রভাত-নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষীণপ্রভায় লীয়মান হইবার উপক্রম করিতেছে। আজি ভট্টপল্লীতে তাহার সামান্য প্রতিবিম্বমাত্রের রেখাপাত দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহাও যে ক্রমে বিলীন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দার্শনিক যুগের পরিষৎ সকল বিশালতায় বৈদিক কালের কুলপতিগণের বিরাট পরিষদের সমকক্ষ না হইলেও তদানীন্তন আর্য্য ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল! সেই সমাদর অধুনা স্বপ্ন বা ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও সহস্র সহস্র বৎসর পরে আজিও সম্পৎসারে সংসারে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। সে গৌরব-তপন বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে;—এখন কেবল সান্ধ্যগগনে ঘনান্ধকারে তাহার লীয়মান লোহিতাভ্র রেখামাত্রে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে; সেই বৈতালিক বিহঙ্গরাজের ভগ্ন পিঞ্জরমাত্র পড়িয়া আছে; তাহাতে সেই স্বর্গীয় স্বরলহরীর প্রতিধ্বনির ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র সংলগ্ন আছে! তবে আর আমাদের কি আছে? কায়া গিয়াছে, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত বিলীন হইয়াছে। এখন সকলই স্বপ্ন,—সমস্তই মায়া—ভোজবাজী! সুবিশাল ভারত-শ্মশানে ব্যাস, বাল্মীকি, অত্রি, অঙ্গিরা, গার্গ্য, গৌতম, জৈমিনি, যাজ্ঞবল্ক্যের অমরাত্মা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত; আর কতকগুলা অহম্মন্য আত্মম্ভরীর প্রেতআত্মা—অর্দ্ধ নিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগ্রৎ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রাম্যমান,—বিকট অট্টহাসে, বিশ্বত্রাসকর বিদ্রূপ ভাবে ভীষণ তাণ্ডব নটনে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে! উহারা আত্মবিস্মৃত,—বিড়ম্বিত! কে উহাদিগকে উদ্বোধিত করিবে? কে উহাদের হৃদয়ে মহামন্ত্র জাগাইয়া তুলিবে? তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা—সকলই হইতেছে; কিন্তু কিছুই তাহাদের অবস্থার উপযোগী নহে। তাহাদের বিদ্যালয় আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, অধ্যাপক আছে,—অধ্যাপনাও হইতেছে। কিন্তু কিছুই তাহাদের প্রয়োজনমত নহে। তাহারা সেই শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্ট, ছন্দঃ, বিজ্ঞান—একরূপ সমস্তই পড়িতেছে; কিন্তু কিছুই পড়িতেছে না। আশৈশব বিজাতীয় ভাষার অসাত্ম্য প্রভাবে শরীরের ওজঃ পদার্থ বিনষ্ট করিয়া রাশি রাশি পুস্তকভারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষীণ ও দুর্ব্বলেন্দ্রিয়সমূহের শুশ্রূষা করিতে করিতে সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে। এখানে তাহাদের পক্ষে সকলই নূতন, সমস্তই বিচিত্র, সমুদায়ই বিসদৃশ। যে নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সুদুর্গম সংসার-ক্ষেত্রে তাহাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা সে নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের রেখামাত্রও দেখিতে পায় নাই। তাহারা

যাহা অধিগত করিয়াছে, তাহা এই সুদুস্তর সংসারক্ষেত্রে প্রতি পদে তাহাদের পথভ্রম উৎপাদন করিতেছে। তাহারা মিল পড়িয়াছে, বেন্থাম পড়িয়াছে; স্পেন্সার, হার্ডার ও শোপনহেয়ারের অধ্যাত্মতত্ত্বে আত্মদর্শী হইয়াছে, বেকন ও বাকলের চতুঃষষ্টি কলায় পরম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু যে নীতিসূত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রতি পদে পদক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা তাহারা পায় না। যে ধর্ম্ম লইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম রক্ষা করিতে হইবে, তাহার সামান্য ছায়ামাত্রও দেখিতে পায় না। তাহারা নিজের গৃহে নিজে অতিথি,—নিজের দেশে নিজে বিদেশী!

তৈত্তিরীয় উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠক, নবম অনুবাকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে নিয়ম লিখিত আছে, তাহা অতীব উপাদেয়।

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।
সত্যং চ ...
তপশ্চ ...
দমশ্চ ...
শমশ্চ ...
অগ্নয়শ্চ ...
অগ্নিহোত্রঞ্চ ...
অতিথয়শ্চ ...
মানুষং চ ...
প্রজা চ ...
প্রজনশ্চ ...
প্রজাতিশ্চ ...

গুরুশিষ্যের এইরূপ দ্বাদশটী প্রতিজ্ঞার উপর আর্য্য হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ভর করিতেছে। ইহাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব,—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনভিভবনীয়ত্ব। যে দিন গুরুশিষ্য এই শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই দিন হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্য স্খলিত হইয়াছে,—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই দিন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ জঘন্য পণ্যবিক্রেতার আদান-প্রদানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আজি আমরা তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। সম, দম, তপঃ, সত্য, ঋত, হোম, অগ্নিহোত্র, পঞ্চযজ্ঞ—কোন্‌টীর কথা বলিব? ইহার মধ্যে একটীও উপেক্ষা করিবার নহে। কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী লইবে? বারটীই আবশ্যক। সচ্চারিত্র্য-সংগঠন, সহিষ্ণুতা, সাধুতা, জ্ঞান, নিন্দিত দ্রব্যে উপেক্ষা ও বৈরাগ্য—এই সকল বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য না থাকিলে—এই সকল সদ্‌গুণের অনুশীলন না করিলে কেহই বড় হইতে পারে না। তাহার পর কৃতপ্রতিজ্ঞ গুরু উপনিষন্ন ব্রহ্মচারীকে শিক্ষা দিতেছেন, "সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্ন প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্।
দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।
আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।
যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।
যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণা স্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্।
শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্।
শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্।
ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

তৈত্তিরীয়ঃ প্রপাঃ ৭ অনু ১১।

এই কয়েকটী উপদেশ তন্ন তন্ন করিয়া

বিশ্লেষিত করিলে তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালী ও বিদ্যালয়সমূহের একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র পাওয়া যাইতে পারে।

মহোদয়গণ! আজি আমরা ভারতের সর্ব্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিপ্লুত দৃশ্য দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে দ্বিজকুলোৎপন্ন প্রত্যেক বালককে উপনয়নের পর একটী নির্দ্দিষ্ট কাল গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। ঋষিকুমার, রাজপুত্র ও বৈশ্যনন্দন—সকলেই এই নিয়মের অধীন ছিল। ত্রিবর্ণের স্ব স্ব কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের অবিরোধে বিদ্যা লাভ করিতে হইত। ছাত্রের এই আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার অধিকাংশ কার্য্যই অতীব কৃচ্ছ্রসাধ্য। ভগবান্ মনু ব্রহ্মচারীর জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন;—

> বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
> শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্॥
> অভ্যঙ্গ মঞ্জনং চাক্ষোরুপানচ্ছত্র ধারণম্।
> কামং ক্রোধং চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
> দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
> স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥
> একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎক্বচিৎ।
> কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥
>
> মনু ২।১৭৭।১৮০।

মধু, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, রসনার তৃপ্তিকর বিবিধ প্রকার খাদ্য, উপানৎ, ছত্র, স্ত্রীসঙ্গ,—এমন কি স্ত্রীলোকের দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ! নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির ত্রিসীমায় যাইতে পাইত না। ব্রহ্মচারী যতদিন গুরুগৃহে থাকিত, ততদিন পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত না, এমন কি তাঁহাদের সংবাদাদিও লইবার অধিকার ছিল না। কেবল গুরুচরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা ও হোমের নিমিত্ত পুষ্পাদি ও সমিধ আহরণ করিয়া দিত এবং উপযুক্তকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইত। এই সকল কঠোর নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইত,—এমন কি ইহার একটীরও অপালন বা অপব্যবহারে অনেক ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য বিফল হইয়া যাইত। আমরা বিস্তর ভ্রষ্ট ব্রহ্মচারীর বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি; তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ত্রিকালদর্শী ভগবান্ মনু যে উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্যের জন্য ঐরূপ কঠোর নিয়মসকল বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব মহৎ। কারণ সেই সকল কঠোর নিয়ম হইতে এক কালে সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। সর্ব্বসংহারক কালের ভীষণ প্রহার সহ্য করিয়া আজি সহস্র সহস্র বৎসর পরেও যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের একটা ছায়া বা প্রতিচ্ছায়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা সেই আশ্রমধর্ম্মের কঠোর নিয়মাবলীর কল্যাণেই বলিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই প্রতিচ্ছায়ার ক্ষীণ প্রতিবিম্বটুকু পর্য্যন্ত বুঝি বিলুপ্ত হয়। কেন বিলুপ্ত হয়, তাহা আমি অতি সঙ্ক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কারণ একটী প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত করিতে হইলে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা তাহাতে একান্ত আবশ্যক।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের বিধান অনুসারে কলিতে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য একবারে হিন্দুর বিধানগ্রন্থ হইতে নিষ্কাশিত হয় নাই। তথাপি কোন্ পাপে আজি আমরা বিরাট হিন্দু সমাজের কুত্রাপি ব্রহ্মচর্য্যের সামান্য নিদর্শনও দেখিতে পাই না? বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বিপ্লুত বিপর্য্যস্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, কোনও কালে ভারতে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া ছাত্র-

দিগের একটা ব্রত ছিল,—তাহা কি কেহ বুঝিতে পারে? কোথায় সেই মধু-মাংস-গন্ধ-মাল্য-বিরোধী, নৃত্যগীতনিষেধক, উপানচ্ছত্রচ্ছেদী, কামকামনাকামিনীবর্জ্জিত দুর্জ্জয় ব্রহ্মচর্য্য; আর কোথায় এই বিলোলকল-কুতুহলী বর্ত্তমান হিন্দুসন্তানগণের চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণির জন্য চটুলচাপল্যে নিত্য চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং রঙ্গভূমে বারাঙ্গনার অঙ্গ ও ব্যঙ্গলীলার ললিতালোলুপতা? এই নিদারুণ অধঃপতনের নিম্ননিখাত নরকতল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই নরকের ন্যক্কারজনক বিভীষিকা বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আমরা হতভাগ্য তিনকড়ি পালের বধ্যভূমিতে দর্শন করিয়াছি। আর কত বলিব? আর কত দৃষ্টান্ত দিব? জাতীয় অধঃপতনের করাল বীভৎস দৃশ্য আর কত অঙ্কিত করিব? তাই বলিতেছি, আমরা মানুষ নহি;—পিতৃপদবীর উপযুক্ত পাত্র নহি;—শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর গৌরবরক্ষায় সক্ষম নহি; সমাজপতির শত হীনযোগ্যও নহি। আমরা জ্ঞানপাপী। প্রজ্ঞাপরাধে আমরা নিজে কলুষিত হইতেছি, আর সুকুমার শিশুদিগকে বিষপান করাইয়া নরকের নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত করিতেছি। আমাদিগের সন্তানগণ ঘোরতর বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তীর পুত্রগণও উপানচ্ছত্র ধারণ করিতে পাইত না, আজি সামান্য দাস্যজীবীর নন্দদুলালও ড্যাসন ল্যাটিমারের হান্টিং শু ও সিল্কের ছাতা নহিলে স্কুলে যাইতে চাহে না। ধনকুবেরের সন্তানগণের কথা কি বলিব? এই অতুলনীয় বাল্যবিলাসিতার বিষময় ফল আমরা নিজে ভোগ করিতেছি এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য দ্বিগুণাংশে রাখিয়া যাইতেছি। আজি সেই বিষে সমাজ জর জর। আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অনেক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াছি, অনেক স্থানে অনেক বৈদেশিক বিপশ্চিতের সহিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু কোথাও ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আদর্শ দেখিতে পাই না। এই অধঃপতিত দেশের জন্য দারুণ বিধি যেন নূতন নিয়ম গঠিত করিয়াছেন; ভাগ্যদেবতা যেন অভিনব অদৃষ্টলিপি লিখিয়া দিয়াছেন। তাই আমাদের ভাবী আশা ভরসা আমাদের সন্তানগণের চারিত্র্যগঠনে আমরা এত অমনোযোগী! তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষায় আমরা এত উদাসীন!!

পীথাগোরস, প্লেটো, এরিষ্টটল, সক্রেটিস্, সিসিরো, টিসিয়স্, বেকন, বেন্থাম প্রভৃতি মহাত্মগণ স্ব স্ব জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়েই শিশুদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায়। সেই বিধি হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যবিধির ন্যায় সর্ব্বাংশে কঠোর না হইলেও তাহাতে বালকগণের চারিত্র্যগঠন ও সংশোধনে বিস্তর সাহায্য হইয়া থাকে। সেই সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্বয়ং অথবা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। পরিদর্শকগণ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যান;—ব্যায়ামাদি স্বাস্থ্যকর ব্যাপারে উপস্থিত থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন। ছাত্রগণ সর্ব্বদা বাটী যাইতে পায় না। বাটীতে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বিপৎপাত অথবা অন্য গুরুতর প্রয়োজনবশতঃ তাহাদের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক হইলে অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া যাইতে হয়; নতুবা বৎসরে ১৫ দিন মাত্র তাহারা মাতাপিতার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। এইরূপ নিয়ম জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচ-

লিত আছে; কেবল সভ্যতার আদিপ্রস্থ ভারতভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা সামান্ত বিধিবিড়ম্বনা নহে। যে মূল প্রস্রবণ হইতে সুবিমল সভ্যতার আদি নিদান আশ্রমধর্ম্মের অমৃত ধারা উৎসারিত হইয়া মন্দাকিনীর ন্তায় জগৎ পবিত্র করিয়াছে;— যাহার পরম কল্যাণকর প্রভাবে একদা মিশর, গ্রীস, রোম, বোগদাদ ধন্য হইয়াছিল,—তাহা শুষ্ক হইয়াছে। তাই ভারত আজ দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত; তাই এককালের দেববাঞ্ছিত কর্ম্মভূমি আজি ভোগভূমির বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

শর্করবাহী বলীবর্দ্দের ন্তায় রাশি রাশি পুস্তকভারে নমিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন চারিটী তোরণদ্বার অতিক্রম করিলেই যে, বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়, এই ধারণা সমাজতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণের অন্তঃকরণ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইতেছে। কেবল কতকগুলা গ্রন্থাংশ কণ্ঠস্থ করিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না;—কিন্তু পণ্ডিত ত আজি গৃহে গৃহে;—পণ্ডিত হইতে হইলে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারী হওয়া আবশ্যক। বিদ্যার সঙ্গে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত এবং সেই সঙ্গে চিত্ত নিত্য স্বর্গীয় বিমল ভাবে পূর্ণ হইলেই, তাহাকে পাণ্ডিত্য বলা যায়। ভারতে এই পাণ্ডিত্য আজি আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সেই অসম্ভব বা অলীক ব্যাপার এক্ষণে সম্ভাব্য সত্যের সরল সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সকলের সম্মুখে সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই পরম প্রয়োজনের সারবত্তা আজি সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সুখের বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও তাহা বুঝিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাবিধিতে ছাত্রনিবাসের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের চরিত্রগঠনের একটী সদুপায় বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে উপায় আবশ্যকতার অনুপাতে অণুপরিমিত বলিতে হইবে। পীড়ার কঠোরতা অনুসারে ঔষধের গুরুতা নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমাদের পীড়া দেশব্যাপী, সুতরাং ইহার ঔষধ তদনুরূপ প্রখর করিতে হইবে; নতুবা সমুদ্রে বিন্দুপাতের ন্তায় তাহা অচিরে লয়প্রাপ্ত হইবে। তাই বলি, যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলির একবার প্রগাঢ় আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অবশ্য যুগধর্ম্মের প্রভাবে কালভেদে দেশকাল পাত্রের উপযোগী বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হওয়া আবশ্যক। আর্য্য সভ্যতার আদি যুগে একমাত্র হিন্দুর জন্য যে সকল নিয়ম বিহিত হইয়াছিল, আজি সহস্র সহস্র বৎসর পরে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, য়িহুদী প্রভৃতি পরস্পর বিসংবাদী নানা জাতি বর্ণে সংসক্ত ও বিভক্ত,—দেশীয় ও বিদেশীয় নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সম্পৃক্ত,—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রমাথিনী ভৈরবী শক্তির সম্মুখে আত্মহারা ভারতবাসীর পক্ষে সে নিয়ম কার্য্যকর হইবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিতে হইলে একমাত্র হিন্দু লইয়া তাহা গঠিত হইতে পারে না। যে সকল জাতি ও সম্প্রদায় ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তৎসমুদায়েরই উপাদান লইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হউক। নতুবা তাহা অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এ ব্যাপার অতীব গুরুতর। ইহা একটী প্রকাণ্ড জাতীয় সমস্যা। এক দিনে বা এক মাসে বা এক বর্ষে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। সকল সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী, সুধীর, বুদ্ধি, শান্তচরিত সুধীগণের সমন্বয় না হইলে ইহা কার্য্যকর হইবে না। তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান সমূহের সমীচীনতা তুলনায় সমালোচনা

করিয়া বর্ত্তমান সমাজনিবহের উপযোগী নিয়মাবলী গঠিত করিবেন। সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ছাত্রগণ সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়, এবং তদ্দ্বারা যাহাতে পরিণামে ধন্য হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এজন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে পল্লবগ্রাহিতা ভারতীয় যুবকগণের অস্থিমজ্জার সহিত গ্রথিত হইয়াছে। ইহাও একটী মহদনিষ্টের মূল নিদান। সুতরাং পল্লবগ্রাহিতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। অনুভাক্ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অবিজ্ঞ এব মন্যতে—যিনি সকল শাস্ত্র অধিগত করিতে না পারিয়া সমুদায়গুলির কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন, তিনি কোন শাস্ত্রেই পারদর্শী হইতে পারেন না। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিফল হইয়া যায়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বত্রই আজি এই বিফল বিদ্যার প্ররোচনা চলিতেছে। সুতরাং ইহার আমূল সংস্কার হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে নগরগ্রামাদির দূরবর্ত্তী স্থানে বিদ্যালয়সকল স্থাপিত হইত। তথায় স্ত্রীলোক বা অসাধু ব্যক্তিরা যাইতে পাইত না। প্রান্তর, তপোবন অথবা গিরিপ্রদেশের উদার ও স্নিগ্ধ গম্ভীর মাধুর্য্যের বিমল সুধাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদ্যালাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। কুৎসিত কামকলার আলোচনা ও সকলপ্রকার প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া তাহারা প্রবৃত্তির নিরোধ করিতে শিখিত এবং এক একটী যোগীর ন্যায় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সকল সুখের সমান অধিকারী হইত। সুতরাং রাজধানী মহানগরী প্রভৃতি জনসঙ্ঘের কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে—নিবিড় নির্জ্জন প্রদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই ছাত্রগণের জন্য আবাস বাটিকা নির্ম্মিত হইবে। নির্দ্দিষ্টকালে তাহারা মাতাপিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অনুমতিক্রমে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিবে এবং স্ব স্ব জাতি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবিরোধে উপযুক্ত বিধিবিহিত বিদ্যাসমূহে পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারে প্রবিষ্ট হইবে। বোধ হয় অনেকেই অবগত হইয়াছেন, পঞ্জাবের আর্য্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয় নামে একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় ব্রহ্মচর্য্যের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী অনুসারে ছাত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে। আর্য্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের সহিত আমাদের মতৈক্য না থাকিলেও আমরা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলের বিশেষ পক্ষপাতী। আজি সেই বিদ্যালয় নিতান্ত নবীন, এখনও দুই বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। তথাপি প্রথম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গুরুকুলের কার্য্যকুশলতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। এখন আশা হইতেছে, গুরুকুল বিদ্যালয় কালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সম্পূর্ণ করিবে।

বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালা সাহিত্যের,—এক কথায় বাঙ্গালীর একটা বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যক। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞানের পরীক্ষা দিবে! বাঙ্গালী পরীক্ষকগণ তাহাদিগের পরীক্ষা করিবেন। নিম্ন হইতে উচ্চ, তদুপরি উচ্চতর, ক্রমে উচ্চতম শ্রেণীসমূহ সৃষ্ট হইবে। যোগ্য বাঙ্গালীদিগের হস্তে তৎসমুদায় বিভাগের পরিচালন, পরিদর্শন, শাসন ও নিয়মনাদি গুরুকার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে যেমন বি-এ এম-এ প্রভৃতি (ডিগ্রি) উপাধি দেওয়া হয়,

প্রস্তাবিত বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপ উপাধি-সকল প্রদত্ত হইবে। এইরূপে নূতন প্রণালী, নূতন পদ্ধতি, নূতন নিয়মাবলীর অনুসারে, সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে, নূতন ভিত্তির উপর, একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে।

ইংরাজী-নবীশ বলিতে পারেন,—

"বৃটিশ-ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। তথা হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র উপাধি লইয়া সগৌরবে বাহির হইতেছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী; তাঁহাদিগের মধ্যে আবার অনেকেই বাঙ্গালা পাঠ করিয়া থাকেন;—কেহ কেহ আবার বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং বাঙ্গালাভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন কি?"

কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কয় জন? প্রতি বৎসর চারি সহস্রেরও অধিক ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে; তাঁহাদের মধ্যে গড়ে পাঁচ শত জন মাত্র দ্বিতীয় ভাষার স্থলে বাঙ্গালায় পরীক্ষা দিয়া থাকে। এফ-এ পরীক্ষায় ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিবার পদ্ধতি আছে সত্য, কিন্তু তাহাতেই বা কয় জন ছাত্র মাতৃভাষার আলোচনা-রূপ মহাপাতকে হস্তার্পন করে? এ সকল জানা কথা। এই সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজী-শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালাশিক্ষা আজিকালি বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা অনেক এম-এ ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙ্গালী যুবকের মাতৃভাষাভিজ্ঞতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি; লিখিতে লজ্জা হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালায় এক ছত্র লিখিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম ও বিকল হইয়া পড়েন। ইহা অপেক্ষা জাতীয় অধঃপতন আর কত অধিক হইতে পারে?

ইংরাজীই বা শিখিলাম কৈ?

ঘটনা বশতঃ ইংরেজ আমাদের রাজা হইয়াছেন; সেইজন্য ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। রাজভাষা না শিখিলে, রাজসরকারে উচ্চপদ ও সম্মান-সম্ভ্রম পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইংরেজী এক হিসাবে আমাদের অর্থকরী বিদ্যা। কিন্তু যে আট কোটী বাঙ্গালী আজি জীবন-সংগ্রামের কঠোর কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্তভাবে "ত্রাহি" "ত্রাহি" ডাক ছাড়িতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কয়জন ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়িয়া ইংরেজীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লইতেছে? তুলনায় শতাংশও নহে, সহস্রাংশও নহে, অযুতাংশও কি না—তাহাতেও সন্দেহ! আট কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে, ধর, হয় ত সাত হাজার জন মাত্র ইংরেজীতে বিবিধ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় লইতেছে। অবশিষ্ট সাতকোটী নিরানব্বুই লক্ষ তিরানব্বুই হাজার লোকের গতি কি হইবে? অবশ্য স্ত্রী, শিশু ও ইতর লোকের সংখ্যা ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট। ঠিক সংখ্যার নির্দ্দেশ করা, আপাততঃ অসম্ভব বলিতে হইবে। তবে একটা অনুমান করিয়া লইয়া আমরা তিন কোটী বাঙ্গালীকে বিদ্যাশিক্ষালাভের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু বল দেখি ভাই, তাহারা কোথায় কি অবস্থায়, কিরূপে জীবন যাপন করিতেছে।

বুঝিতাম, যদি সেই রাজভাষাও সকল বঙ্গসন্তানের অধিগম্য হইত, যদি অন্ততঃ তিনি কোটী বাঙ্গালীও সেই রাজভাষা শিক্ষা করিতে পাইত ও তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইত; তাহা হইলেও বরং ক্ষোভ থাকিত না। তাহা হইলে, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব—হিন্দুর হিন্দুত্ব

অক্ষুণ্ণ থাকুক আর নাই থাকুক, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলোল প্রবাহে প্রাচ্য রক্ষণশীল সমাজনিবহ দূরে ভাসিয়া চলিয়া যাইত; এ জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইত; সকল সঙ্কট ঘুচিয়া যাইত। কিন্তু আমাদের দুকূল গেল; আমাদের তাহাও হইল না, ইহাও থাকিল না। ইংরাজী শিক্ষা বাঙ্গালী-মাত্রের অধিগত হইল না, অথচ বঙ্গের সমাজসমূহ চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

মাতৃভাষা ত্যাগেই অস্তিত্ব-লোপ।

আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। জাতি পরাধীন হইলেই যে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিজেতা রাজার ভাষা শিক্ষা করিবে, জগতের ইতিহাসে সভ্য জাতির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যখন গ্রীশ, তুরস্কের অধীন হইয়াছিল; তখন বিজিত গ্রীকগণ, সেই বিশ্বের বরণীয়া গ্রীক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, তুর্কীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল কি? বিশ্ববিজয়ী রোম, জগতের অর্দ্ধাংশে আপনার অক্ষুণ্ণ প্রভাব পরিচালিত করিয়া, অবশেষে বর্ব্বরদিগের হস্তে যখন আত্মসমর্পণ করিল, তখন রোমীয়গণ কোন্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল? স্যাক্সন ও জর্ম্মাণ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত তাহাদেরও মাতৃভাষা যে পরিত্যক্ত হয় নাই—জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়া যায়। তবে মাতৃভাষা যাহারা একবারে ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা মরিয়াছে, তাহারা ডুবিয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে নাই। বাঙ্গালি! তুমি কি তোমার অস্তিত্বটুকুও লোপ করিতে চাও? যদি না চাও,

তবে আইস,

কৃতসঙ্কল্প হও, ব্রতধারণ কর, প্রাণপণ কর। আজি তোমার মাতৃভাষা আর সেরূপ 'দীনা হীনা মলিনা' নাই; আজি ইহা বিপুল সম্পৎসারে গৌরবান্বিতা। আজি বাঙ্গালা সাহিত্য, জগতের অন্যান্য সাহিত্যের সহিত সমান স্পর্দ্ধা করিতে পারে। তবে তোমার অভাব কি? তুমি বলিবে—বাঙ্গালার উপযুক্ত ইতিহাস নাই, শিল্পশাস্ত্র নাই, বিজ্ঞানশাস্ত্র নাই। না থাকিতে পারে; কিন্তু হইতে কতক্ষণ লাগে? অভাব—সৃষ্টির জনয়িতা। একটু উদ্যোগী হইলেই, দেখিবে—তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে;—বাঙ্গালা ভাষায় কত উৎকৃষ্ট ইতিহাস, কত উৎকৃষ্ট শিল্পশাস্ত্র, কত উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অতএব, সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালায় উচ্চশিক্ষার পথ পরিষ্কার কর, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত দেশের সাহায্য লাভ কর; তবে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমরা বলিয়াছি, বলিতেছি, এবং যত দিন না আমাদের সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়, ততদিন বলিব,—বাঙ্গালায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

সেদিন কবে আসিবে?

সেদিন কবে আসিবে?—যেদিন দেখিব,—বঙ্গের জেলায় জেলায়, পরগণায় পরগণায়, জন-সঙ্ঘের প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে, ইংরেজি স্কুল-সমুদায়ের আদর্শে—অনুকরণে, বড় বড় বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন কবে আসিবে?—যেদিন দেখিব,—সেই সকল বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্র বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে;—প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ছাত্র বাঙ্গালা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাইয়া পরীক্ষা দিতেছে। সেদিন কবে আসিবে?—যেদিন দেখিব,—বিদ্যার জ্যোতি, বিজ্ঞানের প্রতিভা, ধর্ম্মের শান্তোজ্জ্বল আলোকে, বঙ্গের সর্ব্বত্র শতভানু প্রকাশ পাইতেছে। সেদিন কবে আসিবে?

উপায়।

বাঙ্গালা ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা

চাই—করিতেই হইবে। যত দিন না হইবে, তত দিন বাঙ্গালীর প্রধানতম কর্ত্তব্যের উপযুক্ত সংসাধন হইবে না, তত দিন বঙ্গের অধিকাংশ লোক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে, তত দিন বঙ্গের গৃহে গৃহে দৈন্য-দুর্দ্দশা অতৃপ্তি ও অমর্ষের নিবিড় ছায়া বিসর্পিত হইতে থাকিবে, তত দিন বঙ্গের উন্নতি সুদূরপরাহত—বাঙ্গালীর আশা-ভরসা গভীর গর্ভে নিহিত। গতি কি হইবে? আমাদের রাজা, ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষার পথ ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ করিতেছেন; দুই দিন পরে, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানগণ ভিন্ন, হয় ত সেই উচ্চশিক্ষালাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে না! সুতরাং গতি কি হইবে? দীন হীন আমাদের উপায় কি হইবে? উপায় আছে। উপায়,—বাঙ্গালা ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর; মাতৃভাষার প্রচুর আলোচনা কর; বঙ্গের গ্রামে গ্রামে উচ্চ-অঙ্গের বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর; 'ডিগ্রি' দাও, উপাধি দাও, পুরস্কার বিতরণ কর। দেখিব,—অত্যল্প দিনের মধ্যেই আট কোটী বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; বিদ্যার বিমল বাসন্তি সৌকুমার্য্য দিগদিগন্ত ব্যাপিয়া বিচ্ছুরিত হইবে; লোকের মনের অন্ধকার দূর হইবে; দৈন্য-দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য বিদায় লইবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে পরাশরের যুক্তি।

(সাহিত্যের সমালোচনায় উপপত্তি)

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অভ্যাস-গুণে গ্রন্থের প্রধান বিষয় পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত ও আলোচিত হইয়া গ্রন্থ পূর্ণাবয়ব হইয়া আইসে। কিরূপে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত ও আলোচিত হয়?—উপপত্তি-ক্রমে। কুলাল যেমন চক্রের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে ঘট সামগ্রীসকল সংযোজিত করিয়া ঘট প্রস্তুত করিয়া আনেন, গ্রন্থকারও তেমনি গ্রন্থাবয়বে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদিগকে উপপত্তি-ক্রমে সাজাইয়া ও গাঁথিয়া গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়া আনেন। এই জন্য আলঙ্কারিক দণ্ডী সমুদায় গ্রন্থাবয়বকে গ্রন্থের শরীর বলিয়াছেন। তাঁহার এই শরীর-শব্দ সুন্দর অর্থপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, এই শরীর গ্রন্থের "ইষ্টার্থ"—সাধক পদাবলী দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। শরীরের যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল এক এক প্রয়োজন সাধন করিয়া সমুদায় শরীরকে সংগঠনপূর্ব্বক তাহার পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি ইষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে, সুগ্রন্থেরও অধ্যায়, সর্গ, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তদ্রূপ পদাবলী-স্বরূপ হইয়া তাহার ইষ্টার্থ-সাধক ফলপ্রদায়ক হয়। তাহা যদি না হয়, তবে সেই অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও সর্গাদি নিরর্থক ও বৃথায় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু যদি সেই সকল সামগ্রীর যথা-সংযোজন হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থখানি উপপত্তি-ক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে উপনীত হইয়া সুন্দর ফলপ্রদ হয়। গ্রন্থোক্ত বিষয়সামগ্রী যদি উপপত্তি অনুসারে পর পর গ্রথিত হইয়া অভ্যস্ত বা আবৃত্ত হইয়া আইসে, তবেই গ্রন্থের পূর্ণাবয়ব সম্পূর্ণ হয় এবং সেইরূপে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলেই ঠিক বলা যাইতে পারে এই স্থলে গ্রন্থ—সম্পূর্ণ। উপপত্তিই তবে

গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়া আনে। এইজন্ত তাহা সমালোচ্য গ্রন্থের শেষোক্ত গুণরূপে আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকে সর্ব্বশেষে বসিয়াছে।

কিন্তু উপপত্তি যেরূপ গুণ, তাহা ত অভ্যাসের ঠিক পরেই বসা উচিত ছিল, তাহা না হইয়া "অর্থবাদ" বা গ্রন্থের অধিকারের পর বসিল কেন? বসিল এই জন্ত যে গ্রন্থের অধিকার এবং অধিকারীর উপযোগী করিয়াই গ্রন্থসামগ্রীসকল আয়োজিত এবং পর পর সংযুক্ত করিয়া সজ্জিত করা উচিত। তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থের ইষ্টার্থ সিদ্ধ হইবে কেন? তাই গ্রন্থের অধিকার-ভেদ অনুসারে তাহার উপপত্তি হওয়া উচিত। অধিকার অনুসারে যেমন সকল গ্রন্থেরই বিষয়ীভূত সামগ্রীসকল আয়োজিত হইয়া থাকে, তেমনি তাহা তদনুযায়ী উপপত্তিক্রমে পর পর গ্রথিত ও সজ্জিত না হইলে গ্রন্থের ইষ্টার্থ সিদ্ধ হয় না। এই উপপত্তিই সেই আয়োজিত সামগ্রী সকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়কে জলের মত সহজ ও বিশদ করিয়া আনিয়া সুন্দর ফলপ্রদ করে। এইজন্য "উপপত্তি" শ্লোকমধ্যে "অর্থবাদের" পরে বসিয়াছে।

গ্রন্থের প্রকৃতি ও বিষয় যেরূপই হউক না কেন, তাহা উপন্যাস, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, বা ধর্ম্মতত্ব,—যাহাই হউক না, সকল গ্রন্থশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উপপত্তি-অনুসারে সংযুক্ত ও সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস দ্বারা গ্রন্থকার অধিকার-অনুসারে বিষয়-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া আনেন, কিন্তু উপপত্তি-অনুসারে সেই সকল সামগ্রীর প্রয়োজনানুযায়ী নিয়োজন বা নিয়োগ করিয়া দেন। প্রয়োজন, আয়োজন এবং নিয়োজন— এই ত্রিবিধ উপকরণে কি ব্রহ্মাণ্ডশরীর, কি জীবশরীর, কি সমাজ-শরীর, কি গ্রন্থশরীর— সর্ব্ববিধ শরীরই সুনির্ম্মিত। বিধাতা যেমন এই ত্রিবিধ উপকরণে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশরীর গড়িয়াছেন, নৃপতিও তেমনি ঐ ত্রিবিধ উপায়ে প্রজামণ্ডলীকে বিভক্ত, শিক্ষিত এবং ব্যবস্থিত করিয়া সমাজ-শরীর গড়িয়া আনেন এবং গ্রন্থকারও তেমনি গ্রন্থোপকরণ সমুদায়কে প্রয়োজন অনুসারে আয়োজিত এবং নিয়োজিত করিয়া আনেন। সেই গ্রন্থ-শরীরেই ইষ্টার্থ-সিদ্ধি হয়, যাঁহার এই ত্রিবিধ উপকরণ সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারই সমালোচনা ঠিক বিচারসিদ্ধ হইয়াছে; তিনি এই ত্রিবিধ গ্রন্থের এই ত্রিবিধ উপকরণের ঠিক ধারণা করিয়া বিচার করিতে পারিয়াছেন। এই ত্রিবিধ উপকরণের ধ্যান ও ধারণা করিতে গেলেই সকল গ্রন্থের দোষগুণ আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। সমালোচক ঠিক বুঝিতে পারেন, কেন গ্রন্থখানি ঠিক ফলপ্রদ হয় নাই বা হইয়াছে। এ বড় শক্ত বিচার, এই বিচারই গ্রন্থের শেষ বিচার। এই বিচারে সিদ্ধ হয়, কোন্ গ্রন্থ কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে, কাহার ফল বিষময় হইয়াছে এবং কাহারই বা ফল অমৃতময় হইয়াছে।

আয়োজিত বিষয়-সামগ্রীকে প্রয়োজনানুসারে নিয়োজিত করিতে গেলেই উপপত্তি তাহাদিগকে যুক্তি, প্রমাণ, উপযোগিতা প্রভৃতি গুণানুসারে যথাস্থানে সংযুক্ত করিয়া দিবে। সুতরাং উপপত্তি অনুসারে গ্রন্থের সেই সেই গুণেরও যথোচিত পরিচয় হয়। সমালোচক সেই সকল গুণের বিচার করিতে পারিলে তবে গ্রন্থের উপপত্তির বিচার সিদ্ধ হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; আমরা সেই গ্রন্থের উপপত্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

গীতার উপক্রম কি, তাহা আমরা উপক্রমোপসংহার নামক প্রস্তাবে বলিয়াছি।

আমরা আরও বলিয়াছি, গীতা উপক্রমে যে অপূর্ব্ব বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যাস দ্বারা তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনা পূর্ব্বক প্রক্রান্ত বিষয়ের উচ্চ উচ্চ অধিকারে ক্রমশঃ উঠিয়া উপপত্তির যথারীতি ক্রমে চরম উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্ববিধ পাপতাপের একমাত্র কারণ যে মায়া-মোহ, সেই মোহজাত অহঙ্কার হইতে জীব মুক্ত হইতে গেলে ক্রমশই উচ্চ উচ্চ অধিকারে উঠিতে হয়। সেই অধিকারানুযায়ী তাহার সাধনাও নিয়মিত হইয়া আইসে। সুতরাং গীতার অধিকার অতি সুবিস্তৃত। ঘোর মোহসমন্বিত পাপাসক্ত জীবকে মুক্তিপথে আনিতে হইলে তাহাকে নানা অধিকারানুযায়ী সাধনা দ্বারা নিষ্কাম করিতে পারিলে তবে তিনি মুক্ত হইতে পারেন। সেই উচ্চ উচ্চ অধিকারানুযায়ী সাধনা প্রদর্শন করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের ক্রম প্রকাশ করাতেই গীতার অভ্যাস হইয়াছে। এই অভ্যাসবশতঃ গীতা অধিকারানুযায়ী উপপত্তিক্রমে পূর্ণাবয়ব হইয়া আসিয়াছে। এই পূর্ণাবয়ব বা শরীর তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—শিরোদেশ, মধ্যদেশ এবং পাদদেশ। মানবশরীরের যেমন এই তিন প্রধান ভাগ, গীতাশরীরেরও তেমনি ঐ তিন ভাগ। যে সাধনা মুখ্য বিষয়ীভূত, সেই সাধনাই গীতার শিরোদেশ এবং প্রথম ষড়ধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। তৎপরে কথা এই, যাহার সাধনা করিব, সেই সাধ্য কিরূপ? এজন্য দ্বিতীয় ষটে এই সাধ্য বা আরাধ্য ঈশ্বরতত্ত্ব এবং পরম ব্রহ্মপদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মপদ ও আরাধ্য ঈশ্বর সাধকগণের মস্তকোপরি স্থাপিত হওয়াতে গীতার তৃতীয় ষড়ধ্যায়ে সেই সাধকগণের বিষয় আলোচ্য হইয়াছে। তবেই গীতার পাদদেশে সাধকগণ অবস্থিত, তাহার মধ্যদেশে স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালী দেবগণ এবং শিরোদেশে ধ্যান, ধারণা, আরাধনা, প্রভৃতি সাধনা ও নিষ্কাম ধর্ম্মের বিবিধ যোগাঙ্গ।

এই তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগ আবার তিন তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সাধনার তিন ভাগ—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগ; সাধ্যের তিন ভাগ—পরমাত্মা পরব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবগণ, এবং সাধকের তিন ভাগ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান ত্রিবিধ সাধক। কর্ম্মীর দেবগণ, ভক্তের ভগবান্ এবং জ্ঞানীর ব্রহ্ম। ভক্তি কর্ম্মীকে দেবগণ হইতে ভগবানে উপনীত করেন এবং ভগবানে পরাভক্তিতে পরিণত হইয়া জ্ঞানে ব্রহ্ম পদে পরম ব্রহ্মানন্দে মিশিয়া যান।

গীতার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ কি প্রকার, তাহা আমরা দেখাইলাম। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অধিকারানুসারেই সজ্জিত হইয়া অভ্যাস বশতঃ প্রধান বিষয় নিষ্কামধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় গীতা পূর্ণাবয়ব হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপ উপপত্তিক্রমে যুক্তিযুক্ত হইয়া বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে হইলে সমগ্র গ্রন্থের যুক্তিপথ দেখাইতে হয়। শ্রীধর প্রভৃতি টীকাকার এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সেই সেই যুক্তিসকলের সম্যক্ সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমরা সে বিষয় উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এখন কথা এই, গীতার এই যুক্তিপথ ও উপপত্তি দেখাইতে এত টীকাকার ও ভাষ্যকার কেন? যাঁহারা যেরূপে এই গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা গীতাকে সেইরূপে বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন। কাহারও টীকায় কর্ম্মপথ, কাহার বা ভক্তিপথ, কাহারও ভাষ্যে বা জ্ঞানপথ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এজন্য প্রত্যেকেই এক এক অপূর্ব্ব যুক্তিপথ দিয়া গীতার উপসংহারে উপনীত

হইয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেকেই যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপথ বিবৃত করিয়াছেন। বিভিন্ন অধিকার তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। আর্য্য-সাহিত্যের চমৎকারিত্ব এই অধিকার লইয়া। এই অধিকার শুধু যে এক গ্রন্থকে অপর গ্রন্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় এমন নহে, এই অধিকার-ভেদ আবার টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণকেও পৃথক্ করিয়া দেয়। এক শ্রীমদ্ভাগবতের শতাধিক টীকা ও ভাষ্য, কিন্তু সকলই বিভিন্ন।

আমরা গীতাকে যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম, আর্য্যশাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থকেই তদ্রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়। যেহেতু, সে সকল গ্রন্থ আমাদিগের শ্লোকোক্ত উপক্রমাদি গুণাবলি-সম্পন্ন। এমন কি, বিধি-নিষেধ-সম্পন্ন মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রসকলও উপপত্তি-অনুসারে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে; এবং এক এক অধ্যায়স্থ বিধানাবলির মধ্যেও কিয়দংশে যুক্তিপথ পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনুর স্মৃতি ত বিলক্ষণ এ গুণসম্পন্ন। আমরা অপর এক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দিব ;—

অনেকের ধারণা এই যে, স্মৃতিশাস্ত্রে কেবল বিধানসকলই প্রদত্ত হয়। বিধান শাস্ত্রে বিধি-নিষেধ বাক্যের যুক্তি প্রদত্ত হয় না। সর্ব্বস্থলেই এ কথা সত্য নহে। কোন কোন স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ও ব্যবস্থা সকল বিলক্ষণ যুক্তিসিদ্ধ হইতেও দেখা যায়। কারণ আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা যুক্তিপথ বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহারা এই বাক্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন ;—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

"কেবল শাস্ত্রবাক্য আশ্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্ম-নিরূপণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।"

পরাশরের মত আমরা এক্ষণে তিনখানি ব্যবস্থাশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হই—বৃহৎ পরাশর সংহিতা, লঘু পরাশর সংহিতা এবং ব্যাস সংহিতা। এই তিনখানিই তাঁহার শিষ্যত্রয় কর্ত্তৃক লিখিত। কি বৃহৎ পরাশর, কি ব্যাস উভয়ই বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। লঘু পরাশর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ। সুতরাং পরাশরের মত তাহাতে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এজন্য লঘু পরাশরের যুক্তি-পথও অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষেপের মধ্যে সেই শাস্ত্রকর্ত্তা অতি সুন্দররূপে নিজ গুরুর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অভিমত কখন বৃহৎ পরাশর এবং ব্যাস সংহিতাদ্বয় হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। এ প্রস্তাবে আমরা এই লঘু পরাশরের সংক্ষিপ্ত যুক্তিপথ বলিতেছি। লঘু পরাশরের চতুর্থ অধ্যায়ে বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে এইরূপ সংক্ষিপ্ত যুক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ। বৈধব্য, কিরূপ পাতক হইতে তাহার কর্ম্মফল স্বরূপ উৎপত্তি হয়, তাহা শাস্ত্রকার বলিতেছেন ;—

"অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥"

"অপতিত এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে সপ্তজন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে।"

পুরুষ এই পাতকে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে। আর স্ত্রীলোক কোন্ পাতকে তদ্রূপ যন্ত্রণাভাগিনী হন ?- "দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ

করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে।”

এ কথার অর্থ এই, যদি সর্প না হয়, তবে মনুষ্যজন্মেই স্ত্রীজাতীয় হইয়া পুনঃ পুনঃ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে। বৈধব্যের আরও এক কারণ উক্ত হইয়াছে ;—

“ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নৌপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥”

“ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মরণান্তে নরকে বাস এবং পুনঃ পুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে।”

এস্থলে দেখা যাইতেছে, বৈধব্য-যন্ত্রণাই এক প্রকার নরকভোগ। এই বৈধব্য-ভোগ করিবার জন্য যাহাদিগের জন্ম, বিধাতার নিয়মানুসারে তাহাদিগের বৈধব্য ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু বিধবাদিগের যদি পুনরায় বিবাহ হয়, তবে আর তাহারা বিধবা রহিল কৈ? তাহা হইলে হিন্দুসমাজে সবাই সধবা। ঋষিরা কি এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন, যদ্দ্বারা বিধাতার নিয়মভঙ্গ হয়? বিশেষতঃ যে শাস্ত্রকার উক্ত বৈধব্যের নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া সেই বৈধব্য-নিবারণের উপায়স্বরূপ বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা দিতে পারেন? এ ব্যবস্থা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক তিনি সে ব্যবস্থা করেন নাই। বরং যাহাতে চিরদিন সেই বৈধব্য ভোগ হয়, আমরা দেখাইব, তিনি এইরূপই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ। তবে বৈধব্য কি? সকলেই জানেন পতিহীনতার নাম বৈধব্য। মৃত-পতিকাই কি কেবল বিধবা? মৃতপতিকার সহিত সমান অবস্থাপন্না কে কে? সে কথার উত্তরে স্মৃতিকার বলিলেন ;—

“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতপতৌ।”

যাঁহার পতি বহুকাল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তিনি কি পতিহীনা নহেন? যাঁহার পতি প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া বনে গিয়াছেন, তিনি কি পতিহীনা নহেন? যাঁহার পতি ক্লীব, তিনিও কি এক প্রকার বিধবা নহেন? তাঁহার পতি যে জীবিত থাকিতেও নাই। আর যাঁহার পতি পতিত হইয়া বিধর্ম্মী ও জাতিচ্যুত হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিও কি পতিহীনা হইয়া গৃহে একাকিনী অবস্থিতা নহেন? বলিতে গেলে মৃতভর্ত্তৃকার সহিত এই চতুর্ব্বিধ নারীও সমান অবস্থাপন্ন এবং এক প্রকার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত। তবে সর্ব্বসাধারণে কেবল মৃতভর্ত্তৃকাকেই বিধবা বলিয়া থাকেন। এইজন্য স্মৃতিকার বলিলেন, সেই পঞ্চ প্রকার নারী সকলেই একই প্রকার আপৎকালে অবস্থিত। তাঁহারা ;—

“পঞ্চস্বাপৎসু”

মৃতপতিকার যে দশা, অপর চতুর্ব্বিধ নারীর যদি সেই দশাই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে বিধবাই বল, অথবা সম অবস্থাপন্ন আপৎকালে অবস্থিত বল, সে একই কথা। কারণ, সেই পঞ্চবিধ নারীর মধ্যে মৃতপতিকা বিধবাও রহিয়াছেন। অপর চারিজনকে মৃতপতিকার সহিত একই সূত্রে আবদ্ধ করিবার কারণ এই যে, স্মৃতিকারেরা ব্যবস্থা দিবার সময় একভাবাপন্ন সর্ব্বজনের প্রতি যাহাতে একরূপ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়, এমন ভাবেই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সেইরূপ মৃতপতিকার প্রতি প্রযুক্ত করিবার নিমিত্ত সকলকেই একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়া শাস্ত্রকার বলিলেন ;—

“পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।”

একই আপৎকালে অবস্থিত সেই পঞ্চবিধ নারীদিগের

“পতিরন্যো বিধীয়তে।”

এইক্ষণে এই বিধান বিচার্য্য।

তৃতীয়তঃ। ব্যবস্থা হইল, নারীদিগের অন্য পতি বিহিত। তবেই দেখিতে হইবে, নারীদিগের অন্য পতি বলিতে কি বুঝায়? যদি আমরা বলি বিষ্ণুশর্ম্মার অন্য বই, তাহা হইলে কি বুঝাইল না, বিষ্ণুশর্ম্মার "হিতোপদেশ" ব্যতীত অন্য বই। সে বইও অবশ্য বিষ্ণুশর্ম্মা কৃত এবং তাহাও আছে। তদ্রূপ, "নারীদিগের অন্য পতি" বলিলে কি বুঝাইল না যে, সে পতিও নারীদিগের আছে? "নারীণাং পতিরন্যো" বলিলে কি এরূপ আকাঙ্ক্ষা বুঝায় না? যদি বুঝায়, তবে বরং বিচার্য্য, নারীদিগের অন্য পতি কি আছে। কিন্তু একথা দ্বারা নিশ্চয় এমন বুঝায় না যে, নারীদিগের দ্বিতীয়বার বা অন্যবার বিবাহ বিহিত। কারণ, পতি শব্দের অর্থ বিবাহ নহে। লঘু পরাশরের স্মৃতিকারও এমন কথা বলেন নাই যে, আপৎকালে সেই নারীদিগের দ্বিতীয় বা অন্যবার বিবাহ বিহিত। মনু বলেন ;—

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।"

নবম অধ্যায়, ৬৫।

কল্লূক ইহার টীকায় বলেন ;—

"ন চ বিবাহবিধায়কশাস্ত্রেঽন্যেন
পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।"

"বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে এবং বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে লিখিত নাই যে, বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ (অর্থাৎ নিয়োগ) আছে।

এ স্থলে মনু বলিতেছেন, বিবাহবিধায়ক কোন শাস্ত্রেই বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা উক্ত নাই। সুতরাং পরাশরেও তাহা উক্ত হয় নাই। পরাশরের "পতিরন্যো তিনি ত যখন অন্যবার বিবাহের কথা বলেন নাই তখন তাঁহার "অন্য পতি" শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সে পতি নিশ্চয় বিবাহিত পতি নহে। সে পতি কে তাহা যদি শাস্ত্রেই উক্ত থাকে, তবে তখনকার কালে শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই তাহা জানা ছিল। এজন্য, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা হয় নাই। শুধু অন্য পতি বলিলেই যথেষ্ট হইয়াছিল। এই দেখুন, শাস্ত্রে সেই অন্য পতির কথা কিরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

"মানস সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ প্রিয়ঃ পতিঃ।
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্।
তস্মাৎ পতিব্রতা নার্য্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে।
যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ১৮ শঃ অধ্যায়।

"সর্ব্বভূতের হৃদয়বাসী—সেই শ্রীপতি (লক্ষ্মী-পতি) ভগবান্ বাসুদেবই নাম রূপপার্থক্যদ্বারা পৃথক্কৃত বিবিধ দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুরুষদিগের নিকট এবং পতিরূপধারী হইয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট পূজিত হয়েন। অতএব হে সুমধ্যমে! মঙ্গলার্থিনী পতিব্রতা নারীগণ পতিকে আত্মা এবং ঈশ্বরবোধে পূজা করেন।"

প্রকৃতি ও লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবান্ নারীদিগের পতিরূপে বরাবরই বিদ্যমান্। বিবাহিত পতি সত্ত্বেও তিনি বিদ্যমান্। সুতরাং নামরূপকল্পিত পার্থিব বিবাহিত পতির অভাব হইলে প্রকৃত পতিকেই তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া শাস্ত্রের অনুশাসন। পতিত পতিকে ত্যাগ করিয়া যদি কোন পতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে একমাত্র শ্রীভগবানই সেই নিখিলকল্যাণগুণযুক্ত একমাত্র পতি।

পুরুষের একমাত্র পতি—ভগবান্। নারী-

(২) শ্রীভগবান্‌—যিনি সেই বিবাহিত পতির আত্মারূপে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান। যিনি চিরকালই পতি হইয়া আছেন, তাঁহাকে আপৎকালে স্মৃতিকার "পতিরন্যো" বলিয়া বিশিষ্টরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনিই "নারীণাং পতিরন্যো"। তাঁহাকে আর গ্রহণ করিতে হয় না; কারণ, তিনি বরাবরই গৃহীত হইয়া আছেন। এই জন্য "পতিরন্যো" শব্দের পর "বিধীয়তে" শব্দের সুন্দর প্রয়োগ হইয়াছে। লঘু পরাশর কর্ত্তা অন্যপতি গ্রহণীয় বলেন নাই, অন্যপতি বিহিত বলিয়াছেন।

সমুদায় শাস্ত্র-পর্য্যালোচনায় এই অর্থই সুসঙ্গত বোধ হয়। সাধ্বী দময়ন্তীর পতি যখন নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে যে তিনি নলের উদ্দেশে দ্বিতীয়বার বিবাহের ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কেবল কৌশলক্রমে সেই পতিরই লাভরূপ উদ্দেশ করিবার জন্য। নহিলে তিনি যদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া আবার বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে নল ফিরিয়া আসিলে কি সঙ্কট উপস্থিত হইত? পতির নিরুদ্দেশকালে নারীদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে এইরূপ সঙ্কট ঘটিবার সম্ভাবনা। এ কথা কি শাস্ত্রকার বুঝেন নাই? না বুঝিয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা দিবেন? শ্রীরাধিকার পতি ক্লীব ছিলেন বলিয়া তিনি ভগবান্ হরিকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যা ঘটিলে তাঁহার প্রথম পত্নী মৈত্রেয়ী সহধর্ম্মিণীর মত সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিলেন; দ্বিতীয়া পত্নী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহেই অবস্থিতা ছিলেন। নহিলে সেই বৃদ্ধ বয়সে কি আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করা সম্ভব হয়? শাস্ত্রানুসারে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্রকার কি সেইরূপ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পত্নীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করা বিহিত বলিতে পারেন? পরমর্ষি দেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী সুযজ্ঞ রাজার কন্যা রত্নমালা বহুকাল পতিবিরহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পতিতের কথা পুরাণের অধিকারভুক্ত নহে বলিয়া পতিতদিগের বিবরণ শাস্ত্রে তত দেখিতে পাওয়া যায় না, নহিলে আমরা সে দৃষ্টান্তও দিতে পারিতাম। কিন্তু অপর ত্রিবিধ নারীর আপৎকালে যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়, তাহা হইলে যে সঙ্কট এবং বিরুদ্ধাচরণ হয়, সে বিষয়ও বিবেচনা করিলে কি প্রতীত হয় না যে, শাস্ত্রকার কখন সেরূপ বিবাহ নিয়োগ করিতে পারেন না? অতএব এই চতুর্ব্বিধ নারীর আপৎকালে যে "পতিরন্যো" বিহিত হওয়াতে, তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় হইয়াছে, লঘু পরাশরকর্ত্তা মৃতভর্ত্তৃকার আপৎকালেও সেই পতিই তাঁহার পক্ষে নিশ্চিত বিহিত বলিয়াছেন।

উপরে "পতিরন্যো" শব্দের যে অর্থ ধৃত হইল, তাহার এক আপত্তি এই, এস্থলে পতিশব্দের যে ঐ অর্থ তাহার পরিভাষা কই? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিতে পরিভাষা করিয়া শব্দপ্রয়োগের রীতি নাই। শব্দে চলিতার্থই গৃহীত হইয়া থাকে। সে অর্থ ধরিলে পতি-শব্দের অর্থ "বিবাহ" হয় না। সেই "পতিরন্যো" কে, তাহা পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ বিদিত ছিল। তজ্জন্য বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যই চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। তৎপক্ষে কখনও কাহার সন্দেহও হয় নাই। পরাশরের মত যে অন্যবিধ ছিল, একথা অপর শাস্ত্রকারেরাও বুঝেন নাই।

চতুর্থতঃ। লঘু পরাশরকর্ত্তা যে বিধান দিয়াছেন, সেই বিধিবাক্যের পরশ্লোকেই তাহার "ফলশ্রুতি" কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই "ফলশ্রুতি" দ্বারাও সপ্রমাণ হয়, তাহার

বিধানের প্রকৃত অর্থ কি। তাহার অর্থ যে ব্রহ্মচর্য্য, সেই ব্রহ্মচর্য্যেরই গৌরব ঠিক পর শ্লোকেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনীয় হইলে যাঁহারা বিধবা হন, তাঁহারা চিরকালই বিধবা থাকিয়া যান। এজন্ম তাঁহার বাক্যাবলির পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে। অথচ বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে তাহাদিগের বৈধব্যদশার অনেকাংশে শান্তিবিধান হয়। শুধু যে ইহলোকে শান্তিবিধান হয় এমন নহে, মরণান্তেও বিধবাগণ ব্রহ্মচারীদিগের যে গতি, সেই গতি লাভ করিয়া থাকেন। তদর্থে স্মৃতিকার ঠিক পর শ্লোকেই এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

"মৃত ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

"স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ করেন।"

"পতিরন্যো"র অর্থ যদি স্বয়ং সর্ব্বপতি শ্রীভগবান্ হন, তবে তৎপরেই এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের গৌরবকীর্ত্তনের সুন্দর উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। নহিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বলিয়া তৎপরেই ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব-কীর্ত্তন তত সুসঙ্গত হয় না। আবার যে নারী সেই পতিকেই পরম দেবতাজ্ঞানে তাঁহার মরণান্তে সহমৃতা হইয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হন, তাঁহার পক্ষেই যথার্থ "পতিরন্যো বিধীয়তে" হইয়াছে। কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন ;—

"পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।"

"নারীদিগের পতিই পরম দেবতা।" সেই রূপ দেবতাজ্ঞানে যে নারী তাঁহার মরণান্তে অনুগামিনী হইতে পারেন, লঘু পরাশরের স্মৃতিকার তাঁহার অধিকতর গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন ;—

"তিস্রঃ কোটার্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।"

"স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটীসংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গভোগ করেন।"

স্বয়ং ভগবানই যে পতিরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার অনুগামিনী হইয়া যে নারী স্মৃতিকারের "পতিরন্যো"র বিধি অবিলম্বেই অনুসরণ করিলেন, তাহার গৌরব যে তিনি শতমুখে গাহিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! চমৎকার ফলশ্রুতি!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

জীবনচরিতসঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গঙ্গাধর কবিরাজ—বঙ্গের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসক। ইহাঁর পিতার নাম কবিরাজ ভবানী প্রসাদ রায়। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধরের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় মেধাবী ও সুশীল ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এই সময়ে ইহাঁর

নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুঁথি পাঠ লইবেন, এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনোমধ্যে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এবং হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্যসাধনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিখনপঠনের মধ্যে ইনি ইহাঁর অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদি বিষয়ে পাঠ দিতেন। এই সময়ে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা করেন। অতঃপর আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। সুতরাং ইনি আধুনিক রাজধানী সুবিধাকর স্থান বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গঙ্গাধরের বয়স ২১ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অধ্যাপকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন এবং অনেক লোকের বহুবিধ উৎকট রোগের শান্তি করায় দেশময় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

গঙ্গাধর বাল্যকালে মুগ্ধবোধের টীকা করেন, তাহা ভিন্ন বোপদেব তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ সমাপ্ত করিয়া সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় আর একখানি টীকা করেন। এই দুইখানি টীকাই গঙ্গাধরের বিদ্যাবুদ্ধির সমুজ্জ্বল ও অদ্ভুত নিদর্শন। এই সময়ে ইনি "লোকালোক পুরুষীয়" ও "দুর্গবধ কাব্য" নামে দুইখানি মহাকাব্য লেখেন। চরক সংহিতার চক্রদত্ত কৃত একখানি টীকা আছে। সে টীকা অসম্পূর্ণ। গঙ্গাধর সমস্ত চরকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া "জল্প কল্প তরু" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। এই সকল ব্যতীত তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য, প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কার-শাস্ত্র, ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যান, পদ্যে দুই খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'হর্ষোদয়' নামে চিত্রকাব্য, ভাগবত বিচার প্রভৃতি সর্ব্ব শুদ্ধ ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালা লেখাতেও ইহাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। প্রথিতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সংক্ষুব্ধ, সেই সময়ে গঙ্গাধর 'বহুবিবাহরাহিত্য', 'বিধবাবিবাহ-প্রতিষেধ' প্রভৃতি কয়েকখানি গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্ব দিনে নিজের নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের গণনা দ্বারা পরদিন মৃত্যু অবধারিত জানিয়া বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য আমি কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব; কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।" আর সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র চরকের টীকাই গঙ্গাধরকে অমর করিয়া রাখিবে। এই অমূল্য রত্নের নিমিত্ত সমগ্র চিকিৎসক-সমাজ তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

গঙ্গাধর শাস্ত্রী—মহারাষ্ট্র দেশীয় একজন পণ্ডিত। ইনি কৃষ্ণরাজ চম্পূ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর বুদ্ধিমত্তা দর্শনে বরদা

রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ও গাইকওয়াড়ের ভ্রাতা ফতে সিংহ ইঁহাকে আপনার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ক্রমে গঙ্গাধর বরদারাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ইনি পুণা নগরে পেশওয়া বাজিরাওএর নিকট হিসাব নিকাশ দিতে গমন করেন। ইংরাজ-সৈন্য ইঁহাকে নিরাপদে তথায় লইয়া যায়। পেশওয়া ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখেন। পরে কিন্তু ত্রিম্বকজী নামক এক ব্যক্তির নিয়োজিত গুপ্তঘাতক কর্তৃক ইনি নিহত হন।

গঙ্গু—দিল্লীবাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রাহ্মণবিশেষ। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক। দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন প্রথমে এই ব্রাহ্মণের সামান্য ভৃত্য ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা ভূমি কর্ষণ করিতে হুসেন কিঞ্চিৎ গুপ্তধন প্রাপ্ত হন এবং তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুকে আনিয়া দেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্যের সাধুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া গণনা করিয়া দেখিলেন যে, কালে হুসেন রাজা হইবেন। তখন ব্রাহ্মণ হুসেনকে সে কথা জানাইয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লন যে, হুসেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। দিল্লীর রাজসভায় ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহম্মদ তুঘলককে হুসেনের সচ্চরিত্রতার কথা বলিয়া অনুরোধ করায় মহম্মদ তুঘলক হুসেনকে প্রথমে এক শত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ক্রমে হুসেন প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া একটী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ "হুসেন গঙ্গু বাহমণি" উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রভু গঙ্গুকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করেন। গঙ্গুই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানের অধীনে এরূপ উচ্চপদ লাভ করেন।

গজাসুর—গজাকার অসুরবিশেষ। পূর্ব্বকালে মহেশ নামক এক নৃপতি ছিলেন, তিনি একদা দেবর্ষি নারদকে উপেক্ষা করিয়া গমন করাতে দেবর্ষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি জন্মান্তরে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হন। পরে শিব সেই গজাসুরকে বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন।

গণেশ—গজানন গণেশ সম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক কথার প্রসিদ্ধি আছে;—ইনি মহাদেব ও পার্ব্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শনির দৃষ্টিতে ইঁহার মস্তক উড়িয়া গেলে বিষ্ণু একটি করিমুণ্ড আনিয়া ইঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়া ইঁহাকে জীবিত করেন। মতান্তরে, ইনি পার্ব্বতীর গাত্রমলসম্ভূত; স্বয়ং শিব একটি করিমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দেওয়ায় ইনি সজীব হন। ইনি গণের অধীশ্বর এবং সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদাতা। মূষিক ইঁহার বাহন।

দারপরিগ্রহ বিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়া গণেশ তপশ্চর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তুলসী দেবী ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহাকে পতিভাবে পাইতে অভিলাষিণী হন। পরে ইঁহার তপোভঙ্গ করিয়া ইঁহার নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গণেশ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং তুলসীর চিত্তচাঞ্চল্য জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহাকে অসুরের

পত্নী হইতে হইবে। তুলসীও ইহাঁকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অচিরে ইহাঁকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। অতঃপর ইনি পুষ্টি নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

একদিন কৈলাসে গণেশকে দ্বারে প্রহরী রাখিয়া হরপার্ব্বতী নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে শিবশিষ্য ভার্গব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে কৈলাসে উপস্থিত হন। গণেশ তাঁহাকে দেবাদিদেবের আদেশ প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে বলেন। পরশুরাম সে কথা না শুনিয়া পুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল। পরশুরাম স্বীয় কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দন্ত ছেদন করেন। তদবধি ইনি 'একদন্ত' নামে খ্যাত হন। পরন্তু মহাত্মতাহেতু ইনি পরশুরামকে ক্ষমা করেন।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লিপিকারকের অভাবে চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাসকে গণেশের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তদনুসারে ব্যাসদেব গণেশের স্মরণ করিলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন যে, ইহাঁর লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেবও ইহাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন যে, অর্থ না বুঝিয়া ইনি কোনও শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এজন্য ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে দুরূহ শ্লোক রচনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক বুঝিয়া লিখিতে গণেশের বিলম্ব হইত। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বিস্তর শ্লোক মনে মনে রচনা করিয়া লইতেন। ঐ সকল দুরূহ শ্লোক ব্যাসকূট নামে খ্যাত।

গদাধর—বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি বঙ্গের অক্সফোর্ড নবদ্বীপের জনৈক বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সে ইনি দেশের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য মিথিলা গমন করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মিথিলায় গমন করিয়া সে সকল অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে উদ্যত হইলে মৈথিল অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি সঙ্গে আনিতে দিতেন না। সুতরাং গ্রন্থাভাবে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ছাত্রগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায় দর্শন শিক্ষা দিতে পারিতেন না।

গদাধর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন, সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইহাঁর অধ্যাপক ইহাঁকে গ্রন্থাদি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। ইনি অম্লান বদনে তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিলে, তিনি পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলেন যে, গ্রন্থসকল ইহাঁর কণ্ঠস্থ। তখন তিনি ইহাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় ইহাঁকে প্রদান করিলেন, এবং শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত গদাধর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যশঃ-

সৌরভ অতি অল্পকালমধ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইল। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সুদূর মিথিলা গমন না করিয়া ইহাঁর নিকটেই ন্যায়দর্শন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মার প্রতিভাবলেই বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের বহুল প্রচারের সূত্রপাত হয়।

গরুড়—পক্ষিরাজ। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইহাঁর আর এক নাম বৈনতেয়। ইনি ক্ষুধিত হইয়া পিতৃ-নিদেশে যুদ্ধনিরত গজকচ্ছপদ্বয়কে ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাসীত্ব হইতে স্বীয় জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ইনি বিমাতা কদ্রুর আদেশে সুধা আনিতে স্বর্গে গমন করেন [কদ্রু দেখ]। তথায় অমৃত প্রাপ্ত হইয়া তাহা পান না করিয়া পক্ষিবর তাহা লইয়া আসিতে-ছেন দেখিয়া বিষ্ণু ইহাঁর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইহাঁকে বর দিতে প্রস্তুত হইলে, পক্ষিরাজ তদপেক্ষা উচ্চা-সনপ্রাপ্তি এবং অমৃত পান না করিয়াও অজর অমর হইবার বর গ্রহণ করেন। অতঃপর ইনি বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাঁকে বাহনরূপে পাইতে চাহিলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইলেন, এবং গরুড়ের আসন বিষ্ণুর রথধ্বজের উপর স্থিত হইল।

অতঃপর ইন্দ্র সুধাগ্রহণার্থ ইহাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরাস্ত হইয়া ইহাঁর সহিত সখ্য স্থাপন করি-লেন। ইন্দ্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। অনন্তর ইনি অমৃত আন-য়নপূর্ব্বক বিমাতাকে প্রদান করিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন। গরু-ড়ের যোগে ইন্দ্র সুধা হরণ করিলে, তাহা আর সর্পগণের বা সর্পমাতা কদ্রুর ভোগে আসিল না।

একদা গরুড় সুমুখ নামক নাগের পিতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া প্রস্থান করেন। ইতোমধ্যে সুমুখের সহিত ইন্দ্র-সারথি মাতলির কন্যার বিবাহ হওয়ায় ইন্দ্র তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ হইবার বর প্রদান করেন। তচ্ছ্রবণে গরুড় স্বর্গে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের ও বিষ্ণুর সমক্ষে স্বীয় বলের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু পক্ষিবরের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলে ইনি তাহার ভরে মৃতপ্রায় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অতঃপর সুমুখের সহিত গরুড় মিত্রতা স্থাপন করেন।

গান্দিনী—অক্রূরের মাতা, কাশীরাজতনয়া। ইনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইহাঁর শুভকামনা করিয়া কাশীরাজ প্রত্যহ একটী করিয়া গবী দান করিতেন বলিয়া ইহাঁর নাম গান্দিনী রক্ষিত হয়। ইহাঁর সহিত যদুবংশীয় শ্বফল্কের বিবাহ হইলে তদীয় ঔরসে ইহাঁর গর্ভে কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের জন্ম হয়।

গান্ধারী—দুর্য্যোধনাদির জননী। ইনি গান্ধার দেশাধিপতি সুবল রাজার তনয়া। কুরুবংশীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। পতি অন্ধ বলিয়া ইনি আজীবনকাল আপনার চক্ষু বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাঁর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি দুর্য্যোধনকে সাধুপথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্যস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ইহাঁর সৎ-

পরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরব্ধ হইলে, দুর্য্যোধন সময়ে সময়ে জননীর নিকট গমন করিয়া স্বপক্ষের জয়কামনা করিবার নিমিত্ত ইহাঁকে অনুরোধ করিতেন। তখন ইনি কেবল এইমাত্র বলিতেন, "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ," অর্থাৎ ধর্ম্ম যেখানে, জয় সেখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে, ইহাঁর শতপুত্রের শোক উচ্ছ্বসিত হয়। সে সময়ে ব্যাসদেব ইহাঁর ক্রোধের শান্তি করেন। স্বীয় নেত্রবন্ধনবস্ত্রের নিম্নদেশ দিয়া ইনি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগমাত্র দর্শন করিলে সেগুলি বিকৃতাকার ধারণ করে। অতঃপর গান্ধারী সমরক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক মৃত পুত্র ও আত্মীয়স্বজনসমূহের নিমিত্ত বিস্তর শোক করেন। অনন্তর ইনি পতিসহ পঞ্চদশ বৎসর পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমনপূর্ব্বক তিন বৎসরকাল তপস্যা করিয়া অবশেষে দাবানলে ভস্মীভূত হন।

গায়ত্রী—বেদমাতা; কথিত আছে যে, ইনি ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। সাবিত্রী সে সময়ে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে না পারাতে ব্রহ্মা পুনরায় দারপরিগ্রহ বাসনায় উপযুক্তা কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আনয়ন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই গোপ কন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা।

গার্গী—প্রাচীন বিদুষী ভারতমহিলাবিশেষ, গর্গমুনির তনয়া। ইহাঁর ন্যায় বিদ্যাবতী ও প্রতিভাশালিনী অতি অল্প রমণী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কথিত আছে যে, ইনি জনক রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত ঋগ্বেদের টীকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

গার্গ্য—মুনিবিশেষ, গর্গমুনির পুত্র। ইনি ঋগ্বেদের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি গার্গ্যসংহিতা নামক একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যাদবদিগের কুলগুরু ছিলেন এবং সেই বংশে বিবাহ করেন। শ্যালককর্ত্তৃক নপুংসক বলিয়া কথিত হইলে, ইনি যাদবদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে ইনি যাদবদিগের অজেয় একটি পুত্রের কামনা করিয়া বরগ্রহণ করেন। অতঃপর অপ্সরা গোপালীর গর্ভে ইহাঁর ঔরসে কালযবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

গুরুগোবিন্দ—ইনি শিখদিগের দশমগুরু। খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি গুরুপদে বরিত হন। শিখবিদ্বেষীরা ইহাঁর পিতা নবমগুরুকে বধ করে। সেই হইতে ইনি সমস্ত শিখগণকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এবং তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীল হন। এতদভিপ্রায়ে ইনি সমুদায় শিখকে একত্র করেন। জাতিবিচার

ত্যাগ করিয়া সকল শিখকে একজাতীয় হইতে বলায় অনেকে ইহাঁর শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করে। তথাপি প্রায় বিংশ সহস্র শিষ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। এই সকল লোক প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শপথ করিল যে, তাহারা জাতিবিচার মানিয়া চলিবে না, স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে, এবং কোনরূপ অস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদের কথা না উঠে, এই অভিপ্রায়ে সকলেরই উপাধি "সিংহ" করা হইল। অন্যান্য বিষয়ে গোবিন্দ নানকের মতের অনুসরণ করিলেন।

গোবিন্দ যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, রাজা শিখদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করায়, রাজা দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সমাট্ সাহায্য করায় গোবিন্দ পরাভূত হইলেন। এবং তাঁহার পরিবারবর্গ শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইল। কিন্তু পরে ইনি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেন। এই সংবাদে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব ইহাঁকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করেন। গোবিন্দ আত্মদোষক্ষালনে পারস্য ভাষায় লিখিত কবিতায় পত্র লিখিলে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হন। অতঃপর গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলে তথায় তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহার প্রাণবধ করে।

গুহক, গুহ—নিষাদপতি বিশেষ। ইনি রামচন্দ্রের মিত্র ছিলেন। ভাগীরথীতীরে শৃঙ্গবেরপুরে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র ইহাঁর রাজ্যে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাদের যথোচিত অতিথিসৎকার করেন। রাম ও লক্ষ্মণের জটা নির্ম্মাণার্থ বটবৃক্ষের নির্য্যাস, ভাগীরথীর অপর পারে যাইবার জন্য নৌকা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ইনি তাঁহাদের সম্যক্ পরিচর্য্যা করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিগমনকালে গুহক তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলেন।

গোপা—শাক্যসিংহের পত্নী, কলিদেশাধিপতি দণ্ডপাণির তনয়া। ইনি অতি রূপবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। শাক্যসিংহের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা পুত্রের জন্য অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য রাজপুত্রীর ন্যায় গোপাও অশোকভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া কপিলবস্তুতে গমন করেন। রাজকুমারের অশোকভাণ্ড নিঃশেষ হইলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে উভয়ে কথোপকথন হইলে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন শাক্যসিংহ আপনার অঙ্গুরীয় ইহাঁকে প্রদান করেন।

অতঃপর উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, গোপার পিতা বলিলেন যে, শাক্যসিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহার কন্যার পতি হইতে পারেন। তখন শাক্যসিংহ ব্যায়াম, শৌর্য্য, বিদ্যা, রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন। গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন।

শাক্যসিংহের সহিত কয়েক বৎসর সুখে বাস করার পর গোপা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। প্রসবের পর সপ্তমী রজনীতে পতি ধর্ম্মার্থ গৃহত্যাগ

করিলে, গোপা শোকাভিভূত হইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। সাত বৎসর পরে শাক্যসিংহ (তখন সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধ নামে পরিচিত) জন্মভূমি কপিলবস্তু দর্শনে গমন করিয়া একদা প্রাতঃকালে ভিক্ষার্থ নগরে বহির্গত হইলেন। রাজপুত্রের ভিক্ষুকবেশ দর্শনে নাগরিকগণের শোক-কোলাহল উত্থিত হইল। তচ্ছ্রবণে গোপা প্রাসাদের উপর উঠিয়া স্বামীকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। দেখিলেন, অনাবৃতপদে, মুণ্ডিতমস্তকে, পীতপরিচ্ছদে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে, অবনতবদনে, বুদ্ধদেব ভিক্ষার্থ অগ্রসর হইতেছেন। এই সকল দেখিয়া পতিপ্রাণা গোপা অতি কষ্টে আত্মসংযমপূর্ব্বক শ্বশুরের নিকট স্বামীর আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন।

কতিপয় দিবস পরে বুদ্ধদেব রাজবাটীতে আহারার্থ আগমন করিলে, গোপা স্বীয় পুত্র রাহুতকে বলিলেন, "আজ তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া পিতৃধনের জন্য প্রার্থনা কর।" এই কথা বলিয়া ঈষদুন্মুক্ত গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি যতি বুদ্ধদেবকে দেখাইয়া দিলেন। বালক পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের শিষ্যরূপে পরিগণিত হইল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে বুদ্ধদেব পিতার মৃত্যুকালে পুনরায় কপিলবস্তুতে উপস্থিত হন। রাজার মৃত্যুর পর গোপাপ্রমুখ রাজপুরস্ত্রীগণ বুদ্ধদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে স্ত্রীভিক্ষুকরূপে গ্রহণ করিয়া গোপাকে তাঁহাদের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। ধর্ম্মশীলা গোপা সন্ন্যাসিনীরূপে লোকহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া মনের সাধে আর্ত্তের পরিচর্য্যায় পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন।

গোরক্ষনাথ, গোরখনাথ—বিখ্যাত ধার্ম্মিকবিশেষ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী জনৈক ধর্ম্মশীল গোপের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামস্থ অন্যান্য বালকগণের ন্যায় ইনিও বাল্যে গোচারণে নিযুক্ত হন।

একদিন গোরখনাথ বনে গরু চরাইতেছেন, এমন সময়ে একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে বালক গোরখনাথ নত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সন্ন্যাসী কিছু আহারীয় দ্রব্য চাহিলে, ইনি শালপত্রে দুগ্ধ দোহন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী তাহা পান করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সহিত আলাপে গোরখনাথ মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর সেই মহাপুরুষ কিছু দিতে চাহিলে, গোরখনাথ ভাবিলেন যে, ইঁহার নিকট আমি এমন দ্রব্য লইব, যাহা অন্যের নাই। এইরূপ স্থির করিয়া গোরখনাথ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে, ধন, সম্পত্তি, রূপ, যৌবন প্রভৃতি অনেকেরই আছে, এবং সে সকল থাকাতে তাহারা বিশেষ সুখী নহে। প্রার্থিত দ্রব্য স্থির করিতে না পারিয়া ইনি সাধুপুরুষকে এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন যে, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই আমাকে প্রদান করুন্। তখন সন্ন্যাসী গোরখনাথকে বলিলেন, তুমি উৎকৃষ্ট দ্রব্যই পাইবে, কিন্তু তোমাকে এক সপ্তাহ কাল ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। গোরখনাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলে, মহাপুরুষ অদৃশ্য হইলেন।

অতি কষ্টে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধুর আদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়া গোরকথনাথ লোকের নিকট উন্মত্ত বা বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ষষ্ঠ দিবসে মহাপুরুষ পুনরায় দর্শন দিলেন,. এবং প্রতিজ্ঞাপালনে বালক গোরখনাথের দৃঢ়তা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। বালকের আত্মীয় স্বজন তাঁহার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গোরখনাথের আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া এইমাত্র বলিলেন যে, বালক আরোগ্য লাভ করিলে সাধুদিগের পন্থানুসরণ জন্য তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে অনেকে চারি পাঁচটি পুত্রের মধ্যে একটিকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দিত। সেই প্রথানুসারে গোরখনাথের জনক জননী বালকটিকে মহাপুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর গোরখনাথ প্রকৃতিস্থ হইয়া কিছু কাল মাতাপিতার নিকট থাকিয়া সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর গোরখনাথ সেই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া অনন্যমনে তপশ্চরণপূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে ধর্ম্মমার্গে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। কালক্রমে ইনি সাধুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইহাঁর নামানুসারে ইহাঁর জন্মস্থান গোরক্ষপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

গোলাপসিংহ—জনৈক শিখ-সর্দ্দার। ইনি প্রথমে জমুর রাজা ও কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইয়া ইংরেজের সহিত শিখদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গোলাপসিংহ শিখরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। ইংরেজরা খালসা-সৈন্য ছাড়াইয়া দিবার কথা বলায় সে সময়ে সন্ধি হইল না, যুদ্ধ চলিতে থাকিল। অবশেষে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শিখসৈন্য সোব্রাঁও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে গোলাপসিংহ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করেন। তদনুসারে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরেজরা নগদ দেড় কোটি টাকা ও শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশ পাইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু লাহোর দরবারে সে সময়ে ৫০ লক্ষ মাত্র টাকা মজুত ছিল। কাজেই কাশ্মীরপ্রদেশ গোলাপসিংহের নিকট এক কোটি টাকায় বিক্রয় করিয়া ইংরেজদিগকে দেওয়া হয়। তদবধি গোলাপসিংহ সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশের রাজা হইলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা তথায় রাজত্ব করিতেছেন।

গৌতম—ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোক্তা ঋষিবিশেষ; গোতমমুনির পুত্র। ইহাঁর প্রণীত সংহিতায় মানবের আচার ব্যবহারের রীতিনীতি প্রকটিত আছে। রাজর্ষি বৈশ্যের যজ্ঞস্থলে অত্রি ঋষির সহিত ইহাঁর ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে সময়ে সনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। শরস্তম্বে জাত ইহাঁর সন্তান কৃপ ও কৃপী।

ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃজন করিয়া ন্যাসস্বরূপ ইহাঁর নিকট রাখিয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করিলে ব্রহ্মা ইহাঁর জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং ইহাঁকেই সেই কন্যারত্ন ভার্য্যার্থ প্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে ইহাঁর খ্যাতনামা পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। অনন্তর একদা ইন্দ্র ইহাঁর রূপ

ধরিয়া অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে, ইনি উভয়কেই অভিসম্পাত করেন [অহল্যা ও ইন্দ্র দেখ]। অতঃপর গৌতম হিমালয়ে গমন করিয়া অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। বহুবর্ষ পরে ইহাঁর আশ্রমে বিশ্বামিত্র সহ রাম লক্ষ্মণের আগমনে অহল্যা শাপমুক্ত হইলে, গৌতম তথায় উপস্থিত হইয়া ভার্য্যার সহিত পুনর্মিলিত হন।

ঘটোৎকচ—রাক্ষসবিশেষ। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। জন্মকালে ইহাঁর মস্তক ঘটের (করিকুম্ভের) ন্যায় উৎকচ (অর্থাৎ কেশহীন) থাকায় ইহাঁর নাম ঘটোৎকচ রাখা হয়। মতান্তরে, বালক একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা "ঘটোহাস্যোৎকচঃ" এই শব্দ করিয়া ডাকে ; তাহাতেই বালকের নাম ঘটোৎকচ হয়। ইনি মাতামহের রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিবার সময়ে ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন ভীমের স্মরণমাত্রে ঘটোৎকচ সানুচর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন করিয়া অভীষ্ট স্থানে লইয়া যান।

কুরুক্ষেত্র সমরে ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থে সদলবলে উপস্থিত হন এবং অতিশয় বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া বহু কুরুসৈন্য বিনাশ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে ঘটোৎকচ কৌরবদলের রাক্ষসসেনা বধ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মহাবীর কর্ণ ইহাঁর সহিত যুদ্ধে আপনার প্রাণনাশের সম্ভাবনা এবং কুরুসৈন্যের ত্রাস দেখিয়া কৌরবগণের বিশেষ অনুরোধে অর্জ্জুন বধের নিমিত্ত রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রয়োগে ইহাঁর বিনাশ সাধন করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া কুরুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া অনেকের জীবনান্ত করেন।

ঘণ্টাকর্ণ—পিশাচবিশেষ। এই পিশাচ প্রথমে বিষ্ণুদ্বেষী ছিল, এবং বিষ্ণুর নাম কোনক্রমে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে আপনার কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া রাখিত। তাহাতেই ইহার নাম 'ঘণ্টাকর্ণ' হয়। সময়ে সময়ে ইহার মনে সদ্ভাবেরও উদ্রেক হইত। এই পিশাচ মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। মহাদেব ইহাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাসাভিমুখে গমন করেন, সেই সময়ে ঘণ্টাকর্ণ বদরিকাশ্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ পায়, এবং স্তবে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। ইহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে মুক্তি প্রদান করেন। অনন্তর ঘণ্টাকর্ণ স্বর্গে গমন করে।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

অথ শ্রীগণেশ বন্দনা।

প্রণমহ গজানন দুর্গার তনয়।
স্মরণেতে বিঘ্ননাশ কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
অনন্ত দেবতা পূজে থাকিতে গণেশ।
জপ যজ্ঞ শুদ্ধ নয় আপদ বিশেষ॥
ইন্দ্ররাজ আপনি চরণে দেন ফুল।
গণেশ পূজিলে শুরুদেব অনুকূল॥
প্রভাতের ভানু জিনি অঙ্গের বরণ।
স্থূল দেহ খর্ব্ব তনু মূষিকবাহন॥
একদন্ত গজশুণ্ড শিরে জটাজুট।
বিজলীর ছটা যেন শিরেতে মুকুট॥
পরিসর লম্বোদর নাভী সরোবর।
পঞ্চম মৃগাঙ্ক জিনি উজল নখর॥
কটিবেড়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম কিঙ্কিণী মধুর।
পদাঙ্গুলে বাজে ভাল সোণার নূপুর॥
বাল্মীকি পুরাণ আদি যত মহাকবি।
নানা শাস্ত্র প্রকাশিল তব পদ সেবি॥
খেলেনা বুঝিয়া দিলাম মন্দিরেতে ঘা।
কেবল ভরসামাত্র তব রাঙ্গা পা॥
কাতরে কিঙ্করে ডাকে পুরাও অভিলাষ।
দেবগণ লয়্যা উর ছাড়িয়া কৈলাস॥
ঘটে আসি আপনি বসহ গজানন।
দ্বিজ রামচন্দ্র মাগে চরণে স্মরণ॥

সর্ব্বদেব বন্দনা।

প্রথমে বন্দিলাম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
জলশায়ীনেতে বন্দী লক্ষ্মী নারায়ণ॥
হংসে ব্রহ্মা বন্দি বিষ্ণু গরুড় বাহনে।
বৃষভ বাহনে বন্দ দেব ত্রিলোচনে॥
গিরি হিমালয় বন্দ উত্তরে বসতি।
আরাটের বৈদ্যনাথ পশ্চিমের গতি॥
[illegible]

দক্ষিণে বন্দিলাম প্রভু দেব জগন্নাথ।
সাগর সঙ্গম আদি তীর্থ বারাণসী।
স্বর্গের কপিলা বন্দ আস্তের তুলসী॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দ অযোধ্যার মাঝে
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ দশরথ রাজে।
কৌশল্যা সুমিত্রা বন্দ সীতার চরণ।
কনক লঙ্কাপুরে বন্দ রাজা দশানন।
অষ্ট কুলাচল বন্দ প্রভাতের ভানু।
বৃন্দাবন মাঝে বন্দ শ্রীরাধা শ্রীকানু।
ষোড়শ গোপিনী বন্দ প্রভু শ্যামরায়
কদম্ব হেলনা দিয়া মুরলী বাজায়॥
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম আর তারাগণ।
ডাকিনী যোগিনী পায়ে লইনু শরণ।
শ্মশানে বন্দিলাম শ্যামা করালবদনী।
অনন্তর বন্দিলাম চৌষট্টি যোগিনী
ঢেঁকিতে নারদ বন্দ আর হুতাশন
ঐরাবতে ইন্দ্র বন্দ হরিণে পবন॥
কুবের বরুণ বন্দ দশদিক্‌পাল।
স্বর্গে মন্দাকিনী বন্দ নন্দী মহাকাল
ব্যাস বাল্মীকি বন্দ আর মহাবিদ্যা।
চারি বেদ বন্দিলাম চৌষট্টি শাস্ত্রবিদ্যা॥
যজ্ঞের ঈশ্বর বন্দ ধন অধিকারী
শুকদেব বশিষ্ঠ বন্দিলাম যোড় করি॥
একমনে বন্দিলাম কবি কল্পতরু।
হরি নাম দিয়া হোল জগতের গুরু॥
গোরাচাঁদের মহিমা যে জন করে মনে॥
গোরার মহিমা কহি শুন সাবধানে॥
কৃষ্ণগুণ গায় গোরা বলে হরি হরি।
অন্তকালে মুক্ত হোয়ে যান বিষ্ণুপুরী॥
বৈষ্ণব হইয়া যদি হয় অবসান।
অভুক্ত সন্ন্যাসী নহে তাহার সমান॥
বিক্রমপুরে বন্দিলাম দেবীর নিজস্থান।
[illegible]

বন্দনা করিতে ভাই না করিব হেলা।
বালডাঙ্গার বন্দিলাম সর্ব্বমঙ্গলা॥
দশঘরার বিশালাক্ষী দশ অবতার।
তোমার চরণে মাতা আমার পরিহার॥
বারাসতের নন্দিনীর বন্দিলাম চরণে।
সুরেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী লইলাম শরণে॥
কালীঘাটে কালী বন্দ বেড়োতে বেড়াই।
পুরাটের ঠাকুর বন্দ আম্‌তার মেলাই॥
একে একে বন্দিলাম সকল রঙ্গিণী।
সেহাখালায় বন্দিলাম উত্তর বাহিনী॥
বৈদ্যপুরে বাসুকী বন্দিলাম সর্ব্বজয়া।
জগৎ জননী জয়া জয় কর আসিয়া॥
সাহানি পাড়ায় বন্দ নেতের বসতি।
সিংহাসনে বন্দ যথা আছেন জগতি॥
জয় জয় আদি বন্দ জয় বিষহরি।
পাতাল পুরেতে বন্দ পাতালকুমারী॥
পদ্মপত্রে জলপান পদ্ম কুমারী।
বিশ্বধাত্রী নাম জয় বিষহরি॥
সয়লা পাড়াতে বন্দ কমলা সুন্দরী।
তোমার চরণে আমি কি বর্ণিতে পারি॥
জগতের গুরু বন্দিলাম যতনে।
অশেষ প্রণাম করি বৈষ্ণব চরণে॥
জনক জননী বন্দ জগতের সার।
মাতা পিতা সেবা বিনা ধর্ম্ম নাহি আর॥
বন্দিতে বন্দিতে যেবা এড়াইয়া যায়।
অশেষ প্রণাম করি সে দেবের পায়॥
রচিল রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যে ধর্ম্মের গীত গায়।
হরি হরি বল সবে আসর সভায়॥

অথ ভগবতীর বন্দনা।

কোথা আছ জয় দুর্গা হইয়া বিভোল।
চারি দণ্ড ত্যজি এস মহেশের কোল॥
কৈলাস ত্যজিয়ে এসগো সর্ব্বমঙ্গলা।
ঘটে ভর করিয়া ছাড়িয়ে দেহ গলা॥
অন্তের আসরে এস দৃষ্টি বুলাইয়ে।
আমার আসরে এস জয় জয় দিয়ে॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া, দেহ দুর্গে পদছায়া,
অসুরদলনী ক্ষেমঙ্করী।
খড়্গানি চাপিণী ঘোরা, বৈষ্ণবী শিবাণী তারা,
সাবিত্রী ব্রহ্মাণি মহেশ্বরী॥
নিখিল মার্কণ্ড মুনি, সৃষ্টিরূপা সনাতনী,
তব সীমা কেবা দিতে পারে।
আগমে নিগমে কথা, তুমি জগতের মাতা,
দেবগণে ধরেছ উদরে॥
পৃথিবী ডুবিল জলে, মধুকৈটভের কালে,
যোগ নিদ্রা দিলে নারায়ণে।
মহামায়া নাম ধর, মায়ার প্রবন্ধে ফির,
বুঝিতে কঠিন তব কথা॥
অকালেতে পূজা নিলে, দশভূজা মূর্ত্তি হোলে,
মহোদধি বাঁধিলেন রাম।
কপিগণে লয়ে হরি, জিনি গেল লঙ্কাপুরী,
দশাননে হোলে তুমি বাম॥
রাবণ নিধন হোল, মহীরাবণ লয়ে গেল,
রঘুনাথে বধিবার তরে।
মক্ষিকার বেশ ধরি, প্রবেশে পাতাল পুরী,
দেখে হনু কাঞ্চন নগরে॥
খড়্গা হাতে করে লয়, হনুমানে পেয়ে ভয়,
তোমারে স্মরেণ রঘুমণি।
মহীর রুধির নিলে, কটরা পুরিয়ে খেলে,
রামচন্দ্রে রাখিলে আপনি॥
ইতিহাস রামায়ণে, যবে রাম গেল বনে,
সীতা চুরি করিল রাবণ।
রঘুনাথ যোড় হাতে, সেবিল সমর পথে,
তবে রাবণ সবংশে নিধন॥
কর যোড়ে করি স্তুতি, ধন্য মাতা ভগবতী,
পূর্ণ কর মনের বাসনা।
ধর্ম্মের আদেশ পান, দ্বিজ রামচন্দ্র গান,
যারে হ'ল দৈবের করুণা॥

অথ দিক্ বন্দনা।

প্রথমে বন্দিব গোঁসাই দেব নিরঞ্জন।
শূন্য পথে ধৌত রথে উল্লূকবাহন ॥
বন্দিব কামিন্যা দেবী চরণ-সরোজে।
তবে ব্রহ্মা বন্দিব বাহন হংসরাজে ॥
পন্নগারি বাহনে বন্দিব নারায়ণ।
বৃষভ বাহনে বন্দ দেব ত্রিলোচন ॥
জয় দুর্গা বন্দিব যে পারিন্দ্র বাহনে।
গিরিকা বাহনে বন্দ দেব গজাননে ॥
বন্দিব সাবিত্রী দেবী লক্ষ্মী সরস্বতী।
হাঙ্গর বাহনে বন্দ গঙ্গা ভাগীরথী ॥
ময়ূরেতে কার্ত্তিক বন্দিব যোড় হাতে।
ইন্দ্রদেবে বন্দিব বাহন ঐরাবতে ॥
বরুণ কুবের বন্দিব মহাকাল।
নবগ্রহ আদি বন্দ যত দিক্‌পাল ॥
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিব হইয়া সাবধানে।
বিশ্বকর্ম্মা বন্দিব বাহন জাম্বুবানে ॥
ভুজঙ্গ বাহনে বন্দ মনসা কুমারী।
মহিষ বাহনে বন্দ যম অধিকারী ॥
চিত্রগুপ্ত বন্দিব যার ভূত বাহন।
হরিণ বাহনে বন্দ পঞ্চাশ পবন ॥
নারদ সহিত বন্দ যত দেব ঋষি।
ধর্ম্মের সেবক বন্দ লাউসেন তপস্বী ॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বন্দিব এক মনে।
সপ্ত পাতাল বন্দি গাইব যন্ত্রের সনে ॥
সাতবার ষোল তিথি বন্দ রাত্র দিন।
উত্তর পশ্চিম বন্দ পূর্ব্ব দক্ষিণ ॥
গঙ্গা আদি তীর্থ চরণে আনতি।
তুলসী কপিলা বন্দ আর যতি সতী ॥
বশিষ্ঠ শঙ্কর আদি বন্দিলাম চরণ।
বাল্মীকি বন্দিলাম আর ব্যাস নারায়ণ ॥
তস্থপর বন্দিলাম যোগাস্থা প্রভৃতি।
ভারত পুরাণ বন্দ হোয়্যা শুদ্ধ মতি ॥
দশ অবতার বন্দ চরণ এক মনে।

পরশুরাম বন্দ জমদগ্নির কুমার।
বাহুবলে নিঃক্ষত্রি করিল একুশবার ॥
অযোধ্যাতে বন্দ রাম কমল লোচন।
রাজা দশরথ-সুত রাক্ষস দলন ॥
বামেতে বন্দিব দেবী সীতা চন্দ্রমুখী।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ লক্ষ্মণ ধানুকী ॥
হনুমান বীর বন্দ বীরের প্রধান।
সুগ্রীব বানর আদি মায় জাম্ববান ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী বন্দ কর্য়া অভিলাষ।
রামের জননী বন্দ সাত শ পঞ্চাশ ॥
গোকুলে বন্দিব হরি কৃষ্ণ বলরাম।
ব্রজ শিশু আদি বন্দ শ্রীদাম সুদাম ॥
রাধিকা প্রভৃতি বন্দ যত গোপীগণ।
কালিন্দী যমুনা বন্দ আর বৃন্দাবন ॥
দক্ষিণ জলধি তীরে বন্দ জগন্নাথ।
কোথাও শুনিনা যে বাজারে বিকায় ভাত ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ অন্ন লক্ষ্মীর রন্ধন।
সুপ পিঠা বড়ি ভাজা নাকার ব্যঞ্জন ॥
চারিবর্ণ একাকার ধন্য মহাস্থান।
শূদ্র আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খান ॥
কুকুর বদন হোতে যদি কেড়ে খায়।
পরলোক সেজনা বৈকুণ্ঠে চল্যা যায় ॥
এমন স্থানের গুণ কে বর্ণিতে পারে।
বলরাম সুভদ্রা বন্দিব যোড় করে ॥
নদীয়ার গৌরচন্দ্র বন্দিব নিতাই।
বাম হাঁটু পাতিয়া বন্দনা কর ভাই ॥
বারানসীতে মহাদেবে বন্দ করপুটে।
খানাকুলে বন্দিব সে গোপীনাথের পাটে ॥
অভিরাম গোস্বামী বন্দহ কুতূহলি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠখান বাজান মুরলী ॥
বিষ্ণুপুরে লালজিউ বন্দ মদনমোহন।
এক মুখে কি করিব তাহার বর্ণন ॥
১ মল্ল উপরে যদি সেজে আসে অরি।
মদনমোহন তখন হন আসোয়ারি ॥
হাঁসিবাতে রঘুবীরের বন্দিলাম চরণ।

আড়ুই বৈদ্যনাথ বন্দ হয়্যা প্রণিপাত।
বীর বক্রেশ্বর বন্দ সিয়ড়ে শান্তিনাথ ॥
গবপুরে বন্দিব সে স্বরূপ নারায়ণ।
জুঝাটির ধর্ম্মরাজে হয়্যা সাবধান ॥
শশাঙ্কভূষণ শিব বন্দ সুবর্ণরেখা ধারে।
বেহুলাতে বল্লেশ্বর বন্দিব সাদরে ॥
বেলবনির ধর্ম্মরাজে হয়্যা সাবধান।
গণাত যাইয়া বন্দ স্বরূপ নারায়ণ ॥
চন্দ্রকোণার রঘুনাথে বন্দিব মাথায়।
কৃষ্ণনগরের বন্দ বগড়ির কৃষ্ণরায় ॥
অবিরত শ্রীঅঙ্গে ঘাম পড়ে যার।
মদনগোপাল বন্দ দেউল পাড়ার ॥
ইন্দাসের বাঁকুড়ারায় বন্দ সবাকার আগে।
পীনারের বাঁকুড়ারায় বন্দ মাথার পাগে ॥
কাঁউরের কামাখ্যা স্মরিয়া প্রণিপাত।
চম্পাই নগরের বন্দ পরেশ্বর নাথ ॥
বন্দনা করিতে ভাই বড় মনে পড়ে।
লালজিউ ঠাকুর বন্দিব লালগড়ে ॥
গোকুল নগরের প্রভু শঙ্খাসুর।
যাঁহার কৃপায় হল্যাম কবি এ প্রকার ॥
এস প্রভু শঙ্খাসুর বসহ বদনে।
কোটি কোটি প্রণাম যাত্রাসিদ্ধির চরণে ॥
কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তার পায়।
জাড়া গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালুরায় ॥
উড়িষ্যা যাইয়া বন্দিব শিব মহেশ্বর।
আড়ুবারে বাঁকেশ্বর বন্দ তার পর ॥
বোড়োর বলদেব বন্দ আনন্দিত মনে।
বাঘনাগাড়ার বলদেব বন্দ সাবধানে ॥
বাঁকুড়ারায় বন্দ নতি হয়্যা বনপুরে।
লোহাডাঙ্গার ধর্ম্ম যে বন্দিব নদীতীরে ॥
মল্লেশ্বর বিষ্ণুপুরের বন্দ রাজাদেশ।
চন্দকল মল্লেশ্বর কাঁকুলের রমেশ ॥
বন্দিব গোকুলচাঁদ সাপটিয়া হাত।
নিজ গ্রাম চামটে বন্দিব গোপীনাথ ॥
পানখাউয়ের ক্ষেতুরায় বন্দিব সাদরে।
[illegible] ॥

কামারহাটীর পঞ্চানন আর পড়াসের।
বাজিৎপুরের ধর্ম্ম খেলারাম রায় ॥
ব্রহ্মপুরে সাক্ষীগোপাল বন্দ জগচ্চন্দ্র।
গুপ্তিপাড়ায় বন্দি গাইব বৃন্দাবনচন্দ্র ॥
অগ্নিমুখার হর বন্দ রাশি পলাসনে।
বাসুলী সহিত বন্দ নবাসনে ॥
এক লক্ষ চোট যেথা বন্দ তার পায়।
সারা রাতি বাঘের উপরে যেবা ধায় ॥
দিঘপাড়ের বাঁকুড়ারায় বন্দ করপুটে।
তাড়েশ্বর শিব যে বন্দিব তারাহাটে ॥
খড়কাগুলির রঘুনাথে একমন হয়্যা।
অযোধ্যার গোপীনাথের চরণ বন্দিয়া ॥
যাত্রাসিদ্ধি শঙ্খাসুর বন্দ দিঘপেড়ে।
তবে ধর্ম্ম যাত্রাসিদ্ধি বন্দ কাঁটাগোড়ে ॥
বালসীর নবযৌবন বন্দ কুতূহলে।
ধর্ম্মরাজ আঁধার কুলি বন্দ রাজসোলে ॥
কালসায়ের ধর্ম্মরাজে একমন হয়্যা।
বড়াস ঠাকুর হড়ন্দায় চরণ বন্দিয়া ॥
সেতুবন্দ রামেশ্বর বন্দিব সাদরে।
অনকোট শিব বন্দ সত্তা ময়নাপুরে ॥
বিক্রমপুরে বাসুলি বৈতাল ঝকড়াই।
সজপুরে জয়দুর্গা নাম মহলাই ॥
আমুড়ের বিশালাক্ষী বন্দ এক বেলা।
লাড়চা যাইয়া বন্দ সর্ব্বমঙ্গলা ॥
মহেশ্বরী মহামায়ী বন্দ ইন্দুলাতে।
অবিরত থাকে দেবী রাজবন হাটে ॥
বাড়ীর ঈশানেতে মুচকুন্দ ফুল থাকে।
ফুল ফুটে ফল ধরে নাই ফল পাকে ॥
তায় বস্যা আপনি ঈশ্বরী করে খেলা।
খণ্ডঘোষের মহামায়া প্রচণ্ড বিশালা ॥
মুর্শিদাবাদ শম্ভুজায়ার চরণ বন্দিয়া।
ডঙ্গালনের ঘাট বন্দ সাবধান হয়্যা ॥
সেউগ্রামে দণ্ডেশ্বরীর চরণে প্রণিপাত।
যাহার কৃপায় রাজামল্ল মহীনাথ ॥
কাঁউরের কামাখ্যায় সদয় বাসুলী।
[illegible] ॥

বন্দিব বেতার গড়ে সর্ব্বমঙ্গলা।
অসুর কাটিয়া যার গলে মুণ্ডমালা॥
জাজপুরে চরণ বন্দ ধর্ম্মবীর যায়।
নীলপুরে বন্দিব যে বাসুলী চিন্তায়॥
কিরিকলা যাইয়া বন্দিব কিরিটীনী।
সেয়াখালায় বন্দ্যা গাইব উত্তরবাহিনী॥
অষ্টভুজা দেবী বন্দ আশ্বিন কোটায়।
হাতীমায় চণ্ডীর চাঁউর কলানায়॥
কাপসটিকিরি বন্দ দেবী হাস্যমুখী।
কালিঘাটে কালিকা বন্দিলেম আগে লেখি।
লঙ্কায় বন্দিব উগ্রচণ্ডা মহামাই।
বিষ্ণুপুরে চেঙ্গভুবির বন্দনা কর ভাই॥
কর্ণপুরে দণ্ডেশ্বরী বন্দ করযোড়ে।
মহামায়ী দেবী বন্দ জলন্দার গড়ে॥
বাউলভুমে জয়চণ্ডী জাড়ার কালিকা।
ক্ষিরিকোতুলপুরে বন্দ ক্ষীরাইচণ্ডিকা॥
ঘাটশিলায় যাইয়া বন্দিব রঙ্গিণী।
হেথায় বুড়া হেথা বন্দ কুম্ভসনি॥
সোণায় রঙ্গিণী বন্দ মেনা কালিকা।
কুলীন গ্রামে বন্দ্যা গাই সিবাইচণ্ডিকা॥
সাটনন্দির লক্ষ্মীদেবী বন্দ সাবধানে।
সর্ব্বমঙ্গলা যে বন্দিব বর্দ্ধমানে॥
পলাশীর চণ্ডী বন্দ পলাশীর মাঠে।
শুভ মঙ্গলাচণ্ডী বন্দিব মঙ্গলকোটে॥
না সহিতে পারে কারো ছেলের কাদনা।
ভয় বড় লাগে তাই করিতে বন্দনা॥
তাঁহার চরণ বন্দ স্থির করি মন।
গো গ্রামের ভগবতীর বন্দিব চরণ॥
রামনবমীর দিনে পূজার ঘোর ঘটা।
ছাগল কাটিতে মানুষ যায় কাটা॥
চম্পাই নগরের বন্দ দেবী সহচরী।
বানডাঙ্গার বন্দ্যা গাইব দেবী বাড়েশ্বরী॥
ছায়নার বাসুলী বন্দ সুরাসালি ফাটে।
মুণ্ড গ্রামের ব্রহ্মাণি বন্দিব করপুটে॥
ক্ষীর গ্রামে যোগাদ্যা বন্দিব কুতূহলে।
হনুমানবীর সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মহীরাবণ মারা গেল দৈবের কারণ॥
পাতাল হইতে লয়্যা মর্ত্তে উপনীত।
ক্ষীর গ্রামে হনুমান করিলা স্থাপিত॥
ময়নাপুরের ষষ্ঠী বন্দ সাবধান হোয়ে।
পুত্রবর পায় সব নগরিয়া মেয়ে॥
বন্দিব আস্‌মান গাজী গড় মান্দারণে।
জফর গাজি বন্দ ত্রিবেণী সদনে॥
তাহার মহিমা গুণ কি বলিতে পারি।
জল যোগাইতেন গঙ্গা হাতে লয়্যা ঝারি॥
বায়ু আদি নবগ্রহ বন্দিলাম চরণ।
বন মধ্যে বন্দ্যা গাইব ভেদের ব্রাহ্মণ॥
ময়নাপুরে ধর্ম্ম বন্দ হয়্যা যোড় করে।
কুসুম দীঘির যাত্রা সিদ্ধি বন্দিব সাদরে॥
ময়নাপুরের যাত্রা সিদ্ধির বন্দিলাম চরণ।
যাহার দুয়ারে আছে পাথর আশি মণ॥
শিলা মধ্যে গণ্ডকীর চরণ বন্দিলাম।
রাজানন্দে বন্দে গাইব অযোধ্যার রাম॥
নারী মধ্যে বন্দ্যা গাইব রম্ভার চরণ।
পুরুষ মধ্যে বন্দ্যা গাইব মধুসূদন॥
এ তিন ভুবনেতে যত দেব দেবী আছে।
সবাকে প্রণাম রাঙ্গা চরণের কাছে॥
বল্লুকাতে বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
চারি পণ্ডিত বন্দ্যা গাইব এ ঘরবন॥
ভক্ত্যাজন ধামাত কণ্ঠে বদনে কামিনে।
পৃথিবীতে যত আছে গায়ে গুনিনে॥
পিতা মাতার নাম মাথার উপরে।
বড় দুঃখ পায় মাতা ধরিয়া জঠরে॥
মায়ের দুগ্ধের ধার শোধা নাহি যায়।
আত্মকার ময়ুর ভট্ট বন্দিলাম মাথায়॥
দক্ষ দানা ভূত প্রেত বন্দ হয়্যা নত।
ডাকিনী যোগিনী বন্দ ভূতযোনি যত॥
গীত গাইব ধর্ম্মের বন্দিয়া হাতে তালে।
ছাওয়াল খেলা করে যেন জননীর কোলে॥
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু বন্দিলাম চরণ।

অনাদ্য চরণ পদ্ম চিন্তি অহর্নিশি।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান চামট নিবাসী॥
গান দ্বিজ রামচন্দ্র অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে আসর সভায়॥

অথ স্থাপন পালা।

নম ধর্ম্ম নিরঞ্জন, ব্রহ্মরূপ সনাতন,
যোগীন্দ্র পুরুষ পুরাতন।
তুমি ত্রিগুণের ধাম, অনাদি অনন্ত নাম,
নাই তব জনম মরণ॥
নাস্তি কায়া নাস্তি রূপ, শূন্য ত্রিদশের ভূপ,
শূন্য দেব শূন্য অবতার।
দাণ্ডাইতে নাই স্থান. শূন্য পথে ভগবান্,
মহাঘোরময় অন্ধকার॥
রজনী দিবস বেলা, নাহি সূর্য্য শশিকলা,
নাই দেব দেবী যতী সতী।
দানব গন্ধর্ব্ব নর, পশু পক্ষী স্বতন্তর,
কেহ নাই তাহার সংহতি॥
মহাঘোর শূন্যময়, সবে ধর্ম্ম পদদ্বয়,
চিন্তামণি দেব ভগবান্।
নাশিতে তিমির দৃষ্টি, সংসার করিতে সৃষ্টি,
নিজ দেহ করিতে নির্ম্মাণ॥
প্রকাশিলে নিজ কায়, রতন নূপুর পায়,
শোভে অঙ্গ নানা অলঙ্কারে।
পরিধান পীতবাসে, ঘোর অন্ধকার নাশে,
সুরট মুকুট শোভে শিরে॥
পরম উল্লাস মন, হইলে ব্রহ্ম নিরঞ্জন,
ত্রিভুবন সৃজন অভিলাষে।
করিতে আপন রক্ষ, উল্লুক নামেতে পক্ষ,
জন্মাইলে নাসার নিশ্বাসে॥
আরোহণ হোয়ে তথি, ভ্রমে ধর্ম্ম যুগপতি,
দাণ্ডাইতে নাহি ছিল স্থল।
চৌদ্দ যুগ শূন্যে গেল, উল্লুক কাতর হোল,

শুন ধর্ম্ম অধিকারী, আর না রহিতে পারি,
কর প্রভু পৃথিবী সঞ্চার।
কৃপান্বিত হোয়ে, বদনে পীযূষ দিয়ে,
প্রাণ রাখ এবার আমার॥
এত শুনি ধর্ম্ম রায়, পীযূষ দিলেন তায়,
পড়ে বিন্দু পাতালের পথে।
সেই হোতে হোলো জল, উল্লুক পাইল বল,
সমুদ্রের জল হোলো তাথে॥
কিরূপে সৃজন করি, ভাবে ধর্ম্ম-অধিকারী,
ভাবিত হইল চক্রপাণি।
ভাবিতে ভাবিতে চিত্তে, বাম অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে,
বাহির হইল নারায়ণী॥
আদ্য দেবতার বামা, রূপের কি দিব সীমা,
ত্রিভুবনে নাহিক তুলনা।
জিনি বর হংস রাজে, চরণে নূপুর বাজে,
তনুরুচি জিনি কাঁচা সোণা॥
নয়নে কাজর ছটা, কপালে সিন্দূর ফোঁটা,
প্রভাতের জিনিয়া কিরণ।
গলে অর্দ্ধ হেঁসোহার, শোভে নানা অলঙ্কার,
পরিধান বসন ভূষণ॥
বদনে পীযূষ রাশি, মুখে মন্দ মৃদু হাসি,
দেখিয়া মোহিত নিরঞ্জন।
জুড়িয়া অভয় পাণি, রহে দেবী নারায়ণী,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥
উরিলেন আদ্যা দেবী অনাদ্যা ভবানী।
অনন্তরূপিণী মাতা সংসারকারিণী॥
এক দেবী বিনে আর অন্য দেব নাই।
সকলই করিতে পার অনাদ্যা গোসাঞী॥
দেখিয়া আদ্যার রূপ ভুলিল তখন।
আপনার নিজ অঙ্গে কৈল সমর্পণ॥
আদ্যা প্রকৃতি হোল ত্রিগুণের ধাম।
সেই হোতে তিন গুণে হোল তিন নাম॥
সত্ব রজঃ তমো গুণ হইল ঠাকুর।
ফলের মধ্যেতে যেন উঠায় অঙ্কুর॥
তিন গুণে তিন দেবে জন্মাতে সম্মান।

সত্ত্ব গুণে বিষ্ণু হোল বাহন গরুড়।
তমোগুণে জন্ম হোল ঠাকুর চন্দ্রচূড়॥
বিধি বিষ্ণু হর যদি জন্মিল তখন।
আদ্যা প্রকৃতি তবে হইলা অদর্শন॥
না দেখিয়া পিতা মাতা হইলা ভাবিত।
তিন ভাই বন্ধুতে হইল উপনীত॥
কিরূপেতে সৃষ্টি হবে করিব কেমন।
তপস্যা করেন বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন॥
কতকাল তপস্যা নির্ণয় নাহি জানি।
মড়া রূপে ধর্ম্মরাজ ভাসিল আপনি॥
বিধি বিষ্ণু, বিশ্বনাথে ছুলিবারে যান।
অর্দ্ধ অঙ্গ গলিত ছাড়য়ে পচা ঘ্রাণ॥
ভাসিতে ভাসিতে যান ত্রম্বুকার জলে।
প্রথমে ঠেকিল গিয়ে বিধাতার কোলে॥
পচা গন্ধ পেয়ে ব্রহ্মা ঠেলে ফেলে দূরে।
নারিল চিনিতে ব্রহ্মা দেবতা কন্যারে॥
তপস্যা ত্যজিল ব্রহ্মা ঘৃণা কোরে মনে।
ভাসিয়া চলিল ধর্ম্ম বিষ্ণুর সদনে॥
তপস্যা করেন বিষ্ণু এক মন হোয়ে।
বলিতে লাগিল তখন পচা গন্ধ পেয়ে॥
কোথাকার পাতকী আমার কাছে এলো
চিনিতে না পারে বিষ্ণু তপস্যা ত্যজিল॥
এইরূপে ভাসিল শঙ্কর বিদ্যমানে।
ধর্ম্মরাজ ব'লে শিব জানিল ধ্যায়ানে॥
জীব জন্তু কেহ নাই মৃত মড়া ভাসে।
অখিলের পতি বোলে জানিল উদ্দেশে॥
চিন্তা করি ভব অঙ্গে করিল লেপন।
ধর্ম্মকে চিনিতে শিবের হোলো ত্রিলোচন॥
সদয় হইয়া বর দিল বিশ্বনাথে।
নাম মহারুদ্র তব হোলো আজ হোতে॥
তুমি মহারুদ্র হবে সংসার ভিতরে।
সংহারিবে জীবজন্তু অসুর অমরে॥
যাতে হয় সৃষ্টি কর এ তিন ভুবন।
এত শুনি মহাদেবের হরষিত মন॥
সৃষ্টি করিবারে যদি বসিল শঙ্কর।
না পারিলা শিব তখন সৃষ্টি করিবারে।
ধর্ম্মের নিকটে বলে হাত যোড় কোরে॥
বড় ভাই ব্রহ্মাকে আপনি দেন পান।
তিনি করিবেন সৃষ্টি বেদের প্রমাণ॥
বদনে ব্রাহ্মণ হবে ক্ষত্রি বাহু মূলে।
বৈশ্য উরুতে শূদ্র চরণ কমলে॥
সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব তোমা হইতে।
অপার মহিমা গুণ নারি সীমা দিতে॥
এত শুনি ধর্ম্ম পান দিলেন ব্রহ্মাকে।
বেদগান বিধাতা নাচেন চতুর্ম্মুখে॥
পঞ্চভূত শরীরে বসএ সর্ব্বজনে।
তবে মুনি জন্মিল সনক সনাতনে॥
প্রথমে হইল মু আর অহঙ্কার।
এই দুই মুনি হোতে সৃষ্টির সঞ্চার॥
দুই মুনি হোতে হোলো এই পঞ্চজন।
হইল আকাশ, দেশ, অবনি পবন॥
মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু জন্মিলা মহামুনি।
তবে মুনি জন্মিলেন কপিল আপনি॥
দশ প্রভৃতি নারদ মুনিবর।
ব্রহ্মার মানস পুত্র জন্মিল বিস্তর॥
দুখানি কাটিল ব্রহ্মা আপনার তনু।
তাহাতে মানসপুত্র জন্মিলেন মনু॥
মনু অসম্ভবকে বলেন প্রজাপতি।
প্রজা কিসে বৈসে কহ উপায় ভারতি॥
পাতালগামীর ক্ষিতি অসুরের ভয়।
এই সৃষ্টি যুগে যুগে পুরাণেতে কয়॥
দেবগণ শূন্যেতে রহিল কত কাল।
পৃথিবী তুলিতে হ'ল পূর্ব্বে সে পাতাল॥
আচম্বিতে বরাহ হইল নারায়ণ।
জলদ বরণ হোলো বিকট দশন॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদ্যের পায়।
শুনিলে কলুষ নাশ যে জন গাওয়ায়॥

ত্রিপদী।

প্রকাণ্ড বরাহ কায়,　　হোলো ধর্ম্ম দেবরায়,

প্রবেশিয়া জল পথে,   ক্ষিতি ধরি দশনেতে,
বধিলেন হিরণ্যাক্ষ বীরে ॥
বালকে যেমন জলে,   পদ্মের মলাম তুলে,
দশনে ধরণী ধরে হরি।
কুম্ভের উপর তুহি,   নিজ বলে ধরে মহী,
স্থাপন করিল তদুপরি ॥
হিরণ্যাক্ষ দর্প চূর্ণ,   দশন কুঞ্জর বর্ণ,
প্রকাণ্ড শরীর মহাবল।
জলবিন্দু ফল সারি,   উপরে রাখিল ধরি,
কম্পমান সমুদ্রের জল ॥
উদ্ধার করিতে ক্ষিতি,   দেবগণ করে স্তুতি,
ব্রহ্মার আনন্দ হোলো বাড়া।
স্তব শুনি মহাশয়,   জলেতে ডাকিয়া কয়,
বার কত দিল অঙ্গ ঝাড়া ॥
পরাৎপর নারায়ণ,   অঙ্গ ঝাড়া দিল তখন,
অঙ্গ হইতে খসে ছয় লোম।
পড়ে লোম ধরণীতে,   জাহ্নবী হইল তাথে,
সেই হোতে কুশের জনম ॥
ক্ষিতির উপর মাঝে,   অখিল মন্দর সাজে,
চারি দিকে ছয় গিরিবর।
প্রথমে উদয় গিরি,   অস্ত গিরি তদুপরি,
রথ লয়্যা ভ্রমে দিবাকর ॥
সাত ঘোড়া বর্ত্তমান,   ভ্রমে স্যূর্য্যের রথখান,
লোকালোক বেড়িয়া গমন।
স্বর্গপুর মহাস্থান,   হইল রাজা মঘবান,
স্থানে স্থানে বৈসে দেবগণ ॥
গঙ্গা উদ্ধার লোক হোতে,   মিরসিংহ শূন্যপথে,
ত্রিভুবনে পতিত পাবনী।
লোকালোক মহাসুখ,   বিধাতার ঘুচে দুঃখ,
দেখে চিন্ত দিবস রজনী ॥

বৎসর প্রমাণ হেতু,   মাস তিথি ছয় ঋতু,
দিনে দিনে বাড়ে যত প্রজা।
সত্য, ত্রেতা যুগ গেল,   দ্বাপর কলি যে এল,
ভাবিত হইল ধর্ম্ম রাজা ॥
ময়ূরভট্ট পদ ভাবি,   দ্বিজ রামচন্দ্র কবি,
সেবি ধর্ম্ম চরণযুগল।
ধর্ম্মরাজ অনুবলে,   হাজার আত্রিশ সালে,
আরম্ভিল অনাস্থা মঙ্গল ॥

পয়ার।

তিন যুগ গেল কলি যুগ এল প্রায়।
প্রজা হেতু ভাবিত হইল ধর্ম্মরায় ॥
একদিন কৌতুকে বসিল দেবগণ।
ইন্দ্র আদি স্তব করে বরুণ পবন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের কার্ত্তিক লম্বোদর।
নারদ গন্ধর্ব্ব আদি সকল অমর ॥
বার দিয়ে বসিল অনাস্থ ভগবান্।
বামদিকে উল্লূক দক্ষিণে হনুমান ॥
পঞ্চমুখে শঙ্কর আপনি গান গীত।
হরিগুণ গানেতে সদাই পুলকিত ॥
হেন বেলা বলেন ঠাকুর নিরঞ্জন।
অবধান শুনহে সকল দেবগণ ॥
সকল দেবতা পূজা পাবে কলিকালে।
মোর পূজা না রহিল অবনীমণ্ডলে ॥
কারে লয়্যা জন্মাইব অবনী ভিতরে।
মনস্তাপ করেন ঠাকুর মায়াধর ॥
যুগে যুগে আছে বেদ সকল পুরাণ।
ভক্ত বিনা নাহি জানে পূজার বিধান ॥
ভোজরাজা আমারে পূজিল এক মনে।
যুধিষ্ঠির রাজা পূজে হস্তিনা ভবনে ॥

ক্রমশঃ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে আর্য্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রন্থাবলী অতুলনীয়—বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-বিষয়ক।

১। সাহিত্য-চিন্তা। এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত, আর্য্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। কাব্যচিন্তা। রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। কাব্যসুন্দরী দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সৃষ্টিচাতুর্য্য এবং সুন্দরীগণের চরিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সামাজিক।

৪। সমাজতত্ত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

৫। সমাজচিন্তা। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ধর্ম্মবিষয়ক।

৬। দেবসুন্দরী। হিন্দু দেবদেবীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৭। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হওয়াতে এই গ্রন্থ সর্ব্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১।০ মাত্র।

৮। সৃষ্টিবিজ্ঞান। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২০১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।

REG. No. C. 280.

PRINTED BY B. N. NANDI AT THE 'KAVIRATNA PRESS', 12, SIMLA STREET BYE-LANE, CALCUTTA.

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'সাহিত্য-সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

☞ সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

সাহিত্য-সভা।

PATRON :

SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.—*Lieutenant-Governor, Bengal.*

VICE-PATRONS :

THE HON'BLE MR. H. H. RISELEY, C. I. E.—*Secy. Government of India*
THE HON'BLE MR. A. EARLE, I. C. S.—*Director of Public Instruction, Bengal.*

SIR A. PEDLER, ESQ., F.R.S. C.I.E.

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র,
সহযোগী সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,

ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও তৎসংক্রান্ত কয়েকটী কথা।

আমি অদ্য ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি। এই বিষয়ে আমি কি বলিতে পারি? ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। মনুষ্যের নিশ্বাস যে স্থলকে স্পর্শ করিয়াছে, তথায় ইহার সূচনা হইয়াছে। নগর, প্রদেশ, রাজ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য নিবন্ধন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, কালক্রমে আবার সেইগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই সকল স্থান শ্রীহীন ও মলিন হয়। যে সমস্ত স্থল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এক সময় মহিমান্বিত ছিল, কালক্রমে তাহাদের অস্তিত্বের নিরূপণ দুঃসাধ্য হইয়াছে। সেই সমস্ত গৌরবকাহিনী উপন্যাস হইয়াছে। আবার অনেক পরিত্যক্ত জলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থল, ইহার অনুকম্পায় কি শোভা ধারণ করিয়াছে। যে রাজনগরীতে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, ক্ষণিকের নিমিত্ত তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনারা স্মরণ করুন। এক সময়ে ইহা জলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর ভূমি বলিয়া নিন্দিত ছিল। গুণীজন, ধনী বা সামাজিকগণ, কলিকাতা রাজধানী নির্ব্বাচন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। প্রাচীন গৌড়, দিল্লী প্রভৃতির পূর্ব্ব শোভা সম্পদ্ এখন আর নাই। আইসে; স্ফূর্ত্তিহীন জীবন হইতে অস্বাস্থ্যতার উৎপত্তি হয়। দেহমধ্যে রক্তপ্রবাহের পথ নিরুদ্ধ হইলে, দেহ যেমন অবসন্ন হয়, সেই মত ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত ভিন্ন পথে চালিত হইলে, সমৃদ্ধিশালী জনপদ শোভাহীন হয়। প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশগুলি যথা হিক্রেনিয়া, মার্জিয়ানা, চেকটিরিয়া প্রভৃতি এক সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, অধুনা ইহাদের পূর্ব্ব-গৌরব স্বপ্নবৎ বোধ হয়। আপনারা কলচিসদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কলচস রাজ্য এক্ষণে বনজঙ্গলপূর্ণ। এই স্থল এক্ষণে দীন দুঃখী অসভ্যদিগের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। গিবন পাঠে জানা যায় যে, কলচস রাজ্যের ডিওস ফিউচার নগরীর বিপণীতে দেশ দেশান্তর হইতে এত অধিক লোকের সমাগম হইত যে, এই স্থলে একশত ত্রিশ প্রকার ভাষায় কথোপকথন চলিত। প্রতি বৎসর সহস্র নরনারী ইহার বিপণীতে ক্রীত ও বিক্রীত হইত। কলচস প্রদেশ শণ, তিসি ও কাচের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই প্রদেশের সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র সর্ব্বত্র আদৃত হইত। ইউক্রেটিস নদীকূলে স্থাপিত চাজডিয়ানদিগের বর্সিপা নগরীও ঐ জন্য বিখ্যাত ছিল। ষ্ট্রাবো ও প্লিনী কহেন, তৎকালে কাচপাত্রের ব্যবহার

অধিকার স্থাপন করেন। রোম নগরীর ভীনাস দেবীকে (ঔর্ব্বশী) মুক্তা খচিত যে পূর্ণ চাপ বা চাল উৎসর্গ করা হয়, তাহা ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে আনীত হয়। এইলিত্রন্ ও অরিজিন বলেন, ভারতের মুক্তার পরই ব্রিটিশ মুক্তার সুখ্যাতি ছিল। ব্রুটস-জননী সারভিলাকে জুলিয়াস সিজার যে মুক্তা উপহার দেন, তাহার মূল্য ৪৫৪৭৫ পাউণ্ড বা সাত লক্ষ টাকা ছিল। ক্লিও-পেট্রার মুক্তার কর্ণালঙ্কারের মূল্য ১৬১৪৫৮ পাউণ্ড বা বাইস লক্ষ টাকা ছিল। রোমান-দিগের সময়ে ব্রিটন দেশ ধান্য-শস্যে পরিপূর্ণ ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জর্ম্মাণ ও গল-সৈন্যগণ এই দ্বীপজাত চাউল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইতিবেত্তা জোসিমাস বলেন যে, সম্রাট্ জুলিয়ান্ আট শত বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত করাইয়া এই দ্বীপ হইতে চাউল আনাইতেন। রোমানদিগের সহিত সংঘর্ষসূত্রে ব্রিটেনবাসীদিগের মতি বাণিজ্যের প্রতি ধাবিত হয় ও বাণিজ্যের উন্নতির সহিত কালক্রমে ইহারা জলযুদ্ধে কীর্ত্তিমান্ হইয়া উঠেন।

ভলটেয়ার কহেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ইংলাণ্ডের অধিবাসিগণকে প্রভূত ধনশালী করিয়া তুলে ও সেজন্য তাহারা স্বাধীনতা লাভের অধিকারী হয়। এই দ্বীপবাসিগণ স্বাধীনতা ভোগে সক্ষম হইলে, ব্যবসা-বাণি-জ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নশীল হয়, এই উভয়ের সাহায্যে গ্রেট ব্রিটেন গৌরবান্বিত হইয়াছে। মণ্টেসকিউ কহেন, অপর জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা রাজনীতির অধিক সম্মান করে, কিন্তু ইংরাজেরা রাজনীতি অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। অথচ দেখা যায় যে, ধর্ম্ম, বাণিজ্য ও স্বাধী-নতার সমাদর ইহাদের অপেক্ষা আর কেহ করে না। (Other nations have made the interest of Commerce yield to those of politics, the English on the contrary have ever made their political interest give way to those of Commerce. They knew better than any other people how to value at the same time there three great advantages—Religion, Commerce and Liberty.)

বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত অনুশীলন করিতে হইলে,গ্রীকজাতির উল্লেখ করিতে হয়। গ্রীকগণ, ফিনিসিয়ান ও কার্থেজিয়ানদিগের ন্যায় বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু ইহাঁ-দিগের বাণিজ্য বিস্তারের সহিত জ্ঞান ও সভ্যতা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। হোমার জন্মিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে গ্রীকদিগের ব্যবসা অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। কালক্রমে নানা বিত্তার অনুশীলনে শিল্প চর্চ্চায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গ্রীকগণ জগৎকে দীপ্তিমান্ করিয়া তুলে। ইউরোপখণ্ডে গ্রীকরাজ্য এরূপভাবে অবস্থিত যে, তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বোধ হয় যেন ইহার উপসাগরগুলি নানাদিক দিয়া ধাবিত হইয়া সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করিতেছে। গ্রীকগণ, সিসিলি রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার সূচনা করেন। ইহা-দিগের রোডস্, করিন্থ, অর্কোমিনাস প্রদেশ-গুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইলিয়াডে বর্ণিত আছে যে, রোডস্ অধিবাসিগণের প্রতি দেবরাজ জুপিটারের বিশেষ অনুকম্পা ছিল। তাহারা এই অনুকম্পা হেতু প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠে। অর্কোমেনাশ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। করিন্থ নগরীর কথা আর কি বলিব। ইহার ন্যায় প্রভূত সমৃদ্ধিশালী নগরী গ্রীকরাজ্যে আর ছিল না। বিলাসসামগ্রী ভাস্কর ও স্থপতি-

কার্য্যের জন্য করিন্থ নগরী চিরস্মরণীয় হইয়াছে। ইহার দেবী ভেগাসের মন্দির অপূর্ব্ব—অনুপম ছিল। সহস্রাধিক চিত্তহারিণী সুন্দরী নর্ত্তকী এই মন্দিরে দেবসেবায় নিযুক্ত ছিল। এথেন্সের কবি, নাট্যকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ, এই রূপসীদিগের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যকে মনোরম করিয়াছেন। গ্রীকদিগের এথেন্স নগরী ইতিহাসে কীর্ত্তিত। এথিনিয়ানগণের জলযানগুলি কৃষ্ণ উপসাগর হইতে ক্রিমিয়া হইয়া আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদসমূহে ধান্য, যব প্রভৃতি শস্য আহরণের জন্য প্রেরিত হইত। মদিরা, তৈল, মোম, ডুমুর, সুগন্ধ, মধু প্রভৃতির বিনিময়ে আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে হস্তিদন্ত, সুবর্ণ, কাগজ, অশ্ব, তুলা নির্ম্মিত বস্ত্র, উর্ণা, পশম ইত্যাদি দ্রব্য গ্রীকগণ স্বদেশে আনয়ন করিত। সিরিয়ান ও ভিনিসিয়ানগণকে জলযুদ্ধে পরাভব করিয়া এথিনিয়ানগণ অপ্রতিহতপ্রভাবে ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য করিতে থাকেন। ফিনিসিয়ানদিগের ন্যায় গ্রীকগণও উদারসরল—নীতিপথে ব্যবসায় চালাইতেন। এই গুণে গ্রীকজাতি সুখসমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। ইহাঁরা কলাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যায়—বিশেষতঃ বয়ন কৌশলেও ইহাঁরা যশস্বী হয়েন। সমগ্র সভ্য ইউরোপখণ্ডকে গ্রীকগণ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রমণীয় বস্ত্র, মণি-মুক্তাদি-খচিত বিবিধ সৌখিন দ্রব্য, রেশম ও তুলা নির্ম্মিত আবরণ প্রদান করিত।

গ্রীকদিগের ন্যায় রোমানগণও ব্যবসাবাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন না। ইহাঁদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি ভিন্নরূপ ছিল। সমুদ্র বহিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিব, সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রসারণ করিব, এ সকল বাসনা তাঁহাদের হৃদয়কে উত্তেজিত করিত না। সমুদ্র তাঁহাদিগের ভীতির কারণ ছিল। সমুদ্রযাত্রা, নাবিক-জীবনকে তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। সাধারণতঃ ক্রীতদাস বা মুক্তদাস এবং সেনার অনুপযুক্ত ব্যক্তিই নাবিকের কার্য্য করিত। নাবিকদিগকে প্রতারক, অভিসন্ধিপরায়ণ বা কাপুরুষ জ্ঞান করা হইত। জলযুদ্ধের কৌশল চাতুর্য্যপূর্ণ বোধে সাহসী রোমানগণ ইহা ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সিসিরো কহিতেন, একই ব্যক্তির কারকুন ও কুঠিওয়ালার কার্য্যের সহিত রাজকার্য্য চালন যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সামান্য ক্ষুদ্র স্বার্থের সহিত মহৎ উদ্দেশ্যের অনুশীলন এক প্রকার অসম্ভব। (Cicero did not like that the same people should be at once both the lords and factors of the whole earth. For this would indeed be to suppose that every individual in the estate and the whole state collectively had their head constantly filled with grand views and at the same time with small ones; which is a contradiction (Montesquieu.)

জুলিয়াস সিজার বলিয়াছিলেন যে, গল জাতি চিরদিনই জার্ম্মাণজাতিকে পরাজয় করিত। কিন্তু তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ দিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। রোমান জাতি পৃথিবী মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা লইয়া সুধীদিগের মধ্যে মতবৈষম্য আছে। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত স্মারার বলেন যে, প্রাচীন কালে ইহাঁদিগের শক্তি ও প্রভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা অপর সভ্যজাতির ধন লুণ্ঠন করিয়াছেন।

রোমানদিগের অত্যাচার নির্য্যাতনে অনেক উর্ব্বর ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অধীন রাজ্যগুলি করভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে ইত্যাদি। অন্তপক্ষে কেহ কেহ বলেন যে, রোমানরাজ্য-শাসননীতির দ্বারা নানা জাতি, সম্প্রদায় ও মনুষ্যদল একত্র এক শাসনের অন্তর্গত হইয়া, যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে শান্তি লাভ করিয়াছে। সাম্রাজ্য মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্যের পথ নির্ম্মাণ করিয়া, রোমানেরা এক দেশের সহিত অপর দেশের পরিচয় সহজসাধ্য করিয়াছে। দস্যু ও তস্কর-ভীতি অপনোদন করিয়া বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়াছে। আসিয়া ও ইয়ুরোপে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া, স্বাধীন অবাধ ব্যবসায় সুদূরবিস্তৃত করিয়াছে।

রোমানগণ কোন কোন স্থলে স্বাধীন জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনে আপত্তি করিতেন না। দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতির সহিত ব্যবসা করিতে আশঙ্কা করিতেন। রোম-সম্রাট্ ভেলেন্স প্রেসিয়ান, থিওডোসিয়ান, ভেলেনটিয়ান প্রভৃতির বিধিব্যবস্থা অনুধাবন করিলে ইহা উপলব্ধি হয়। সম্রাট্ প্রোবাস ও জুলিয়ানের কিন্তু অবাধ স্বাধীন ব্যবসার উন্নতি বিষয়ে দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের এই সংক্রান্ত বিধিগুলি উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক। রোমানদিগের মধ্যে সৈনিক জীবন ও ব্যবহারিক জীবন বিশেষ আদরণীয় ছিল। কালক্রমে এই রোমানজাতি নৌ-চালনবিদ্যায় ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অদ্বিতীয় হইয়া উঠে।

আরবীয়দিগের সহিত রোমানদিগের ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। এই ব্যবসার সৌকর্য্যার্থে সম্রাট্ অগষ্টাস আরবদেশ জয় করেন। মহম্মদের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী সময়ে যে আরব জাতি যুদ্ধ, বিক্রম ও বীরত্বের চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সম্রাট্ অগষ্টাসের সময় সেই আরবজাতি মৃদুস্বভাব ও নিরীহপ্রকৃতি ছিল। রোমান সেনাপতি আরব দেশ জয় করেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে রোমানদিগের সাতটী মাত্র সেনা বিনষ্ট হয়। রোমানগণ বহুকাল এই রাজ্য অধিকারভুক্ত রাখেন নাই। প্রাকৃতিক ও অপর অসুবিধানিবন্ধন রোমানগণ এই রাজ্য পরিত্যাগ করেন। আরবগণ বোগদাদ, আলিপো স্থান হইতে নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুয়েজ বন্দরে রোমান সম্রাটের জল-যানে প্রদান করিত।

রোমানদিগের সহিত ভারতের ব্যবসা প্রসিদ্ধ। এই ব্যবসা স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চালিত হইত। ম্যাসিডোনিয়ার সওদাগরগণ এই জন্য স্থলপথে একটী নূতন পথ নির্দ্ধারণ করেন। মিসর রাজ্যের মায়াস্ হরমস্ বন্দর হইতে দক্ষিণায়ণে বণিক্গণ জলযানে লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন করিত। রোমানগণ ভারত হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ কোটী সিসট্রিস মুদ্রা —২২ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিত। ভারতীয় রেশম রোম রাজ্যে সমধিক আদৃত হইত। তৎকালে মহিলাদিগের মধ্যেই রেশমী পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত। পুরুষের পক্ষে ইহার ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট্ ইলাবেলাসের সময় হইতে পুরুষদিগের মধ্যেও ইহার ব্যবহার প্রচলন হয়। বঙ্গদেশের জামালপুর প্রদেশ হইতে হীরক, ভারতীয় মুক্তা, প্রবাল ও বিবিধ মূল্যবান প্রস্তর রোমরাজ্যে প্রেরিত হইত। দেবদেবীর পূজা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য গন্ধ দ্রব্য ও চন্দন কাষ্ঠ এবং আদ্রক, মরিচ, আবলুশ কাষ্ঠ, ভারতীয় বৃক্ষ, খনিজ পদার্থ নীল ইত্যাদি ভারত হইতে প্রেরিত হইত। কিম্বদন্তী আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণ

খৃষ্টির ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের চা চীন রাজ্যে লইয়া যান। ভারতীয়গণ রোমানদিগের নিকট হইতে রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন, কৃষ্ণকান্তমণি, শিলাকুসুম, কাচ, বিবিধ প্রকার মদিরা ও পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিতেন। রোমান ডিনারি মুদ্রা ভারতে প্রচলিত ছিল। এই উপলক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভারতের সহিত ব্যবসা রোমানদিগের সুবিধাজনক ছিল না। আরব ও ভারতের সহিত ব্যবসায়ে দ্রব্য বিনিময়ে নিষ্ক্রমণ হেতু রোমরাজ্যে প্রতি বৎসর সুবর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর হ্রাস হওয়ায় তাম্র ইত্যাদি মলিন ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত হয়। অন্য পক্ষে অনেকে এই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বাহ্য বাণিজ্যনিবন্ধন রোমানদিগের মধ্যে নৌচালনবিদ্যার সমাদর হয়। ইহাঁরা জলপথে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। শিল্প ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা হয়। জাতি, সুখস্পৃহ হইতে ধনস্পৃহ হইয়া উঠে এবং সম্পত্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর মধ্যে সঙ্কীর্ণভাবে নিবদ্ধ থাকে না। সম্রাট্ ক্লডিয়াসের পরবর্ত্তী সময় হইতে রোমানেরা মিসরের বণিক্গণের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সহিত ব্যবসা চালাইতে থাকেন। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের ব্যবসার উন্নতিকল্পে সম্রাট্ অগষ্টাস, মিসর অধিকার করিয়া সুবিধিব্যবস্থা প্রচলন করেন। জলপথে বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্য র‍্যাভেনা, মিসিনিয়ম্ প্রভৃতি বন্দরে রণপোত স্থাপন করেন। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য রোমানদিগের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ইহাঁরা (Banking System) মহাজনী কারবার প্রচলন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইহাঁরাই বর্ত্তমান মুদ্রাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডের চলিত মুদ্রা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের চিহ্ন (£. s. d.) রোমান (Librai, Solidi Demri) হইতে লওয়া হইয়াছে। রোমানদিগের ব্যবসা বাণিজ্য খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০ শত বৎসর হইতে সূচনা হইয়া, সম্রাট্ আগষ্টাসের সময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব অতুলনীয় অসম্ভব ঘটনা দেখাইয়াছে। যে স্বাধীন ও অবাধবাণিজ্য ও পথের নিরাপত্তা সভ্যতার গৌরব বলিয়া আধুনিক রাজনীতিজ্ঞগণ কল্পনা করেন, পৃথিবীব্যাপী রোমরাজ্যে তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল।

আগষ্টাসের পর হইতে রোমের রাজ্য ভঙ্গের সহিত বাণিজ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমের পতন সহ পাশ্চাত্য ইয়োরোপে এক প্রকার লোপ হয়। রোমরাজ্যের কনষ্টান্টিনোপলে কতক পরিমাণে বাণিজ্য-ব্যবসা প্রচলন থাকে।

পাশ্চাত্য খণ্ডের বাণিজ্য বিষয়ে বলিতে হইলে, কার্থেজিয়ানগণের বিবরণ বলিতে হয়। তাহাদিগের বাণিজ্যনীতি সঙ্কীর্ণ কুটিলতামক্ষ ছিল। ইহাঁরা অপর জাতির বণিক্দিগকে সারডিনিয়া হইতে হারকিউলিয়ের স্তম্ভ পর্য্যন্ত আসিতে দিতেন না। যদি কেহ এই নিষেধ অবহেলা করিত, তাহা হইলে ইহাঁরা নৌকা সহিত তাহাকে জলমগ্ন করিতেন। নাবিক-জীবনই ইহাঁদের তৃপ্তিকর ছিল। প্রজামধ্যে কেহ নাবিক-জীবন ত্যাগ করিয়া ভূমি কর্ষণ কার্য্য অবলম্বন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অনেক জনপদে ইহাঁরা বাণিজ্য চালাইতেন ও অনেক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। টায়ার নগরীর পতনে কার্থেজের সৌভাগ্য উদয় হয়। ইহাঁরা চর্ম্মব্যবসায়ী ও বিচিত্র সূত্রধার বলিয়া প্রশংসনীয় ছিলেন। এখনকার কাগজের নোটের ন্যায় তাঁহারা চর্ম্মমুদ্রা ব্যবহার করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য নিবন্ধন পররাজ্যের সহিত বিবাদ ও আত্মকলহ ইহাঁদের পতনের সূচনা হয়। অবশেষে রোমানগণ

ইহাদিগের দেশ ধ্বংশ করেন। হনুমানের লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রোমানেরা নগরীর ধ্বংশসাধন করে। সপ্তদশ দিবসে এই ধ্বংসসাধন সম্পূর্ণ হয়। সাত লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র পঞ্চাশ সহস্র লোক জীবিত ছিল।

ভারত চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। আমি অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণ ভাবে কতিপয় প্রধান প্রাচীন জাতির যে কাহিনী বর্ণনা করিলাম, তাহাতে দেখাইয়াছি যে তাঁহারা সকলেই ভারতের সহিত আদান প্রদান করিতেন। জ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতায় ভারত চিরদিনই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ভারতভূমি পুণ্যভূমি নামে আখ্যাত। এখানকার ব্যবসায়ী মহাজন, সাধু প্রভৃতি সুনামে অভিহিত হইত। ইহাদিগের ব্যবসায় সততা ও ন্যায়পরতার উপর ন্যস্ত ছিল। এখন পর্য্যন্ত ভারতবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-কার্য্য আইনসঙ্গত কণ্ট্রাক্ট ব্যতিরেকে মৌখিক কথায়—এমন কি ইঙ্গিতেও সম্পাদন হইয়া থাকে। কি প্রাচীন ও আধুনিক বিদেশীয় বণিক্ সকলেই ভারতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনে নিতান্ত উদ্‌গ্রীব। ইহা অত্যুক্তি নহে, ভারত হইতে বিবিধ দ্রব্য আহরণ সংকল্পে নানা সভ্যজাতি মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা ও উন্নতি সাধন হইয়াছে। ভারতের ধন করায়ত্ত করিবার জন্য প্রাচীন কাল হইতে সভ্যজাতিগণ উন্মত্ত। স্থলপথে ও জলপথের যে সমস্ত উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভারতভূমে আগমন উদ্দেশ্যে সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন স্থলপথ ও জলপথের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। আধুনিক সময়ে ভারতে আগমন উদ্দেশ্যে কলম্বস আমেরিকায় গমন করে ও ভাসকো-ডা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ইয়োরোপের পাশ্চাত্যখণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পথ নির্দ্ধারণ করেন। সুয়েজ খাল কর্ত্তন করায় বিজ্ঞানের গৌরবের সহিত ভারতে আসিবার জলপথ আরও সুগম হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে, চালডিয়া ও সিরিয়া হইতে বণিক্‌গণ দলে দলে ভারতে আগমন করিতেছে। এই সকল বণিক্‌দিগের সুবিধা করিয়া সিলুসিয়া, বাগদাদ, ডামাস্কাস, টায়ার প্রভৃতি নগরী সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়া নগরী এই উপলক্ষে এক হাজার আট শত বৎসর সুখসচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছে। ইউডিমিয়া ও পিট্রা নগরীর পরিচয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই প্রাচীন ভারতভূমিই তাহাদের গৌরবের মূল কারণ। ইহার বহু পরবর্ত্তী সময়ে ভিনিস ও জেনোয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, ইহাদেরও উন্নতির কারণ এই ভারতভূমি। একজন বিবেচক ইংরাজ সুধী কহিয়াছেন, উল্লিখিত অধিকাংশ রাজ্য ও নগরীর উন্নতি ও অবনতি, ভারতের ব্যবসার উত্থান ও পতনের সহিত সংমিশ্রিত আছে। (Nearly all the cities in that region whose commerce we are attempting to describe rose and fell with the fluctuations with that commerce and the great changes there have been caused by the different directions which the wealth of India has taken in its passage to Europe.)

সুখস্পৃহা-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-হৃদয়কে নিরন্তর উদ্বেলিত করে। ইহার পরিতৃপ্তির জন্য বিলাসসামগ্রীর উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির অনুকম্পায় কোন কোন

জনপদবাসী শিল্প ও জ্ঞানচর্চ্চায় রত হইবার সুবিধা ও সময় পায় এবং ক্রমশঃ উন্নতি ও সভ্যতার অভিমুখে অগ্রসর হয়। জাতি মধ্যে সামাজিক বন্ধন-প্রথা, জাতীয় উদ্যমের সাহায্য বা বিরোধ করিয়া, মনুষ্যসমাজে তাহাদের স্থান স্থির করিয়া দেয়। আর্য্য হিন্দুগণ অতি প্রাচীন কালেই পার্থিব মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সামাজিক লোকের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সামঞ্জস্যভাবে সেবা বিহিত, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ, জিজ্ঞাসাচ্ছলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'মহারাজ, অর্থচিন্তায় নিরত থাকিয়া, ধর্ম্মচিন্তাত বিস্মৃত হয়েন নাই? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া অর্থ-চিন্তায় ত একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না? অবিশ্রান্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনকার ধর্ম্মার্থের ত কোন হানি হইতেছে না? উচিত সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন?' কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন অষ্টবিধ রাজকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। কৃষিসম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কৃষি, খালখনন ও কৃষকদিগকে অল্প সুদে অল্প পরিমাণে কর্জ্জ দাদন সম্বন্ধে অধুনা গভর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য হিন্দুগণ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন," শিল্পোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর্য্য হিন্দুগণ বহির্ব্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেন। "শিল্পকারদিগকে ত উপকরণ সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন? হে রাজন! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌গণের নিকট আপনকার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা ত যথাযোগ্য শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় এবং তদীয় লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে?" ইহা হইতে বোধ হয় যে, তাঁহারা দেশমধ্যে শিল্পের উপকরণসামগ্রীর অভাব হইতে দিতেন না এবং ভিন্নদেশীয় শিল্প সামগ্রীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান রাখিতেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে প্রদত্ত উপহারগুলির আলোচনা করিলে, সেই সময়ের আদৃত বস্তু ও সেই সকলের নির্ম্মাণস্থানের বিষয় জানা যায়। "কাম্বোজরাজ ঊর্ণানির্ম্মিত সামুদ্রিক বিড়াল-লোম-রচিত কাঞ্চন সদৃশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছদসকল প্রদান করিয়াছিলেন। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণোচিত রঙ্কু মৃগের অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ব্ব প্রকার পূজোপকরণ ও গান্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপস্থিত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিন্ধুপারে ও সমুদ্র-সন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকৃষ্ট ও নদীমুখ ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা কলস, বৈরাম, পারদ, অভীর ও কীতবগণ, বিবিধ বলি, বহুবিধ রত্ন, সদ্যপ্রসূত অজাদুগ্ধ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, যবনগণ সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তুরঙ্গকুল-সম্ভূত বেগগামী অশ্বসমূহ ও সর্ব্ববিধ বলিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রবেশ করিতে না

পারিয়া লৌহনির্ম্মিত অশ্বভূষণে ও নির্ম্মল গজদন্ত নির্ম্মিত ৎসরু-শোভিত অসিসমুদায় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। চীন, শক ও ওড্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্ব্বরজাতি, বৃষ্ণিবংশীয় হূণদেশীয় হিমালয় পার্ব্বতীয় এবং নীপ ও অনুপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বক্ষুতীরনিবাসীরা কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শত ক্রোশগামী সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশ সহস্র রাসভ প্রদান করিয়াছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমক ও শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য, ঊর্ণাজ, কঙ্কর, কীটক, পট্টক, কুটিকৃত কমলসদৃশ প্রভা-সম্পন্ন ও কার্পাসনির্ম্মিত শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র, মেষচর্ম্ম, কোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন এই সমুদয় গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পূর্ব্বদেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণি-কাঞ্চন-খচিত গজদন্ত বিনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, শস্ত্র, সুশিক্ষিত হয়সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত বহুবিধ রথ, বিচিত্র রত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিল। যাঁহারা মেরু ও মন্দর গিরির মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদা নদীর উভয় কূলস্থিত কীচক ও বেণুর রমণীয় ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহীপালেরা দ্রোণ পরিমিত অত্যুৎকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান করিতেছিলেন, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমাগারসম্ভূত, পুষ্পজ সুস্বাদ মধু, উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব্ব মালা, উত্তর কৈলাস হইতে আহৃত বলবিধায়িনী ওষধি এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য উপহার সকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধি-ষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবা-রিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণ, প্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ, তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত পর্ব্বতপ্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। হেমকুম্ভসমাস্থিত সুরভি চন্দন রস, মলয় এবং দদুরাচলসম্ভূত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিমান মণি, রত্ন ও সূক্ষ্ম কাঞ্চন বস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহল দ্বীপের লোকেরা, সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্য মণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আস্তরণ উপহার প্রদান করিয়াছে। (মহাভারত সভাপর্ব্ব)। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে জাতিবিভাগ বর্ত্তমান আছে। নানা কারণের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প অনুশীলন এই জাতি বিভাগের কারণ। এই জাতি বিভাগ হেতু বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের শিল্পিগণ অসহনীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাই-য়াছে। পুরুষানুক্রমিক চর্চ্চা ও চেষ্টায় শিল্প, কুশলতার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই জাতিবিভাগ না থাকিলে, বিনা মূলধনে সাধারণ শিল্পীর পক্ষে এতদূর উন্নতি অসম্ভব হইত। সার উই-লিয়ম হাণ্টার বলেন যে, ভারতের মধ্যযুগের অনুপম মস্‌লিন, রেসম বস্ত্র, জরির কার্য্য ও সুবর্ণ ও বহুমূল্য রত্নখচিত অস্ত্র ও অন্য প্রকার শ্রমগত জাতি বিভাগের ফল (The famous manufacturers of Mediaeval India, its muslins, silks, cloth of gold, inlaid weapons, and exquisite works in precious stonesware brought to perfection under the care of the casters or trade-guilds.) এই উন্নত শিল্পমার্জ্জিতরুচি ধনীদিগের সাহায্য-সাপেক্ষ। সাধারণ লোক বহুমূল্য দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না। সমগ্র-ভাবে তাহাদের রুচি ও উন্নত শিল্প-সৌন্দর্য্য

উপভোগের নিমিত্ত মার্জ্জিত হয় না। এরূপ অবস্থায় ধনবানদিগের রুচির পরিবর্ত্তনে উন্নত শিল্পের অবনতি হয় এবং পুরুষানুক্রমিক শিল্পিকারগণের অবস্থা শোচনীয় হয়। ভারতের এক্ষণে এই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে রোমের পতনের সহিত ইউরোপ খণ্ডে বাণিজ্যের অবসান হয়। বিজয়ী বর্ব্বরজাতি লুণ্ঠন দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিত, বণিক্‌দিগের অর্ণবপোত বা বৃহৎ জলযান আর নদীপথে দৃষ্ট হইত না। লোকসকলের গমনাগমনের জন্য নদীপথে ক্ষুদ্রতরণী ব্যবহৃত হইত। ইউরোপীয়গণ শিল্প পরিত্যাগ করিয়া ভূমিকর্ষণে মনোযোগী হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তদনুকুল মহাজনীকার্য্যের নিন্দা প্রচার করিয়া, লোকসকলকে এই সকল কার্য্যে নিরস্ত করিতে থাকেন। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে পাশ্চাত্য খণ্ডে কেবল মাত্র ইহুদিজাতি ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহুদিগণ বাণিজ্য বিষয়ে চিরপ্রসিদ্ধ। যে অমানুষিক ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিয়া ইহাঁরা নিজ জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত পাঠে লোমাঞ্চ হয়। ব্যবসা ও তজ্জনিত ধনশালিতা ইহাদের নির্য্যাতনের কারণ হইয়াছিল। ইহাঁরা খৃষ্টীয়ানদিগের এক প্রকার অস্পৃশ্য ছিলেন। সুদখোর শঠ কৃপণ প্রভৃতি ঘৃণ্য আখ্যায় ইহাদিগের উল্লেখ করা হইত। দস্যুপ্রকৃতি প্রবল খৃষ্টীয়ানগণ ইহাদিগের শ্রমলব্ধ ধন লুণ্ঠনকে গৌরবের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত। এইরূপে ঘৃণিত ও উৎপীড়িত হইয়াও চরিত্রবল ও কার্য্যকুশলতায় ইহুদিগণ, রাজ্য সংক্রান্ত বিশ্বস্ত গোপনীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইত। লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত নিজ নিজ মূল্যবান সম্পত্তিগুলি বিশ্বস্ত আত্মীয় বা বন্ধুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অপর দেশ হইতে ইহারা বরাতপত্র বা হুণ্ডির দ্বারা ব্যবসা কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কথিত আছে এই বরাতপত্র (Letters of Exchange) প্রথমে ইহাঁরাই ব্যবসা কার্য্যে প্রবর্ত্তন করেন।

ইউরোপের এই সময়ে আরব প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের আবির্ভাব হয়। এই মহাত্মার অনুকম্পায় মুসলমান জাতির সৃষ্টি হয়। ইহাদিগের প্রতাপ ও বীরদর্পে এক সময়ে মেদিনী কম্পিত হইয়াছিল। রোমরাজ্য অপেক্ষাও মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া উঠে। উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্য আসিয়া ও ভারতবর্ষ এই সকল জনপদগুলি মুসলমান সভ্যতায় উদ্ভাসিত হয়। দিগ্বিজয়ী মুসলমানগণ জ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্যের বিরোধী ছিলেন না। প্রত্যুত ইহাঁদিগের সময়ে শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন ঘটে। স্পেনরাজ্যের পিরাণি পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া চীনরাজ্যের প্রান্তভাগ অবধি,—রুসিয়া হইতে ভারত অবধি, ইহাঁদিগের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মুসলমানজাতি বীরভাবে অনুপ্রাণিত থাকিয়াও অতি বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ফলতঃ ভোগবাসনা বৃদ্ধি মুসলমানদিগের দ্বারা এ জগতে হইয়াছে। তৎকর্ত্তৃক শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার অতি দ্রুতবেগে সংসাধিত হয়। অমরাবতীর সুখভোগ করিবার নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যভূমিকে সুন্দর মনোরম ও উৎকৃষ্ট করিয়াছেন। এই সুখপ্রিয় জাতি বিবিধ উদ্যানবাটীকা ও মর্ম্মরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছে। কানন মধ্যে মনোরম প্রস্রবণ স্থাপন করিয়া শ্রুতিসুখকর তৃপ্তিদায়ক জলনির্ঝরণ প্রবল করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়াছে। ইহাঁরা বিচিত্র মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। সুকোমল-লাবণ্যময়ী

রমণীর নৃত্য ও উহাদিগের কম্পিত কণ্ঠের সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইতেন। নানা যন্ত্রযুক্ত বাদ্য বাজাইতেন। ইহাঁদিগের আলিপো, বাগদাদ, ডামাস্কাস্, কায়রো, সেভাইন গ্রাণাডা প্রভৃতি নগরী ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পারস্যোপসাগর ও কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূলবর্ত্তী যে সমস্ত জনপদ অধুনা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, খালিপদিগের সময়ে তাহা জনকোলাহলে গগন ভেদ করিত। প্রাচীন রাজনীতি অর্থাৎ শত্রু-রাজ্য বিধ্বংশ করিয়াও সেই রাজ্যের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি লইয়া নিজ রাজ্যের শোভা বৃদ্ধি করণ প্রথা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণই বিজিত রাজ্যের শোভা-শ্রীবৃদ্ধিতে মনোযোগ প্রদান করেন। পাশ্চাত্য খণ্ডে স্পেন রাজ্য প্রভৃতিতে মুসলমানদিগের প্রাচীন গৌরব অদ্যাবধি উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছে। ধর্ম্মযুদ্ধ-কাণ্ডে প্যালেষ্টাইন ক্ষেত্রে মুসলমানদিগের সহিত সংঘর্ষণে ধর্ম্মযাজক-পরিপুষ্ট মূঢ় আত্মাভিমান কুজ্ঝাটিকা ভেদ করিয়া, সভ্যতার ক্ষীণালোক ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশমান হয়। স্পেনীয় মুরদিগের শিক্ষকতায় ইউরোপ, শিল্পোন্নতিকর নানা বিদ্যা অর্জ্জন করে। গ্রীক ও লাটীন সাহিত্য অনুশীলনে ইউরোপে নবযুগের আবির্ভাব হয়। স্বাধীন চিন্তা সমাদৃত হয়। কুসংস্কার, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। ধর্ম্ম যাজকদিগের অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষীণ হয় এবং উহাঁদিগের মধ্যেও মত পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। বাণিজ্য-ব্যবসা দ্বারা মুসলমান প্রদেশগুলির সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া, ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তৃগণ, ব্যবসায়ীদিগের প্রতি অত্যাচার 'নির্য্যাতন করিতে নিরস্ত হইতে থাকে। ভিনিস, জেনোয়া, লেগহরণ ইত্যাদি জনপদগুলি এই সময়ে ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভ করে। এই প্রদেশগুলিতে ইহুদিদিগের সহিত সদ্ব্যবহারের সূচনা হয়। ইহুদিগণ এই সকল স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হয়। ইহাঁরা লেগহরণে একটী ধর্ম্ম মন্দির (Synagogue) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহুদিদিগের এই ধর্ম্মমন্দির পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইয়োরোপের ধর্ম্মসংস্কার-বিপ্লবের ফলেও ইহুদিদিগের উপর নির্য্যাতন কম হইয়াছে। নানা ঘটনার সমাচারে ইউরোপীয়গণ বুঝিতে পারেন যে, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের উপর অত্যাচার করিলে রাজ্যেরই অনিষ্ট সাধন করা হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সুচতুর জাতি, এই নীতির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিল্পীগণকে উৎসাহ দিতে থাকেন। ভ্রমান্ধজাতি অত্যাচার করিয়া নিজ অনিষ্ট সাধন করে। ফ্রান্স দেশের হিউগিনটস্, বর্জেস্ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের এই জন্য বিষম দুর্দ্দশা হয়। আর অত্যাচারপ্রপীড়িত পশম শিল্পকারদিগকে সমাদর করিয়া ইংলণ্ডের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থায় রোম-বিজয়ী বর্ব্বরজাতিগণের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতালোক বিস্তৃত হইলে, আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগণ অদম্য উদ্যমশীল হইয়া উঠেন। জীবনের সকল কার্য্যেই এই উদ্যমশীলতার প্রভাব বিস্তৃত হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে, শ্রীবৃদ্ধি সাধন ইউরোপীয়দিগের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না॥ পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের প্রভাব বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদের একাগ্রতা, সাহস ও আত্মনির্ভরতার ফল পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনারা অনেকেই বোধ হয় মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী অবগত আছেন। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পন্ন হয়। এই সময় হইতে পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে প্রাচ্য প্রদেশের ধনলুণ্ঠন লালসার উদ্রেক হয়।

ইহার এক শতাব্দী পরে সার্ জন ম্যানডেভিল আসিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশে বহু বর্ষ কাল বাস করেন। কন্টি নামা জনৈক ইউরোপীয় পারস্য ও ভারত রাজ্যে ১৪০৯ হইতে ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর্য্যটন করেন। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের (Compass) ব্যবহারে পৃথিবীতে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। সমুদ্র-যাত্রায় সুবিধা হওয়ায় সমগ্র পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে কলম্বস্, আটলাণ্টিক মহাসাগর অতি-ক্রম করিয়া আমেরিকার উপকূলে উপনীত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ভ্রমণের ফল-গৌরবে কলম্বসের নাম মহিমা-ন্বিত ও চিরস্মরণীয় হইয়াছে—ইউরোপে যুগান্তর সংসাধিত হইয়াছে। কার্য্যের ফল যে অবস্থাসাপেক্ষ, কলম্বসের আবিষ্কার তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কলম্বসের জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে স্কাণ্ডিনেভীয়া প্রদেশের এরিক-দিরেডের পুত্র লিফ (Leif) আমেরিকায় গমন করেন ও ন্যাণ্টিকিউট প্রভৃতি প্রদেশের নামকরণ করেন। ইঁহার ভ্রমণে ইউরোপে কিছুমাত্র আন্দোলন হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কলম্বস্, লিফের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আমেরিকায় যাইতে কৃতসংকল্প হন। অপরে আপত্তি করেন যে, কলম্বসের ইহা জানা থাকিলে, তিনি আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি-তেন। যাহাহউক কলম্বসের ভ্রমণকালে ইউরোপে অদম্য সাহসিকতা ও বীরভাবের উদ্দীপন হয়। অজ্ঞাতদেশে ধর্ম্মপ্রচার ও তথাকার ধনলুণ্ঠনের প্রবল বাসনা ইউ-রোপীয়গণকে উত্তেজিত করে। স্থিরসংকল্প সাহসী নাবিকগণ দৃঢ় যত্ন সহকারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমনের জন্য সমুদ্রপথের অন্বে-ষণে বহির্গত হন। ঘৃণিত ইহুদি জাতির (Rabbi Abraham and Rabbi Joseph) আব্রাহাম ও জোসেফের পরামর্শে পর্ত্তুগীজ পেড্রো ডি কেভিল হো আফ্রিকার দক্ষিণ অন্তরীপগুলি বেষ্টন করিয়া থাকেন। আর-বীয় নাবিকও তাহাদিগের সামুদ্রিক মানচিত্র অবলম্বনে কেভিল হো এই কার্য্য সমাধা করেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুলাই তারিখে ভাসকো ডা গামা দুইটী জলযানে ১৬৮ ব্যক্তি ও দুইজন ইহুদি চিকিৎসক লইয়া মুসলমান দিগের মানচিত্র অবলম্বনে ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ নির্দ্ধারণ জন্য বহির্গত হয়েন। ইহুদি চিকিৎসকদিগের পরামর্শে বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক গামা জলপথে সময় ও স্থান নির্ণয় হেতু চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের দূরত্ব মাপক যন্ত্র (Atrolobe) ব্যবহার করেন। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম, নাবিক ও সঙ্গি-দিগের আত্মকলহ সহ্য করিয়া, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে তারিখে ভারতের উপকূল কালি-কট রাজ্যে আগমন করেন। এই জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাসকো-ডি-গামা আরব-দিগের জলযানে দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র (Compass) ও উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রের (Quadrant) ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হন। আরব-দিগের (Sea chart) সামুদ্রিক মানচিত্রও তাঁহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করে। ইহার পৃষ্ঠে ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিনিসির কডো ম্যাগটো আফ্রিকার পশ্চিম প্রদেশগুলির তথ্য পাশ্চাত্যদিগের নিকট প্রচার করেন। সিবা-ষ্টিয়ান ক্যাবট হিমপ্রধান নিউ ফাউণ্ড্ল্যাণ্ড প্রদেশে গমন করেন ও উত্তর সমুদ্র দিয়া চীনদেশে যাইবার জন্য চেষ্টা করেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাব্রাল, রণপোত লইয়া আফ্রিকার পশ্চিম কূল হইতে ঝটিকা-বিতাড়িত হইয়া অবশেষে ব্রাজিলে উপনীত হন। জলপথে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ উদ্দেশ্যে স্পেন রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া ম্যাগেলিন নামা জনৈক পর্ত্তুগীস্ কর্ম্মচারী ১৫১৯

খ্রীষ্টাব্দে ১০ই আগষ্ট তারিখে ৫টী জলযান সমেত প্রয়াণ করেন। ম্যাগেলিনের দৃঢ়-সংকল্পতা, সহিষ্ণুতা ও অসমসাহসিকতা দেখিয়া সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, জগৎ মধ্যে মনুষ্যচরিত্রে এরূপ দৃশ্য আর পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহাঁর তুলনায় কলম্বসের কার্য্য মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মহাবীর দুই বৎসর তিন মাসকাল সমুদ্রোপরি জীবনযাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগণিয়া প্রদেশ ইনিই আবিষ্কার করেন ও ঐ মহাদেশ পরিক্রম করিয়া, পশ্চিম মহাসাগর আটল্যাণ্টিক হইতে সমশীতল ও উষ্ণ, নির্ব্বাত ও ঝটিকাপ্রপীড়িত (Zone) পৃথিবীর কটিবন্ধন অতিক্রম করিয়া হিমপ্রধান পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটস্থ স্থান দিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে (Pacific Ocean) উপনীত হন। এই সমুদ্রের স্থিরভাব সন্দর্শনে তিনি ইহাকে প্রশান্ত মহাসাগর নামে আখ্যাত করেন। নাবিক ও সঙ্গীদিগের বিশেষ অনুরোধে দুই মহাসমুদ্রের সংযোগ-স্থল (Strait of Magallin) নিজ নামে অভিহিত করেন। ইনি প্রশান্ত মহাসাগরে তিন মাস কুড়ি দিন অতিবাহিত করেন। পানীয় ও আহার্য্যের অভাব হইলে, দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত জল পান করিয়াছেন—শুষ্ক চর্ম্ম সকল জলে কোমল ও সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়াছেন, তথাপি নিজ সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দৃঢ়তা ও শাসনগুণে নাবিকগণ বিদ্রোহী হইয়াও তাঁহার কার্য্য পণ্ড করিতে পারে নাই। কথিত আছে, অকূল প্রশান্ত মহাসাগরের পথ নিরূপণ উদ্দেশ্যে ম্যাগেলিন দ্বাদশ সহস্র মাইল পথ ভ্রমণ করেন। মালাক্কা দ্বীপের নিকটস্থ বেবু বা মিউট্যান উপদ্বীপে অসভ্যদিগের হস্তে তাঁহার নিধন হয়। কেহ কেহ কহেন, বিদ্রোহী নাবিকগণ তাঁহাকে সংহার করে। ফলতঃ ম্যাগেলিন মৃত হইয়াও চিরস্মরণীয় আছেন। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। পৃথিবীর দুইটী মহাসাগরের সম্মিলন-স্থল তাঁহার অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ হীরকাক্ষরে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতেছে। ইহাঁর সহকারী সিবাণ্টিয়ান ডি আলকানো স্বীয় নরপতির নিকট মহৎ কার্য্যের অভিজ্ঞান শিরোপার সর্ব্বপ্রধান ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কেতনে পৃথিবীর অনুরূপ গোলকের উপর Primus circumdedistime খোদিত করা হইয়াছিল। এই সমস্ত অসমসাহসিক নাবিক কর্ত্তৃক সমুদ্র পথের মানচিত্র প্রস্তুত হইলে বাণিজ্যকার্য্য পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালের নাবিকগণ আধুনিক ইউরোপীয় নাবিকদিগের সমকক্ষ ছিলেন না। তাহারা যে আসিয়ার ও আফ্রিকার সর্ব্বত্র গমনাগমন করিত, এরূপ উল্লেখ নাই। প্রাচীনকালের জলযানগুলি অকূল সমুদ্রগমনের উপযুক্ত ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতি ও সাহায্যে এতৎ বিষয়ে কি অভাবনীয় না পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সমুদ্রপথে ভ্রমণ আর ভীতিজনক নহে। এমন কি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পক্ষেও সমুদ্রভ্রমণ যেন আনন্দদায়ক হইয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে ধনতৃষ্ণা এরূপ প্রবল যে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমনের পথ সুগম হইলে উহারা পর-রাষ্ট্র-লুণ্ঠনে উন্মত্ত হইয়া উঠে। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্দারও পর্টুগীজদিগকে পৃথিবীর পূর্ব্বদিক ও স্পেনীয়দিগকে পশ্চিমদিক লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত বিভাগ করিয়া দেন। এই দুই জাতির ক্রিয়া-কলাপ ও অত্যাচার আমার লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব।

চাইপার বিশপ বলেন, স্পেনীয়গণ তাঁহার সময়ে দেড় কোটীর অধিক লোকের প্রাণ সংহার করিয়া, নিশ্চিন্তমনে তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। এই অসহ্য দারুণ উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ কামনায় হতভাগ্য আমেরিকাবাসিগণ, রক্তবর্ণ ফ্লেমিঙ্গে পক্ষী যে সমস্ত সমুদ্রকূলবর্ত্তী নিভৃত বালুকা মধ্যে উষার সময়ে মৎস্য ধরিত, তথায় বা নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে লুক্কায়িত হইয়া অবশেষে আপনা আপনি নিধন প্রাপ্ত হইত। একমাত্র জগতের চক্ষু দিবাকর ব্যতিরেকে ইহাদিগের মৃত্যুর সাক্ষী কেহ ছিল না। উলিয়ম ড্রেপার কহেন যে, স্পেনীয়গণ তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য আমেরিকা জাতিদিগের সমূলে ধ্বংশ সাধন করিয়াছেন। মুরদিগের প্রতি ইহাদিগের নিষ্ঠুরতা মনুষ্য-নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। পর্ত্তুগীজগণ এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে বাইবল পুস্তক ধারণ করিয়া লুণ্ঠন ক্রিয়ায় বহির্গত হয়েন। স্পেন ও পর্টুগালের সুখ-সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া অপর ইউরোপীয় জাতি ইহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। পূর্ব্বখণ্ডের বাণিজ্য হইতে ডচ্‌গণ পর্ত্তুগীজদিগকে ক্রমশঃ বিতাড়িত করেন। কালক্রমে সকলকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজ জাতি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ কশাহস্তে আফ্রিকা ও আমেরিকার খনিসমূহে ক্রীতদাসদিগকে নিযুক্ত করিয়া দেহপাত পরিশ্রম করাইয়া শোণিত শোষণ করিত। ভগবানের বিধি অলৌকিক শক্তি দ্বারা আমাদিগের অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। দেখা যায়, অন্যায় অত্যাচার চিরদিন প্রভুত্ব করিতে পারে না। প্রবল পাশ্চাত্যগণের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল ক্রীতদাসগণ আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ছিল। ইহাদিগের জীবন বিনিময়ে লভ্য খনিজ ধাতুর হেতু অবশেষে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ক্রীতদাসঘটিত বিষম-কলহ বিরোধের সূচনা হয়। এতৎসূত্রে নানাবিধ প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হয়। সুদূরদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইউরোপীয়গণ যখন বুঝিলেন যে, এই নব বিধিপ্রণালী অনুসারে ক্রীত দাস দ্বারা কার্য্য তাদৃশ ফলজনক নহে। ইহা বুঝিয়া অল্পে অল্পে দাসত্ব-প্রথা তিরোধান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ফলতঃ পাশ্চাত্যদিগের স্বার্থবোধ অতিশয় তীক্ষ্ণ ও প্রবল। ইহাঁদিগের রাজনীতি-সমাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সকলগুলিই বিভিন্ন প্রকার স্বার্থগুলির পরিপুষ্টি সাধন ও সামঞ্জস্য রক্ষায় বিশেষ যত্নবান। এই স্বার্থগুলি সকল সময়ে যে কুটিলতাময় ও সংকীর্ণতায় আবদ্ধ আছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্যদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বহুদর্শিতার প্রশংসা করিতে হয়। ইহারা কল্পনাকে দমন করিয়া যুক্তি দ্বারা স্বার্থ সম্বন্ধে বিচার করেন। এবং যুক্তি অপেক্ষা প্রকৃত ঘটনার প্রাধান্য স্বীকার করেন। কোন বিষয়ের প্রকৃত অনিষ্টের সূচনা হইতে দেখিলে, ইউরোপীয়গণ দৃঢ় হৃদয়ে সেই অনিষ্টের কারণটী অপসৃত করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। মানসিক দৌর্ব্বল্য বা হৃদয়দৌর্ব্বল্য দ্বারা তাঁহারা বিচলিত হয়েন না। এই প্রকৃষ্ট স্বার্থজ্ঞান ইউরোপীয়দিগের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ হইয়াছে।

আমি অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছি যে, বিভিন্ন জাতি মধ্যে ব্যবসা সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্কার ও মতবাদ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন নীতি অনুসারে ব্যবসা কার্য্য সম্পাদন করিত। প্রাচীন জাতি লুণ্ঠনপ্রিয় ছিল। পররাষ্ট্র-লুণ্ঠন তাদৃশ দোষাবহ ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশসমূহেই এই প্রকার দস্যু-নীতির সমাদর ছিল। কিংবদন্তী আছে যে, রাবণের রণপিপাসা নিবৃত্তির জন্য রক্তপাতহীন রণক্রীড়ায় অর্থাৎ সতরঞ্চ খেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলতঃ

অনেক জাতিই বাণিজ্যকে রক্তপাতহীন লুণ্ঠন ক্রিয়ায় পরিণত করেন। আশু ফলাফলের প্রতিই ব্যবসায়িগণের অধিক লক্ষ্য ছিল। পরোক্ষ ফলের দিকে তাদৃশ দৃষ্টি ছিল না। বোধ হয় এই নিমিত্ত ব্যবসা ঘটিত নানা জাতি মধ্যে অধিক লাভের প্রত্যাশায় নানাবিধ অনুদার সংকীর্ণ ভাবের প্রাবল্য হয়। এই লোভপ্রদ অনুদার নীতি প্রথমতঃ সুবিধাজনক বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইলেও পরিণামে উহা পতনের সহায় হয়। স্পেনীয়দিগের অধঃপতন ইহার একটী উদাহরণ। আমেরিকাবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া লোভী স্পেনীয়গণ স্বর্ণ-রৌপাদি ধাতু অজস্রপরিমাণে নিজদেশে আনয়ন করিত। স্পেনীয়গণ ইউরোপে প্রধান ধনশালী জাতি হইয়া উঠে, এবং নিজদেশে পরিশ্রমসাধ্য শিল্পোন্নতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া, স্বর্ণাদি ধাতু বিনিময়ে অপর দেশজাত সৌখীন দ্রব্য খরিদ করেন। কিছুকাল পরে অজস্র স্বর্ণ রৌপ্যের আমদানী সূত্রে ইউরোপে স্বর্ণ রৌপ্যের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণিত হয় ও সেই সঙ্গে তাহাদের বিনিময় মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক হইয়া যায়। সুতরাং স্পেনীয়দিগের লাভের পরিমাণও হ্রাস হয়। ইহার পরিণাম—নরপতি দ্বিতীয় ফিলিপ প্রকাশ্যভাবে দেউলিয়া হন। ভিনিস, জেনেওয়া প্রভৃতি জনপদের পতনও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এই সকল জনপদের উন্নতির কারণ ভারতের বাণিজ্য। অর্থাৎ এই সমস্ত জনপদের সমৃদ্ধি ভিন্ন দেশীয় শিল্পের উপর নির্ভর করিত। চলিত ভাষায় ইহারা "পরের ধনে পোদ্দারি করিত।" ভারতীয় বাণিজ্য সমুদ্রপথে ইউরোপে চালিত হওয়ায় এই পরধন তাহাদের হস্তচ্যুত হয় ও সেই সঙ্গে তাহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয়। দেখা যায় যে, শ্রমসাধ্য শিল্প ব্যতিরেকে অনায়াসলব্ধ সমৃদ্ধি চিরদিন স্থির থাকে না। ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রথম প্রকোপেই উহা অদৃশ্য হয়।

বাণিজ্য দুই প্রকার। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। স্বদেশজাত বস্তুর আদান প্রদান সূত্রে দেশ মধ্যে প্রচলনকে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও একদেশজাত বস্তুর আদান প্রদান সূত্রে অপর দেশে প্রচলনকে বহির্ব্বাণিজ্য কহে। অন্তর্ব্বাণিজ্য প্রধানতঃ প্রচলিত মুদ্রা বিনিময়ে সম্পাদিত হয়, আর বহির্ব্বাণিজ্য প্রধানতঃ হুণ্ডি ও দ্রব্যাদি বিনিময়ে সম্পাদিত হয়। আবার বহির্বাণিজ্য পররাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী, সমাজ ও শিল্পাদির অবস্থাসাপেক্ষ। যে সমস্ত ঘটনার সমবায়ে স্বদেশজাত বস্তুর মূল্যের তারতম্য হয়, ভিন্ন দেশজাত বস্তুর মূল্য সম্বন্ধে সেই সকল কারণের প্রভাব নাই। ইহার মধ্যে স্বদেশী শিল্পকার্য্যে ও বিদেশী শিল্প কার্য্যে মূলধন নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা এই পার্থক্যের অন্যতম কারণ। জাতি মধ্যে শিল্পজাত বস্তুর নির্ম্মাণ অধিক পরিমাণে হইলে বহির্বাণিজ্যের সূচনা হয়। দেশ মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য যত অধিক প্রকারের হইতে থাকে, ততই নির্ম্মাণ-কৌশল বৃদ্ধির সহিত সেইগুলির সুঠামের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মনোহারী দ্রব্যের সৃষ্টি হইলে, তাহাদের মধ্যে কোন না কোন বস্তু অপর জাতীয় চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, সেইগুলি সৌখিন সামগ্রী বলিয়া তথায় আদৃত ও প্রচলিত হয়। জল, বায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা কর্ত্তৃক আমাদিগের আচার-ব্যবহার-রীতি-প্রণালী প্রচলন হয়। বিভিন্ন শাসন-প্রণালী হইতে ইহার উন্নতি অবনতি নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। যদিও মনুষ্য বিভিন্ন রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন স্থানে বসবাস নিবন্ধন অথবা বিভিন্ন শাসন-প্রণালীর অধিকারভুক্ত হইয়া পৃথক

জাতিতে বিভক্ত দেখা যায়, তথাপি অনেক বিষয়ে মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের মিল আছে। এই নিমিত্তই এক জাতির উৎপন্ন দ্রব্য অপর জাতির নিকট আদরের বস্তু হয়। বিশেষতঃ প্রকৃতি সকল স্থল ও সকল মনুষ্যকে সমগুণবিশিষ্ট না করায় আমরা পরস্পরের সাহায্য প্রত্যাশা করি। এক দেশে যে বস্তু অল্প আয়াসসাধ্য, উহা অন্যত্র বহু আয়াসসাধ্য, এমন কি কোন কোন স্থলে উহা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ফলতঃ বহির্ব্বাণিজ্য দ্বারা বিবিধ আবশ্যক সৌখিন দ্রব্যের উপভোগ সভ্যজাতিমাত্রেরই সুসাধ্য হইয়াছে। বিভিন্নজাতি মধ্যে আদান প্রদান যদি না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য কি এত জ্ঞান, মধুরস্বভাব ও সুখসমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইত? পরস্পরের প্রতি কি এত মমতা সহানুভূতি জন্মাইত? মনুষ্য, চরিত্রের ঈদৃশ বিকাশ হইত না, ঘোর অচিন্তনীয় দুর্দ্দশা মানবকে গ্রাস করিত। ইহাও দেখা যায় যে, বাণিজ্য-সূত্রে ব্যবসায়িগণ মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বশতঃ হিংসাদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার অভাব নাই।

মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইলেই ব্যবসার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম দ্রব্যবিনিময়ে দ্রব্যের সংগ্রহ হয়। বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে ভূমি কর্ষণ ও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ প্রদান করিয়া মনুষ্যের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি ঘটে। এই সূত্রে আবশ্যক দ্রব্যের প্রচলন হয়। অবশেষে দ্রব্যবিনিময়-প্রথা বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। বিনিময় সৌকর্য্যার্থে এমন একটী চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রচলন আবশ্যক হয়, যাহা দ্বারা কেহ কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করেন। বিভিন্ন জাতি অবশেষে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ব্যবহার আরম্ভ করে। বেগবান্ নদীপ্রবাহ বা ভূমিস্ফোটন হইতে (erruption) পৃথিবী গর্ভস্থ ধাতুরাশির বিষয় অবগত হইয়া মনুষ্য স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে দৃঢ়তা, অমলিনতা, দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি গুণের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর মুদ্রা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত টঙ্কশালা (Mint) গভর্ণমেণ্ট ধনশালা ও সাধারণ ধনশালা (Bank) প্রভৃতির স্থাপন ও হুণ্ডির প্রচলন হয়। শাসনপ্রণালীর গুণে সম্পত্তি নিরাপদ হওয়ার জাতিমধ্যে মূলধন সংগ্রহ হয়। বিজ্ঞানসাহায্যে শিল্পের উন্নতি, গমনাগমন ও বাণিজ্যে দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সুবিধা হওয়ায় খরতর বেগে পৃথিবীময় ইহার বিস্তার হয়। অধুনা সমস্ত দেশ বাণিজ্য সম্বন্ধে মুক্তদ্বার হইলেও শাসনকর্ত্তৃগণ ভিন্নদেশীয় বণিকগণকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দেন না। পণ্ডিতগণ কহেন যে, ইহাতে ব্যবসায়ের স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত পক্ষে হস্তক্ষেপ করা হয় না। স্বদেশীয় শিল্পের সাহায্যের জন্য এবং বিদেশীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্য ব্যপদেশে যাহাতে দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে না পারেন এই উদ্দেশে, বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন ও উহা পরিদর্শন করেন। কোন কোন প্রদেশে এই শুল্কগ্রহণের ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করা হইত। এই সমস্ত জোতদারগণ অত্যাচার ও অযথা শুল্ক গ্রহণ করিয়া ব্যবসার অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ নিজহস্তে ব্যবসার কার্য্য গ্রহণ করিলে রাজ্যের অনিষ্ট সাধন হয়। জোনারাস কহেন, সম্রাট্ থিয়োফাইলাস্ নিজ রাজ্য মধ্যে সম্রাজ্ঞীর ব্যবসা করা অনুচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সেইজন্য স্বীয় রাজ্ঞীর জলযানপূর্ণ পণ্যদ্রব্য রোমে আনীত হইলে, অগ্নিদ্বারা

জলযান সমেত পণ্যদ্রব্যগুলি দগ্ধ করিতে অনুমতি দেন। পর্ত্তুগীস্ ও স্পেনীয়দিগের ক্ষমতাশালী কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজ হস্তে ব্যবসায় কার্য্য গ্রহণ করিলে তাহাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন প্রতাপশালী সাম্রাজ্য অবনতিমুখে নিপতিত হইয়া যায়।

কোন বিশেষ অনিবার্য্য ঘটনা ব্যতিরেকে এক জাতির আর একটী জাতির সহিত ব্যবসা রহিত করা অবিধেয়। অথবা বিক্রেয় দ্রব্যসমূহ একনির্দ্দিষ্ট মূল্যে কেবল মাত্র এক জাতির সহিত ক্রয় বিক্রয় করা সুবিধাজনক নহে। ফলতঃ নানা ঘটনার দ্বারা বিক্রেয় দ্রব্যগুলির মূল্য এমন কি প্রতি দিবস হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। এই কারণ গুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বস্তুগুলির এক মূল্য নির্দ্ধারণ করা দূষণীয়। ব্যবসা কার্য্য এক অখণ্ডনীয় স্থির সিদ্ধান্ত বা অক্ষুণ্ণ নীতিপ্রণালী দ্বারা পরিচালিত হয় না।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ। নির্ধন হইতে নরপতি অবধি, কে না ধন-লোভে লোভী? চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কোন সময়ে একদা ফরাসী নরপতি রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে তাঁহার বুঞ্জেস প্রদেশে শুভাগমন করেন। তৎকালে এই প্রদেশ ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। রাজ্ঞীর সংবর্দ্ধনাহেতু বুঞ্জেসের বিশিষ্ট ছয় শত অধিবাসীর পত্নী নানা বেশভূষা ধারণ করিয়া রাজমহিষীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। রাজ্ঞী ইঁহাদিগের বহুবিধ মূল্যবান্ বিচিত্র পরিচ্ছদ অবলোকন করিয়া ও আপন হীন রাজবেশের অবস্থা চিন্তা করিয়া ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন (Lecky's Rationalism)। আর একটী ঘটনার এস্থলে উল্লেখ করিলাম। চতুর্দ্দশ লুইস ইটালি জয় করিয়া টিউরিণ অধিকার লালসায় সসৈন্যে তথায় গমন করেন। ইতোমধ্যে রাজকুমার ইউজিনি এই দেশগুলি উদ্ধার করিবার জন্য জর্ম্মন প্রদেশ হইতে সসৈন্যে তথায় যাত্রা করেন। রাজপুত্র ইউজিনির এই যুদ্ধযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাভাব হয়। ইংরাজ সওদাগরদিগের নিকট হইতে তিনি ৫০ লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ চাহেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে ইংরাজেরা তাঁহাকে এই টাকা কর্জ্জ দান করেন। এই অর্থানুকূল্যে সাহসী বীর ইউজিনি শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া ঐ সকল রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন। উদারহৃদয় রাজপুত্র কৃতজ্ঞতাসহকারে ইংরাজ বণিক্‌দিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া পাঠান;—আমি অর্থ পাইয়াছি এবং ইহা গৌরব সহকারে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে উহা আপনাদিগের প্রীতিকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি। (I have received your money, and I flatter myself that I have laid it out to your satisfaction).

সুধিগণ ব্যবসায়ের কাল তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—১ম, পুরাকাল হইতে ৪৭৬ খৃঃ অর্থাৎ রোমের পতনের সময় অবধি, ২য়, ৪৭৬ খৃঃ হইতে আমেরিকা আবিষ্কারের কাল অবধি, ৩য়, বর্ত্তমান সময় জলপথে ভারতে আসিবার পথ সুগম সাধন অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা কহিয়া থাকেন ব্যবসা-বাণিজ্য নিবন্ধন বর্ত্তমান কালে যুদ্ধ বিগ্রহ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য স্বীকার করি যে, বর্ত্তমান কালে জাতি মধ্যে যুদ্ধের কারণ ভিন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের যুদ্ধের তালিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এস্থলে আমি কতিপয় যুদ্ধের উল্লেখ করিলাম। ১ম, আমেরিকার আত্ম কলহ-সংক্রান্ত যুদ্ধ (American Civil war) ২য়, ফরাসী ও ইটালি একত্র হইয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ। ৩য়, প্রুসীয়া ও অষ্ট্রীয়া একত্র

হইয়া ডেন্মার্কের সহিত যুদ্ধ। ৪র্থ, প্রুসিয়া ও ইটালি একত্র হইয়া অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ। ৫ম, ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রাঙ্কো জর্ম্মান যুদ্ধ। ৬ষ্ঠ, চীনদিগের সহিত পাশ্চাত্যজাতিগণের ও আমেরিকানদিগের যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। অধুনা ব্যবসা সৌকর্য্যার্থে প্রবল দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিয়া ইহার সূচনা করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে সুসভ্য ইউরোপীয়গণ আফ্রিকা মহাপ্রদেশ যেভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, জনৈক সুধী তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—Few more curious spectacles have been exhibited in the present century than that of the Chief civilised nations of Europe dividing among themselves the African Continent without even a shadow or pretext of right. (Lecky's Democracy and Liberty).

অধুনা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভীতি উৎপাদন করিয়া শান্তি সংরক্ষণ হেতু নিয়মিত সৈন্য রক্ষার জন্য কি অজস্র অর্থশ্রাদ্ধ হইতেছে? কে বলিতে পারে ইহা পরিণামে অশেষ দুঃখের কারণ হইবে না? কবডেন ক্লাবের পুস্তিকায় উল্লেখ আছে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সৈন্য-সংরক্ষণ-হেতু ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হইত। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে গ্রেট বৃটনের কমন্স মহাসভায় জনৈক সভ্য ইহা উল্লেখ করেন যে, এই বাবতে একশত পঁচানব্বই কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া ও ইটালি যুদ্ধক্ষেত্রে বাট লক্ষ সৈন্য অনায়াসে আনয়ন করিতে সক্ষম ছিল। দিন দিন ক্রমশঃ এই ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস হইতেছে না। সৈন্যরক্ষা বাবতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইতে হয়। অধুনা করভারে অধিবাসিগণ জর্জ্জরিত।

সমাজবিপ্লবকারী ও শ্রমজীবীদিগের (Socialist and Labour-party) বিষয়ে কতিপয় কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহাদিগের মতবাদ বুঝিবার জন্য, ধন, দ্রব্যের মূল্য প্রভৃতির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। শ্রমসাধ্য আবশ্যক পার্থিব বস্তু—যাহার বিনিময়ে অপর দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে ধন বলা যায়। দ্রব্যের মূল্য দুই প্রকার, একটী প্রকৃত স্বাভাবিক মূল্য, আর একটী বাজার দর বা বিনিময় মূল্য। পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে কারিকরকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সেই শ্রমের পারিশ্রমিক প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ সমশ্রমসাধ্য বস্তুর মূল্য সমান। বিনিময়-মূল্য বা বাজার দর জিনিষের পরিমাণ ও ক্রেতার আগ্রহের তারতম্য-অনুসারে অধিক বা অল্প হয়। ফলতঃ এই তারতম্য অনুসারে শিল্পিগণ দ্রব্য প্রস্তুতে মনোযোগী হন বা অবহেলা করেন। বিনিময় মূল্য প্রকৃত মূল্যের সমান হইতে থাকে। শ্রমজীবিগণ যাহাতে অনায়াসে (বিনা কষ্টে ও বিনা বিলাসিতায়) জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ও সমসংখ্যক সন্তানের লালনপালনে সক্ষম হয়, এই পরিমাণ পারিশ্রমিকই তাহাদের ন্যায্য বা স্বাভাবিক। কিন্তু এই পারিশ্রমিক ও তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার লোকের আগ্রহ ও তাহাদের সংখ্যার তারতম্য-অনুসারে বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। এইরূপে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলেও এই পারিশ্রমিক অধিক কাল স্বাভাবিক হইতে পৃথক্ থাকে না। কারণ পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সহিত বিলাসিতার বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের অভাব বিস্তৃত হয়। এবং তাহাদের সংখ্যা ও বিবাহাদিসূত্রে বৃদ্ধি হয়, আর তাহাদের পারিশ্রমিক কম হইলে অভাবহেতু তাহাদের সংখ্যা কম হইয়া পড়ে। দেশের মধ্যে যে ধন অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্র, উপকরণ সামগ্রী কলকারখানা প্রভৃতি যাহা শিল্পো-

ন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মূলধন বলে। কলকারখানা দ্বারা প্রকৃতির শক্তি মনুষ্যের কার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায় শ্রমের পরিমাণ হ্রাস হয় ও সেইজন্য শিল্পজাত দ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্যের হ্রাস হয়। শ্রমজাত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হয়, তাহা হইতে শিল্পের উপকরণসামগ্রী ও শিল্পজীবিগণের পারিশ্রমিকের যে মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা আদায় হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই ধনী কারবারীর লভ্যাংশ। এই লভ্যাংশ বিনিময় মূল্য হইতে উদ্বৃত্ত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা বিনিময় মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, লভ্যাংশও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। আবার এই বিনিময় মূল্য হইতে পণ্য দ্রব্য প্রস্তুতকালীন ব্যয়িত মূলধন আদায় বাদে উদ্বৃত্ত অংশ লাভের বলিয়া এই মূলধনের অর্থাৎ প্রধানতঃ শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের পরিমাণ হ্রাস হইলে লভ্যাংশ বৃদ্ধি হয় এবং তদ্বিপরীতে কম হয়। কলের দ্বারা শ্রমজীবীদিগের কার্য্য কম হওয়ায় জীবিকার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তাহাতে ধনীদিগের সুবিধা হয়। অন্য পক্ষে ধনীদিগের মূলধন বৃদ্ধি হওয়ায় নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইয়া শ্রমজীবীর আবশ্যক বৃদ্ধি হয়। এই দুই বিপরীত অবস্থার তারতম্যে শিল্পজীবিগণের অবস্থার তারতম্য হয়। ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের মূলধন বৃদ্ধির সহিত তাহাদের নব নব শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় শিল্পজীবিগণের অবস্থাও ভাল হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য স্থানে সেরূপ না হওয়ায় শ্রমজীবীদিগের সাহায্যের জন্য সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতির দলের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের সমাজ বিপ্লবকারী শ্রমজীবীদিগের প্রভাব ও আধিপত্য ইউরোপখণ্ডে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ফলতঃ ইহাদিগের মতবাদে নূতন নীতি-কথা প্রদান হয় নাই। যথা প্রত্যেক মানবই পার্থিব বস্তুতে ভোগাধিকারী। "ঋণ দান বা কুসীদ গ্রহণ দূষণীয়" ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রাচীন পুস্তকেও উল্লেখ আছে। প্রাচীন হিন্দু হিব্রু বা ইহুদি এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যাজকগণের বচনাবলীতে পাওয়া যায় যে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, উলঙ্গকে বস্ত্রদান না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহার মুখ দর্শন অকর্ত্তব্য, সে ব্যক্তি পাপাত্মা ইত্যাদি" জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে পরিমাণ অর্থ আবশ্যক তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দীন দরিদ্রকে প্রদান করিতে প্রত্যেকেই বাধ্য। "মৃত্যু হইলে ধন সম্পত্তি সঙ্গে যায় না।" ইত্যাদি বচনগুলি বর্ত্তমান সমাজ-বিপ্লবকারিগণ প্রথম প্রচার করেন নাই। তাঁহারা অনুগ্রহের উপর ধনবিভাগ নির্ভর না করিয়া পরিবর্ত্তিত সমাজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে চাহেন। মাবাক্স নামক এই দলের জনৈক প্রচারক বলেন, প্রাচীন ক্রীতদাসদিগের জীবন অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের শ্রমজীবিগণের অদৃষ্ট অধিকতর ক্লেশ কর। বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া বিবিধ প্রকার কল কারখানা স্থাপন হইয়া গরীব শ্রমজীবীদিগের দুঃখের উপশম হয় নাই। যে কোন শ্রমজীবী প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে তাহার উপজীবিকা আহরণ সম্ভবপর হয়। এই কল কারখানায় তাহাদিগকে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। এই অতিরিক্ত পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের ফল শ্রমজীবীরা না পাইয়া কল কারখানার সত্বাধিকারিগণ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রমজীবিগণ দশ ঘণ্টা দেহপাত পরিশ্রম করিয়া পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের ফল সেই উদরান্ন সংস্থান ব্যতিরেকে আর কিছুই পায় না। ফলতঃ ইহাদিগের সিদ্ধান্তে কল কারখানার সত্বাধিকারীদিগের উপসত্ব বা মূলধনের যে সৃষ্টি হইতেছে, উহা শ্রমজীবীদিগকে বঞ্চ

পূর্ব্বক অন্যায় পরিশ্রম করাইবার ফলে ঘটিতেছে। ম্যারাক্স কহেন যে, শ্রমজীবীদিগকে চিরকালই ধনী ব্যবসায়িগণ লুণ্ঠন করিয়া আসিতেছেন। "বেতন" বা "মজুরী" নামে শ্রমজীবীদিগকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের পারিশ্রমিকের অতি অল্পাংশমাত্র দেওয়া হয়। রুষিয়ার নিহিলিষ্টসম্প্রদায়ের নেতা সমাজবিপ্লবকারী বকুনিন এই উপলক্ষে বলেন, ব্যক্তিগত মূলধন লুণ্ঠন করিয়া শ্রমজীবীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। ল্যাসেল (Lasselle) বলেন, শ্রমজীবীদিগের শ্রমফল যেন তাহাদের ধ্বংশ সাধন উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়। The Produce of his lobour strangles the labourer কল কারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধন হওয়ায় শ্রমজীবীদিগের দুঃখ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শিল্পের বৃদ্ধির সহিত লাভের অংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং লাভের অংশ বৃদ্ধি শ্রমজীবীদিগের উপস্বত্ব লুণ্ঠন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূলধন এইরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রমজীবিগণ ধনী ব্যবসায়ীর অধিকতর করতলগত হইতেছে, এবং এই দাসত্ব আইন মধ্যে মধ্যে যে সংশোধন করা হইতেছে, তাহা দ্বারা শ্রমজীবীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। ক্ষুধার তাড়না তাহাদিগের কম কষ্টদায়ক নিষ্পেষণ নহে। শিল্পোন্নতিতে পৃথিবীর ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু ভিত্তি হইতে সমাজ গঠন সংস্কৃত না হইলে শ্রমজীবিগণের অবস্থা উত্তরোত্তর দুঃখজনক হইবে।

Machinery, bringing the "great industry" in its train, had vastly aggravàted the evil. It has introduced an era of great profits; and great profits mean increased spoliation of the producer. It has placed the maker more and more in the hands of the capitalists establishing a slavery, which is not the less grinding, because it is maintained, not by law, but by hunger. The wealth of the world may increase but unless society is radically revolutionised, the part of the labourers must become continually less.

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কতিপয় সমস্যার উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। সকলগুলির অবতারণা হয় নাই এবং সকলগুলির অবতারণা এক প্রবন্ধে হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। ইহার সহিত মনুষ্যের অবস্থা স্থির হইতেছে। আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ উদ্দেশে ইহা পঠিত হইল।*

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ।

---

* সাহিত্যসভায় সপ্তম বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

গন্ধদ্রব্যের আদর।

কোকিলের কাকলী, ভ্রমরের গুঞ্জন, ঝঙ্কার এবং সুকণ্ঠের স্বর-লহরী যেমন কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরিমল-গর্ভ বিকসিত কুসুমদামের মন-প্রাণ-বিভোরকারী গন্ধামোদে মানব-চিত্ত স্বতঃই প্রফুল্ল এবং বিমুগ্ধ হইয়া উঠে। গন্ধদ্রব্যের সহিত মানব-হৃদয়ের এই যে সম্বন্ধ, ইহা অতি পবিত্র, অতি সুখদ এবং অতি প্রলোভনীয়। মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য জীব-দিগের মধ্যেও গন্ধামোদ উপভোগের বাসনা বলবতী দেখিতে পাওয়া যায়। পরিমল গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অলিকুল ব্যাকুলভাবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধুসংগ্রহ করিয়া থাকে। নব বসন্তের সমাগমে যখন আম্র-মুকুল দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া, স্বীয় সুরভি বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন সে সৌরভে কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়? ফলতঃ গন্ধ-দ্রব্যের উপভোগজনিত যে বিমল আনন্দ আমরা সম্ভোগ করিয়া থাকি, তাহা ভগবানের শান্তি-প্রদ দান।

অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নানা দেশে, নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্য বিভিন্নাকারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা কোন্ সময়ে, কোন্ দেশের অধিবাসীরা প্রথমে কিরূপ আকারে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। ইয়ুরোপীয় প্রচীন গ্রন্থকারদিগের মতে এই সুখ-বর্দ্ধক-দ্রব্য-সমূহ প্রথমতঃ ইনাম নামক দেশ হইতে ইয়ুরোপ খণ্ডে আনীত হইয়াছিল। ইনাম দেশের বর্ত্তমান্ নাম পারস্য দেশ। অতি পূর্ব্বকালে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ মিসর দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। ইহাদিগের ধর্ম্মব্যবস্থাপক মুসার প্রণীত "আদিপুস্তক" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যাকুব নামক এক ব্যক্তির দ্বাদশটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে যোসেফ নামা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটিকে সে অত্যন্ত স্নেহ করিত। এজন্য তাহার অন্যান্য ভ্রতারা অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ হইয়া, যোসেফকে ইস্মাইল দেশীয় বণিক্-দিগের নিকট বিক্রয় করে। তৎকালে ঐ বণিকেরা নানা-প্রকার মসলা, গন্ধ-দ্রব্য এবং বহুমূল্য ঔষধাদি লইয়া, মিসর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল। যোসেফ তাহাদের সহিত গমন করিয়া, বহুকাল মিসর দেশে বাস করে; অনন্তর তাহার পিতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য পরিবারেরা তথায় আসিয়া অবস্থিতি করে। এই স্থানে তাহারা যে, বহুল পরিমাণে গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহার করিতে অভ্যাস করি-য়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব মিশর দেশে বাস করিয়া, ইস্রায়েল বংশীয়েরা যে, গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার শিখিয়া-ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কালসহকারে তাহাদের বংশধরগণ পারস্য প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে পৃথিবীর নানা দেশে গন্ধ-দ্রব্য প্রচারিত এবং ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মৃগনাভি প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় গন্ধ-দ্রব্য জীবদেহ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা-দিগকে জৈব-গন্ধ-দ্রব্য কহে। যে সকল গন্ধ-দ্রব্য খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা-দিগকে খনিজ গন্ধ-দ্রব্য বলা যায়। মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার গন্ধ-দ্রব্য প্রক্রিয়াবিশেষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল গন্ধ-দ্রব্য তরু, লতা, পুষ্প এবং তৃণ প্রভৃতি হইতে উৎ-

পত্র হয়, তৎসমুদয় উদ্ভিজ্জ গন্ধ-দ্রব্য। কোন কোন বৃক্ষের কাষ্ঠই অতি উপাদেয় গন্ধ-দ্রব্য,—যেমন অগুরু, চন্দন। কোন কোন উদ্ভিদের পত্র হইতে গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপ উদ্ভিদ্‌গণের ত্বক্‌, নির্য্যাস এবং মূল প্রভৃতি হইতে বিবিধ গন্ধ-দ্রব্য-প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। কিন্তু গন্ধ-দ্রব্য সমূহের মধ্যে পুষ্পই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রূপ-রস-গন্ধের আধার একমাত্র পুষ্পই নয়ন ও নাসার যুগপৎ আনন্দ জন্মাইবার প্রধান সাধন। জাতি, যূথি, বেল, মল্লিকা, মালতী ও গোলাপ প্রভৃতি অতি মনোহর পুষ্প সমূহের ন্যায় পরিমল-বিশিষ্ট পদার্থ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। রসায়ন-বিদ্যা-পারদর্শী পণ্ডিতেরা উক্ত সর্ব্ববিধ পদার্থ হইতে নানা-প্রকারে বিবিধ সুগন্ধ তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

যুগভেদে এবং রুচিভেদে মানব-সমাজে বিভিন্নাকার গন্ধ-দ্রব্যের সমাদর হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে প্রচীন কালে পুষ্প, চন্দন, অগুরু-প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্য-সমূহ অত্যন্ত আদরের সহিত ব্যবহৃত হইত। এজন্য প্রচীন সূপ-শাস্ত্রে রাজন্যবর্গের পরিবেষিকা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে :—

স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী কর্পূর-
সৌরভমুখী নয়নাভিরামা।
বিম্বাধরা শিরসিবদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা মন্দস্মিনা
ক্ষিতিভুতাংপরিবেষিকাস্যাৎ।"

স্নান করি সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি।
সুচারু নূতন ধূপগন্ধে অঙ্গ ভরি॥
কর্পূর সৌরভ মুখে অনঙ্গ বিভোল।
বলে ছলে মৃদুমদে নয়ন-হিল্লোল॥
ওষ্ঠ দুটি পরিপাটি বিম্বফল জিনি।
সুকোমল মুখে মৃদু মধুরহাসিনী॥
সুগন্ধ-পুষ্পের গুচ্ছে কবরী বন্ধন।
নৃপ পরিবেষিকার এমত লক্ষণ॥"

ফলতঃ রত্ন-সিংহাসনারূঢ় নরপতি হইতে সামান্য পরিচারিকা পর্য্যন্ত সকলকেই কোন না কোন প্রকার গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখা যাইত। বিশেষতঃ মহিলাগণের নিকট উহা অত্যন্ত আদরণীয়। অতি নির্ম্মল অথচ উপকারী এবং সুখদ, এরূপ দ্রব্যের যে সমাজ মধ্যে সমাদর বৃদ্ধি হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মনুষ্যসমাজ যে পরিমাণে সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিলাস-সাধনোপযোগী দ্রব্যাদিরও আবিষ্কার এবং ব্যবহার অধিক হইতে দেখা যায়। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে বহুবিধ গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। জাতি বিশেষে আবার গন্ধ-দ্রব্যের আদর পৃথক্ পৃথক্ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; এদেশে চন্দনাদির যেরূপ ব্যবহার, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না। বাগ্‌দেবীর বরপুত্র কবিগণ নির্গন্ধ কুসুমের সহিত গুণহীন নরের তুলনা করিয়া, গন্ধের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া-গিয়াছেন।

ইতিহাসে দেখা যায়,—"হুমায়ুনের অমরকোটে অবস্থান কালে, তদীয় সহধর্ম্মিণী হামিদা বানু ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র আক্‌বর নামে খ্যাত। আক্‌বরের জন্মকালে হুমায়ুনের এরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছিল যে, তাদৃশ শুভ সময়েও অনুচরবর্গকে সামান্য একটি মৃগনাভি ব্যতীত অন্য কোনও উপহার প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। হুমায়ুন এই বলিয়া মৃগনাভিটী বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমার পুত্রের যশঃসৌরভ যেন এই সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভের ন্যায় সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়।"

গন্ধ-দ্রব্য খাদ্যাদির উপরও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। কি পানীয়, কি তাম্বুল, কি অন্যবিধ খাদ্য,

নানাপ্রকার গন্ধ দ্বারা সুবাসিত করা হইয়া থাকে। ফলতঃ খাদ্যদ্রব্যাদি গন্ধামোদিত করিবার প্রথাও প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। গন্ধ-দ্রব্য বিলাস-সাধনের একটী প্রধান উপকরণ। এজন্য প্রেমিক ও প্রেমিকাদিগের নিকট উহা অতি প্রিয় বস্তু। অন্তঃকরণ বিমর্ষ থাকিলেও কোন প্রকার সুরভি নাসিকাপথে প্রবিষ্ট হইলে, প্রাণে কেমন এক প্রকার পুলকের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে! সদ্গন্ধ মনের উত্তেজক; এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল। ব্যাধি-ক্লিষ্ট রুগ্ন ব্যক্তির শয্যা, পরিচ্ছদ কিংবা দেহে সুগন্ধ সংযোগ করিলে, রোগীর এক প্রকার প্রফুল্লতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য রোগ এবং পথ্য বিশেষে সুগন্ধের আদর দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লিখিত আছে, গন্ধ দ্রব্য শরীরে লেপন করিলে, বীর্য্য, বল, বর্ণ, সৌভাগ্য ও প্রীতির বৃদ্ধি হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্রম, বায়ু, তন্দ্রা ও গাত্রদৌর্ব্বল্য নিবারিত হয়।

আমাদের দেশে ধূপধূনার সুগন্ধে বায়ুর বিশোধনক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য অনেক স্থলে, সদ্গন্ধ দ্বারা ঔষধের কার্য্য সাধিত হয়। শরীরের ক্লেদ অথবা অন্য কোন প্রকার গুকার-জনক পদার্থ-সমূহের দুর্গন্ধ বিনাশ করিবার পক্ষে, সুগন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। এজন্য প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে কোন না কোন গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুজাতির মধ্যে চন্দন ও কুঙ্কুমাদির সমধিক ব্যবহার ছিল। মুসলমানরাজত্বকালে আতর এবং গোলাপ জলের প্রচলন হওয়াতে কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় জাতিই ঐ সকল গন্ধ-দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন মিসর, গ্রীস এবং রোমরাজ্যে গন্ধ-দ্রব্যের অত্যন্ত আদর ছিল। রোমের বিলাসিতা দর্শনে সুবিখ্যাত সুধীবর প্লীনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—"আহা, সুবাসবিশিষ্ট বস্তুর সৌরভে এদেশের লোকেরা কি বিমোহিত হইয়াছে! শিবিরস্থিত সৈন্যেরাও ইহার জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়; কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, তাহারা অস্ত্র-শস্ত্রেও গন্ধ-দ্রব্য লেপন করিয়া, আপনাদিগের শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকে।"

আমরা জীবিতকালেই যে কেবলমাত্র গন্ধ-দ্রব্যের প্রতি আদর করিয়া থাকি তাহা নহে। মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থেও উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে প্রায় সকল জাতিই কোন না কোন প্রকার গন্ধ-দ্রব্য মৃত শরীরে লেপন করিয়া থাকে এবং কোন কোন জাতি গন্ধ-দ্রব্য জ্বালাইয়া শব দাহ করে। উপাসনাকালে গন্ধ-দ্রব্য ব্যবহার করে না, এমত জাতি পৃথিবীতে অতি বিরল দেখা যায়। খ্রীষ্টীয়সম্প্রদায় মধ্যে রোমান কাথলিকেরা অদ্যাপি ধূনচিতে গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া উপাসনামন্দির আমোদিত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে লোকে উপঢৌকন দানকালে, মণিমাণিক্য এবং স্বর্ণ রজতাদি বহুমূল্য দ্রব্য-সম্ভারের সহিত যে গন্ধ-দ্রব্য প্রেরণ করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। মহাভারত মধ্যে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনারোহণ করিলে, নানাস্থান হইতে ভারে ভারে গন্ধ-দ্রব্য-সমূহ উপহারস্বরূপ তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কংসবিনাশ সাধনে বাসুদেব মথুরাতে উপস্থিত হইলে, কুব্জা নাম্নী পরিচারিকা তাঁহাকে অগুরু চন্দন প্রদান করিয়াছিল।

গন্ধ-দ্রব্য দেবতাদিগের পূজার একটী প্রধান উপকরণ। স্বর্ণ-মণিমাণিক্যাদিতে

দেবতা যে সন্তুষ্ট হন, এরূপ প্রমাণ অতি বিরল; কিন্তু সৌরভপূর্ণ পুষ্প এবং ধূপদীপাদিতে যে পরিতুষ্ট হন, ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। বাস্তবিকই দেবার্চ্চনার সময় সুরভি-পরিপূর্ণ চন্দনচর্চ্চিত কুসুম-সমূহ এবং ধূপাদির সদ্গন্ধে চিত্তে এক প্রকার অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; সাত্ত্বিক ভাব দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা সাধিত হয়। এই জন্যই হিন্দুর নিকট দেবপূজায় পুষ্পের এত আদর। নির্গন্ধ পুষ্প দেবপূজায় প্রায় ব্যবহৃত হয় না। বাহ্য বস্তুনিচয়ের সহিত মানব-চিত্তের অতি নিকট সম্বন্ধ। যে সকল দ্রব্যের ব্যবহারে মনের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে বাসনা-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই সকল দ্রব্য অভীষ্ট দেবের আরাধনায় মনের একাগ্রতা জন্মাইতে পারে না। মনের একাগ্রতা বা চিত্তবৃত্তির নিরোধই ধ্যান ধারণার প্রকৃত সময়। এই জন্যই যাহাতে মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ দ্রব্যই ভগবানের পূজার প্রধান উপকরণ। তাই ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্ত হৃদয়ে সুর মিলাইয়া গাহিলেন;—

"তোমার আরতি করে নিখিল ভুবন;
নিরখি জুড়াই নাথ, যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন দীপ জ্বলে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন হৃদয়-রঞ্জন॥
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন।
ধূপ মলয়-পবন, নিরন্তর সমীরণ
করে চামর-ব্যজন, হে বিশ্বকারণ।
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী মনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন॥"

পুষ্পের যে এত আদর, কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যই কি তাহার কারণ? লোকে ত নির্গন্ধ পুষ্পের প্রতি তত শ্রদ্ধা প্রকাশ করে না। এই গন্ধের জন্যই ত পুষ্প ভগবানের চরণতলে আশ্রয় পাইয়া থাকে! আমাদের খাদ্যদ্রব্যসমূহ যেমন সাত্ত্বিক, তামসিক এবং রাজসিক গুণত্রয়াত্মক, সেইরূপ গন্ধদ্রব্যসমূহও উক্ত ত্রিবিধ গুণসংযুক্ত। ইয়ুরোপীয় যে সকল গন্ধদ্রব্য এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় প্রায়ই স্পিরিটসংযোগে প্রস্তুত হইতে দেখা যায়; এজন্য ঐ সকলের ব্যবহারে অন্তঃকরণে তামসিকাদি ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সকলের দ্বারা চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয় না। পরন্তু ধূপ গুগ্‌গুল এবং পুষ্প চন্দনাদির গন্ধে হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের পূত স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এজন্য হিন্দু সচন্দন গন্ধ পুষ্প দ্বারা ইষ্টদেবতার চরণ পূজা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

আমাদের বাড়ি।

সুখ, শান্তি, প্রেমপূর্ণ নহে যক্ষপুরী—
অলকা সুন্দর;
পড়েনাক সূর্য—মেঘ চুমা বেতসের
তরঙ্গ উপর।

আছে হংসকুল, চরিতে জানেনা তারা—
মণিময় ঘাটে;
কুমুদ কহ্লার মাঝে ফুটে সরোজিনী
খালে বিলে মাঠে।

ফুটেনা অশোকগুচ্ছ রমণীর কম
বাম পদাঘাতে ;
মুখ প্রক্ষালিত মদিরায়,—হাসে নাক
মহুয়া প্রভাতে।
ম্যালেরিয়া প্রসবিনী মধ্য বঙ্গভূমে,—
যশোর জেলায়—
গ্রামখানি শুয়ে আছে যেন, বনলতা
তরু আগাছায়।
দক্ষিণে খেলেনা বায়ু, পূর্ব্বে রবিকর—
বাঁশবনে ঢাকা ;
ধন, ধান্য, স্বাস্থ্যহীন আছে কৃষকের—
সকরুণ ডাকা।
পশ্চিমে অশ্বথ আড়ে, না জানায়ে কারো—
সূর্য্য বসে পাটে ;
গোধূলি গেরুয়া রঙে ঢলে পড়ে সেই
পুকুরের ঘাটে।
এখনো কলসী কাঁকে সারি দিয়া পথে—
বধূ ঘাটে যায়,
মুখে হাসি নাই, দীর্ঘশ্বাসে ঘরে ফেরে—
শ্যামল সন্ধ্যায়।
অঙ্গনা পরে না আর কমনীয় ভালে—
গুলপোকা টিপ ;
শব্দহীন, দীপ্তহীন, সান্ধ্য-শুভশঙ্খ,—
সন্ধ্যার প্রদীপ।
আজো সেই ভাঙ্গা নায়ে পাটনি একেলা—
ঘাটে দেয় পাড়ি ;
এই ইছামতী তীর, ঐ চন্দনপুরে—
আমাদের বাড়ি।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আত্মারহস্য।

আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে যতটুকু সাধনা ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা সাধারণতঃ সকলের সমান নহে। অধিকারিভেদে তাহার তারতম্য মনুষ্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিসঞ্চার হেতু উত্তম অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা ইহজীবনে সুদুর্ল্লভ গুরূপদেশ লাভ করিলেই সম্যক্ রূপে আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন; পক্ষান্তরে প্রকৃত সদ্গুরু লাভ এ জীবনে যাঁহাদের ভাগ্যে আদৌ ঘটিয়া উঠিবার নহে, সেই মধ্যম ও মন্দ অধিকারিগণের মঙ্গলার্থ বিশিষ্টরূপ উপদেশান্তরের আবশ্যক, শাস্ত্রের অনুশাসন প্রতিপালনই সে পক্ষে তাঁহাদের প্রধান সহায়। এক্ষণে কিরূপ প্রকৃতির কারী, শাস্ত্র সে সম্বন্ধে কি বলিতেছেন—অবহিতভাবে অতঃপর তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

কি প্রকারের লোক তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ্য ?

মুমুক্ষবে শ্রদ্ধধানায় যতয়ে বীতরাগায়।

অর্থাৎ—মুমুক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও বৈরাগ্যসম্পন্ন জনগণই তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ লাভের প্রকৃত অধিকারী। মুক্তির ইচ্ছা ব্যতিরেকে মুক্তি বিষয়ে অধিকার লাভ ঘটিতেই পারে না। আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিই মুক্তিপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। আত্মবিৎ মহানুভব জনগণই জ্বালামালাসঙ্কুল সংসারের শোকরূপ মহা

সম্যক্‌রূপ সামর্থ্য ধারণ করিয়া থাকেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞের পক্ষে চরমে পরমপদ প্রাপ্তি অনায়াসসাধ্য।

মোক্ষ কি ?

জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারের মায়া মোহ জনিত দুঃখের বিষম যন্ত্রণা হইতে সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিয়া পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের আদি মূল সেই চিদ্‌ঘনরূপী যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপে জীবের যে চরম অবস্থান, তাহারই নাম নির্ব্বাণ বা মোক্ষ। এই মোক্ষ-লাভের উৎকট লালসা, অবিচ্ছেদভাবে হৃদয়ে যিনি পোষণ করিয়া থাকেন, তিনিই মুমুক্ষু-পদবাচ্য। মোক্ষলাভ জ্ঞান ও উপদেশ-সাপেক্ষ, গুরু ও আচার্য্যগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন না হইলে, উক্ত জ্ঞান ও উপদেশপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত, বিশ্বাসও মোক্ষপথের মুখ্য সোপান।

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে ?

গুরু এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রবাক্যে অটল বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। কি ঐহিক, কি পারত্রিক, কোন প্রকার বিষয় ভোগেই বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই—ভোগেচ্ছাপরিশূন্য এইরূপ মহাত্মাকেই প্রকৃত বৈরাগ্যসম্পন্ন বলা যায়।

ধর্ম্মের প্রকার।

অভ্যুদয় ও নির্ব্বাণভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদনরূপ যে ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা আমরা এই সংসারে নানাবিধ অভ্যুদয় লাভ করিতে সমর্থ হই, পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞান লাভরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নির্ব্বাণকাম ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞানধর্ম্মের

সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীকেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করা বিহিত; আর সেই অবস্থাতেই মানবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ও তদ্বি-ষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে ঐকা-ন্তিকী মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, অবস্থান্তরে নহে।

সাধনচতুষ্টয় কি ?

১। শম=মনের নিগ্রহ।
২। দম=বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযমন।
৩। তিতিক্ষা=শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।
৪। উপরতি=কর্ম্মমাত্রে অনাসক্তি।

২। উৎকৃষ্ট পদার্থ কি ?

আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ।

অর্থাৎ—আত্মজ্ঞান লাভ অপেক্ষা উৎ-কৃষ্টতর লাভ এ সংসারে আর কিছুই নাই। আত্মজ্ঞানলাভই দুর্ল্লভ মানবজন্মের যে এক মাত্র চরম উদ্দেশ্য এবং তাঁহাই যে আমা-দের জীবনের মুখ্য প্রয়োজন—মনীষাসম্পন্ন ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ পরম পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যে প্রয়ো-জন আমাদের পার্থিব জীবনে যে পরিমাণে ইষ্টদায়ক, সেই প্রয়োজনেই আমাদের তত আসক্তি, তত অভিরুচি, ও তত উৎকট আকাঙ্ক্ষার বিদ্যমানতা। স্বর্গাদি অভ্যুদয়রূপ যে সকাম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধি ইহ-লৌকিক দান ও যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে; পক্ষান্তরে মোক্ষরূপ প্রয়োজন-সাধনবিষয়ে যত্নপরায়ণ হইতে গেলে আত্ম-জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের উপরেই সর্ব্বতঃ ও সমধিক নির্ভরতাপরতন্ত্র হইতে হয়। পরিদৃশ্যমান নিখিল এই বিশ্বসংসারে সেই এক নিত্য অতীন্দ্রিয় নিরুপাধিক নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় আত্মা ভিন্ন অন্য কোন সদ্বস্তরই পৃথক্ সত্তার বিদ্যমানতা নাই। মায়া-মোহসঙ্কুল নশ্বর ও

আর সর্ব্বোপরি স্বর্গই বল, তাবৎ অভ্যুদয়ই আকাশকুসুমবৎ অজ্ঞানবিজৃম্ভিত অনিত্য ও অসৎ, সুতরাং তাহাদের লাভও যে অনিত্য ও অসৎ এবং প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের একান্ত অনমুকূল, তদ্বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞান বিজ্ঞানময় নিত্যানন্দরূপী আত্মার লাভই আমাদেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজন।

৩। দৃশ্য পদার্থ হইতে দ্রষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দ্রষ্টৃ দৃশ্যোহন্য ইতি প্রসিদ্ধ লোকে।

অর্থাৎ—নিখিল বিশ্বের যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ যে দ্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতে যে সামগ্রী অলব্ধ, তাহাই লব্ধ হইবার সম্ভাবনা। চিদ্‌ঘনরূপী অবিনশ্বর আত্মাই এ সংসারে একমাত্র নিত্য বস্তু, সুতরাং তিনি কখনই অলব্ধব্য হইতে পারেন না, প্রাণিমাত্রেই অজ্ঞান ও মোহে অবিরাম আচ্ছন্ন, তাই লব্ধব্য আত্মা তাহার সকাশে অলব্ধব্য বস্তুর ন্যায় সদাই প্রতীয়মান হয়, এবং এই কারণ নিবন্ধনই, আমি যে আত্মা নহি, পদে পদে তাহাদের এই দুরপনেয় ভ্রান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তিই যে আত্মলাভ—মনীষাসম্পন্ন ভগবদেকনিষ্ঠ মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার স্বীকার ও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। অনাবিল বিশুদ্ধ জ্ঞানই অজ্ঞাননিবৃত্তির মুখ্য সাধন; অতএব যে উপায় অবলম্বন দ্বারা অনায়াসে সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণ জ্ঞানে আমাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যিনি যে কোন বস্তু দর্শন করেন, তিনিই তাহার দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট পদার্থটিই দৃশ্য। দ্রষ্টা রাম হইতে দৃষ্ট বৃক্ষটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, তাহা অনুভব করিবার শক্তি সকলেরই আছে, আবার একমাত্র নিত্য ও শুদ্ধ আত্মাই যে তাবৎ পদার্থের প্রকৃত দ্রষ্টা নিঃসংশয়িতরূপে তাহাও প্রমাণিত।

৪। আত্মা কি?—অথ ক আত্মেতি

অর্থাৎ উপরে যে আত্মার কথা বলা হইল, তিনি কে? কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ দ্বারা তাহা আদৌ নির্ণীত হইবার নহে। সূক্ষ্ম বিচারশক্তিসাহায্যেই তিনি প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—আত্মাই তাবৎ পদার্থের দ্রষ্টা। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের এই দেহান্তর্গত কোন বস্তুবিশেষই অবশ্য "আত্মা" পদবাচ্য হইবে; যেহেতু দেহবহির্ভূত পদার্থবিশেষ হইতে দেহীর দর্শনাদি জ্ঞান কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ অথবা মন প্রভৃতির কেহ না কেহ যে আত্মা, সে বিষয়ে আর সংশয় কোথায়? কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? পাছে হস্ত-পদাদির উপর *আত্মার আরোপ হয়,* তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

৫। হস্ত-পদাদি সম্বলিত এই দেহ আত্মা নহে।

দেহস্তাবদাত্মা ন ভবতি রূপাদিমত্ত্বেনোপলভ্যমানত্বাৎ।

অর্থাৎ—কর-চরণাদি সংযুক্ত পরিদৃশ্যমান আমাদের এই যে বহিঃস্থ শরীর, ইহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। তবে এই শরীরে রূপাদির বিদ্যমানতা আছে বলিয়া ইহা দৃশ্য এবং এই কারণেই আমরা ইহার উপলব্ধি করিতে সমর্থ। পঞ্চভূতাত্মক আমাদের এই দেহ ও আত্মা যে এক পদার্থ নহে, প্রথমতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। অনন্তর এই দেহেই আমাদের অকল্পনীয় বা আত্মা-

ভ্রম কেন জন্মে, তাহার রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য। অনুমান ও প্রমাণ দ্বারা দেহ ও আত্মার ভেদ সাধিত হইতেছে। অনুমানে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্য নির্দ্দেশ করিতে হয়। পক্ষ, সাধ্য ও হেতু এই তিনটিই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অঙ্গ। যাহা সাধন করিতে হইবে, তাহাই সাধ্য, সাধ্য যাহাতে বিদ্যমান তাহাই পক্ষ, এবং হেতু বলিতে কেবল কারণই বুঝায়। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দৃষ্টান্ত যথা—পর্ব্বত অগ্নিযুক্ত, কারণ ইহা ধূমবিশিষ্ট, এস্থলে অগ্নি বা অগ্নির সংযোগ-সাধ্য; পর্ব্বত—পক্ষ (কারণ পর্ব্বতেই অগ্নির বিদ্যমানতা), আর ধূম বা ধূমের সংযোগই হেতু বা কারণ। অতএব সূত্রস্থ প্রতিজ্ঞাবাক্যের আত্মভেদই সাধ্য (অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা তাহা সাধন বা প্রতিপন্ন করিতে হইবে) দেহ পক্ষ (যেহেতু দেহেই আত্মার বিদ্যমানতা), আর রূপাদিযুক্তরূপে অনুভবই হেতু বা কারণ (অর্থাৎ দেহে রূপাদি বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি)। হেতু দ্বারা যে কিরূপে সাধ্য সাধিত হয়, তাহা পরে বিশদভাবে বুঝান যাইবে। রূপাদি বলিতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বুঝায়, আর রূপাদিযুক্তভাবে দেহের অনুভব বলিতে ইহাই বুঝায় যে, আমি গৌর বা কৃশ, আমার শরীর উষ্ণ বা শীতল ইত্যাদি রূপ প্রতীতি জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে।

৬। রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়াই দেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়।

যথা ঘটাদয়ো রূপাদিমত্তশ্চক্ষুরাদি করণৈরূপ লভ্যন্তে এবন্দে হোঽপি রূপাদিমান চক্ষু াদি করণৈরুপলভ্যতে অয়মিতি। ৯

যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, দেহও রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়া চক্ষুরাদি করণ উপায় দ্বারা তদ্রূপ এই দেহ সুন্দর, এই দেহ কৃশ ইত্যাদিরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এক্ষণে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতাযুক্ত হেতুই সাধ্য সাধনের উপযোগী।

ব্যাপ্তি কাহাকে বলে?

যে যে স্থলে হেতু বিদ্যমান থাকে, সেই সেই স্থলেই যদি সাধ্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। যেমন—যে যে স্থানে ধূমের বিদ্যমানতা, সেই সেই স্থলেই অগ্নির অস্তিত্ব। আবার উক্ত ব্যাপ্তির প্রমাণার্থ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কথা আদৌ বিশ্বাস্য নহে। অগ্নি স্থলে দৃষ্টান্ত যথা—রন্ধনশালা, কর্ম্মকারগৃহ ইত্যাদি। ব্যাপ্তি ভিন্ন মাত্র হেতু দ্বারা সাধ্য নির্ণয় কখনই সম্ভবপর নহে। ব্যাপ্তিই এই জন্য অনুমানের মুখ্য অঙ্গ।

পক্ষধর্ম্মতা কি?

এইরূপ ব্যাপ্তিযুক্ত হেতু যদি যথার্থই পক্ষে বিদ্যমান থাকে, তবে তাহাকে পক্ষধর্ম্মতা কহে। পক্ষে যদি হেতু না থাকে—তাহা হইলে সাধ্যের বিদ্যমানতা আদৌ সম্ভবপর নহে। এই কারণে পক্ষধর্ম্মতাও অনুমানের আর একটি অঙ্গ।

সূত্রস্থ অনুমানোপযোগী বাক্য এই যে, যে যে বস্তু যাহা কর্ত্তৃক রূপাদি যুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই সেই বস্তু তাহা অর্থাৎ উপলব্ধা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যেমন ঘট পট প্রভৃতি রূপাদি যুক্ত বলিয়া, মনুষ্যেরা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অথচ

পৃথক্। দেহ ও আত্মা কর্ত্তৃক এইরূপে উপলব্ধ হয় বলিয়া, পঞ্চভূতাত্মক আমাদের এই দেহও আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ।

৭। দ্রষ্টা আত্মা দৃশ্য দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ।

যথা দাহ্য প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি ব্যতিরিক্তো দাহক-প্রকাশকোঽগ্নিঃ। তথা দৃশ্যাদ্ দেহাদ্ দ্রষ্টা ব্যতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধঃ॥

অর্থাৎ—যেমন অগ্নি দাহক ও প্রকাশক বলিয়া, দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেইরূপ আত্মা দ্রষ্টা বলিয়া দৃশ্য ও পরিদৃশ্যমান যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ।

অতঃপর দেহের, অনাত্মত্ব অনুমান করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত যে আত্মত্ব তাহারই অনুমানার্থ বিপরীতভাবে অনুমান ও ব্যাপ্তি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইতেছে। সাধারণতঃ, কর্ত্তা যে কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, বর্ত্তমানে ইহাই প্রতিপাদ্য। সামান্যতঃ, কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব লইয়া—অগ্নি ও কাষ্ঠকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ অবলম্বন করা হইয়াছে। এখানে অনুমান যথা—দ্রষ্টা আত্মা—দৃশ্য দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যেহেতু আত্মা কর্ত্তা ও দেহাদি তাহার কর্ম্ম। আবার ব্যাপ্তি যথা—যে যে বস্তু কর্ত্তা, সেই সেই বস্তুই তাহার কর্ম্ম হইতে ভিন্ন। দৃষ্টান্ত যথা—দহন ও প্রকাশ কর্ত্তা অগ্নি—দহন ও প্রকাশ কর্ম্ম কাষ্ঠ হইতে বিভিন্ন। কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব লইয়াই সাধারণতঃ ভেদ-সাধনের অভিপ্রায় বুঝিতে হয়। কর্ত্তা যে কর্ম্ম হইতে ভিন্ন, ইহা সহজেই অনুভবযোগ্য। অগ্নি স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া কখন নিজেকে দাহ করিতে সমর্থ আর্দ্র করিবার সামর্থ্য ধারণ করে না। সেইরূপ আত্মার পক্ষে আত্মাকে দর্শন করা আদৌ সম্ভবপর নহে।

৮। দেহের মরণ, মূর্চ্ছা ও নিদ্রাবস্থাই দেহাতিরিক্ত চৈতন্যময় আত্মার বিদ্যমানতা দ্যোতক।

এতস্মাদপি কারণাদ্ দেহব্যতিরিক্ত আত্মাঃ—স্বাপ মরণাদির্দর্শনাৎ॥

অর্থাৎ—দেহের মরণ মূর্চ্ছা ও নিদ্রাবস্থা দর্শন করিয়াও দেহ ব্যতিরিক্ত—দেহের পরিচালক কোন চৈতন্যময় আত্মার বিদ্যমানতা সহজ জ্ঞানেই অনুমেয়। এ সম্বন্ধে আরও একটি অনুমানব্যাপার বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। নিদ্রা, মৃত্যু ও মূর্চ্ছাকালে দেহ পূর্ব্বের ন্যায়ই অটুট বিদ্যমান থাকে, অথচ পূর্ব্বের মত তাহার গতিপ্রভৃতি কার্য্য আদৌ অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে জাগরণকালে দেহের সেই সেই গতি বা ক্রিয়া পুনরায় আমাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত হয়। সুতরাং যখন একই বস্তুর এক সময়ে গতি প্রভৃতি কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, আবার সময়ান্তরে তাহাদের "বিদ্যমানতা আদৌ উপলব্ধ হইবার নহে, তখন নিঃসন্দেহরূপে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দেহের প্রাগুক্ত গতি প্রভৃতি কার্য্যগুলি নিজ দেহের আয়ত্তাধীন নহে; নিশ্চয়ই অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে উহা অর্থাৎ সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দেহ যৎকালে সেই সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কার্য্যগুলি তখনই চলিতে থাকে, আর সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা যখন না থাকে, তখন বাহ্য কার্য্যাবলির অস্তিত্বও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের কার্য্য সম্বন্ধে আত্মার দেহাভিমানই ঐ সাহায্য-কারী, সুতরাং দেহ হইতে আত্মা সম্পূর্ণ

অনুমেয়—দেহ অন্য কোন চেতন-পদার্থের সংযোগ-নিবন্ধন ক্রিয়াবিশিষ্ট; যেহেতু উহা সাময়িক ক্রিয়াযুক্ত; যাহা যাহা সাময়িক ক্রিয়াবিশিষ্ট; তত্তৎ অবশ্যই অন্য-প্রেরিত ক্রিয়াশক্তি-পরিচালিত। রথ ও শকট প্রভৃতি ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এখানে আত্মা সাধ্য—দেহ পক্ষ ও সাময়িক ক্রিয়া হেতু।

৯। জাগ্রদবস্থায় আত্মা যখন জীবদেহে অহমভিমান রূপ ব্যাপ্তি বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করেন, সেই সময়েই শরীর গমন ভোজন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে সমর্থ হয়।

যস্মিন্‌কালে দেহং সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে আত্মা কাষ্ঠাদিবৎ, তদা দেহো ব্যবহারযোগ্যো ভবতি, যদা দেহাদপসর্পতি তদা দেহঃ কাষ্ঠাদি সদৃশো ভবতি।

অর্থাৎ—অগ্নি যতক্ষণ কাষ্ঠাদি ব্যাপিয়া অবস্থান করে—ততক্ষণই যেরূপ সেই কাষ্ঠ দ্বারা দাহ ও পাকাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় আত্মা যখন জীব-দেহে অহমভিমান রূপ ব্যাপ্তি বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থান করেন, সেই সময়েই শরীর গমন-ভোজন-দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে সমর্থ হয়, পক্ষান্তরে দেহ হইতে সেই আত্মা যখন বিয়োগ-অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন, অর্থাৎ দেহে অহমভিমান পরিত্যাগ করেন, তখনই এই দেহ নির্ব্বাপিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জড়বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যদিও পরিদৃশ্যমান আমাদের এই দেহের অবস্থান রূপ ব্যবহার (স্বীয় সত্বা) অবিচ্ছেদভাবে অবিরামই বিদ্যমান, তথাপি তাহার গমনাদি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার অবশ্যই আগন্তুক; কারণ দেহে সকল সময়ে যে গমনাদি ক্রিয়ার কিন্তু সংশয়বাদীরা এস্থলে সম্ভবতঃ এই একটা অতি অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে—"আত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, তখন তাঁহার সহিত দেহের সংযোগ অবিচ্ছেদভাবেই অবিরাম বর্ত্তমান আছে; অতএব আত্মাই যদি দেহের তাবৎ ক্রিয়ার সাধক, তখন দেহের ক্রিয়াদিও নিরন্তরই বর্ত্তমান থাকা উচিত।" সুতরাং সিদ্ধান্তের সহিত যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাগুক্ত অনুমানে "হেত্বসিদ্ধি" দোষ আসিয়া দাঁড়ায়। এক্ষণে উক্ত আপ-ত্তির খণ্ডন করিয়া "হেত্বসিদ্ধি" দোষের পরিহারকল্পে প্রয়াসশীল হওয়া যাউক। আত্মা সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং অবিচ্ছেদভাবে সর্ব্বকালেই দেহের সহিত তাঁহার নির্লেপ-সংযোগ আছে, ইহা বাস্তবিক কথা। কিন্তু মাত্র সংযোগত্ব নিবন্ধনই কি আত্মা দেহকে পরিচালিত করিয়া থাকেন? কখনই নহে। যে মুহূর্ত্ত হইতে দেহে আত্মার অহংভাব আসিয়া পড়ে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেহ পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। আত্মার এই অহংভাবই বা অহমভিমানই দেহ ব্যব-হারের হেতু—ইহাকেই আত্মার দেহ-ব্যাপ্তি বলা যায়। কাষ্ঠাভ্যন্তরে অগ্নির বিদ্যমানতা যতক্ষণ, ততক্ষণই তাহার দাহকত্ব পাচকত্ব প্রভৃতি ব্যবহার-যোগ্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। আত্মাও সেইরূপ যাবৎ জড়দেহকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন এবং দেহে অহং রূপ অভিমান প্রকাশ করেন, ততক্ষণই এই দেহ গমন-স্পন্দন প্রভৃতি কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহার-যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু নিদ্রাদি অবস্থায় যখন তিনি দেহ হইতে বিযুক্ত অব-স্থায় থাকেন, অর্থাৎ দেহে অহংভাব পরিত্যাগ করেন, তখন দেহ পূর্ব্বোক্ত যোগ্যতা-বিহীন হইয়া নির্ব্বাপিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়

ব্যবহার অবিরামভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই যে অন্যান্য ব্যবহার সকলকে অনাগন্তকস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে, তাহাও নহে। অবস্থান ব্যবহার কাষ্ঠাদিতেও নিয়ত বর্ত্তমান আছে, অথচ তাহার দাহ-যোগ্যতাদি ব্যবহার যে আগন্তুক, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং দেহের কর্ত্তৃত্বাদি ও গমনাদি ব্যবহার যে আগন্তুক ব্যাপার, ইহা আদৌ অযৌক্তিক নহে; এ অবস্থায় তাহা হইলে "হেত্বসিদ্ধি" দোষের অলীক আশঙ্কা কোথায়?

১০। আত্মা দেহ হইতে সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ।

তস্মাদ, দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধঃ।

অর্থাৎ—আত্মা যে দেহ হইতে সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, ইহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ বা প্রতিপন্ন হইল। সংশয়বাদী কেহ কেহ এ স্থলে হয়ত এই আপত্তি পুনরায় উত্থাপিত করিতে পারেন যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমান আত্মার সাধক না হইয়া আত্মা ভিন্ন অপর কোন পদার্থের সাধকও ত হইতে পারে। উক্তরূপ আপত্তির খণ্ডনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মসাধনপ্রকরণের উপসংহার করা যাইতেছে। উপরে যে হেতুগুলি বিন্যস্ত করা হইয়াছে, সেইগুলি স্বীকার করিলে প্রাগুক্ত অনুমানসকল আত্মারই সাধন বা প্রমাণ পক্ষে স্পষ্টতঃ সমর্থন করিবে। আবার প্রস্তাবিত হেতুগুলি যদি অস্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ প্রমাণই পাওয়া যাইবে না। উভয় অবস্থাতেই সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আপত্তি অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, অতি ভিত্তিহীন।

১১। চক্ষু আত্মা নহে।

চক্ষুরপি আত্মা ন ভবতি,—রূপগ্রহণ সাধনত্বাৎ প্রদীপবৎ।

অর্থাৎ—চক্ষুও আত্মা নহে; যেহেতু তাহা দ্বারা প্রদীপের ন্যায় মাত্র রূপগ্রহণ-কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণার অধীন, ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, যেহেতু আমি অন্ধ আমি বধির—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিতে ইত্যাদি রূপ আত্ম-প্রত্যয় সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক যে আত্মা নহে, যুক্তিপ্রয়োগে তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। যেমন আমি অন্ধ—এইরূপ অনুভবের বিদ্যমানতা আছে, সেইরূপ আমার চক্ষু, এই-রূপ অনুভবও ত হইয়া থাকে। সুতরাং চক্ষু ভিন্ন একজন আত্মা যে বর্ত্তমান আছে—তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আমি অন্ধ—এই অনুভবটি ভ্রমমাত্র। আবার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমি রূপ-বান্, আমি কদাকার, এবংবিধ অনুভবও হইয়া থাকে। চক্ষুর দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ তাবৎ ইন্দ্রিয়ই যে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, তাহাও প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। চক্ষু যে করণ অর্থাৎ দৃষ্টিক্রিয়াসাধন, এ বিষয়ে অনুমান যথা—রূপ গ্রহণ করণ সাধ্য, যেহেতু উহা একটি ক্রিয়া, যেমন ছেদন ক্রিয়া অস্ত্ররূপ করণ সাধ্য। এইরূপে সামান্যতঃ করণসাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হইলে অপরা-পর করণের যোগ্যতা না থাকায়, অবশেষে চক্ষুই রূপজ্ঞানের করণ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। আবার করণের অনাত্মত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণ যথা—যাহা করণ তাহা আত্মা নহে; যেমন প্রদীপরূপ করণের সাহায্যেই দর্শনরূপ ক্রিয়া সংসাধিত হয়, কিন্তু প্রদীপ নিজে যে দর্শনকর্ত্তা নহে, বালকদিগেরও ইহা অনায়াসবোধ্য। অতএব যে সাধন বা করণ বা উপায় দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই করণ বা সাধন বা উপায় কখনই যে সেই কার্য্যের কর্ত্তা নহে, ইহা প্রত্যক্ষ ও

যুক্তিসিদ্ধ। এই হেতু চক্ষু যখন দর্শন-সাধন তখন উহা দর্শনকর্ত্তা বা আত্মা কখনই নহে।

১২। প্রদীপ সাহায্যে রূপের উপলব্ধির ন্যায় চক্ষু দ্বারাও রূপের প্রতীয়মানতা।

যথা প্রদীপেন করণেন রূপমুপলভ্যতে, তথা চক্ষুষাপি করণেন রূপমুপলভ্যতে।

অর্থাৎ—যেরূপ প্রদীপ রূপ সাধন বা করণ সাহায্যে রূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে, চক্ষু রূপ করণসাহায্যেও সেইরূপ রূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উপরে তাহা বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৩। চক্ষু ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গুলির সম্বন্ধেও এই কথা।

একমেব ইতরাণ্যপি করণানি।

অর্থাৎ—চক্ষু ব্যতীত অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় গুলির সম্বন্ধেও উল্লিখিত যুক্তি প্রযুজ্য। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও যে আত্মাপদবাচ্য নহে, উল্লিখিত রূপে তাহাও প্রতিপাদ্য। পৃথক্ পৃথক্ এক একটি ইন্দ্রিয়ই যে আত্মা, তাহাও আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমার ইন্দ্রিয়—এই বিরুদ্ধ প্রত্যয়টিই আত্মত্বের সাধক না হইয়া বিষম বাধক; বিশেষতঃ আমি ইন্দ্রিয় এই অনুভবটি যে মাত্র একটিতেই বিদ্যমান আছে তাহা নহে; ইহা যেমন অন্ধের চক্ষুতে, তেমনই বধিরের কর্ণে, আবার ইন্দ্রিয়ান্তরেও তাহার বিদ্যমানতার সম্ভাবনা। সুতরাং আমি ইন্দ্রিয় এই প্রত্যয়ের বলবত্তা স্বীকার করিলেও ইহা দ্বারা কোন্ ইন্দ্রিয়টি যে আত্মা তাহার কিছুই স্থিরনিশ্চয়তা নাই; পক্ষান্তরে যাবতীয় ইন্দ্রিয় সম্মিলিতভাবে যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

প্রত্যভিজ্ঞা কাহাকে বলে?

অর্থাৎ আমি একটি বস্তু দর্শন করিলাম—পরক্ষণে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবার সময় বুঝিতে পারিলাম যে "যে আমি" এই পদার্থটি তখন দর্শন করিয়াছিলাম—"সেই আমিই" এই বস্তুটি এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি; ইহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞা। এক্ষণে এই এক আমি জ্ঞানটি কিরূপে জন্মিল? দর্শন সময়ে ত আমি চক্ষু ছিলাম, স্পর্শ সময়ে সেই আমিই আবার স্পর্শ বা ত্বক্ হইয়াছি। জ্ঞাতার একত্ব সিদ্ধ বা প্রতিপাদিত না হইলে বস্তুরও একত্ব সিদ্ধি আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ এক বস্তুকেই যে স্পর্শ করিতেছি, ইহাই বা কিরূপে হইতে পারে? পূর্ব্বের দর্শনকর্ত্তা আমি ও বর্ত্তমানের স্পর্শকর্ত্তা আমি—পরস্পর ভিন্ন—এই ভাবে জ্ঞাতৃদ্বয় যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান দুইটিও অবশ্যই স্বতন্ত্র হইবে। আবার জ্ঞান দুইটি যদি ভিন্ন হইল, তাহা হইলে জ্ঞেয় বস্তুটিও এইটির ন্যায় ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ারই সম্ভাবনা। আবার একই দেহে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিদ্যমানতা আছে বলিয়াই যে এক প্রত্যভিজ্ঞা, ইহাও হইতে পারে না; তাহা হইলে একই হস্তীতে আরূঢ় রাম-যদু প্রভৃতিরও এক প্রত্যভিজ্ঞা হইত, অর্থাৎ রাম যাহা দেখিয়াছে, হরিও তাহা হইলে তাহা দেখিয়া চিনিতে পারিত; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত তাহাই হয় কি? সুতরাং নিখিল ইন্দ্রিয়ের সমবায় বা সম্মিলনই যে এক আত্মা তাহাও নহে।

১৪। মনও আত্মা নহে।

মনোঽপি আত্মা ন ভবতি, দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাচ্চ প্রদীপবৎ।

—মনও আত্মা নহে; যেহেতু আত্মাও দৃশ্য এবং প্রদীপের ন্যায় করণ বা

কার্য্য সাধক। মনেরও অহম্প্রত্যয় আছে, অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি, ইত্যাদি নানাবিধ অহম্ভাব মনোমধ্যেও অনুভূত হইয়া থাকে। তজ্জন্য কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, মনই আত্মা; কিন্তু মনে যে অহম্প্রত্যয় ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ "আমার মন" এবংবিধ বলবান্ অনুভবই তাহাকে পূর্ব্ববৎ বাধা দিতেছে।

১৫। বুদ্ধিও আত্মা নহে।

বুদ্ধিরপি আত্মা ন ভবতি, দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ প্রদীপবৎ।

অর্থাৎ—বুদ্ধিও আত্মা নহে; যেহেতু তাহাও দৃশ্য এবং প্রদীপের ন্যায় করণ বা কার্য্য সাধক। সম্প্রদায়বিশেষের মত এই যে, বুদ্ধিই আত্মা; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। বুদ্ধিকে যদি দৃশ্য না বলা যায়, তবে বুদ্ধিই সিদ্ধ হয় না। আর যদি বুদ্ধিকে দৃশ্য বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহারও অনাত্মত্ব-প্রতিপাদিত হইবে। অধিকন্তু বুদ্ধিকে করণও বলা যায়। আবার যদি তাহাকে কর্ত্রী বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে করণরূপা আর একটি বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নিশ্চয়তা-জনক একটি সাধারণ করণের বিদ্যমানতা না থাকিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু দুইটি বুদ্ধির অস্তিত্ব কাহারও স্বীকার্য্য কি? অত-এব বুদ্ধিও অবশ্যই করণ। তাহা হইলে তাহার আত্ম-ভিন্নত্ব-বিষয়ে আর কোন বিবা-দই থাকে না। কোন কোন মতে বিজ্ঞানা-ত্মিকা বুদ্ধি ক্ষণস্থায়িনী; তদনুসারে যদি বুদ্ধির ক্ষণস্থায়িত্বও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞাদি সিদ্ধির নিমিত্ত বুদ্ধির অতিরিক্ত কোন একটা দ্রষ্টৃ পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; তাহা না হইলে পূর্ব্বক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির জ্ঞাত বা অধিগত বিষয় পরক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির স্মর-ণের বিষয় হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

প্রাচীন কথা।

অনেক মাসিক পত্রিকায় আজকাল অনেক প্রাচীন কথা—প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা হইতেছে, কিন্তু উক্ত পত্রিকা-সমূহে সুদূর পল্লীগ্রাম বা যে সমস্ত স্থানে গমনাগমনের বিশেষ কোন সুবিধা নাই, সেই সমস্ত স্থানের অতীত কীর্ত্তির কোন উল্লেখ বা আলোচনা বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গম পল্লীগ্রাম, যাহা এক কালে সমৃদ্ধিশালী বর্দ্ধিষ্ঠ গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিগণিত ছিল, যাহাকে একদিন মফঃস্বলের স্থানে হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় কীর্ত্তি অতীতের অনেক বিস্ময়কর কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে লতাগুল্মের নিগড় পরিধান করতঃ শ্বাপদকুলে পরিবৃত হইয়া নীরবে নির্জ্জনে নিদ্রা যাইতেছে, আজ সেই সমস্ত মফঃস্বলের সুপ্ত প্রাচীন কথা অতীতের গহ্বর হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় অগ্রসর হইতেছি।

বনগ্রাম সাতভেয়ে কালী। বন-গ্রাম যশোহর জেলার অন্যতম একটী মহা-

জেলার ভিতর উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান। এই বনগ্রামের দুই মাইল দক্ষিণে ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে পুরাতন বনগ্রামে "সাত ভেয়ে কালী" নামে একটী জাগ্রতা দেবী আছেন। পুরাতন বনগ্রাম পরগণা খোসদহের অন্তর্গত, বর্ত্তমান কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের জমিদারিভুক্ত। E. B. S. Railwayর central section হইতে কলিকাতা দিয়া যশোহর ও খুলনা যাইতে হইলে এই বনগ্রাম station দিয়া যাইতে হয়। পশ্চিম বঙ্গবাসী ও কলিকাতার ভদ্রসন্তানগণ যখন যশোহর যান, তখন তাঁহারা এই বনগ্রাম stationএর এক মাইল দূরবর্ত্তী ইচ্ছামতী নদী দেখিবার জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়েন। রেলওয়ে পুলের উপর উঠিয়া তাঁহারা ইচ্ছামতীর কুম্ভীরের ভয়ে ভীত চকিত ও ত্রস্ত হইয়া সোৎসুকনেত্রে পুল হইতে ইচ্ছামতীর বক্ষোপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন এবং বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁহাদিগকে যে ইচ্ছামতীর তীরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাই, সেইজন্য ভগবান্‌কে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। ইচ্ছামতীর কুম্ভীরের নাম করিলে অনেকেরই কম্পন উপস্থিত হয়। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ইচ্ছামতীর ধারেই বাস করিয়া থাকি এবং প্রায়ই সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া থাকি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ইচ্ছামতী তীরবাসীদিগের প্রতি কুম্ভীরের তত অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে ক্বচিৎ কোন বর্ষে দুই একটী লোককে কুম্ভীরে না ধরে, তাহাও নহে। মনে পড়ে, ছোটবেলা যখন বনগ্রাম স্কুলে পড়িতাম, সেই সময় কলিকাতার এক বাবু ইচ্ছামতীর জলে আগুল্‌ফ নিমজ্জিত করিয়াছেন, আর আশেপাশে ৯।১০ জন লোক মোটা বংশদণ্ড লইয়া নদীর জলে প্রহার করিতেছে, বাবুর তথাপি কম্পন থামিতেছে না। পাশে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল কলিকাতার কোন বড়লোক মোকদ্দমার জন্য এখানে আসিয়াছেন। কুম্ভীরের ভয়ে নদীতে নামিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। সেইজন্যই এই রহস্যজনক ব্যাপার। সে রহস্য অনেক দিন স্মরণ থাকিবে।

যশোহর যাইতে হইলে এই ইচ্ছামতী নদীর পুলের ঠিক বামপার্শ্বেই যে লতাপাতা ঘেরা প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং আশে পাশে যে কয়েকখানি মেটেঘর দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্থানটীই আমাদের সেই জাগ্রত সাতভেয়ে কালীতলা। শনি ও মঙ্গলবারে প্রায় সারাদিনই এখানে জনসমাগম হইয়া থাকে। অনেক বলিদানও হয়। এই দুই দিন ৺কালীতলায় যথেষ্ট ভিড় হইয়া থাকে; train হইতে অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রবাদ, পুরাতন বনগ্রামে কোন বংশে সাত ভাই ছিল, ডাকাতি করিয়া তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। তখন রেল হয় নাই; ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম তীরস্থ যশোহর ও ২৪ পরগণার পল্লীসমূহের হিন্দু তীর্থযাত্রী ৺ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিকট চাকদহে যাইত, সেই সময় কালীতলার সম্মুখীন প্রশস্তরাস্তা ব্যতীত যাত্রীদিগের গমনাগমনের অন্য কোন বিশেষ সুবিধাজনক রাস্তা ছিল না। তখন নদীতীরস্থ ৺ কালীতলার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সাত ভাই ডাকাত তাহাদের লুণ্ঠন ও চৌর্য্যবৃত্তির সুবিধার জন্যই এই গভীর জঙ্গলে আড্ডা করিয়াছিল। তাহারা ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে এই স্থানের কালীমাতার পূজা না করিয়া কোথাও বাহির হইত না। প্রবাদ

প্রতিবর্ষে মায়ের সন্তোষার্থে ইহারা একটী করিয়া নরবলিও দিত। প্রবীণ লোকে আজও বলিয়া থাকেন, সে সময়ে সাধারণ লোকের অন্তঃকরণে এরূপ দৃঢ় ভয় ছিল যে, প্রাণান্তেও একাকী কেহ ৺ কালীতলার রাস্তা দিয়া দিনের বেলায় যাওয়া আসা করিত না। এই ভয় যে সাত ভাই ধরিতে পারিলেই নিশ্চয় ৺ কালীতলায় বলি দিবে। লোকে বলে, এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর একদিন এক সাধু সন্ন্যাসীকে ধরিয়া আনিয়া ডাকাতেরা মায়ের নিকট বলি দিবার জন্য জঙ্গলে বাঁধিয়া রাখে। সাত ভাই যে সময় মায়ের পূজা দিবার পূর্ব্বে ইচ্ছামতীতে স্নান করিতে গেল, সেই সময় এক রমণীমূর্ত্তি অকস্মাৎ জঙ্গল হইতে আবির্ভূতা হইয়া সন্ন্যাসীর মুখে একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বাক্‌রুদ্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "আয় বাছা আমার সঙ্গে আয়, তোর কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিলাম, আমার কথা মুখ দিয়া কাহাকেও ব্যক্ত করিতে পারিবি না, আমি তোকে বর দিলাম, তুই আকার ইঙ্গিতে গ্রামবাসীকে সমস্ত বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা পাইলি, আমি আর নরবলি খাইতে পারি না। তুই ভক্ত, তোর রক্ত আর স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না, তোর এইখানেই মুক্তি হইবে, কোন ভয় নাই, আমার সঙ্গে আয়, গ্রামবাসীকে শনি ও মঙ্গলবারে আমার পূজা দিতে বলিস্, সাত ভাই আমার বড় ভক্ত ছিল; তাহাদিগকে কোল দিলাম, তাহারা আর অই নদী হইতে উঠিবে না।" এই কথা বলিয়া রমণী সাধুকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের ভিতর লইয়া গেল। প্রায় ভোর হইল, রমণী যে সেই সময় কোথায় অন্তর্হিতা হইয়া গেল, সন্ন্যাসী তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিল না। শনি মঙ্গলবারে মায়ের পূজা দিবার

স্বপ্ন হইয়াছিল, প্রাতঃকালে সাধু আকার ইঙ্গিতে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। তখন গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া বনজঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, কেবল ইচ্ছামতী নদীর তীরে সাতটী কৌপীন ও একখানি তরবারি পড়িয়াছিল ইহাই দেখিতে পাইল; আর জঙ্গলে মায়ের প্রতিমূর্ত্তি কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল একটী বেলতলায় একখণ্ড পাথরের গাত্রে সিন্দুরের ফোঁটা দেখিতে পাইল। তখন হইতে গ্রামবাসী সেই প্রস্তরখণ্ডকে ৺ সাত ভেয়ে কালী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সন্ন্যাসী কিছুদিন রুদ্ধবাক্ অবস্থায় ৺ কালীতলায় ছিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে মায়ের আসনের নিম্নে তাঁহাকে সমাধি করা হয়।

এ পর্য্যন্ত এখানে বোধ হয় লক্ষ বলিরও অধিক বলিদান হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণে এবং 'মানত' করিলে প্রায়ই সকলে সিদ্ধমনোরথ হয় বলিয়া এ দেশের লোকে সাতভেয়ে কালীতলাকে একটী সিদ্ধ পীঠস্থান বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বে বেলগাছ ছিল, এখন আর তাহার কোন চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হয় না। বেলগাছের পরিবর্ত্তে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা ছেলেবেলায় সেই প্রস্তরখণ্ডখানি দেখিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বটের বোয়া নামিয়া চারিদিক্ হইতে সেই প্রস্তরখণ্ডখানি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, এক্ষণে এই বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে সিন্দুর দিয়া পূজা করা হইয়া থাকে, প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে যথেষ্ট 'মানত' পূজা আসিয়া থাকে এবং প্রায় ৮।১০টী করিয়া বলিদান হয়। প্রায় ১২।১৪ ক্রোশ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ই 'মানত' পূজা দিতে আসিয়া থাকে। পোষ্টাল ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর জেনারাল ৺বিষ্ণু-

করিয়া সফলকাম হওয়ায় ৺ কালীতলার গোড়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন, সাতভেয়ে কালীতলার উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল; কোন শুভ কার্য্যে তিনি ৺ মায়ের পূজা না দিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি জীবিত অবস্থায় প্রায়ই সাতভেয়ে কালীতলায় পূজা দিতেন। বনগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ মিত্র মহাশয় আজপর্য্যন্ত প্রতি অমাবস্যায় ৺ সাতভেয়ে কালীর পূজা না দিয়া জলগ্রহণ করেন না। আর একটী কথা। ১৮৮৩ সালে খুলনা রেল খোলা হয়, জনশ্রুতি এইরূপ যে রেলওয়ে কোম্পানির বড় সাহেব এই ৺ কালীতলার উপর দিয়া রেল লাইন বসাইবার ব্যবস্থা করেন, স্থানীয় কোন হিন্দু মুসলমান বৃক্ষ ছেদন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, সাহেব জিদ করিয়া কতকগুলি সাঁওতালি কুলিকে গাছে উঠিয়া গাছ কাটিতে হুকুম দেন, যাহারা গাছ কাটিতে উঠিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই পরদিন কলেরায় মৃত্যু হয়।

সাহেবপুঙ্গবও মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যান। সেই সময়ের এ সমস্ত কাণ্ড যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই আজো পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। এখনও বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অশ্বত্থের প্রকাণ্ড ডালগুলিতে Railway লাইনের অনেক তার জড়ান দেখিতে পাওয়া যায় ও স্থানে স্থানে ডাল কাটার চিহ্নও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। শুনিতে পাই ৺কালীতলার উপর দিয়া পুল না হওয়ার জন্য বনগ্রাম ষ্টেসন হইতে রেল লাইন ঐরূপ বাঁকিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, সেই সময় রেলের সাহেব মায়ের পূজা দিয়া অব্যাহতি পান এবং সেই সময় হইতে রেল কর্তৃপক্ষ আজ পর্য্যন্ত বৎসরান্তে একবার করিয়া ৺ কালীর পূজা দিয়া [illegible]

আর সেই সময় হইতেই ৺ সাতভেয়ে কালী সর্ব্বসাধারণের নিকট অত্যধিক জাগ্রতা হইয়া পড়িয়াছেন, পুরাতন বনগ্রামের কয়েকঘর ব্রাহ্মণ জমিদারের নিকট হইতে বর্ত্তমান ৺ কালীতলা জমা করিয়া লইয়াছে, তাহারাই এখন প্রকৃত সেবাইত। যদি কখনও কোন কারণে শনি ও মঙ্গলবারে মানত পূজা না আসে, তবে তাহাদিগকেই সেদিন পূজা দিতে হয়। আজ কাল সেবাইতগণ ৺ কালীতলার দৌলতে দু'পয়সা সংস্থান করিয়া লইয়াছে। এই স্থানটী বড়ই নির্জ্জন, পূর্ব্বে কোন জনমানবের সম্বন্ধ ছিল না, এক্ষণে কয়েকঘর বৈষ্ণব ও দোকানদার এই পবিত্র নির্জ্জন স্থানটীতে বাস করিতেছে। এখানে বট, অশ্বত্থ, অশোক, বেল ও অন্যান্য লতাগুল্মের সমষ্টি লইয়া কেমন একটী কুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে, গাছের তলা দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত শত লোকে মানত করিয়া ইটের ভারা বাঁধিয়া যাইতেছে, আবার হাজার হাজার লোকে সিদ্ধমনোরথ হইয়া ইটের ভারা খুলিয়া দিয়া যাইতেছে। কত সন্ন্যাসী, কত অসূর্য্যম্পশ্যা ভদ্রললনাগণ গাছতলায় মায়ের পবিত্র আশ্রয়ে বনভোজন করিয়া যাইতেছেন, মানত করিতে আসিতেছেন। কত সহস্র সহস্র ইষ্টক প্রস্তরের ভারা কত বৎসর ধরিয়া বটবৃক্ষের প্রতি বোয়ায় বোয়ায় ঝুলিতেছে। যে রেল একদিন গর্ব্ব করিয়া মায়ের বক্ষ চিরিয়া চলিয়া যাইবার বাসনা করিয়াছিল, আজ সেই রেল যেন ভয়ে ভয়ে প্রতিদিনই একটু দূর দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে।

৺ কালীমায়ের পাদদেশ স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী ইচ্ছামতী কুলুকুলুস্বরে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যখন কত দেশ দেশান্তর হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান কুলললনাগণ [illegible]

করিয়া মায়ের সুশীতল ছায়ায় মনের আনন্দে পাশাপাশি বনভোজন করিতে থাকে, তখন সেই দৃশ্য অবলোকন করিলে নাস্তিকেরও পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। এখানে আসিলে স্বভাবতঃই ঈশ্বরের প্রতি কেমন এক প্রকার ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। এই স্থানে—এই জনশূন্য প্রান্তরে অনেক উকিল মোক্তার মুন্সেফ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বড় ঘরের ভদ্র ঘরের মেয়ে ছেলেরাও মর্য্যাদার সহিত মানত করিতে আসিয়া থাকেন, ভক্তির সহিত সাতভেয়ে কালীতলার মানত করিলে প্রায় কেহ বিফলমনোরথ হন না। বঙ্গবিজেতা-লেখক মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান ১৮৭৮।১৮৭৯ সালে বনগ্রামের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বঙ্গবিজেতায় অনেক স্থানে এই ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পল্লীসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সেই ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ বনগ্রামের "মহেশ্বর মন্দির" এই সাতভেয়ে কালীতলারই রূপান্তর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বঙ্গবিজেতা-লেখক যে এই সাতভেয়ে কালীতলা উপলক্ষ করিয়াই সেই বনগ্রামের চন্দ্রশেখর মহন্তের "মহেশ্বর মন্দির" কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ঘনরাম—বঙ্গভাষায় একজন উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন কবি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর ঔরসে তৎপত্নী সীতাদেবীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইহাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। সময় পাইলেই ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা প্রবন্ধ রচনা করিতেন। ইহাঁর মধুময়ী কবিতাসমূহ পাঠ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ইহাঁর গুরু ইহাঁর অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি দেখিয়া ইহাঁকে এক খানি মহাকাব্য রচনা করিতে বলেন। তাঁহার আদেশে ইনি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন। ইহাঁর রচনার মধ্যে একপে ইহার ভাষা অতি সরল ও অনেকাংশে গ্রাম্যতাদোষবর্জ্জিত। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনার আরম্ভকাল স্মরণ নাই, তবে ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ইহা সমাপ্ত হইল।" বঙ্গীয় সাহিত্যে কবিবর কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি যেরূপ উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঘনরাম তাহা হইতে কোন বিষয়ে কোন অংশে ন্যূন নহেন।

ঘৃতাচী—অপ্সরাবিশেষ। ইহাঁর গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যার জন্ম হয়। চ্যবনতনয় প্রমতি ইহাঁর গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, ইহাঁকে দেখিয়া ব্যাসদেবের মনে কামভাবের উদয় হওয়ার অরণীমধ্যে তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া পতিত হয়, এবং তাহাতেই

চণ্ডীদাস—বাঙ্গালা ভাষার একজন বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। ব্রাহ্মণকুলে ইহাঁর জন্ম। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গুণ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী হন। পরে ঘটনাক্রমে ভাগীরথীতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের কবিত্ব ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। চণ্ডীদাসের সময় বাঙ্গালা রচনার আদিকাল বলা যাইতে পারে। ইনি বঙ্গের আদি কবি না হইলেও বঙ্গভাষার সেই শৈশব অবস্থায় ইনি যেরূপ রচনা-পারিপাট্য, রসমাধুর্য্য ও সুললিত ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই ইনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার যোগ্য। চণ্ডীদাস অতি সরল ভাষায় যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎকালীন অন্য কোন কবির লেখায় সেরূপ দেখা যায় না। ফলতঃ চণ্ডীদাস আমাদের দেশের একজন খাঁটি বাঙ্গালা কবি।

চন্দ্র, চন্দ—চন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যানের প্রচার আছে ;—

ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। মতান্তরে, সমুদ্রমন্থনে ইহাঁর উদ্ভব হয়। ইহাঁর রথ ত্রিচক্র ও দশটি কুন্দধবল অশ্বদ্বারা বাহিত। ইনি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা ইনি রোহিণীর প্রতি অধিকতর প্রত্যনুরাগী ছিলেন। সেই হেতু ইহাঁর অন্য ভার্য্যারা দক্ষের নিকট ইহাঁর অসমদর্শিতার বিষয়ে অনুযোগ করায় তিনি ইহাঁকে [illegible] প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। চন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করায় দক্ষ ইহাঁকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। চন্দ্র সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া শ্বশুরের আদেশ পালন করিলে, ইহাঁর রোগের উপশম হয়। অনন্তর ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। কথিত আছে যে, ইনি বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে বুধ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবগুরুর অপমানে দেবতারা ইহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, ইনি শুক্রাচার্য্য ও অসুরগণের শরণাপন্ন হন। তখন দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে দেবাসুরে যুদ্ধ রহিত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত—মগধ রাজ্যের স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ নরপতি। মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের ঔরসে তদীয় মুরানাম্নী এক শূদ্রাদাসীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনি মগধে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইহাঁর মাতার নামানুসারে মৌর্য্যবংশ নামে খ্যাত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি বিশিষ্ট বুদ্ধিশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। যৌবনের প্রারম্ভে পিতৃনিদেশে ইনি পঞ্জাবে অবস্থিতি করেন। নানা কারণে ইনি অনেকের হিংসার পাত্র হওয়ায় মগধরাজ্যের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন।

এই সময়ে খ্যাতনামা গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার (সেকন্দার) পঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হন।

ইঁহার সহায়তায় মগধরাজ্য আক্রমণের সুবিধা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া চতুর আলেকজাণ্ডার ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ইঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। তখন চন্দ্রগুপ্ত প্রাণভয়ে সে স্থান হইতেও পলায়ন করেন।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত বিখ্যাত কূটরাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত চাণক্যের শরণাপন্ন হন। চাণক্য স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩১৬ খৃঃ পূঃ)। কালসহকারে চন্দ্রগুপ্ত একজন অসামান্য প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উ[illegible] যে দৃঢ় ভিত্তির উপর রাজ্যস্থাপন করিয়া যান, তাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার সেনাপতিরা ভাগ করিয়া লন। প্রধান সেনানী সেলিউকস পূর্ব্বাঞ্চল প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে অগ্রসর হইলে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে গ্রীকদিগের পরাজয় হয়। অনন্তর চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের এক রূপবতী কন্যাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া এবং গ্রীকদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেলুকসের সহিত সন্ধি করেন, এবং এই সকলের বিনিময়ে মিগাস্থিনিস্ একজন গ্রীক রাজদূতকে আপনার সভায় থাকিবার অনুমতি দেন। চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ২৯০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

চন্দ্রহাস—নরপতিবিশেষ। ইনি অতিশয় রূপবান্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম চন্দ্রহাস হয়। কথিত আছে যে, এই রাজপুত্র শৈশবে পিতার বিপৎকালে অন্য রাজ্যে রক্ষিত হন। সেই রাজ্যের মন্ত্রী ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট ইঁহাকে উপস্থিত করেন। ইনি রাজভবনে গৃহীত হইয়া দাসীপুত্ররূপে পালিত হইতে লাগিলেন।

একদা সেই রাজভবনে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রহাসের রূপদর্শনে রাজজামাতা বিবেচনায় ইঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা এই ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ইঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ঘাতকদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে তাহারা ইঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া ইঙ্গিতদ্বারা শিরশ্ছেদের সময় জানাইবার প্রার্থনায় সম্মত হইল। ভগবৎকৃপায় ইতোমধ্যে তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইলে তাহারা ইঁহার প্রাণবধ না করিয়া ইঁহার অতিরিক্ত একটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহাস তখন বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অন্য এক রাজা মৃগয়ার্থ সেই বনে আসিয়া সুরূপ যুবক চন্দ্রহাসকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে সেই রাজা অন্যান্য উপহারদ্রব্যসম্ভারের সহিত চন্দ্রহাসকে পূর্ব্বোক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহাকে দর্শনমাত্র রাজার পূর্ব্বহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি একখানি পত্রসহ চন্দ্রহাসকে উদ্যানস্থিত স্বীয় পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে বিষপ্রদানে ইঁহার প্রাণবধের আদেশ ছিল। রাজপুত্র পত্রের অন্যরূপ অর্থ

বুঝিয়া বিষের পরিবর্ত্তে ইহাঁকে রাজতনয়া স্বীয় ভগিনীকে ভার্য্যার্থে প্রদান করিলেন।

অতঃপর তিনজনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন; তাঁহার ক্রোধানল অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তিনি চন্দ্রহাসের জীবননাশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা চন্দ্রহাসের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, বিবাহান্তে সকলকে কালীবাড়ীতে দেবীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত ঘাতককে নবজামাতার বধার্থে গোপনে উপদেশ দিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, মহামায়ার মায়ায় কালীবাড়ীতে রাজপরিবারস্থ সকলেই নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নির্ব্বিবাদে শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাপীড়—কাশ্মীরদেশের নরপতিবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম প্রতাপাদিত্য। এস্থলে প্রতাপাদিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের পুত্রসন্তান ছিল না, অনঙ্গলেখা নামে এক কন্যা ছিল। বালাদিত্য তাঁহাকে অশ্বথামবংশীয় দুর্লভবর্দ্ধন নামক এক সুপুরুষ কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন। কিন্তু কহ্লণপণ্ডিত দুর্লভবর্দ্ধন ও তাঁহার উত্তরপুরুষবর্গকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালাদিত্যের মৃত্যুতে রাজবংশের লোপ হইলে, কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনই কাশ্মীর রাজ্যে অভিষিক্ত হন। দুর্লভবর্দ্ধন লোকান্তর গমন করিলে তৎপুত্র দুর্লভক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতামহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্য নরেন্দ্রপ্রভা নাম্নী এক নর্ত্তকীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। এই নর্ত্তকীর গর্ভে প্রতাপাদিত্যের চন্দ্রাপীড়, তারাপীড়, ও অবিমুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা পিতৃমাতামহের বংশের রীত্যনুসারে যথাক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে খ্যাত হন।

৬৮৪ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইলে, চন্দ্রাপীড় পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাঁর মহিষীর নাম প্রকাশা। ইনি অতিশয় প্রজারঞ্জন রাজা ছিলেন। ইনি বিবিধ সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া ন্যায়সম্মত শাসনে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন। পরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি নয় বৎসরের অধিক রাজ্যশাসন করিতে পান নাই। রাজ্যলোলুপ স্বীয় ভ্রাতা তারাপীড়ের নিয়োজিত ব্রাহ্মণের অভিচারকার্য্য দ্বারা ইনি ৬৯৩ খৃঃ অব্দে নিধন প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রাপীড়ের ন্যায়বিচারের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রকটিত হইতেছে। এক সময়ে ইনি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনের অভিলাষী হইয়া একটি মন্দিরনির্ম্মাণের আদেশ দেন। মন্দিরের স্থান মনোনীত হইলে তথাকার অধিবাসী প্রজাদিগকে ন্যায্য মূল্য লইয়া তাহাদিগের অধ্যুষিত স্থান বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে বলা হইল। সকলেই যথোচিত মূল্য পাইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল,

কেবল এক চর্ম্মকার তাহার আবাস বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইল। চন্দ্রাপীড় এই কথা শুনিয়া স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন যে, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মূল্য লইয়া তাহার আবাস বিক্রয় না করিলে, রাজার বলপূর্ব্বক তাহা লইবার অধিকার নাই। অতঃপর চন্দ্রাপীড় স্বয়ং সেই চর্ম্মকারগৃহে গমন করিলে, সে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে উপযুক্ত অর্থ লইয়া বাসস্থান বিক্রয় করিয়া উঠিয়া গেল।

চন্দ্রাবলী—ব্রজবাসিনী গোপীবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অতি প্রিয় সখী। রাধার খুল্লতাত চন্দ্রভানুর ঔরসে তৎপত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। গোবর্দ্ধনমল্লের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। অন্যান্য ব্রজবাসীর ন্যায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণের রূপেগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন।

চরক—প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার মুনিবিশেষ। কথিত আছে যে, ইনি ব্রহ্মা, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, ও অগ্নিবেশের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন; ইহাঁর প্রণীত "চরক-সংহিতা" চিকিৎসাশাস্ত্রের অমূল্য রত্ন।

চাঁদ কবি—সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি কবিবিশেষ। ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দু নরপতি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস-সম্বন্ধে ইনি "পৃথ্বীরায় রাসৌ" নামক পুস্তক হিন্দি কবিতায় তিন খণ্ডে প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

চাঁদ রায়—১। রাজমহলবাসী একজন বহু-সম্পত্তিশালী জমিদার। ইনি ধনাঢ্য হইয়া অসচ্চরিত্র ও দস্যু দলপতি হইয়াছিলেন। প্রজাপীড়ন ও পরধনহরণই ইহাঁর প্রধান ব্যবসায় ছিল। সতীর সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি দুষ্কার্য্য ইহাঁর অঙ্গভূষণ ছিল। ক্রমে এতদূর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, নবাব সরকারে রাজকর প্রেরণ রহিত করিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়াও ইহাঁর কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল,—দস্যুপতি চাঁদরায় উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ সন্তোষরায় অনেক বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করা-ইলেন, কিন্তু রোগের প্রতীকার হওয়া দূরে থাকুক, পাপের ফল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সন্তোষরায় গড়ের হাট নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া জ্যেষ্ঠকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। কিছুদিন পরেই চাঁদরায় আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি ইহাঁর মতি গতি ফিরিয়া গেল। সর্ব্বপ্রকার গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ইনি সাধু-শীল ও পরম বৈষ্ণব হইলেন। ঐশী শক্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা!

২। বিখ্যাত বার ভুঁয়ার মধ্যে এক-জন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শ্রীপুর ইহাঁর রাজধানী। ইনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নিজ বাহুবলে সন্দ্বীপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ইনি নিজের অধিকার মধ্যে নানাস্থানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কেদারনাথ নামে ইহাঁর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। চাঁদ রায়ের বংশ নাই। কিন্তু কেদার রায়ের বংশ আছে।

চাঁদ সদাগর—স্বনামখ্যাত বণিক্‌বিশেষ।

ইহাঁর পুত্রের নাম নখিন্দর। চম্পাই নগরে ইহাঁর বাস ছিল। ইনি মনসা-দেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। ইহাতে মনসা অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হওয়ায়, নখিন্দর বিবাহরাত্রিতে বাসরঘরে সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পতিপ্রাণা বেহুলা পতিশোকে ম্রিয়মাণা হইয়া নানা-বিধ স্তবস্তুতিতে মনসাদেবীকে তুষ্ট করিলে, তিনি প্রসন্না হইয়া নখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। তদবধি চাঁদ সদাগর মনসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন।

চাণক্য —কূটরাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত-বিশেষ। তক্ষশীলা ইহাঁর আদি বাস-ভূমি। ইনি প্রথমে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের জন্য যত্নশীল হন। কথিত আছে, বিবাহের পাত্রী স্থির হইলে, বিবাহার্থ গমন করি-বার সময়ে পথে ইহাঁর চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ায় তাহা হইতে রুধির পাত হয়। কাজেই সেদিন বিবাহ স্থগিত থাকে। চাণক্য কুশকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে তথায় অবস্থিত হইয়া কুশমূলে তক্র ঢালিতে থাকেন। এই সময়ে মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের মন্ত্রী শটকার সেই স্থলে উপস্থিত হন। তিনি ইহাঁর সেই কঠোর প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিয়া এবং তৎপালনার্থ ইহাঁর ঐকান্তিক অধ্যবসায় দেখিয়া স্বীয় শত্রুরাজ্যের অপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইহাঁকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন।

শটকার কৌশলে মহানন্দ দ্বারা চাণ-ক্যের অপমান করাইলে, চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর মগধরাজ্যলোলুপ চন্দ্রগুপ্ত ইহাঁর সহিত মিলিত হইলে, ইনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্র-গুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। চাণক্যের বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্তের রাজশ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহাঁর মন্ত্রণায় চালিত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত অচিরে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁর শেষ জীবনে চন্দ্র-গুপ্তের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় ইনি পাটলীপুত্র ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। চাণক্য পণ্ডিতের সঙ্কলিত শ্লোকসমূহ নীতিশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

চার্ব্বাক—১। নাস্তিক মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতবিশেষ; ইহাঁর মতে, "সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; পরলোক নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, ইত্যাদি।" কথিত আছে যে, বৃহস্পতি এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক; চার্ব্বাক বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট এই মত প্রাপ্ত হন।

২। রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস কৌরবগণের পক্ষাবলম্বী ও পাণ্ডবদিগের বিপক্ষ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরাদি যৎকালে ব্রাহ্মণগণসহ হস্তিনা-পুরে প্রবেশ করেন, তৎকালে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে। পরে ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহাকে ভস্মীভূত করেন।

চিত্রগুপ্ত—যমবিশেষ, চতুর্দ্দশ যমের এক যম; যমরাজের লেথক-কর্ম্মচারী। ব্রহ্মার কায় হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। পিতার আদেশে ইনি চণ্ডিকার প্রীত্যর্থে তপস্যা করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া ইহাঁকে পরোপকারী, স্বাধিকারস্থ, ও চিরজীবী হইবার বর প্রদান করেন। ইনি ইরাবতী ও দক্ষিণা নাম্নী দুইজন ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ইহাঁর দ্বাদশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনেকে বলেন, চিত্রগুপ্তের ঐ সকল পুত্রই কায়স্থগণের আদি পুরুষ।

চিত্ররথ—গন্ধর্ব্ববিশেষ। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর অপর নাম অঙ্গারপর্ণ। সময়ে সময়ে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করিতেন, তাহা হইতেই 'চিত্ররথ' নাম প্রাপ্ত হন। ইনি একদা মর্ত্ত্যে গঙ্গাতীরে জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরী হইতে পঞ্চালে গমনকালে তথায় উপস্থিত হন। চিত্ররথ তাঁহাদের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার হস্তে বন্দী হন। পরে দয়াশীল যুধিষ্ঠিরের কৃপায় ইনি মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর চিত্ররথ অর্জ্জুনের সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে চক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করেন।

চিত্রলেখা—অসুররাজ বাণতনয়া উষার প্রিয়তমা সহচরী; বাণের অন্যতম মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা। ইনি চিত্রবিদ্যায় অতিশয় নিপুণা ছিলেন। উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্তা হইলে চিত্রলেখা তাঁহাকে নানাদিগ্দেশীয় রাজকুমারগণের চিত্র প্রদর্শন দ্বারা কৌশলে তাঁহার প্রকৃত প্রণয়পাত্রের কথা জানিয়া লন। অতঃপর ইনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং নারদের নিকট শিক্ষিত তামসীবিদ্যার প্রভাবে অন্যের অগোচরে অনিরুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। অনন্তর ইনি অনিরুদ্ধকে লইয়া বাণরাজপুরীতে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া উষার সহিত মিলন সঙ্ঘটন করিয়া দেন।

চিত্রসেন—ইন্দ্রের সভাসদ্ গন্ধর্ব্ববিশেষ, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র এবং স্বর্গের নৃত্যগীতাদির অধ্যক্ষ। বনবাসকালে অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন। এক সময়ে দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রায় গমন করিলে তাঁহার সৈন্যগণ এই গন্ধর্ব্বের বন ভগ্ন করে। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে কর্ণাদি বীরগণকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণসহ দুর্য্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে ইহাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইনি অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন।

চিত্রাঙ্গদ—শান্তনুর পুত্র; সত্যবতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়; শান্তনুর মৃত্যু হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণ না করায় ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং নানা দেশ জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। একদা ইনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সরস্বতীতীরে এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চিত্রাঙ্গদা—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভার্য্যা।

২। মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে মণিপুরে উপস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হন। চিত্রভানু অর্জ্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু এই নিয়ম করিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে, তিনিই মণিপুরের রাজা হইবেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে, অর্জ্জুন এক বৎসর কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন, এবং তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর অর্জ্জুন স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরেই রহিলেন। কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুরে উপস্থিত হইলে অশ্ব লইয়া পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জ্জুন হতচেতন হইলে, তাঁহার অন্যতমা পত্নী উলুপীর সহায়তায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। তখন চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর যজ্ঞকালে ইনি হস্তিনায় গমন করিয়া পতিসহ বাস করিতে লাগিলেন। [চিত্রাঙ্গদ দেখ]

চৈতন্য—আধুনিক বৈষ্ণবমতের প্রধান প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবেরা ইহাঁকে পূর্ণব্রহ্ম ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি ভগবানের অংশাবতার। সে যাহা হউক, ইনি যে একজন প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ সাধক ও হরিনাম সাধক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। এই মহাপুরুষ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজধানী পবিত্র নবদ্বীপধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে তৎপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অনেকগুলি নাম ছিল। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া ইনি প্রথমতঃ নিমাই নামে কথিত হন, পরে অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহার নামকরণ হয় বিশ্বম্ভর; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া অনেকে ইহাঁকে গৌরাঙ্গ বলিত; এবং উত্তরকালে সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে ইনি চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন। এই শেষ নামেই ইনি সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত।

বাল্যকালেই চৈতন্য অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়াও ইনি সতত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। এই সময়ে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ায়, চৈতন্য অন্তরে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ইহাঁর পিতৃবিয়োগে চৈতন্যই শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল হইলেন। অতঃপর শচীদেবীর চেষ্টায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী আর একটি সুশীলা কন্যার সহিত ইহাঁর পরিণয় হইল।

একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য স্বয়ং চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইহাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

খ্যাতনামা পণ্ডিতসকল বিচারে ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাঁর সৌজন্যে এবং সরল ও সাধু ব্যবহারে কেহই ইহাঁর উপর রাগ করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ ইনি একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। একদিন রজতশুভ্র চন্দ্রিকাময়ী রজনীতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে ইনি শিষ্যগণ সহ বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমাগত হইয়া বলিলেন, "ওহে নিমাই, তুমি নাকি বড় পণ্ডিত।" নিমাই (চৈতন্য) অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন্, আমরা শুনিয়া সুখী হই।" আগন্তুক পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকগুলির দোষাদোষ প্রদর্শনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও অলঙ্কারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। তখন আত্মাভিমানী পণ্ডিতপ্রবর অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া চৈতন্যকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চৈতন্য অতি উদারস্বভাব ছিলেন। একদিন ইনি অপর একটি পণ্ডিতের সহিত এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইতেছিলেন। পণ্ডিত, চৈতন্যের হস্তে ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইনি তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত বলিলেন, "আমিও একখানি ন্যায়ের টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে?" এই কথা শুনিবামাত্র চৈতন্য নিজের কৃত টীকা খানি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে নিমাই পিতৃক্রিয়ার্থ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুপদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্তব, স্তুতি, পূজা, বন্দনা প্রভৃতি দর্শনে ও শ্রবণে ইহাঁর হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্থানে ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত আলাপে ইহাঁর ভক্তিস্রোতে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কয়েক দিন পরে নিমাই ব্রহ্মচারীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় এখন হইতে ইহাঁর কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞান সার হইল।

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিধ্যান ভিন্ন অন্য কিছু এখন আর ইহাঁর হৃদয়ে স্থান পাইত না। নিমাই ভক্তিপ্রেমে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। সংসারের কাজকর্ম্ম আর ইহাঁর ভাল লাগিত না, কাজেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। অতঃপর ইনি অধ্যাপনা কার্য্যও বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময়ে হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই ইহাঁর মুখে আসিত না। এক্ষণে নিমাই সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহাঁর ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর সহিত মিলিত হইলেন। যবন হরিদাস হরিনাম-রসে আর্দ্র হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া ইহাঁদের সহিত যোগ দিলেন [হরিদাস দেখ]। ভক্ত বৈষ্ণবসকল

একজাতীয়; তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিচার নাই। তাঁহারা জানিতেন

"চাণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ।"
"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥

অতঃপর নিমাই সাধুভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া কেবলঃ হরিনামরসে মগ্ন হইয়া রহিলেন। সাধন ভজন ভিন্ন ইহাঁর আর অন্য কার্য্য রহিল না। সংসারে থাকিয়াও ইনি কেবল ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও চৈতন্যের মনের আশা মিটিল না। ইনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা ছিন্ন করিয়া এক দিন নিশাকালে গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বৃদ্ধা জননী, যুবতী ভার্য্যা ও প্রিয় সহচরবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমাই পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলে, সেখানে শচীদেবী ও ভক্তবৃন্দ ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; অতঃপর ইনি মধুরসম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধু ইহাঁর সহিত গমন করিলেন। পুরীর নিকটবর্ত্তী হইলে, জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত ইহাঁর আগ্রহ এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, ইনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইনি অনুরাগের আবেগে তাহা ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন, এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সঙ্গিগণ দ্রুতপদে আসিয়া হরিনামের ধ্বনিতে ইহাঁর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

নীলাচলে অবস্থানের সময়ে পুরীরাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সহিত ইহাঁর বন্ধুতা জন্মে। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, চৈতন্য বড় বেশী কিছু জানেন না বা বুঝেন না; তিনি চৈতন্য ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে একদিন

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং মিথং ভূতগুণো হরিঃ॥

শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিয়া চৈতন্যের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন।

অতঃপর ইনি নীলাচলেই আপনার আবাস স্থির করিলেন। ভাগবত হরিদাস প্রভৃতি দুই একজন ধর্ম্মবন্ধু ইহাঁর নিকটে রহিলেন। অনন্তর ইনি নিত্যানন্দকে দেশে ফিরিয়া যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে বলিলেন। ইহার পর চৈতন্য কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিলেন। তথায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে একবার দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে আবার নীলাচলে গমন করিলেন। সেইস্থানে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ইনি তিরোহিত হন (১৫৩৩ খৃঃ)।

চৈতন্যের মতে ভক্তিই ভগবতপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তদ্গতচিত্তে হরিনাম

করিতে পারিলে জীবমাত্রেরই মুক্তি হয়। ইনি বলিতেন, বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্লোকের উপদেশই যথার্থ। হরিনামই একমাত্র সার পদার্থ; কলিতে মুক্তির অন্য উপায় নাই। এই জন্য চৈতন্য যেমন নিজে সর্ব্বদা হরিনাম করিতেন, তেমনি অন্যকেও সেই পথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। নীলাচলে অবস্থানের সময়ে উৎকলবাসী জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ চৈতন্যকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন। গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, "আমি লক্ষপতি ভিন্ন অন্যের গৃহে আহার করি না।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ মনে বলিলেন, "তাহা হইলে এ নির্ধনদেশে কেহই আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুখী হইতে পারিবে না।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "যে ব্যক্তি লক্ষ হরিনাম জপ করে, তাহাকেই আমি লক্ষপতি বলি।"

চৈৎসিংহ—কাশীরাজবিশেষ। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির অবস্থায় বারাণসী প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের অধীন হইয়া পড়ে। কাশীরাজ অযোধ্যার নবাবকে কর দিতেন। কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ ইংরাজদিগের সহায়তায় নবাব সুজাউদ্দৌলাকে অপদস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, নবাব তদীয় বংশধরদিগকে কাশীরাজ্য হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজরা তাহাতে বাধা দিয়া বলবন্তের পুত্র চৈৎসিংহকে কাশীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চৈৎসিংহ নবাবকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কর দিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু নিয়ম হইল যে, অতঃপর আর কখনও করবৃদ্ধি হইতে পারিবে না। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌল্লার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আসফদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হইলেন। তাঁহাদের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তদ্দারা কাশীরাজ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইল। নিয়ম হইল যে, চৈৎসিংহ নবাবের পরিবর্ত্তে ইংরেজদিগকে বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিবেন; কিন্তু তিনি অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন থাকিবেন, এমন কি প্রকৃত স্বাধীন রাজার ন্যায় স্বনামে মুদ্রা পর্য্যন্ত চালাইতে পারিবেন। কিছুদিন বেশ সদ্ভাবেই চলিল। ইতোমধ্যে হায়দর আলি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে অপরিমিত ব্যয় হওয়ায় ইংরেজের কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। এই ব্যয় পূরণ করিবার নিমিত্ত তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস চৈৎসিংহকে বার্ষিক আরও পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক কর দিতে বলিলেন। চৈৎসিংহ দুই এক বৎসর এই কর দিয়া অসঙ্গতি বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক সন্ধির নিয়মাতিরিক্ত কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। হেষ্টিংস তখন তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিলেন যে, তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই বলিয়া হেষ্টিংস স্বয়ং কাশী গমন করিলেন, এবং চৈৎসিংহের বিরুদ্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না থাকিলেও তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন। অতঃপর কয়েক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চৈৎসিংহ তাঁহার অধিকাংশ ধনসম্পত্তি লইয়া গোয়ালিয়রে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজরা তাঁহার ধনাগারাদি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার একটি দুর্গে ৫০ লক্ষ টাকার ধনরত্ন প্রাপ্ত হই-

লেন। তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে এই অর্থ সৈনিকগণ আপনারা ভাগ করিয়া লইল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কিছুই লাভ হইল না। লাভের মধ্যে ঈদৃশ অন্যায়াচরণ জন্য হেষ্টিংস লোকের অধিকতর বিরাগভাজন হইলেন। অতঃপর চৈৎসিংহের ভ্রাতৃপুত্র অধিক অর্থ প্রদানে সম্মত হইলে, হেষ্টিংস তাঁহাকেই কাশীরাজ্য প্রদান করিলেন।

চ্যবন—ঋষিবিশেষ। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে গর্ভস্থ বালক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হন, তাহাতেই ইহাঁর নাম চ্যবন হয়। দুরাত্মা রাক্ষস ইহাঁর তেজে ভস্মীভূত হয়।

উপযুক্ত বয়সে চ্যবন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তপস্যা করায় ইহাঁর শরীর বল্মীক দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। একদিন রাজা শর্যাতি সপরিবারে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে, রাজার সুকন্যানাম্নী দুহিতা কণ্টক দ্বারা বল্মীকমধ্যস্থ ঋষিবরের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিদ্ধ করেন চ্যবন রাজসৈন্যের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন রাজা ইহাঁকে স্বীয় দুহিতা ভার্য্যার্থে প্রদান করিয়া ইহাঁর তুষ্টি বিধান করেন।

অতঃপর চ্যবন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভার্য্যা সুকন্যাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে ইনি নবযৌবন লাভ করিলেন। সুকন্যার গর্ভে ইহাঁর প্রমতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্বীয় শ্বশুরের যজ্ঞে ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করিতে দেন। তাহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া ইহাঁর বিনাশার্থে বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত করেন। অনন্তর চ্যবন তপোবলে এক অসুর সৃজন করিয়া তাহাকে ইন্দ্রের প্রাণনাশার্থ আদেশ করেন। তখন দেবরাজ চ্যবনের শরণাপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

ছায়া—সূর্য্যপ্রিয়া। সূর্য্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে আপনার অনুরূপ ছায়াকে সৃজন করেন। অতঃপর তিনি ছায়াকে পত্নীভাবে পতির নিকট রাখিয়া এবং স্বীয় সন্তানদিগকে ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বামীকে না বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সূর্য্যের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের ঔরসে ইহাঁর গর্ভে সাবর্ণিমনু ও শনি নামক দুই পুত্র ও তপতী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। সপত্নীর সন্তানদিগকে অযত্ন করায় তাঁহারা ইহাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। যম ইহাঁকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হওয়ায় ইনি অভিশাপ প্রদানে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ করিয়া দেন।

জগৎ শেঠ—মুর্শিদাবাদবাসী সুপ্রসিদ্ধ বণিক্‌বংশ। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে,—রাজদত্ত উপাধিমাত্র। শেঠ কথাটী শ্রেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। অধুনা এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত সংক্ষিপ্তসার ইতিহাসগুলিতে যেরূপভাবে জগৎশেঠ শব্দটীর ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে উহা একজন লোকের নাম বলিয়াই সহজে ধারণা হয়। পরন্তু সেরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাঁহার পূর্ণ নাম

মহতাব রায় জগৎশেঠ। তাঁহার কথা পরে বলিব।

রাজপুতানার মধ্যস্থ যোধপুর রাজ্যান্তর্গত নাগর নামক নগরে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। প্রায় তিন শত বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা তথা হইতে অন্যান্য মাড়ওয়ারী বণিক্‌দিগের সহিত গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় হীরানন্দ সা প্রথমে পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে পাটনায় ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির কুঠি ছিল। হীরানন্দের সাত পুত্র। এই সাতজনই পিতার ন্যায় ভারতের নানা স্থানে মহাজনী ও হুণ্ডির কাজ করিতেন; জ্যেষ্ঠপুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। এই খানে থাকিয়াই মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ানী করিতেন। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া মুকসদাবাদে উঠিয়া আসিলেন; তাঁহার নামানুসারে নবরাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ হইল। মাণিকচাঁদও নবাবের সহিত উঠিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিলেন। এখানে নূতন টাঁকশাল আরম্ভ হইল। মাণিকচাঁদ তাহার কর্তৃত্ব পাইলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর আবেদনানুসারে সম্রাট্ ফরুখ্‌শিয়ার মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন (১৭১৫ খৃঃ)। মাণিকচাঁদের পুত্রসন্তান না থাকায়, তিনি আপনার ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

১৭২২ খৃঃ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হইলে ফতেচাঁদ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যে একজন ধনকুবের হইয়া পড়িলেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে তিনি সম্রাট্ মহম্মদ সাঁহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, এক সময়ে সম্রাট্ মুর্শিদকুলির উপর বিরক্ত হইয়া ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উদারহৃদয় ফতেচাঁদ যাহাতে মুর্শিদকুলিই সিংহাসনে থাকিতে পান, তজ্জন্য আবেদন করেন। ইহাতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া ফতেচাঁদকে একটি বহুমূল্য সমুজ্জ্বল মরকত মণি প্রদান করেন; তাহাতে "জগৎশেঠ" নাম ক্ষোদিত ছিল। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলির মৃত্যু হইলে, সুজাউদ্দিন নবাব হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ তাঁহার অন্যতম প্রধান সচিব ছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরফরাজের কিঞ্চিৎ চরিত্রদোষ ছিল। এই লাম্পট্য-দোষেই তাঁহার সহিত ফতেচাঁদের বিবাদ হয়। ফতেচাঁদের পুত্রবধূ অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। কথাটা সরফরাজের কাণে গেল। নবাব সুন্দরীকে একবার দেখিতে চাহিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু পরে অত্যাচারের ভয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সুন্দরীর ধর্ম্মনষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু ধনকুবের জগৎশেঠ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ফতেচাঁদ আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত মিলিত হইয়া সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলি-

বর্দ্দিকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের মার্হাট্টা রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন, এবং জগৎ-শেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—দয়াচাঁদ ও আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের ঔরসে স্বরূপ-চাঁদ ও আনন্দচাঁদের ঔরসে মহতাব রায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" এবং মহতাব রায় "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠি আক্রমণ করিলে, ইংরেজ বণিক্‌গণ জগৎ-শেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা লইয়া নবাবকে প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি ইংরেজরা সময়ে সময়ে জগৎশেঠের নিকট অনেক উপ-কার প্রাপ্ত হন। এই জগৎশেঠ মহতাব রায়ই ইংরেজদিগের ভারতসাম্রাজ্যস্থাপ-নের সূত্রপাত করিয়া দেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র তরুণবয়স্ক উদ্ধত সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর সিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি মিরজাফর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই দুঃসময়ে সিরাজ জগৎশেঠ মহতাব রায়ের নিকট তিন কোটি টাকা চাহিয়া বসি-লেন। জগৎশেঠ তাহাতে আপত্তি করায় উদ্ধত সিরাজ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করি-লেন। ধনকুবের জগৎশেঠের এই অব-মাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ; অতঃপর অতি কষ্টে জগৎশেঠ মুক্তিলাভ করিলেন, এবং সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর এক ঘট-নায় লক্ষ্মীশ্বর মহতাব রায় সিরাজের উপর আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। কথিত আছে যে, অসামান্যা নামে জগৎশেঠের এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন; তেমন সুন্দরী নাকি বাঙ্গালায় আর ছিল না। তাঁহার উপর বিলাসব্যসনাক্ত কামুক সিরাজের কুদৃষ্টি পড়িল। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ধনকুবের জগৎশেঠের দুহি-তাকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয় দেখিয়া নবাব কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ রূপতৃষ্ণার মোহে অন্ততঃ একবার স্বচক্ষে দেখিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদনমানসে বেগ-মের বেশে রমণীমূর্ত্তিতে শেঠভবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কৌশলে শেঠতনয়াকে এক নিভৃত কক্ষে আনাইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ফলা-ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া আলিঙ্গন-মানসে সুন্দরীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। শেঠদুহিতার তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি ত্রস্ত হইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে স্বামীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণমাত্র শেঠজামাতা শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে এক লম্ফে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সিরাজ সেই সপ্তমহালবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদ অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে

ধরিয়া শতাধিকবার চর্ম্মপাদুকাপ্রহারে, ঘন ঘন মুষ্টিপ্রহারে ও চপেটাঘাতে কোমলকায় নবাবের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই মর্ম্মস্পর্শী দুঃসহ যাতনাপ্রদ নিদারুণ অবমাননার কথা সিরাজের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলবৎ আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে শেঠজামাতা রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন যবন-সেনানী হঠাৎ আসিয়া প্রকাশ্যে দিবালোকে সকলের সম্মুখে তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিল। ভয়ে সকল লোক পলায়ন করিল। অতঃপর সেই মস্তক রৌপ্য থালে রক্ষিত ও বহুমূল্য রুমালে আচ্ছাদিত হইয়া শেঠদুহিতার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হইল। জগৎশেঠ মহতাব রায় আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্লাইভ কর্ত্তৃক চন্দননগর অধিকারের পর সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। জগৎশেঠই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রথমে প্রস্তাব করিলেন। মিরজাফর তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পলাসীর রণক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মিরজাফর বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫৭ খৃঃ)। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মিরজাফর রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার জামাতা মিরকাসিম নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যখন ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি শুনিলেন, শেঠেরা ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন (১৭৬৩ খৃঃ)। জগৎশেঠের পুরমহিলাগণ যখন এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন যবনের হস্তে নিগৃহীত হইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহারা আগুন হাতে করিয়া বারুদের উপর বসিয়া রহিলেন। এই নিদারুণ সঙ্কটকালে ক্লাইভ গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহতাব রায় নবাবের বন্দী হইলেন। ইংরেজগণ ইঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেও নবাব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উদ্বনালার যুদ্ধে পরাজিত হইলে মিরকাসিম ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে আসিলেন, এবং সেখানেও রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় নাই দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহতাব রায়ের প্রাণবিনাশ করিলেন। দুই ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও দীধিতি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম যাদব চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। যাদবচন্দ্র নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জগদীশ বাল্যকালে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। তদুপরি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইঁহার দুর্ব্বৃত্ততা আরও বাড়িয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা একটা প্রধান রোগ ছিল। একদিন পক্ষিশাবক-গ্রহণ-মানসে এক প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ষীর কুলায় মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে এক বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হই-

লেন না; আর কোন উপায় না দেখিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সর্পও লেজ দিয়া ইঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু তাহাতেও ইনি ভীত হইয়া দিশাহারা হইলেন না। প্রত্যুত প্রত্যুৎপন্নমতি বলে তালশাখার করপত্রবৎ ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সর্পের মস্তক কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদবধি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ কার্য্য আর কখনও করিবেন না। একজন সন্ন্যাসী জগদীশের এইরূপ অসাধারণ সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসীর সীর কথায় জগদীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর,—অথচ অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় পরিশ্রমে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ কাব্যাদির পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার দুঃখের সীমা ছিল না। তৈলাভাবে রাত্রিতে রীতিমত পাঠ হইত না বলিয়া বাঁশের পাতা জ্বালাইয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। কাব্যাদির পাঠ শেষ হইলে জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ে ন্যায়শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া অধ্যাপকের নিকট তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে টোল খুলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রামস্থ লোকের সহায়তায় জগদীশ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশঃ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দূরদূরান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোল পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার পূর্ব্বে দীধিতি গ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, এ কারণে উহার অধ্যয়নে ব্যাঘাত হইত। সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত তিনি দীধিতির টীকা রচনা করিয়া ন্যায়জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে তর্কামৃত ও রহস্যপ্রকাশ নামক কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। জগদীশের দুই পুত্র, রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর; উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।

জগদেব পমার—বিষ্ণুভক্ত সাধুবিশেষ। ইনি অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, সর্ব্বদা অনন্যমনে হরিনাম সাধন করিতেন। পরমধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই ইঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইনি যে দেশে বাস করিতেন, সেই দেশের রাজতনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, রাজা ইঁহাকেই কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করিয়া ইঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইনি কিন্তু দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলে হরিসাধনের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর কীর্ত্তনশ্রবণার্থ একদিন সাধু জগদেব রাজবাটীতে গমন করিলেন। সুযোগ পাইয়া রাজকন্যা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন কেন? আমি আপনার ধর্ম্মসাধনের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিব না। আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই; আমার একমাত্র ইচ্ছা, আপনার সেবা করিয়া দেহ পবিত্র করি, এবং সর্ব্বদা হরিগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া

কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি। তখন জগদেব রাজবালাকে হরির অনুরাগিণী জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, এবং পরমানন্দে সস্ত্রীক হরিসাধন করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ—পুরুষোত্তম জগন্নাথ সম্বন্ধে এইরূপ কথার প্রসিদ্ধি আছে;—

এই মূর্ত্তি পুরীক্ষেত্রে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক স্থাপিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ সেই বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোন মহাপুরুষ সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন; অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হইলে, তিনি তাহাতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন যে, "আমার মূর্ত্তিনির্ম্মাণ সময়ে যদি কেহ তাহা দর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিব।" বিশ্বকর্ম্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিদর্শনার্থ একান্ত ঔৎসুক্যবশতঃ অধীর হইয়া যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্ম্মা অন্তর্হিত হইলেন। তখনও মূর্ত্তির হস্তপদাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অগত্যা মূর্ত্তি সেই অবস্থাতেই রহিল। পরে ব্রহ্মার তদবস্থ মূর্ত্তিই জগন্নাথদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—ইনি একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত। হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ কুলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। জগন্নাথের জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। রুদ্রদেব শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণে এবং শিষ্যযজমানের দ্বারা যাহা কিছু আয় হইত, তাহাতেই তিনি কায়ক্লেশে বহু পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। অনপত্যতা ও দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনি বহুদিন বড়ই অসুখী ছিলেন; পরে শেষাবস্থায় এক পুত্র লাভ করিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন।

পুত্রের নামকরণের সময় রুদ্রদেব স্বীয় শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে বালকের নাম জগন্নাথ রাখিলেন। কথিত আছে যে, 'বৃদ্ধ বয়সে রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে,' এই কথা কোন বিখ্যাত জ্যোতিষীর নিকট শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী সেই জরাজীর্ণ রুদ্রদেবকে আপনার বালিকা কন্যা সম্প্রদান করেন। পরে সেই কন্যার পুত্রকামনায় বাসুদেব পুরুষোত্তম গমনপূর্ব্বক পুরশ্চরণাদি নানা দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয় যে, "তোমার কন্যার গর্ভে এক অমূল্য রত্ন জন্ম গ্রহণ করিবে; তুমি গৃহে গমন কর, শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও।" তদনুসারে তিনি দৌহিত্রের নাম জগন্নাথ রাখেন।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় জগন্নাথের বিদ্যারম্ভ হয়। রুদ্রদেব তাঁহাকে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখাইতে লাগিলেন। পরে দুই চারিখানি সাহিত্যগ্রন্থও পড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার

অসাধারণ মেধা, অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও অলৌকিক প্রতিভাবলে অনায়াসে ঐ সকল দুরূহ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যে পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্যগুলি সমাপ্ত করিয়া জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাঁশবেড়িয়া গ্রামস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র।

ইতোমধ্যে পুত্রবৎসল বৃদ্ধ রুদ্রদেব পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং জগন্নাথের চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। অতঃপর জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি অল্পকালমধ্যে সেই অতীব দুরূহ শাস্ত্রে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ করিলেন। তথাপি তিনি আরও সাত আট বৎসর ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানাশাস্ত্রে সবিশেষ বু্ৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র। এ পর্য্যন্ত তিনি কেবল বিদ্যানুশীলনই করিয়াছিলেন, অর্থোপার্জ্জনের কথা একদিনও ভাবেন নাই। এক্ষণে সংসারের ভার মাথায় পড়িল দেখিয়া, জগন্নাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন। জগন্নাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কোনও রূপে গলার কাচা নামাইয়া শুদ্ধ হইলেন।

অতঃপর কায়ক্লেশে একখানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটি ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশলের গুণে ক্রমে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ও প্রতিভার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার মানসম্ভ্রম বাড়িয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিতলের "অমৃতী" জলপাত্র, অনধিক দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও তৃণাচ্ছাদিত নিতান্ত ভগ্ন একখানি ঘর ছিল। কিন্তু জগন্নাথ মৃত্যুকালে অন্যূন এক লক্ষ টাকা নগদ ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা লাভের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান।

ক্রমে দেশের তাৎকালীন প্রধান প্রধান সাহেব ও দেশীয়ের সহিত তর্কপঞ্চাননের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও নবাবের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস, সার জন শোর, প্রভৃতি বড় বড় লোক তাঁহার যথেষ্ট মান্য করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি হারিংটন সাহেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অগাধ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সার উইলিয়াম জোন্স তাঁহাকে এমন ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে তাঁহার বাটিতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দেশে সে সময়ে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। এই

ব্যাপার অবগত হইয়া সার উইলিয়াম জোনস নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী জগন্নাথের বাটীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এবং 'হেদে পোতা' নামক একখানি তালুক প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র জগন্নাথকে অনেক নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে উখুড়া পরগণায় সাত শত বিঘা ভূমি প্রদান করেন। জগন্নাথের বংশাবলী সেই জমির আয় হইতে অদ্যাপি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কথিত আছে যে, সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট তর্কপঞ্চাননের দ্বারা দুরূহ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির অনুরোধে জগন্নাথ "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ্-ভঙ্গার্ণব" নামক দুইখানি দায় সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সঙ্কলন সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৭০০৲ টাকা এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মাসিক ৩০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তদ্ভিন্ন তিনি রামচরিত বর্ণনাদি বিষয়ে দুই একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা এবং ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথের বুদ্ধি ও মেধা যে কত প্রবল ছিল, তাহা বলা যায় না। এমন কি তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিলেও দোষাবহ হয় না। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে পশ্চাল্লিখিত অদ্ভুত গল্পের প্রসিদ্ধি আছে। একদিন তিনি ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে একখানা বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বজরা হইতে দুই জন গোরা তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কথান্তর হইতে হইতে দুইজনে শেষে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। জগন্নাথ আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদিগের ঝগড়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় পরস্পরের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ সাক্ষী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "আমাদের সাক্ষী কেহই নাই, তবে আমরা যখন ঝগড়া করি, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের ধারে হাত পা নাড়িয়া কি করিতেছিল"। অনুসন্ধানে বিচারপতি জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। বিচারপতি কর্ত্তৃক আহূত ও সাহেবদ্বয়ের বিবাদের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্কপঞ্চানন বলিলেন, "উহারা মারামারি করিয়াছে দেখিয়াছি, দুইজনের বচসাও শুনিয়াছি; কিন্তু ইংরেজী জানি না বলিয়া উহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, তবে কে কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল, অবিকল বলিতে পারি।" এই বলিয়া যে যাহাকে যাহা বলিয়াছিল, পর পর সমুদায় অবিকল বলিলেন। বিচারপতি শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার এতাদৃশী স্মৃতিশক্তি অতি প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল তাঁহার আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল।

জগন্নাথ যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অত্যুৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, তেমনি অতি দীর্ঘজীবনও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১১১ বৎসর হইয়াছিল। তত বয়সেও তাঁহার দর্শন বা শ্রবণশক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

জগন্নাথের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ কালিদাস, মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্র, এবং কনিষ্ঠ রামনিধি। মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। ঐ সকল সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনুরূপ পৌত্র ঘনশ্যামের অকাল মৃত্যুতে জগন্নাথ শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে আর্য্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রন্থাবলী অতুলনীয়—বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-বিষয়ক।

১। **সাহিত্য-চিন্তা।** এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **কাব্যচিন্তা।** রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **কাব্যসুন্দরী** দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সৃষ্টিচাতুর্য্য এবং সুন্দরীগণের চরিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সামাজিক।

৪। **সমাজতত্ত্ব।** হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

৫। **সমাজচিন্তা।** বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ধর্ম্মবিষয়ক।

৬। **দেবসুন্দরী।** হিন্দু দেবদেবীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৭। **হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ।** প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হওয়াতে এই গ্রন্থ সর্ব্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১।০ মাত্র।

৮। **সৃষ্টিবিজ্ঞান।** পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২০১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ধূমদত্ত বণিক্ পূজিল মমুই পুরে।
রাজা হরিশ্চন্দ্র পূজে বম্বুকার ধারে॥
পুত্রবর নিলেন মদনা পাটরাণী।
আদ্যা পূজা সাবধানে দিল নৃপমণি॥
পূজিল অনেক ভক্ত অবনী ভিতরে।
কলিকালে পূজা হবে কেমন প্রকারে
স্বর্গবাসী হোল মোর সেবক সকল।
কে আর দিবেক কলিকালে পুষ্প জল
এত যদি কহিল ঠাকুর নিরঞ্জন।
যোড় হাতে বিধাতা করেন নিবেদন॥
ইন্দ্রের নাচনী নাম আছে অম্বুবতী।
কলিযুগে প্রকাশিবে পূজার পদ্ধতি॥
গৌড়েশ্বর রাজা গৌড়ে মহেন্দ্র পাতর।
ভানুমতী পাটরাণী পাত্র সহোদর॥
তার পিতা বেণু রাজা রমতিনিবাসী।
মুন্দুরা নামেতে বেণু রাজার মহিষী॥
জন্ম নেক্ তার গর্ভে ইন্দ্রের নাচনী।
অম্বুবতী নাম যার রূপেতে বাখানী॥
নাম হবে রঞ্জাবতী অবনী ভিতর।
বিবাহ করিবেক কর্ণ সেন নৃপবর॥
শালে ভর দিবে রঞ্জা চাঁপাই ভিতরে।
নেয়াদিত্য জন্ম নিবে রঞ্জার উদরে॥
হাকন্দে দিবেক সেন পশ্চিম উদয়।
তবে সে তোমার পূজা কলিযুগে হয়॥
অম্বুবতী নৃত্য করে ইন্দ্রের মহলে।
তারে শাপ দেয় জন্ম নেবে মহীতলে॥
ঠাকুর দিলেন সায় দেবতা সকল।
নৃত্য দেখিবারে চলে ইন্দ্রের মহল॥
ইন্দ্রের মহলে হবে ধর্ম্মের বিরাম।
আজ্ঞা পেয়ে বিমান সাজান হনুমান॥
উর্দ্দাল ঘণ্টের ঘণ্টা বাজে রণ রণ।
রথ লয়্যা যোগাইল পবননন্দন॥
আরোহণ হইল রথে ধর্ম্ম যুগপতি।
চলিল ধর্ম্মের রথ উলুক সারথী॥
ব্রহ্মা আদি দেব লয়্যা চলে করতার।
চামর ঢুলায় হনু পবনকুমার॥
অবিলম্বে পাইল রথ ইন্দ্রের ভবন।
আনন্দিত হোলো রাজা সহস্রলোচন॥
বিধি হর উদ্দেশে সেবনা করে যার।
হেন ব্রহ্মা উপনীত মন্দিরে আমার॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
সকল দেবতা বৈসে আনন্দিত মন॥
নারদে বলেন ইন্দ্র শুন মন দিয়া।
অম্বুবতী নাচনীকে আন ডাক দিয়া॥
তাণ্ডব দেখিবে তার সকল অমর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান গুণে মায়াধর॥
এত শুনি সহস্রলোচন দেবরায়।
অম্বুবতী নাচনীকে আনান ত্বরায়॥
ইন্দ্র বলে বিদ্যাধরী কর অবধান।
কেবা ভাগ্যবতী আছে তোমার সমান
তব নৃত্য দেখিবারে ধর্ম্মের আগমন।
মুখ চেয়া আছেন সকল দেবগণ॥
শুনিবে তোমার গান সকল অমরে।
নাচ বেশ কোরে এস গান করিবারে॥
সাবধানে গান কর ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
দুই মন করিলে যাইবে অধঃপাতে॥
আজ্ঞা দিল এত বলি মঘবান রায়।
স্নান করিবারে তবে অম্বুবতী যায়॥
মন্দাকিনী জলে নটী করিবারে স্নান।
রাজহংস গমনেতে করিল পয়ান॥
রূপে গুণে দশদিক রাঙ্গা ফুল কাণে।
রস কথা সদাই সকল সখীগণে॥
স্নান করিবারে যদি করিল পয়ান।
অভয়া লইয়া কিছু কর অবধান॥

কৈলাসেতে পদ্মার সঙ্গে করেন যুক্তি।
মন দিয়া শুন পদ্মা আমার ভারতী॥
এক যুক্তি হোয়েচে সকল দেবতার।
কিরূপে ধর্ম্মের পূজা হইবে এবার॥
মোর দাসী অম্বুবতী কেবা নাহি জানে।
জন্মাইতে চায় তারে মরত ভুবনে॥
আমি সখা থাকিলে নটীর বিঘ্ন নাই।
তবে কলিযুগে পূজা না পাবে গোঁসাই॥
আকাশগঙ্গাতে স্নান করিবারে এসে।
আজ দেখা দিব বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে॥
ভবানী বলেন যদি চিনিতে না পারে।
অভিশাপ দিয়া আমি আসিব তাহারে॥
এত বলি হোল বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ।
বদনে দশন নাই শিরে পাকা কেশ॥
চলে যেতে অভয়ার অঙ্গে ঘাম ছুটে।
আরম্ভিল শিবপূজা মন্দাকিনী ঘাটে॥
পথ আগুলিয়া দেবী বসিলা তখন।
হেন বেলা অম্বুবতী দিলা দরশন॥
পথ ছেড়ে দাও বুড়ী অম্বুবতী বলে।
উচ্চুর হইল বেলা গগনমণ্ডলে॥
নৃত্য করিবারে যাই ইন্দ্রের নগর।
মোর নৃত্য দেখিবে ঠাকুব মায়াধর॥
শিবলিঙ্গ পূজিবে অন্তর করে লও।
ঘর যাই স্নান করে পথ ছেড়ে দাও॥
অম্বুবতীর বচন শুনিয়া বুড়ী বলে।
লক্ষ পথ আছে নটী গঙ্গার দুকূলে॥
বসেছি এখানে আমি অনেক যতনে।
গায়ের গরবে পথ না দেখ নয়নে॥
বয়সের ধর্ম্ম বাছা তোর দোষ নয়।
যমরাজা আমারে দেখিয়া করে ভয়॥
হরিহর বিধি দেখে কাঁপয়ে তরাসে।
এত শুনি অম্বুবতী খল্ খল্ হাসে॥
পৃষ্ঠে কুব্জ দুরন্ত অন্ধক দুই আঁখি।
পথে ব'সে বুড়ির বড়াই বড় দেখি॥
সাতকালি পরিধান তিনকাল গেছে।
তোমারে দেখিয়া বুড়ী দেবতা কেঁপেছে॥

উঠ্ বুড়ি বলিয়া বুড়িকে ঠেলে ফেলে।
ঝাঁপ দিয়া সুন্দরী পড়িল গঙ্গাজলে॥
গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বিদ্যাধরী।
কোপযুক্ত হয়্যা শাঁপ দিলেন ঈশ্বরী॥
চিনিতে নারিলে আমায় অহঙ্কার করে।
পৃথিবীতে জন্ম লও বেণু রাজার ঘরে॥
বুড়ী বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া গেলি পথে।
অ মা হোতে বৃদ্ধপতি পাবি পৃথিবীতে॥
যৌবন কালেতে তোর না পূরিবে সাদ।
ভাই হোয়ে তোমাকে দিবেন বন্ধ্যাবাদ॥
তিন দিন মোরে ঘর্য্যা থেক শালে দিয়া ভর
তবে বর দিবেন ঠাকুর মায়াধর॥
এত বলি মহামায়া অন্তর্ধ্যান হোল।
বচন শুনিয়া নটী কাঁদিতে লাগিল॥
ধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিৎ।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥
এই খানে ছিল বুড়ি পথের উপরে।
কোন্ পথে গেল বুড়ী শাঁপ দিয়া মোরে॥
কাঁদিতে লাগিল রামা পরিণাম গণি।
কোন্ ভাবে কেবা এল কিছুই না জানি॥
মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে অঝর নয়ান।
কি ক্ষণে এলাম আমি করিবারে স্নান॥
দাসী সব প্রবোধ করিছে নাচনীকে।
কোথা থেকে কেবা এল কিবা ভয় তাকে
ঘরে গিয়ে ঠাকুরাণী বেশে দাও মন।
তাণ্ডব করিতে চল যথা দেবগণ॥
যত বলে সবাই অন্তরে নয় সুখী।
নিজ ঘরে দরশন দিলা বিধুমুখী॥
দাসী সব পালটিতে যোগাল বসন।
ক্ষীরখণ্ড দুগ্ধ চিনি করিল ভক্ষণ॥
রূপে রম্ভাবতী কিম্বা মদনমঞ্জরি।
দর্পণ দেখিয়া রূপ দেখিল সুন্দরী॥
কত মধু চোয়ায় বদন ষোলকলা।
কুন্দকোর দশনে ভ্রমর করে খেলা॥
অলকায় ছায়াতে তিমির করে দূর।
সোণার চিরুণি সিঁথা আছেতু সিন্দুর॥

মদন পঞ্চম শর কটাক্ষ চাহনি।
বৃন্দাবনে সাজে যেন রাধা বিনোদিনী ॥
আভরণ পেড়া দাসী দিল অপরূপ।
বণাল্য তাহার ডালা ঘুচায়্যা কুলুপ ॥
বাঁধিল বিনোদ খোঁপা মূল্য নাই যার।
তার দোলে স্বর্ণ ঝাঁপা মালতীর হার ॥
ললাটে সিন্দুর দিল জিনি কিরণমালী।
অলকা তিলকা ঘটা মধু চায় অলি ॥
চারিদিকে সুগন্ধি চন্দন বিন্দু সাজে।
জন্মদিনে যেমন উদয় দ্বিজরাজে ॥
তার কোলে দিল রামা শোক শিশুর টিক্যা।
বসন্ত ধৈরজ নয় মদন কাঁদে দেখ্যা ॥
বদনে তাম্বূল দিল নয়নে কাজল।
যেখানের যে অলঙ্কার পরিল সকল।
অপরূপ বসন পরিল তারপর।
কাঁচুলীতে ঢাকিল যুগল পয়োধর ॥
সুবেশ করিয়া রামা করিল পয়াণ।
দেবতা সমাজে নৃত্য করিবারে যান ॥
সঙ্গে সহচরীগণ সবাই নর্ত্তকী।
হংসরাজ গমনে চলিল সুধামুখী ॥
যথা বৈসে দেবগণ ধর্ম্মের সহিতে।
উপনীত হ'ল নটী তাণ্ডব করিতে ॥
তাণ্ডব করিতে নটী হ'ল উপনীত।
রূপ দেখে ধর্ম্মরাজ হইল মোহিত ॥
সকল দেবতা বলে এস অম্বুবতী।
মুখ চেয়্যা তোমার ঠাকুর যুগপতি ॥
গুণিগণ তখন পাখোয়াজে দেয় তাল।
সপ্তস্বরা বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ রসাল ॥
অম্বুবতী নৃত্য করে ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
দেব সভায় প্রণাম করেন যোড় হাতে ॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে স্বর্গের নাচনী।
তা থেই তা থেই বাজে তাথেনি তাথেনি
অম্বুবতী গান যে করিল তানমানে।
মোহিত হইল শুনে যত দেবগণে ॥
ব্রাহ্মণীর শাপ তখন মনেতে পড়িল।
সেই ক্ষণে অম্বুবতীর তাল ভঙ্গ হল ॥

তাল ভঙ্গ হইতে বদনে নাই কথা।
অভিশাপ দিল তখন সকল দেবতা ॥
ধর্ম্মের সাক্ষাতে নাচ ছুই মন্দা হয়ে।
মানুষের ঘরে তুমি জন্ম লহ গিয়ে ॥
স্বর্গপুরে তোমার নিবাস নাহি হয়।
অবিলম্বে পৃথিবীকে করহ বিজয় ॥
দেবগণে শাপ দিল অম্বুবতী কাঁদে।
ধর্ম্মের চরণে পড়ে কেশ নাহি বাঁধে ॥
কিক্ষণে আমার তরে পোহাল রজনী।
পৃথিবীতে কেমনে রহিব চক্রপাণি ॥
ঠাকুর মোছেন তার নয়নের জল।
আমি হব তোমার সারথি পক্ষাবল ॥
পূজা প্রকাশিবে মোর না গেলেই নয়।
পশ্চিম উদয় দিবে তোমার তনয় ॥
সভা ভেঙ্গে গা তুলিল ধর্ম্ম যুগপতি।
দেহ ত্যাগ গঙ্গাতে করিল অম্বুবতী ॥
মন্দুরা নামেতে রাণী বসতি ভুবনে।
তার গর্ভে জন্ম নিল ঋতুস্নান দিনে ॥
রতিরঙ্গে বাসর বঞ্চিল বেণু-রায়।
দশ মাস দশ দিন এইরূপে যায় ॥
শুভক্ষণে প্রসব হইল যথাকালে।
আনন্দের সীমা নাই রাজার মহলে ॥
রাণী হল প্রসব মেয়ের যাওয়া ধাই।
করাইল নাড়ীচ্ছেদ আনাইয়া ধাই ॥
বেণু রাজা পাঠাইল নিজের নফর।
বাধাই দিলেন শুন্যা রায় গৌড়েশ্বর ॥
মহামদ পাত্তর গৌড়ে নাম যার।
ভগিনী হইল শুন্যা আনন্দ অপার ॥
রঞ্জাবতী নাম থুল্যা বেণু মহারাজা।
ছয় দিনে যেটেরা একুশে ষষ্ঠীপূজা ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বর্ণ কাঁচা সোণা।
সাত মাসে বেণু রাজা করান ভুঞ্জনা ॥
দেবকন্যা রঞ্জাবতী বাড়ে দিনে দিনে।
রায় গৌড়েশ্বর লয়্যা কর অবধানে ॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়।
[illegible] সবে পাপ দৈন্য যায় ॥

বেণু রাজার ঘরে কন্তা বাড়ে রত্নাবতী।
রূপের কি দিব জিনি রম্ভা অরুন্ধতি॥
রাজা গৌড়েশ্বর নোয়্যা কর অবধান।
দালানে বসিল রাজা করিয়া দিয়ান॥
ধনু মল্ল রাজা আদি মান নৃপবর।
জালন্দার বোসে রাজা জাল্লাল শিখর॥
বর্দ্ধমানের কালিদাস রাউৎ বলায়।
মঙ্গল কোটের রাজা বৈসে মানসিংহ রায়॥
সিমুল্যা নিবাসী বৈসে রাজা হরিপাল।
নব লক্ষ্য দল বসে যেন যম কাল॥
বার ভুঞ্যা বসে আছে রাজার সাক্ষাৎ।
মহামদ পাত্র বোসে আছে যোড় হাত॥
সূর্য্যবংশে রাম দশরথের নন্দন।
শত্রু হেতু রামচন্দ্র ভ্রমেন কানন॥
কুটীর করিল রাম জানকীর তরে।
দৈব যোগে মৃগ হোল রাবণের চরে॥
মায়ামৃগ নাচে কাছে সোণার বরণ।
মৃগ দেখি সীতার তখন হোল মন॥
এমন সোণার মৃগ নয়নে না দেখি।
মৃগ ধরে দেও রাম কহেন জানকী॥
এই অধ্যায় শুনিল গৌউড় নৃপমণি।
শিকার করিতে রাজা করিল উঠানি॥
গৌড়ের উত্তর দিকে আছয়ে কানন।
চলিল শিকারে রাজা লয়ে লোকজন॥
বারণ উপর রাজা সাজে দড় বড়।
দল বল লয়্যা চলে মাহুদে নাবড়॥
মৃগয়া করিতে যদি চলিল রাজন।
বনযাত্রা কাচলি চৌতারা দিয়াগণ॥
শ্যাম ঘোষ গোয়ালা বন্দি লুহাটা চণ্ডাল।
চরণে ডাঁড়ুকা দেখি গৌড়ড়ে ভুপাল॥
শতকানি পরিধান অঙ্গে উঠে খড়ি।
মাথায় পিঙ্গল জুটা বুকে লম্ব দাড়ি॥
রাজা কহেন তখন ডাকিয়া দুই জনে।
কহ ভাই বন্দি আছ কিসের কারণে॥
ডাড়ুকা চরণে কেন বলে নৃপমণি।
শ্যাম ঘোষ কান্দে তখন লোটায়ে ধরণী॥

জোহার করিয়ে কর বুকে দিয়ে কর।
অবধান শুন রাজা রায় গৌড়েশ্বর॥
সাত পুরুষ গোউড় সহরে করি ধাম।
পল্লব গোপ জেতে বটি শ্যাম ঘোষ নাম॥
মহামদ পাত্র আমাকে দুঃখ দেন।
বিনে অপরাধে মোর ঘর বিচে লেন॥
খাসা দই যোগাইতে মিশে ছিল জল।
এই হেতু পাত্র দিল চরণে শিকল॥
বেন্নু বৎস বেচিয়ে সকল নিল মোর।
পোতা শালে দাখিল হইল যেন চোর॥
লোহাটা চণ্ডাল বটে আমার সাঙ্গাতি।
এবাব বৎসর বন্দি শুন মহামতি॥
হায় হায় করে শুনে গৌড়ের ঠাকুর।
প্রজাগণে পাত্র কেন হোয়েচে নিষ্ঠুর॥
এইরূপে কষ্ট পায় রেয়ৎ সকল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় ধর্ম্মের মঙ্গল॥
মহামদ পাত্র ডেকে গৌড়েশ্বর বলে।
এইরূপে দুঃখ দেও রেয়ৎ সকলে॥
অল্প দুঃখে কষ্ট পায় বনেদি চাকর।
এইরূপে গেল মোর গোউড় সহর॥
শ্যাম ঘোষে দেখে রাজার দয়া হৈল বড়।
কামারে ডাকিয়া যে হুকুম দিল দড়॥
কি করিতে পারে পাত্র রাজা হলে সখা।
কর্ম্মকার দুজনার ঘুচাল ডাঁড়ুকা॥
ঘুচাল মাথার কেশ আনায়ে নাপিত।
নানা ধনে শ্যাম ঘোষে করিল ভুষিত॥
আপনি দিলেন রাজা চড়িবারে ঘোড়া।
ঢাল খাঁড়া হেতের দিলেন জামা জোড়া॥
রাজা বলে শ্যাম ঘোষ শুনহ বচন।
অজয়া সলিল পার এগটি ভুবন॥
কর্ণ সেনের দেশ বটে এগটি নগরে।
ছয় পুত্র সেনের সমরে বল ধরে॥
কর্ণ সেনের দেশ বটে মোরে দেয় কর।
পরিজন লয়ে সেই দেশে কর ঘর॥
এগটির খাজনা গৌউড়ে এনে দিবে।
শত টাকা মাহিনা খাজনা তোলে দিবে॥

এত বদি কহিল গৌড়ের নৃপমণি।
শ্যাম ঘোষ বলেন শুন মম মুখে যোড়পাণি
একটি নগর যদি যাব মহীপাল।
আমার সঙ্গেতে দেহ লোহাটা চণ্ডাল॥
লয়ে যাও তখন ভূপতি দিল সায়।
রাজার সাক্ষাতে ঘোষ হইল বিদায়॥
শিকার করিয়ে রাজা গেল নিজ ঘরে।
শ্যাম ঘোষ যাত্রা কৈল একটি নগরে॥
চতুর্দ্দোলে শ্যাম ঘোষ পরিজন লয়ে।
পার হোল বড় গঙ্গা গৌড়ে রাখিয়ে॥
পরিবার সঙ্গে চলে লোহাটা বজ্জর।
পিছু রাখি কীর্ত্তি বাটী বিজয়া নগর॥
গৃহস্থের ভবনে রাখিয়ে পরিজন।
কর্ণসেনে দেখা করে গোয়ালানন্দন॥
নানা ধনে ভেটিল ভূপতি কর্ণসেনে।
নিজ দুঃখ কহিল রাজার বিদ্যমানে॥
সমাচার শ্যাম ঘোষ কহিল সকল।
রাজার আরতি পেয়ে তুলিল মহল॥
মহল তুলিল ঘোষ একটি ভবনে।
শ্যাম ঘোষ ভাবে তখন পুত্রের কারণে॥
পুত্র নাই শ্যাম ঘোষ ভাবেন তখন।
তনয় বিহনে মিছে এ ঘর করণ॥
রূপেতে প্রতিমা শ্যামা নামে চন্দ্রকলা।
মনস্তাপ করে শ্যাম ঘোষের অবলা॥
মিছে মোর জীবন তনয় নাই কোলে।
দণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ আইল হেন কালে॥
শ্যাম ঘোষ প্রণাম করিয়ে দ্বিজে কয়।
সর্ব্বশাস্ত্র আপনি জানহ মহাশয়॥
কোন দেবে পূজিলে পাইব বংশধর।
এত শুনি কহে চণ্ডীদাস দ্বিজবর॥
গণনা করিয়া দ্বিজ কহিল তখন।
এক-মনে পূজা কর দেবীর চরণ॥
পুত্র বর দিবে তোরে ব্রহ্মার জননী।
যোড়শোপচারে পূজ কৈতবনাশিনী॥
হরষিত হৈল মনে গোয়ালা কোঙার।
[illegible] মন্দির [illegible] আনন্দে [illegible]॥

[illegible]রাতে ভদ্রকালী করিল স্থাপন।
যথাবিধি পূজিল করিয়া আয়োজন॥
নানাফুল ঘৃত মধু চন্দন চামর।
আতপ তণ্ডুল আদি সামগ্রী বিস্তর॥
শত শত ছাগল মহিষ দিয়া বলি।
শ্যাম ঘোষ পূজা করে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি॥
কৃপা কর কৃপাময়ী করালবদনী।
ক্ষেমঙ্করী, খড়্গেশ্বরী খঞ্জননয়নী॥
গৌরী গিরি শুভগিরি গিরিশের জায়া।
ঘোর নিদ্রা, ঘোরবর্ণা ঘটে উর গিয়া॥
ভক্তের অধীন বটে সর্ব্বদেবগণ।
সাক্ষাৎ হইল দেবী করিতে স্মরণ।
কালিয়ে মেঘের ঘটা সম্মুখে ঈশ্বরী।
নানা আভরণ অঙ্গে পড়িছে বিজুরি॥
শ্যাম ঘোষ বলে দেবী দেহ পুত্রবর।
অপুত্রক নাম ঘুচুক জগৎ ভিতর॥
এই বর দিলাম বলেন মহামায়ী।
পুত্র হ'লে নাম তার রাখিবে ইছাই॥
দ্বিতীয় রাবণ হবে তোমার তনয়।
এত বলে শ্যামারূপা কৈলাসে বিজয়॥
বর পেয়ে শ্যাম ঘোষ হৈল হরষিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদি সঙ্গীত॥

ঈশ্বরী দিলেন বর,　　কোলে হবে বংশধর,
আনন্দিত হইল গোয়ালা।
প্রথম বসন্ত বায়,　　কোকিলে পঞ্চম গায়,
ঋতুমতী ঘোষের অবলা॥
বঞ্চিয়া বাসর রাতি,　　সন্তান জন্মিল তথি,
দুই চারি মাস নিবড়িল।
সাত মাসে সাধ খায়,　　দশ মাস গেল প্রায়,
শুভদিনে প্রসব হইল॥
ভূমিষ্ঠ হইল বালা,　　রূপে ঘর কৈল আলা,
নাড়ী সঙ্কুলিল এসে দাই।
দেখে হরষিত মন,　　বাপের আরাধ্য ধন,
নাম থুইল সুন্দর ইছাই।
দেবী বরে পুত্র পাইল,　　আনন্দে বাধাই দিল,
[illegible] বাজায় সবে একত্র

ষেটেরা পূজন আদি, করিলেন যথাবিধি,
ভুজঙ্গা করিলা ছয় মাসে॥
ছ' চারি বৎসর গেল, সাত বৎসরের হ'ল,
করিশুণ্ড বাহুর বলন।
ভালে রাজদণ্ড দেখি, অরুণ বরণ আঁখি,
গায়ে সাজে নানা আভরণ॥
পড়িল অনেক শাস্ত্র, শিক্ষা করি নানা অস্ত্র,
মহাবিদ্যে হইল উপাসনা।
বলবান হৈল বড়, মল্ল আখড়ায় দড়,
স্বর্গপুরে দিতে চায় হানা॥
ঈশ্বরী করিয়ে পূজা, এই দেশের হব রাজা,
গৌড়েশ্বরে কর নাহি দিব।
লইব ইন্দ্রের হস্তী, ব্রহ্মাকে ধরাব ছাতি,
যমের বড়াই ঘুচাইব।
কর্ণসেনে তাড়াইব, এদেশের রাজা হব,
ঈশ্বরীর ঠাঁই লব বর।
উর্দ্ধবাহু অনাহারে, ইছাই তপস্যা করে,
এক মনে দ্বাদশ বৎসর॥
ব্রহ্মার জননী ধ্যানে, আর অন্ত নাহি জানে,
পূজা করে রঙ্গিনী বাসুলি।
আয়োজন নাহি ওর, ধূপধূনা ঘটা ঘোর,
ছাগল মহিষ দিল বলি॥
তুষ্ট হয়্যা দশভুজা, ইছায়ে করিতে রাজা,
আইল চণ্ডী মরত ভুবন।
ধর্ম্ম পদারবিন্দে, ভাবি ত্রিপদীর ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥
ইছাই ঈশ্বরী পূজে হয়ে এক মন।
বর দিতে বাসুলী দিলেন দরশন॥
দেবী হৈল সাক্ষাৎ ইছায়ে দিতে বর।
স্তব করে ইছাই সম্মুখে যোড়কর॥
মহিমে তোমার মাতা শুনেছি ভারতে।
হরিভক্তি-প্রদায়িনী দেবী নমস্তে॥
দেবী বলে ইছাই মাগিয়ে লহ বর।
অমর করিব তোমা ব্রহ্মার উপর॥
ইছাই বলেন বর দিবে দশভুজা।
এই দেশে হব আমি স্বতন্ত্র রাজা॥
অমরেতে কার্য্য নাহি শুন সাবধানে।
মোর মাথা পড়ে যেন বিষ্ণুর চরণে॥
এত শুনি শ্যামারূপা কাঁদিতে লাগিল।
তথাস্তু বলিয়ে বর ইছায়েরে দিল॥
ইন্দ্রের সমান রাজা হবে এই দেশে।
যতদিন কশ্যপনন্দন নাহি এসে॥
তোমার উপরে যেবা আসিবে সাজিয়া।
বাড়িবে অজয়া জল পাতাল ভেদিয়া॥
এশট্টি নগর নাম আছিল জগতে।
ঢেকুরের গড় নাম হ'ল আজি হ'তে॥
আজি হ'তে নাম হ'ল অজয় ঢেকুর।
জিনিতে নারিবে কোন দেবতা অসুর॥
আজি হ'তে আপনি ইছাই মহীনাথ।
না পড়িবে এদেশে ইন্দ্রের বজ্রাঘাত॥
স্মরণ করে ইছাই পবনের সুতে।
বীর মাটি আনাইল কৈলাস হইতে॥
ছড়াইল বীর মাটি পবননন্দন।
ঢেকুর হইল লঙ্কা ইছাই রাবণ॥
বলবন্ত ইছাই বাড়েন দিনে দিনে।
না পারি করিতে অন্ত ইছাইএর ধনে॥
ইছাই দুয়ারে যত দেবতা খাটেন।
চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই হুকুমে চলেন॥
যমরাজা না চলেন ঢেকুর দিয়া পথ।
ইছায়ের কাছে টাকা যোগায় রেবৎ॥
শ্যামারূপা বসিলা ইছায়ে লয়ে কোলে।
পড়িল দুহাই দেশে ইছায়ের বলে॥
ইছায়ের নামে দেশে দোহাই পড়িল।
কর্ণসেন রাজা বড় বিপাকে ঠেকিল॥
ভগবতীর বরেতে হেতের নাহি বান্দে।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার চান্দে॥
লুঠ করে নিল রাজার হস্তী আর ঘোড়া।
ইন্দ্র হ'তে ইছায়ের মগজ হ'ল বাড়া॥
রাজটিকা ইছায়ে দিলেন ভদ্রকালি।
নব দণ্ড ছাতা শিরে সোনার আড়ালি॥
লোহাটাকে কোটাল কৈল ঢেকুর ভিতরে
কর দিতে মানা কৈল রাজা গৌড়েশ্বরে॥

ছয় পুত্র কর্ণসেন করিয়া সংহতি।
মকস্থলে বসে রাজা করেন যুকতি॥
আচম্বিতে গোয়ালা হইল রঘুরাম।
এতদিনে আমাদিগে বিধি হল বাম॥
প্রাণ লয়ে চল সবে পলাইয়া যাই।
পিতার বচন শুনি কান্দে ছয় ভাই॥
মালমত্তা ধন কড়ি রহিল পড়িয়া।
কর্ণসেন রাজা যান ঢেকুর ছাড়িয়া॥
ধায়াধাই চৌদিকে নফর লোকজন।
শীঘ্রগতি চতুর্দ্দোলে নিল পরিজন॥
পাছু রেখে পাষণ্ড পালায় নিশিকালে।
অজয়া হইল পার এক হাঁটু জলে॥
আড়াই দিনে গৌড় সহরে দরশন।
সেঙ্গাতের বাটিতে রাখিয়ে পরিজন॥
দরবারে বসে আছে গৌড়েশ্বর রায়।
কর্ণসেন দেখা দিল রাজার সভায়॥
রাজ সম্ভাষিয়া রাজা বসিল আসনে।
বারভূঞ্যা সম্ভাষ করিল কর্ণসেনে॥
গৌড়েশ্বর কহে সেন কহ সমাচার।
পুত্র সব সঙ্গে কেন এসেছ দরবার॥
নিজ দুঃখ সেন কহে রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥
রাজার দরবারে সেন কাঁদিতে লাগিল।
এতদিনে মহারাজা রাজ্য দেশ গেল॥
ইছাই হইল রাজা ঢেকুর ভিতরে।
আপনি আছেন দুর্গা ইছায়ের ঘরে॥
দেবতা সকল ধরে নব দণ্ড ছাতা।
লুঠ করে নিলেক আমার মালমাত্তা॥
আজকাল হানা দিবে গৌড় সহরে।
এত শুনি গৌড়েশ্বর রুষিল অন্তরে॥
মহামদ বলে রাজা চল সেজে যাব।
ঢেকুরের মাটি আজি গৌড়ে ঢুলাব॥
দেখিব ইছাই যোধ কত বল ধরে।
মার কাট বোলে পাত্র ডাকিছে দরবারে॥
বচন শুনিয়া রাজার ক্রোধে কাঁপে মাটি।
রাজ দায় গগন [illegible] পড়ে কাটি॥

নানা বাদ্য বাজে নাচে নৃপ সেনাগণ।
তোলপাড় করে রাজ গৌড় ভুবন॥
রায় বেণী গঙ্গ, বেণী জম্বু, বাঁকুলাল।
খঞ্জর, খঞ্জরী, কাড়া কুমুরে কাহাল॥
দগড় দগড়ি, বীণা, রুদ্র বীণা শানি।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টা, ঘোর শব্দ শুনি॥
ধুমসি, মহোরি ঢোল, খঞ্জরী, খমক।
জগঝম্প বাদ্য বাজে গগনে ধমক॥
রণশিঙ্গা, করতাল বাজে যোড়া যোড়া।
আঠার হাজার ঢাক বিশাসয় ঘোড়া॥
রাজার আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল।
মার কাট ডাক ছাড়ে রাউৎ সকল॥
আশি হাজার নেড়ে সাজে মুখে লম্বা দাড়ি
মাথায় শোভিত পাটা সোণার পাগড়ি॥
মল্লবান বীর সাজে রাজার কোণ্ডার।
কামান কৃপাণগুলা গাড়ীর উপর॥
রজপুত সিপাই চলিল কত শুল।
হানা দিতে সময়ে গগনে উঠে ধূল॥
হাজার হাজার ঢালি হাতে করি খাঁড়া।
যমের সমান সাজে দিয়ে গোঁপ নাড়া॥
ভীমমল্ল বীর সাজে টানে বাঁশ গোটা।
পাথর বিঁধিয়া পাড়ে দিয়ে চুণ ফোঁটা॥
সঙ্গে সব ধানুকী চামর বাঁধা বাসে।
নূতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে॥
ধায় সব করি কাল কোরে বীরপণা।
ফলঙ্গ মারিয়া যায় শত হাতখানা॥
রায়বাঁশ হাজার হাজার পাগ ধায়।
দেখা শুনা করিতে যমের সঙ্গে চায়॥
গৌড়েশ্বর সাজিল চাপিয়া গজ মাথা।
আড়ানি শোভিত সাজে শিরে ধবল ছাতা
পাখরিয়া ঘুড়ী সব চলে করিবর।
কপালে সিন্দুর শুণ্ডে লৌহার মুদগর॥
আগুয়লে সেনাপতি বিটে নিল বাট।
চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট॥
রথবন্দে চলে রথী দেখতে বিপরীত।
রণ[illegible] উড়ে পতাকা শোভিত॥

বারভূঞ্যা চলে ঘোর করিয়া কাঁদনি
আচ্ছাদিল ধূলায় গগনে দিনমণি ॥
সর্ব্ব আগে মহামদ করিল পয়াণ।
ছয় পুত্র সঙ্গে রাজা কর্ণসেন যান ॥
ইন্দ্রজাল সঙ্গে ধায় ভাট গঙ্গাধর।
মার কাট ডাক ছাড়ে যতেক লস্কর ॥
গোউড়রারক্ষি পার হল ভেরবীর জল
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদি মঙ্গল ॥
ভেরবী হইল পার রাজার লস্কর।
যেন যম জিনিবারে যান লঙ্কেশ্বর ॥
বালিঘাটাশ্বর নদী রেখে বামভিতে।
রাখিল সিংহল গ্রাম দেখিতে দেখিতে ॥
ডাহিনে কনকপুর বিজয় নগর।
খানা খাল বিপিন রাখিয়া তারপর ॥
অজয়া নদীর ধারে উপনীত হল।
অরিকুল দেখি জল বাড়িতে লাগিল ॥
বাড়িল অজয়া নদী অভয়ার বরে।
আষাঢ় মাসেতে যেন সব নদী বাড়ে ॥
অকালে অজয়া নদী বাড়িল প্রলয়।
নব লক্ষ সেনা দেখি মানিল বিস্ময় ॥
হাতীর উপরে ভাসে গৌড়ের ঠাকুর।
জিনিতে নারিলাম পারা অজয় ঢেকুর ॥
মহামদ বলে রাজা কর অবধান।
এখনি যাবেক মরে জোয়ারের বান ॥
জোয়ার মরিলে নদী পার হব তড়ে।
রাতারাতি হানা দিব ঢেকুরের গড়ে ॥
খাটাইল তাম্বু ঘর যতেক লস্করে।
পড়িল পাত্রের ডেরা অজয়ার ধারে ॥
ষোল ক্রোশ যুড়ে বসে নব লক্ষ সেনা।
ধাড় ধাড় বাদ্য বাজে দামামা নিশানা।
বাদ্য শুনি ঢেকুরে লাগিল চমৎকার।
সবে বলে লস্কর অজয়া হল পার ॥
ঢেকুর জিনিতে আইল রায় গৌড়েশ্বর
ভাবিত হইল শুনি ইছাই কুমার ॥
ভবানীরে সঙরিল ইছাই গোয়ালা।
সাক্ষাৎ হইল দেবী সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ইছাই বলেন রাখ দেবী দশভুজা।
গম্ভীরাতে আরম্ভ করিল মহাপূজা ॥
ভবানী বলেন শুন গোয়ালানন্দন।
কি কারণে এত পূজা কর বাছাধন ॥
যোড় করে নিবেদন করিছে গোয়ালা।
অবধান শুন মাতা সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ঢেকুরের গড়ে রাজা করিলে আপনি।
রণে সেজে এসেছে গৌড়ের নৃপমণি ॥
সঙ্গেতে এসেছে বলে কর্ণসেন রাজা।
নব লক্ষ সেনাপতি রণে মহাতেজা ॥
প্রলয়েতে মরে প্রাণ পাইব কেমনে।
বাশুলি বলেন আমি হানা দিব রণে ॥
লোহাটা কোটাল থাক উপলক্ষ হয়ে।
আমি হানা দিব দানাগণ সঙ্গে লয়ে ॥
চলিল ইছাই ঘোষ শুনিয়া বচন।
লোহাটাকে ডাক দিয়ে আনিল তখন
আসিয়া কোটাল শুষ্কমুখে যোড়কর।
ইছাই বলেন, তোর বুকে নাহি ডর ॥
রণে যেতে আজ্ঞা তোরে দিলা ভগবতী।
এত শুনি লোহাটা সাজিল শীঘ্রগতি ॥
দড় সাজে হেতের বাধিল যমকাল।
সাজিল বীরের সঙ্গে ছ কুড়ি চণ্ডাল ॥
বেয়াল্লিশ বাজনা সঙ্গে বাজে রনকাড়া।
মার কাট ঢেকুরে উঠিয়া গেল সাড়া ॥

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,
এফ, আর, জি, এস।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'সাহিত্য-সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র,
সহযোগী সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূহের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য সভার সম্পাদক।

// সাহিত্য-সংহিতা।

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

মুক্তাতত্ত্ব।

কোন্ সময় হইতে যে মুক্তা এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করা অতীব কঠিন। যে সময় পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগ ঘোরতর অসভ্যতান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, সে সময় হইতে ভারতে যে মুক্তার প্রতি আদর এবং গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুজাতির মধ্যে মুক্তার ব্যবহার প্রচলিত। কি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে, কি পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থ-নিচয়ে—মুক্তার উপকারিতা এবং প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুক্তা সমুদ্রজাত এক প্রকার শুক্তির গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য ইহার একটি নাম "শুক্তিজ"। যে শুক্তি হইতে মুক্তা জন্মে, তাহাকে "মুক্তাপ্রসূ" কহিয়া থাকে। ইউরোপ, আসিয়া এবং আমেরিকা, পৃথিবীর এই তিন মহাদেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রেই মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু আসিয়া মহাদেশের উপকূল ভাগ ইহার প্রধান জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পারস্য সাগরে, লোহিত সমুদ্রে এবং সিংহল দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সাগরে, বহুল মুক্তাপ্রসূ দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে; ফলতঃ তাদৃশ উজ্জ্বল মুক্তা কুত্রাপি দেখা যায় না।

মুক্তার নয়ন-রঞ্জন কান্তি দর্শন করিলে, সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকেন। সূর্য্যের প্রখর আলোক দর্শনের পর, স্নিগ্ধজ্যোতিঃ চন্দ্র-কিরণ অবলোকন করিলে, নয়নদ্বয় যেরূপ তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ হীরকের খর-দীপ্তি নিরীক্ষণ করিয়া, মুক্তা-ফলোদ্ভূত কোমল প্রভায় নয়ন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। মুক্তা সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় লোকের অন্তঃকরণে এক প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে। অনেকের সংস্কার এই যে, স্বাতি নক্ষত্রের জল বংশে পতিত হইয়া, বংশলোচন, করি-শিরে পতিত হইয়া গজমতি এবং শুক্তিতে পতিত হইয়া মুক্তা উৎপন্ন হয়। আবার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়;—

> "মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।
> শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ॥
> বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈ-র্মৌক্তি যোনয়ঃ।

অর্থাৎ শুক্তি, শঙ্খ, গজমস্তক, সর্পমস্তক, এবং মৎস্যমস্তক, এই কয়েকটী মুক্তার যোনি—উৎপত্তিস্থান।" কিন্তু এখন বিজ্ঞা-নাদির কিরণ দিন দিন বিস্তীর্ণ হওয়াতে, এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে কেহ হৃদয়ে স্থান দেয় না।

> ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেই স্মিন্নতীব যৎ।
> ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

ধনাভিলাষী ব্যক্তিবর্গই রত্ন প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয় বলি-য়াই শাব্দিকেরা উহাকে রত্ন বলিয়া থাকেন।

১ রত্নং গরুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদ স্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি।
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥

রত্ন নয়টী, যথা,—হীরা, গারুত্মত (পান্না), পুষ্পরাগমণি (পোখ্‌রাজ), মাণিক্য (পদ্মরাগ) ইন্দ্রনীল (নীলকান্তমণি), গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা এবং প্রবাল। যে নয়টী রত্নের কথা উল্লিখিত হইল, মুক্তাও যে তদ্‌শ্রেণীভুক্ত, তাহা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে। মুক্তাকে হিন্দি ভাষাতে "মোতি" কহিয়া থাকে। আর মুক্তাশুক্তিকে মহারাষ্ট্র দেশে মোতি সীঁপ এবং কর্ণাটে মুক্তি সিঁপু কহে। মুক্তার সংস্কৃত পর্য্যায়:—মৌক্তিক, শৌক্তিক, ভৌত্তিক, শুক্তিমণি, বিন্দুফল, অন্তঃসার, মুক্তিবীজ, মুক্তিকা, ইন্দ্ররত্ন, ভৌতিক, লক্ষ্মী, ইন্দুরত্ন, এবং তারা ইত্যাদি। মুক্তার গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে ;—

মুক্তাকষায়া স্বাদ্বী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী।
বৃষ্যা নেত্রহিতা রাজযক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী॥

অর্থাৎ মুক্তা,—কষায় মধুর রস, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, নেত্রের হিতকর, বিষদোষ এবং রাজযক্ষ্মানাশক। এতদ্ভিন্ন মুক্তার প্রলেপে শোথের উপশম হয়। মুক্তা শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়ন্তী পাতার রসের সহিত কিংবা অম্লবর্গ ও কাঁজির সহিত দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া লইলে, মুক্তা শোধিত হয়; পরে উহা অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলেই জারিত হইয়া থাকে। মুক্তাশুক্তি অর্থাৎ যে ঝিনুকে মুক্তা হয়, তাহা মধুর-কটু-রস, স্নিগ্ধ, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচি-কর এবং শ্বাস, হৃদ্রোগ ও শূলরোগে হিতকর।

রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুর্মধুরাণি সরাণি চ।
চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ॥

ফলতঃ শোধিত যাবতীয় রত্নই,—ভক্ষণে মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকারক, শীতবীর্য্য এবং বিষনাশক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রোগ-বিশেষে যেমন মুক্তাদি রত্নসমূহের গুণ বর্ণিত দেখা যায়, সেইরূপ উহার ধারণেও বিস্তর উপকারিতার কথা উল্লিখিত আছে :—

স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাৎ গ্রহপাপনুৎ।
মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষ হরাণি চ।

মাণিক্যস্তরণে সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগোর্মাহেয়স্য তু বিক্রমো নিগদিতঃ সৌমস্য গারুত্মতম্‌। দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগ মসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনের্নীলং নির্ম্মল মন্যয়ো নিগাদিতে গোমেদ বৈদূর্য্যকে॥

অর্থাৎ ইহা দ্বারা রমণীদিগের কান্তি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত করে। অঙ্গধৃত রত্ন মঙ্গলজনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহ-দোষ-বিনাশক। রবিগ্রহের প্রতিকারার্থে মাণিক্য, সোমগ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত সুজাত ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলগ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত প্রবাল, বুধগ্রহের শান্তির জন্য পান্না, বৃহস্পতির শান্তি হেতু পুষ্পরাগ, শুক্রের শান্তির নিমিত্ত হীরক, শনিগ্রহের শান্ত্যর্থ ইন্দ্রনীলমণি, রাহুগ্রহের প্রতিবিধান নিমিত্ত গোমেদ এবং কেতুগ্রহের শান্তির জন্য বৈদূর্য্যমণি ব্যবহার করিতে হয়।*

এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শুক্তির আবরণ কোন কারণে আহত হইলে, তন্মধ্যে এক প্রকার ব্রণ জন্মে এবং কালসহকারে তাহা হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়। তাঁহারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, মসৃণ অনাহত শুক্তিতে প্রায় শুক্তি জন্মে না; কিন্তু যে শুক্তির উপরিভাগ বন্ধুর কিংবা আহতের লক্ষণবিশিষ্ট, তাহাতেই মুক্তা লাভের সম্ভাবনা। প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুক্তির গর্ভমধ্যে বালুকাকণা অথবা অন্য কোন ক্ষুদ্র পদার্থ প্রবেশ করাইয়া, ঐ শুক্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে, সেই বালুকাদি পদার্থের আঘাতে

* দ্রব্যগুণ দেখ।

শুক্তির অন্তরে ব্রণ জন্মে এবং ক্রমশঃ সেই বালুকা মৌক্তিক পদার্থে আবৃত হয়। চীনদেশীয়েরা এই প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি শুক্তিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ শুক্তিমধ্যস্থ তাম্রমূর্ত্তির উপর মৌক্তিক পদার্থ জন্মে এবং চীনেরা ঐ মুক্তাজাত বুদ্ধ মূর্ত্তি ইতর লোকদিগকে প্রদর্শন পূর্ব্বক বিমোহিত করিয়া থাকে। আসিয়াটিক সোসাইটীর চিত্রশালিকায় এই প্রকার বুদ্ধ মূর্ত্তিবিশিষ্ট একখানি শুক্তি রক্ষিত আছে।

চীনবাসীরা প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিয়া প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মুক্তা উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুকের ছোট মালা প্রস্তুত করিয়া রাখে, যখন মুক্তাশুক্তি ভাসিয়া উঠে, তখন তাহা ধরিয়া ঐ মালা তাহার ভিতর প্রবেশিত করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। কালক্রমে আহৃত শুক্তির ভিতরে ঐ মালা মুক্তালক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে।

শুক্তির ডিম্ব বেঙ্গাচির সদৃশ। যদি ধীবরেরা কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটায়, কিংবা হাঙ্গরাদি কোন হিংস্র জন্তু নষ্ট না করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ সকল ডিম্ব ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া মুক্তাপ্রসূ হইয়া উঠে।

মুক্তাপ্রসূ ধরিবার রীতি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। এস্থলে সিংহল দ্বীপের প্রচলিত প্রথা বর্ণিত হইতেছে। তথায় শুক্তি-গ্রাহকেরা প্রথমতঃ কণ্ডাচি নামক এক স্থানে সমাগত হয়; অনন্তর সুযোগানুসারে সমুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকারোহণে গমন করে। তাহাদিগের প্রত্যেক নৌকায় একবিংশতি ব্যক্তি থাকে, তন্মধ্যে দশজন ডুবুরি। ঐ ডুবুরিরা পর্য্যায়ক্রমে এক এক বারে পাঁচজন জলে অবতরণ করে। নিমগ্ন হইতে বিলম্ব না ঘটে, এই নিমিত্ত প্রস্তরবদ্ধ এক রজ্জুর উপর নির্ভর করিয়া, দক্ষিণ হস্তে আর এক গাছি রজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক, বাম হস্ত দ্বারা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া নিমগ্ন হয়। উভয় রজ্জুর অগ্রভাগ নৌকাস্থ অপর লোকেরা ধরিয়া থাকে। শুক্তি ধরিবার জাল ডুবুরিদিগের পদে সংলগ্ন থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহারা এরূপ অল্পকাল মধ্যে স্বীয় কার্য্য সাধন করে যে, আমরা হস্ত দ্বারাও তাহা অপেক্ষা সহজে কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই না। ফলতঃ তাহারা এরূপ কার্য্যপটু যে, দুই তিন মিনিটের মধ্যে চারি হইতে কুড়ি ব্যাস পর্য্যন্ত গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া, দুই তিন ক্ষেপ জাল ফেলিয়া শুক্তি সংগ্রহ করে এবং উর্দ্ধে আগমনের ইচ্ছা হইলেই, রজ্জু টানিয়া সঙ্কেত করে। তদনুসারে উপরের লোকেরা রজ্জু আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া লয়। প্রাতঃকালাবধি দিবা অবসান পর্য্যন্ত ডুবুরিয়া শুক্তি ধরিতে নিযুক্ত থাকে। অনন্তর কাণ্ডাচিতে প্রত্যাগত হইয়া, একটি গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে শুক্তিগুলি স্থাপিত করে এবং আহারাদি সমাপন করিয়া, দুই প্রহর রাত্রির সময় শুক্তি ধরিতে সমুদ্রে পুনর্যাত্রা করে।

পূর্ব্বে গর্ত্তমধ্যে যে সকল শুক্তি স্থাপিত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে, কিছুদিন উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিলে, শুক্তির মাংস গলিত হইয়া যায়। অনন্তর মুক্তা-সংগ্রাহকেরা তাহা তুলিয়া কাষ্ঠের যন্ত্র দ্বারা শুক্তির গর্ভ ভেদ করিয়া, মুক্তা সংগ্রহ করিয়া থাকে। তৎপরে মুক্তা জলে সিদ্ধ করিলে মুক্তাচূর্ণ দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। মাঘ মাসের শেষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত শুক্তি ধরিবার উপযুক্ত সময়; কিন্তু বায়ু কিঞ্চিৎ প্রবল হইলে, আর শুক্তি ধরা হয় না। এজন্য প্রতি বৎসর ত্রিশ দিবসের অধিককাল শুক্তি ধরিবার সুযোগ হয় না।

সমুদ্রে শুক্তি ধরিবার নিমিত্ত সিংহল

দ্বীপের রাজকর্ম্মচারীরা মুক্তাব্যবসায়ীদিগকে সমুদ্রের তট ইজারা দিয়া থাকেন; তদনুসারে উক্ত ব্যবসায়ীরা নির্দ্দিষ্ট জলভাগে শুক্তি ধরিতে পায়। এক বৎসর এক স্থানে শুক্তি ধরিলে, অনেক কাল পর্য্যন্ত তথায় আর শুক্তি ধরিবার ব্যবস্থা নাই। এইরূপে পরিত্যক্ত স্থানের শুক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশ বৎসর এই প্রকারে শুক্তি বর্দ্ধিত হইলে, তাহা ধরিবার উপযুক্ত হয়। শুক্তি ধরিবার লোক সিংহলদ্বীপে দুষ্প্রাপ্য। এজন্য মালব ও করমণ্ডল উপকূল হইতে তাহাদিগকে আনিতে হয়।

যে মুক্তা বৃহৎ এবং সম্পূর্ণ গোলাকার অথবা ডিম্বাকার, ঈষৎ রক্তিমাভ ও চিহ্ন-শূন্য, সেই মুক্তাই বিশেষ আদরণীয় এবং বহুমূল্য। এইরূপ আকার ও জ্যোতির্বিশিষ্ট মুক্তাকে "পাকা মুক্তা" কহিয়া থাকে। পূর্ব্ব-কালে দিল্লীশ্বরদিগের অতীব রমণীয় এক ছড়া মুক্তাহার ছিল, তাহা অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। পারস্য বাদশাহের একগাছি মুক্তাহার আছে, তাহার মূল্য ৩,৪০,০০০৲ টাকা। রুশিয়ার সম্রাটের মস্কো রাজধানীর চিত্রশালায় একটী বহুমূল্য মুক্তা আছে, তাহা ওজনে একশত রতিরও অধিক।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত রায়, ছাব্বিশ হাজার টাকার মূল্যের দুই ছড়া মতির মালা ক্রয় করিয়া মনন করেন, একগাছি রাণীকে, অপর ছড়া জয়কালী বিগ্রহকে প্রদান করিবেন। দুই ছড়ার মধ্যে এক ছড়া উত্তম, অপর ছড়া কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। রাজা ভাবিলেন, "উৎকৃষ্ট ছড়া রাণীকে দিয়া, নিকৃষ্ট ছড়া বিগ্রহকে দিবেন।" রাণী দুই ছড়া মালা দর্শনে উৎ-কৃষ্ট ছড়া দেবীর জন্য রাখিয়া, অপকৃষ্ট ছড়া আপনি লইবেন মনস্থ করিলেন। তাহাতে রাজা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে; রাণী কহিলেন,—"তবে উভয়েরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, অর্থাৎ দুই ছড়াই দেবতাকে দেওয়া যাউক।" কি নির্লোভতা!

মুক্তার মূল্য অধিক বলিয়া, সাধারণে উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য এক প্রকার কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হইতেছে। এই মুক্তা কয়েক প্রকার মৎস্যের শল্কে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্লীক্ নামে এক প্রকার অতি সুখাদ্য মৎস্য আছে। মৎস্যজাতির মধ্যে ইহার অপেক্ষা চঞ্চল মৎস্য আর নয়নগোচর হয় না। এই মৎস্যের শল্কের নিম্নে রজত-চূর্ণবৎ এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে, সেই চাক্‌চিক্যশালী পদার্থই ব্লীক্ মৎস্যের গৌরব বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ঐ পদার্থ থাকাতেই উহার শল্কসমূহ রৌপ্যবৎ চাক্‌চিক্য-শালী বোধ হয়। শিল্পকরেরা তদ্দ্বারা এক প্রকার অতি সুন্দর কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই পদার্থ রোহিতজাতীয় সকল মৎস্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মুক্তা প্রস্তুত জন্য হোয়াইট্‌বেট্ মৎস্যের শল্কই সর্ব্ব-প্রধান; তন্নিম্নে ব্লীক্ মৎস্যের শল্ক এবং তদনন্তর রোচ্ এবং ডেস্ মৎস্যের শল্ক। ধীবরেরা এই সকল মৎস্য ধরিয়া, তাহাদের শল্কসমূহ কৃত্রিম-মুক্তাপ্রস্তুতকারীদিগকে বিক্রয় করে। উক্ত ব্যবসায়ীরা ঐ শল্ক সাবধানে ধৌত করিয়া, জলে ভিজাইয়া রাখে। দুই তিন দিন জলে ভিজিয়া থাকিলে, রজতবৎ চূর্ণ পদার্থ শল্ক হইতে পৃথক্ হয়।

অনন্তর ঐ পদার্থে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত গঁদের জল কিংবা শিরিস মিশ্রিত করিয়া, তব্‌লকির ভিতরে অথবা উপরে লিপ্ত করিয়া, শুষ্ক করিলেই মুক্তা প্রস্তুত হইল। এই কৃত্রিম মুক্তার ব্যবসায়ে বিস্তর লোক নিযুক্ত আছে। এই মুক্তার জন্য উপরি উক্ত মৎস্যের শল্ক টাকায় এক বা দেড় তোলা পরিমাণে বিক্রীত

হয়। রোহিত, কাতলা এবং বাটা প্রভৃতি মৎস্য গ্রীক্, ডেস্ প্রভৃতির সহিত এক শ্রেণী-ভুক্ত। অতএব বোধ হয়, উহাদের শল্কে যে রজতবর্ণ পদার্থ আছে, তাহাতেও মুক্তা প্রস্তুত হইতে পারে। এ বিষয়ে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

আত্মারহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৬। প্রাণও আত্মা নহে

প্রাণোঽপি আত্মা ন ভবতি।

অর্থাৎ—প্রাণও আত্মা নহে। হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মার উপাসকদিগের মত এই যে, প্রাণই আত্মা; কিন্তু প্রাণেরও ত অহম্প্রত্যয় ভাব আছে, অর্থাৎ প্রাণেও আমার প্রাণ ইত্যাদি অনুভবের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাণও দৃশ্য পদার্থ। অতএব তাহাও আত্মা নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতেও প্রাণের করণত্ব কথিত হইয়াছে। যথা;—

"প্রাণের রক্ষ্য বরং কুলায়মিতি করণত্বাঙ্গী-কারাচ্চ"।

প্রাণ দ্বারা কুলায়স্বরূপ স্থূল শরীরকে রক্ষা করিয়া—ইত্যাদি।

শ্রুতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র অবশ্য প্রামাণিক নহে।

১৭। সুষুপ্তি কালে চৈতন্যের বিদ্য-মানতার অভাব।

সুষুপ্তৌ চৈতন্য ভাবাৎ।

অর্থাৎ—সুষুপ্তি সময়ে চৈতন্যের বিদ্য-মানতা আদৌ থাকে না। সুষুপ্তি অর্থাৎ প্রগাঢ় নিদ্রার অবস্থায় সকলেরই প্রাণ থাকে বটে, কিন্তু চৈতন্য ব্যক্ত থাকে না, আবার প্রাণও চৈতন্যময় আত্মা নহেন।

১৮। যুদ্ধকালে রাজা ও ভৃত্যের পার্থক্য অপরিজ্ঞানের ন্যায় চৈতন্য যে কাহার তাহা বুঝা যায় না।

প্রাণস্যেতরস্মিন্ কালে ভৃত্য স্বামিনোরিব সঙ্কীর্ণয়োর্ন জ্ঞায়তে কস্যেদং চৈতন্য মিতি।

অর্থাৎ—রাজা ও ভৃত্য যখন একত্র সমর-সজ্জায় অবস্থান করেন, তখন কে রাজা, কে ভৃত্য, ইহা যেমন সহজে নির্ণয় করা যায় না, সেইরূপ জাগরণাদি সময়ে প্রাণ ও আত্মা একত্র সংকীর্ণ থাকায় কাহার চৈতন্য ইহা আদৌ উপলব্ধ হইবার নহে

১৯। সুষুপ্তিকালে প্রাণ বিজ্ঞান রহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুষুপ্তেতু পুনর্বিজ্ঞান রহিতঃ প্রাণ উপলভ্যতে।

অর্থাৎ—সুষুপ্তি কালে প্রাণ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-রহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সুষুপ্তি কালে প্রাণের চৈতন্য নাই বলায়, অপর সময়ে যে তাহার চৈতন্য আছে, ইহা বুঝিতে হইবে না। জাগ্রত অবস্থায় প্রাণেরই যে চৈতন্য আছে, ইহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতে পারে, কারণ সে সময় প্রাণের চিহ্ন জীবন ও আত্মার চিহ্ন চৈতন্য উভয়ই ব্যক্ত ও পর-স্পর সম্মিলিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বাভাবিক কারণে অব্যক্তভাবে অব-স্থান করায় আত্ম-চৈতন্যও অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকেন। কিন্তু পক্ষান্তরে প্রাণ পূর্ব্ববৎ ব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় আর কোন সন্দেহের কারণই বর্ত্তমান থাকে না। এই কারণেই সুষুপ্তি সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। নানাপ্রকার

সৈন্য ও সামন্তের সহিত যোদ্ধ্‌বেশে একই স্থলে এবং একই সময়ে যদি রাজা অবস্থান করেন, তবে কোন্ ব্যক্তি রাজা, আর কেই বা তাঁহার সৈন্য বা সেনাপতি, ইহার নির্দ্ধারণ বিষয়ে যেমন ঘোর সংশয়ের উদ্রেক হয়, জাগ্রত অবস্থায় সেইরূপ প্রাণ ও আত্মার সহিত এক সঙ্গে কার্য্য করায় চৈতন্যরূপ চিহ্নটি যে কাহার, এ বিষয়ে সংশয় উৎপত্তি অনিবার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সুষুপ্তি সময়ে প্রাণের চিহ্ন যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। অতএব প্রাণ যে আত্মা নহে, ইহা বুঝিতে বোধ করি সন্দেহ না থাকিতে পারে।

২০। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণের বিরাম বশতঃ প্রাণের বিজ্ঞানাভাব সম্ভবপর কি না?

করণোপরমাদ্ বিজ্ঞানাভাবঃ প্রাণস্যেতি চেৎ।

অর্থাৎ—যদি কেহ বলেন যে, সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণের বিরাম নিবন্ধনই প্রাণের বিজ্ঞানাভাব অনুভূত হয়।

২১। রাজা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ভৃত্যবর্গেরও কার্য্যে অব্যাপৃত থাকা যেমন অসম্ভব, প্রভুস্থানীয় প্রাণের কার্য্য থাকিতে ভৃত্য ইন্দ্রিয়বর্গেরও সেইরূপ।

ন স্বামিনি ব্যাপ্রিয় মাণে করণোপরমাভাবাৎ রাজা পুরুষবৎ।

ইন্দ্রিয়গণের বিরাম অবস্থায় প্রাণের বিজ্ঞানাভাব অবস্থা আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ রাজা যদি নিজেই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারিবর্গের পক্ষে কর্ম্মে উদাসীন থাকা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ প্রভুস্থানীয় প্রাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভৃত্যস্থানীয় ইন্দ্রিয়নিবহের কার্য্য বিরতিও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

২২। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের আজ্ঞাবহ নহে।

অতএব ন প্রাণ স্যৈতানি।

অর্থাৎ—ইন্দ্রিয়গণ কখনই প্রাণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য নহে। প্রাণের চৈতন্য আছে, সুষুপ্তিকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হয়, সেই কারণেই তাহার উপলব্ধি হয় না, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ যদি প্রাণই চেতন ও ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ামক বা পরিচালক হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি সময়ে তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কি জন্য ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালনকার্য্যে উদাসীন থাকিবে? রাজা যখন অন্য কোন রাজার সহিত সংগ্রামাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তখন কি তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণ যুদ্ধকার্য্যে নিবৃত্ত থাকিতে পারে? ইহা সম্ভব হইলে ভৃত্যবর্গের উপর রাজার যে কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাণের ও ইন্দ্রিয়বর্গের কোন প্রভুত্বই নাই, সুতরাং প্রাণ ভিন্ন এমন একটি চৈতন্যময় পদার্থের বিদ্যমানতা অবশ্যই আছে, যিনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক।

২৩। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিরই অধীন।

যং স্বাপেনোপরতস্য স্যৈতানি করণানি উপরতানি।

অর্থাৎ—নিদ্রিত অবস্থায় স্বকার্য্য হইতে যে বিরত হয়, ইন্দ্রিয়গণ সেই বুদ্ধিরই অধীন। কারণ বুদ্ধি যদি স্বকার্য্য-বিরত হয়, তাহা হইলে তদধীন ইন্দ্রিয়বর্গও নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ক্রিয়াগুলির করণসাধন বা উপায়সমূহ কাহার

অধীন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। করণ বা উপায়গুলি কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তাহাদের করণত্বই থাকে না। যাহারা স্বাধীন, তাহারা করণ না হইয়া কর্ত্তাই হইয়া উঠে। সুষুপ্তি সময়ে দর্শনাদি জ্ঞানরহিত অবস্থায় যিনি বিজ্ঞান-স্বরূপে অবস্থান করেন, ইন্দ্রিয়নিচয় তাঁহারই কর্তৃস্বাধীন। কারণ ভাবে বুদ্ধির অবস্থানই নিদ্রা। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ মাত্র, অবিদ্যাই কিন্তু তাহার প্রকৃত মূল কারণ। অন্তঃকরণ যে সময় স্বকীয় কার্য্য নিশ্চয়, সঙ্কল্প, বিকল্প ও অভিমানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মূল কারণ অবিদ্যায় লীনভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহার নিদ্রাবস্থা। নিদ্রিত অবস্থায় বুদ্ধিগত আভাষ চৈতন্যই, বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করেন, অতএব সেই বিজ্ঞানাত্মাই ইন্দ্রিয়-গণের অধিস্বামী বা নিয়ন্তা।

২৪। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বর্গে অধিষ্ঠিত হইলেই ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ে প্রবৃত্তি সঞ্চার হয়।

যদাসৌ বহির্নির্গত্য করণান্যধিতিষ্ঠতি,
তদা সর্ব্বাণি করণানি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তন্তে।

অর্থাৎ—বুদ্ধি যে সময়ে বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহে অধিষ্ঠান করে, তখনই নিখিল ইন্দ্রিয়রাজি নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়টি বিশদ-ভাবে বিবৃত হইতেছে।

অন্বয় ব্যতিরেক কাহাকে বলে ?

যে বস্তুটির বিদ্যমানতায় অন্য একটি বস্তুর আস্তিত্ব ও যাহার অভাবে তাহার বর্ত্তমানত্বা-ভাব—শেষোক্ত বস্তুটির সহিত সেই বস্তুটির সে সম্বন্ধ, তাহাকে অন্বয়-ব্যতিরেক বলা যায়। এস্থলে বিজ্ঞানাত্মা যখন অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে বাহ্য বিষয়াভিমুখ করতঃ নিজে ও বুদ্ধি দ্বারা বহির্মুখ হইয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে অধিষ্ঠিত হন, ইন্দ্রিয়সমূহ তখনই স্ব স্ব শব্দাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়ারাজি উৎ-পাদন করে। বুদ্ধিও ঠিক সেই সময়েই ইন্দ্রিয়-সন্নিহিত বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাই বিজ্ঞান আত্মার অধিষ্ঠান ও করণের প্রবৃত্তি-অন্বয়।

২৫। জাগ্রত স্থিতির হেতুভুত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের উদ্ভব-কালে সুষুপ্তি হইতে বুদ্ধির সঞ্চার হয়।

যদা জাগ্রৎ স্থিতি নিমিত্তং কর্ম্মোদ্ভূতং ভবতি,
তদা স্বাপাদুপরতো ভবতি।

অর্থাৎ—যে সময় জাগ্রত স্থিতির হেতু-ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের উদ্ভব হয়,—তখন সেই বুদ্ধি সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানাত্মা যে ঠিক কোন্ সময়ে এইরূপে বহির্ম্মুখ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহে আসিয়া অধি-ষ্ঠান করেন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মাত্র তাহাই আলোচ্য। যখন জাগ্রত অবস্থার কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম উদ্ভূত হয়, বিজ্ঞানাত্মা তখনই নিদ্রা হইতে উপরত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম-ফল ভোগই জাগ্রদাদি অবস্থার হেতু। আমরা কায় মন ও বাক্য দ্বারা অবিরামভাবে যে সমস্ত কার্য্য দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়-তই সম্পন্ন করিতেছি, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-ভাবে সে সমস্তই নিজ নিজ ফল আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। কতকগুলি দিনান্তরে, কতকগুলি বর্ষান্তরে, কতকগুলি বহু বৎসরান্তে, আবার কতকগুলি বা জন্মজন্মা-ন্তরে। এইরূপে কর্ম্মসমূহ অনাদিসঞ্চিত

কর্ম্ম বাসনা দ্বারা সূত্র গ্রথিতের ন্যায় রুদ্ধ ও ও প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় বিচিত্র গতিতে প্রাণিগণের সংসারযাত্রা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখিয়া দেয়। যদিও জন্মান্তরাদি প্রাপক কর্ম্মপুঞ্জের প্রচার ও ফলদানবিষয়ক কালজ্ঞান যোগিগণেরও দুঃসাধ্য, তথাপি ঐহিক ফলদায়কবিশেষ, নিত্যফলদ কতকগুলির প্রচার ও সময়জ্ঞান, স্থূলতঃ অল্প আয়াসেই অনুভূত হইতে পারে। এইরূপে আমরা দৈনন্দিন ফলদায়ক পরিশ্রমাদি রূপ কর্ম্মকে আশুভাবিনী নিদ্রার প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে পারি।

২৬। বিজ্ঞানাত্মা কখন্ স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন?

তৎক্ষয়ে সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধি সম্পর্কজনিত বিষয়-বিজ্ঞানেন স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছতি।

অর্থাৎ—জাগ্রত অবস্থাপ্রাপক কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অন্তঃকরণ রূপ উপাধি সম্বন্ধজনিত বিষয়জ্ঞান দ্বারা নিখিল ইন্দ্রিয়বর্গকে সংহৃত করিয়া, বিজ্ঞানাত্মা স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন স্ফটিক স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও সন্নিকটস্থ জবাকুসুম প্রভৃতির লোহিতাদি বর্ণ রঞ্জিত হওয়ায় তত্তৎ বর্ণযুক্তের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মাও স্বভাবতঃ নিত্য-শুদ্ধবদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব হইয়াও, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সান্নিধ্যবশতঃ কর্তৃত্ব ও সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি কর্ম্ম সম্পর্কে—"আমি কর্ত্তা," "আমি সুখী," "আমি দুঃখী"—ইত্যাদিরূপ অভিমান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—স্ফটিকের পুষ্প বিশেষের আভা প্রতিফলনের ন্যায় এই বুদ্ধিই আত্মার উপাধি। কথিত এই বুদ্ধি ব্যতীত, অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলিয়া, আত্মার সূক্ষ্মতম আরও একটি উপাধি আছে, তাহাই বুদ্ধি সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি।

উপাধি কাহাকে বলে?

সাধারণতঃ যাহা সমীপে বিদ্যমান থাকিয়া নিজ কার্য্য নিকটস্থ বস্তুর উপর সংক্রামিত করিয়া তাহাতেই তত্তৎ কার্য্যের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, শাস্ত্র তাহাকেই উপাধি পদবাচ্য করিয়াছেন। এবংবিধ উপাধিতে আত্মার অভিমান যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই তাহা উপাধি। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপস্থিত চৈতন্যের নাম চৈতন্যাভাস। এই চৈতন্যাভাস যখন বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করেন, তখনই তাঁহার স্বপ্নাবস্থা; পক্ষান্তরে যখন অজ্ঞান-উপাধিতে উপহিত চৈতন্যাভাস, অজ্ঞান উপাধিক বিজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকেও উপরত করেন, তখন তাঁহার সুষুপ্তি। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানরূপ উপাধির নাশ হয় না। মোক্ষ পর্য্যন্তই তাহার স্থিতি।

২৭। বিজ্ঞানাত্মা পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এবং স্থানত্রয়ং অনবরতং গচ্ছতি।

অর্থাৎ—এইরূপে বিজ্ঞানাত্মা অনবরতই স্থানত্রয় প্রাপ্ত হইতেছেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা না ঘটে—সে পর্য্যন্ত তিনি কখন ক্রমপূর্ব্বক এবং কখন বা ক্রমরহিত অবস্থায় অবিরামভাবে এই স্থানত্রয়—অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

ভারতীয় দর্শনোক্ত জ্ঞানসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

আজ কাল জ্ঞানের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং জ্ঞানালোকদীপ্ত মনুষ্যসমাজে জ্ঞানের যেরূপ আদর বাড়িতেছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দু-দর্শনোক্ত জ্ঞান সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত নিরর্থক ও অসঙ্গত হইবে না। প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট জ্ঞান কি পদার্থ ছিল, তাঁহারা জ্ঞানকে কি ভাবে দেখিতেন, কিরূপেই বা তাহার বিভাগ করিতেন, তাহার উপকারিতাই বা কি ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে আমাদের প্রভূত লাভের আশা না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই। বরং অতীত চিন্তাস্রোতের গতি দেখিয়া বর্ত্তমান প্রবাহের তুলনা করিলে কিছু সুফলের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে।

এ জগতে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিত্য অনুভূত হয়। অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য কার্য্যটী হইতে অতি মহৎ ও বৃহৎ কার্য্যটী পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই জ্ঞানের সমান আবশ্যকতা আছে। জ্ঞান জগতের একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ। তাহাকে ছাড়িলে আমাদের এক দণ্ডও চলে না। দর্শন শ্রবণ আহার বিহার প্রভৃতি সামান্য কার্য্যগুলি যেরূপ জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, জগতের উন্নতি মনুষ্যজাতির সুখস্বচ্ছন্দ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি মহৎ বিষয় সমূহও সেইরূপ কেবলমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই সাধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। এমন কি জ্ঞান ব্যতীত আমাদের জীবনযাত্রা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে।

দর্শন শ্রবণ স্পর্শন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারই জ্ঞানমূলক। কোন পদার্থে চক্ষুঃ সংযোগ হইলেই যে উহার দর্শনব্যাপার সিদ্ধ হয়, এরূপ নহে। যতক্ষণ দেখিলাম বলিয়া জ্ঞান না হইতেছে, ততক্ষণ উহা দেখা হয় নাই। কেবল চাহিয়া থাকিলেই দেখা হয় না। গভীর চিন্তামগ্ন বা শোকাভিভূত হইয়া আমরা কত বস্তু দেখি, কিন্তু সকলই কি দেখিয়াছি বলিয়া জ্ঞান হয়? এইরূপ শব্দ কর্ণগোচর হইলেই শ্রবণ করা হয় না, উহাতে অপর কিছু প্রয়োজনীয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটে, যে যখন আমরা কোন বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হই, তখন কেহ আমাদিগকে কোন কথা বলিলে আমরা তাহা শুনিতে পাই না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দর্শনাদি ব্যাপারে মনঃসংযোগই প্রধান কারণ। যতক্ষণ না মন তত্তৎ পদার্থে নিবিষ্ট হয়, ততক্ষণ সেই সেই পদার্থে দর্শনাদিজনিত জ্ঞান হয় না। নয়নাদি গোচর হইবার পর মনঃসংযোগে সেই সেই বস্তুর জ্ঞান হইলে তবে দর্শনাদিব্যাপার সিদ্ধ হয়। যে যে বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় না, সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানও হয় না এবং জ্ঞান না হইলে সেই সেই বিষয়ের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না। স্পর্শনাদি ব্যাপারেও এইরূপ। দর্শনে শ্রবণে আহারে বিহারে স্বপ্নে জাগরণে সকল অবস্থায় সকল কার্য্যেই জ্ঞান প্রয়োজনীয়; জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সকল কার্য্যেই জ্ঞানের সাহায্য লইতে বাধ্য। অতএব জ্ঞান কাহাকে বলে বা কি কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আমাদের একটু চিন্তা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। জ্ঞাত হওয়া বা জানার অর্থ জ্ঞান (The act of knowing)। জ্ঞান ও বোধ

সমানার্থ। জ্ঞা ধাতু হইতে জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয় এই দুইটী শব্দও হইয়াছে। যে জানে, যে জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ত্তা, যে না থাকিলে জানা অসম্ভব হয়, সেই জ্ঞাতা; সেইজন্য আত্মাই জ্ঞাতা। জ্ঞেয় শব্দে জ্ঞানের বিষয় বুঝায়। যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জ্ঞেয়। জগতের বাহ্য বিষয় সকলই সাধারণতঃ জ্ঞেয় নামে অভিহিত, সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থ অসংখ্য। বাহ্য বিষয়ই যে কেবল জ্ঞেয় হইবে এমন নহে, আন্তর বিষয়ও জ্ঞেয় হইতে পারে। যাহা কিছু জ্ঞানের গোচর, তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই তিনটী বড় নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। জ্ঞেয় পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে যেমন জ্ঞান সম্ভব হয় না, সেইরূপ জ্ঞাতা না থাকিলেও জ্ঞান অসম্ভব হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের সাধন—উহারা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, উহাদের সাহায্যেই জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়। পূজ্যপাদ অমর সিংহ জ্ঞান শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"।

মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধির নাম জ্ঞান, অন্য বিষয়িণী বুদ্ধিকে, যথা শিল্প ও শাস্ত্রবোধকে বিজ্ঞান কহে। ইহার অন্য প্রকার অর্থও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। মোক্ষফলাথী জ্ঞান, অন্য ঘটপট বিষয়াথী জ্ঞান, শিল্পশাস্ত্র বিষয়াথী বিজ্ঞান। অথবা মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞান ধী, অন্য বিষয়ক বোধ জ্ঞান, শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বোধ বিজ্ঞান। অথবা মোক্ষ শিল্প-শাস্ত্র ও অন্যান্য সকল বিষয়ক জ্ঞানেই সমান-ভাবে জ্ঞান বা বিজ্ঞান এই উভয় পদের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।*

জ্ঞান শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়; জ্ঞান অর্থে বুদ্ধি বুঝায়, অনেক সময় বিদ্যা অর্থে প্রযুক্ত হয়, কখনও কখনও চেতনামাত্রে ব্যবহৃত হয়, কখনও বা তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝাইয়া থাকে।

যোগশাস্ত্রে জ্ঞান অর্থে বুদ্ধিবৃত্তিনিরোধ বুঝায়।*

জ্ঞানের সাধনও জ্ঞান নামে কখনও কখনও উক্ত হয়। যেমন গীতার ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ। ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্। ৮
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ৯

* মোক্ষবিষয়ে ধীর্জ্ঞানং, অন্যত্র ঘটপটাদি বিষয়ে জ্ঞানং, শিল্পশাস্ত্রয়োর্বিজ্ঞানং। মোক্ষ-ফলাধীর্জ্ঞানং তস্মাদন্যত্র শিল্পশাস্ত্রয়োধীঃ বিজ্ঞানমিত্যন্যে। বায়স্তু মোক্ষবিষয়ে যজ্ জ্ঞানং তত্ ধীরুচ্যতে, অন্যত্র জ্ঞানং, শিল্পশাস্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞানমিতি। ভরতস্তু মোক্ষে শিল্পে শাস্ত্রে চ যা ধীঃ সা জ্ঞানং বিজ্ঞানং চোচ্যতে। এষা বিশেষ প্রতিপত্তিঃ। অন্যত্র ঘটপটাদৌ যা ধীঃ সাপি জ্ঞানং বিজ্ঞানং চোচ্যতে। এষা সামান্য প্রতিপত্তিঃ। মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং বিজ্ঞানং যথা :—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ" 'সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টাঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।' অন্যত্র যথা :—'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে', 'ঘটত্বপ্রকারকং জ্ঞানং' 'শিল্পজ্ঞানং' 'ব্যাকরণজ্ঞানং' 'ঘটাদিবিজ্ঞানং' ইত্যাদি।

অমরকোষঃ।

* যোগশাস্ত্রমতেতু
"একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্।

মহাভারত শাঃ মোক্ষধর্ম্ম।

একত্বং বুদ্ধিমাত্রেণাবস্থানং বুদ্ধিবৃত্তিনিরোধ ইতি যাবৎ। টীকা।

যয়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যাভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি। ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। ১১

এস্থলে যাহাদ্বারা সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পারে বা জ্ঞানোপায়কেই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইতেছে।

বৈদান্তিকেরা জ্ঞানকে চেতনামাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া জ্ঞানের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহারা বলেন, সকল জ্ঞানই উপাধিশূন্য হইলে একরূপ হইয়া থাকে। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি সকল অবস্থায় সকল কালেই জ্ঞান বিদ্যমানও একরূপ। "সমুদয় পদার্থের সুস্পষ্ট ব্যবহারযোগ্য যে কাল, তাহার নাম জাগ্রত অবস্থা। তাহাতে জ্ঞেয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও তাহাদিগের আশ্রয় আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী, এ সকল স্বরূপত ভিন্ন হইলেও তত্তদ্ বিষয়ক যে জ্ঞান (শব্দজ্ঞান স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি) সেই সকল উপাধিস্বরূপ শব্দ স্পর্শাদি বিষয় হইতে পৃথক্ হইলে তাহা একাকার হওয়াতে একমাত্রই হয়, উহাদের জ্ঞান পৃথক্ ও বহু নহে। সংস্কার দ্বারা বস্তুর ব্যবহারযোগ্য কালের নাম স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় পদার্থসকল ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞান যেমন একরূপ হয়, স্বপ্নাবস্থাতেও সেইরূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, তাহাতে জ্ঞেয় বিষয়সকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞান ভিন্ন নহে। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে বিভেদ এই যে, স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত বিষয় সকল অস্থায়ী, জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থসকল স্থায়ী। সুষুপ্তি অবস্থায়ও এইরূপ। সে সময় সুখে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন থাকিলেও জ্ঞানের অসদ্ভাব নাই। গাঢ় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া আমরা বলিয়া থাকি, 'আজ বেশ ঘুমাইয়াছি, এরূপ সুখে ঘুমাইয়াছি যে কিরূপে সময় কাটিল কিছুই জানিতে পারি নাই।' এখন দেখা যাইতেছে যে, সুষুপ্তি হইতে উত্থিত জাগরিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বোধ হয়। আমি তখন সকল বস্তুর অজ্ঞাতা ছিলাম, এইরূপ বোধ হয়। তাহাকে স্মরণজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। কারণ সে সময়ে তত্তদ্ বিষয়ে চক্ষুরাদিসংযোগ বর্ত্তমান নাই। অতএব সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞানের বোধ হওয়াতে জ্ঞানের সত্তা অঙ্গীকার করিতে হয়, এবং যেরূপ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার বস্তুসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞানের ঐক্য আছে, এরূপ সুষুপ্তিকালের জ্ঞানও, অজ্ঞানাদি বিষয় হইতে ভিন্ন, কিন্তু অবস্থান্তরের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। আবার যেরূপ জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই জ্ঞান একরূপ, সেইরূপ এক দিবসের জ্ঞান অন্য দিবসের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে পক্ষ মাস বৎসর প্রভৃতি ও ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানকালের জ্ঞান একমাত্রই হইয়া থাকে, কদাপি পৃথক্ নহে। এইরূপে জ্ঞানের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হয়।*

নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, জ্ঞান আত্মার বিশেষ ধর্ম্ম। 'জ্ঞানসুখাদিমানাত্মা।' যেরূপ নীল পীতাদিবর্ণ দ্রব্যের ধর্ম্ম বা গুণ, দ্রব্য-

* শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে। ৩
তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে। ৪
সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ। ৫
সবোধো বিষয়াদ্ ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সংবিত্তদ্বদ্দিনান্তরে। ৬
মাসাব্দ যুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা।
পঞ্চদশী ১ অধ্যায়।

কেই আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানও আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ধর্ম্ম—আত্মা ধর্ম্মী।* বৈদান্তিকদিগের মত অন্যরূপ। তাঁহারা জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পঞ্চদশীর প্রথমাধ্যায়ে 'ইয়মাত্মা পরানন্দঃ' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা 'জ্ঞানই আত্মা' প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন, 'নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।' তাঁহারা বলেন, উপাধিশূন্য জীবাত্মা-সমষ্টিই ব্রহ্ম। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ ভিন্ন নহে, উভয়ের স্বরূপ একই, কিন্তু যখন ঘটের মধ্যে থাকে, তখন উহাকে ঘটাকাশ বলি এবং ঘটের নাশে মহাকাশই হয়, সেইরূপ আত্মা জীবত্বোপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবাত্মা বলিয়া কথিত হন এবং উপাধিনাশে সেই আত্মাই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হয়েন। সেই ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশের জন্য বলিতেছেন যে, তিনি নিত্য বা সৎ, জ্ঞান বা চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাব। তাঁহার প্রথম স্বরূপ সত্তা। সত্তা নিত্য ও অবিনাশী। কোন পদার্থ দেখিলে তাহার জ্ঞানও তাহা আছে এইরূপ জ্ঞান হয়। একটী পুষ্পে চক্ষুঃ মনঃ সংযোগ হইলে উহার দর্শনজ্ঞান ও সেই সঙ্গে 'উহা আছে' এইরূপ জ্ঞান হয়। সেই পুষ্পটীর নাশে সত্তার নাশ হয় না, কারণ সত্তা বা বিদ্যমানতা সে পুষ্পে না থাকিলেও অন্য পুষ্পে তখন আছে। ব্রহ্মের দ্বিতীয় স্বরূপ জ্ঞান। জ্ঞান বা চিৎ নিত্য এবং অবিনাশী। এখানে জ্ঞান অর্থে উপাধিশূন্য জ্ঞান। জ্ঞান দ্রব্যাশ্রয়ত্ব হেতু বহু ও নানাবিধ। দ্রব্যভেদে অবস্থাভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হয়। যেমন শব্দজ্ঞান স্পর্শজ্ঞান হইতে ভিন্ন। কিন্তু শব্দস্পর্শাদি উপাধিবিরহিত জ্ঞান ভিন্ন নহে, সে একমাত্র, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সে শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের লোপ কোন কালেই কোন অবস্থায়ই হয় না, সে নিত্য ও অবিনাশী এবং তাহাই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

নৈয়ায়িকেরা কিন্তু ব্রহ্মকে জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ কহেন না। তাঁহারা বলেন যে, তিনি জ্ঞানের ও আনন্দের আশ্রয় বা জনক। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইলে, ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ না করিয়া প্রচলিত পুংলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগেই সে অর্থ আসিতে পারিত। "স্যাদানন্দথুরানন্দঃ শর্ম্মশাতসুখানি চ"—আনন্দ শব্দ পুংলিঙ্গ। সুতরাং বিশেষ তাৎপর্য্যে প্রচলিত ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে অথবা আ সম্যকনন্দোহর্ষো যস্মাৎ বহুব্রীহি সমাসেও ক্লীবলিঙ্গ হইতে পারে। উভয় প্রকারেই আনন্দজনক এই অর্থ আসে। ব্রহ্ম যে আনন্দজনক শ্রুবাদিতে তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞান শব্দেরও অর্থ এই যে, বিশিষ্টং জ্ঞানং যস্মাৎ অর্থাৎ জ্ঞানাশ্রয়। জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ সামগ্রী। ব্রহ্মে রূপক সাজাইবার প্রয়োজন কি? যদি দুইটী শব্দই এক বস্তুর বোধক হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হয় না। যদি অমরকোষের ন্যায় অভিধান করা প্রয়োজন হয়, তবে জ্ঞানবাচক বা আনন্দবাচক যে যে শব্দ আছে, তাহাদেরও কিছু কিছু উল্লেখ থাকিত। 'অধর্ম্মাৎ জায়তে দুঃখং ধর্ম্মাদুৎপদ্যতে সুখং' ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন, যখন 'শুভাদৃষ্টজন্যতাবচ্ছেদকত্বে' 'আনন্দত্ব' জাতি সিদ্ধ, তখন নিত্যব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইতেই পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মে যে আনন্দ শব্দ তাহা পারিভাষিক অর্থাৎ 'আনন্দ' ব্রহ্মের একটী নাম মাত্র।

* জ্ঞানাধিকরণমাত্মা। তর্ক সংগ্রহ। বিভুর্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্। ভা পরিচ্ছেদ;

একক্ষণে জ্ঞানের বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ সকল জ্ঞানকেই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা প্রমা ও অপ্রমা। অপ্রমা বা মিথ্যাজ্ঞানের দুই ভেদ। ভ্রম ও সংশয়। প্রমা বা সত্যজ্ঞানের দুই ভেদ, যথা স্মৃতি ও অনুভূতি।*

ভ্রমজ্ঞান। অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ ভ্রমঃ। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া নিশ্চয়রূপ জানার নাম ভ্রম। যেমন অন্ধকারে একগাছি রজ্জু দেখিয়া তাহাকে সর্প বলিয়া যে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মে, উহা ভ্রম। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানাই সত্য বা প্রমা জ্ঞান। উহাকে অপর কিছু বলিয়া নিশ্চয় করিলে যথার্থ জ্ঞান হইবে না। উহা অপ্রমান্তর্গত ভ্রমজ্ঞান। শুক্তিকায় রজতজ্ঞানও ভ্রমজ্ঞান। একপ্রকার নেত্ররোগ আছে, যাহাতে সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখায় (Jaundice)। এইরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শশিশুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখে। উহা ভ্রমজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নহে, কারণ শঙ্খ কদাপি পীতবর্ণ নহে, তথাপি তাহাতে পীততাজ্ঞান হইতেছে। ভ্রমজ্ঞানের প্রভাবেই আমাদের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি জন্মে। আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক হইলেও আমরা ইহাতে এতই অভ্যস্ত ও এত মোহাচ্ছন্ন যে, আমাদের ভ্রম কিছুতেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। "আমি" পদার্থ কখনও স্থূলও নহে, কৃশও নহে, সুখী নহে, দুঃখী নহে। শ্রুতি বলিতেছেন ;—"অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমঃ অবায়ু অনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাহ্ অমনোহতেজস্করসমপ্রাণমমুখমগাত্রমিতি।" তিনি স্থূল সূক্ষ্ম দীর্ঘ হ্রস্ব রসগন্ধাদি কিছুই নহেন। কিন্তু "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"—তিনি সাক্ষী চিন্ময়, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। বস্তুতঃ দেহ বা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই আত্মা নহেন। তবে উহাতে যে আমাদের আত্মজ্ঞান জন্মে, তাহা কেবল ভ্রমজ্ঞানের বিলসনমাত্র।

আত্মাকে আত্মা বলিয়া স্থির করা ও দেহাদিকে আত্মব্যতিরিক্ত বলিয়া জানাই প্রমাজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। অপ্রমাজ্ঞানের জনকদোষ হইতেই অযথার্থ জ্ঞান জন্মে। দৃষ্টি বিকৃত না হইলে আর কেহ শঙ্খকে পীতবর্ণ দেখে না। সেইরূপ অবিদ্যা, মোহ বা মায়ার মহিমায় দেহাদি অনাত্ম পদার্থে আমাদের আত্মপ্রতীতি হইয়া থাকে।

সংশয় জ্ঞান। ইহা অপ্রমাজ্ঞানের দ্বিতীয় ভেদ। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া অনিশ্চয়রূপে জানার নাম সংশয়। যেমন দূরস্থ একটা পত্র-শাখাবিহীন বৃক্ষ দেখিয়া সংশয় হয়, "ওটা বৃক্ষ বা পুরুষ"। অথবা একখণ্ড কাচ দেখিয়া সংশয় জন্মে, ইহা কাচ বা হীরক। ভ্রম ও সংশয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভ্রমজ্ঞানে নিশ্চয়রূপ-

---

* স দ্বিবিধঃ যথার্থোঽযথার্থশ্চেতি। তদ্বতি তৎপ্রকারকোঽনুভবঃ যথার্থঃ। যথা রজতে ইদং রজতমিতি জ্ঞানং। সৈবপ্রমা ইত্যুচ্যতে। তদভাববতি তৎপ্রকারকোঽনুভব অযথার্থঃ। যথা শুক্তৌ রজতমিদমিতি জ্ঞানং। সৈব অপ্রমেত্যুচ্যতে। তর্কসংগ্রহ।

"বুদ্ধিস্তুদ্বিবিধামতা। অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চস্যাৎ। ৫১ ভাঃ পঃ। পরে ভ্রম ও সংশয় ভেদে আর দুই প্রকার, যথা :—বুদ্ধেঃ প্রকারঃ প্রাগেব প্রায়শোপিনিরূপিতঃ। অথা বশিষ্টোপ্যপরঃ প্রকারঃ পরিদর্শ্যতে। অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানংদ্বিবিধমুচ্যতে। ১২৭ তচ্ছূন্যে তন্মতির্যাস্যাদ প্রমা সা নিরূপিতা। তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োপি প্রকীর্ত্তিতঃ। ১২৮ ভাঃ পঃ। সর্ব্বব্যবহারহেতুর্জ্ঞানং বুদ্ধিঃ। সা দ্বিবিধা স্মৃতিরনু ভবশ্চ। সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। তদ্ভিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ। ইত্যাদি। আদ্যো দেহে ষাত্মবুদ্ধিঃ শংখাদৌ পীততামতিঃ। ভবেন্নিশ্চয়রূপা যা সংশয়োঽর্থ প্রদর্শ্যতে।

প্রতীতি জন্মে, কিন্তু সংশয়জ্ঞানে ঐরূপ নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে না—এটা বা ওটা এইরূপ সন্দেহ হয়।*

স্মৃতি জ্ঞান। সংস্কারমাত্র জন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। পূর্ব্বানুভূত বস্তুর সাদৃশ্যাদি হেতু জন্য স্মরণকে স্মৃতিজ্ঞান কহে। যখন কোন পদার্থ আমাদের অনুভবে আইসে, তখন সেই বস্তুর সংস্কার আমাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং পরে সেই বা তৎসদৃশ পদার্থ আমাদের অনুভবপথে আসিলে অনুভব বা সাদৃশ্যাদি জ্ঞান দ্বারা আমাদের সেই পূর্ব্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই বস্তুর স্মরণ হয়। যেমন কোন ব্যক্তিকে প্রথমে ভাল করিয়া দেখিয়া পরে যদি সেই ব্যক্তির সহিত বা ঠিক তাহার ন্যায় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে 'ইনিই সেই ব্যক্তি' বা 'ইনি পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তির সদৃশ' এই স্মৃতি তখনই হইয়া থাকে। কোন পদার্থ পূর্ব্বে অনুভূত না হইলে তাহার স্মৃতি হয় না। সাদৃশ্যাদি-কারণ স্মৃতিজ্ঞানের উদ্বোধক।

অনুভব জ্ঞান। অনুভবজ্ঞানই প্রমাজ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞান অপেক্ষা ইহার সমধিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক আমাদের প্রায় তাবৎ জ্ঞানই এই শ্রেণী হইতে আগত ও উপার্জ্জিত। অনুভব চারি প্রকার যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ। প্রত্যক্ষ আবার ৬ প্রকার।*

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্ ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষু দ্বারা রূপের, কর্ণ দ্বারা শব্দের, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণের, রসনা দ্বারা রসের ও ত্বক দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় এবং মন দ্বারা আন্তরিক সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক সমস্ত পদার্থই এই ছয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দর্শনাদি ব্যাপারে মনঃসংযোগই প্রধান কারণ। কিন্তু রূপ প্রত্যক্ষে আলোক সংযোগ ও মনঃসংযোগ উভয়েরই হেতু। অন্ধকারস্থ পদার্থে চক্ষুঃ মনঃ সংযোগ হইলেও কিছুতেই উহার রূপ প্রত্যক্ষ হইবে না। শ্রবণাদি প্রত্যক্ষে মনঃসংযোগই প্রধান হেতু; বহু ছাত্র এক স্থানে একত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার মধ্যে নিজের পুত্রও অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ না করিলে আপনার পুত্রের পাঠ শ্রুত হইবে না। ঘ্রাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষেও এইরূপ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দুইটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা;—'ইন্দ্রিয় জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং' বা 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং' ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ অথবা যে জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না, তাহাকে প্রত্যক্ষ কহে। অনুমিতি উপমিতি শব্দ প্রভৃতি সকল জ্ঞানই অন্য জ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু প্রত্যক্ষে সেরূপ নহে। যথা সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে উপমিতি জন্মে ও পদজ্ঞান শব্দ জ্ঞান উৎপাদন করে। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষজনিত সেই বস্তুর জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে পৃথক্ ব্যবস্থা। যথাস্থানে সকল বিবৃত হইবে।

পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলেও কখনও কখনও উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না,

* "কিং স্বিদয়ো বা স্থাণুর্বৈত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ। * * * "দোষোঽপ্রমায়াঃ জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ। পিত্তদূরত্বাদিরূপোদোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ। ১২৯-১৩১ ভাঃ পঃ।

* অনুভূতিশ্চতুর্বিধা। প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শব্দজে। ঘ্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়বিধ মতং। ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপিস্মৃতঃ। ইত্যাদি ৫১—৫৩ ভাষা পরিচ্ছেদ।

এইরূপ দেখা যায়। কখন ইন্দ্রিয়ের দোষে, কখন পদার্থের দোষে, কখনও বা উভয়ের দোষে এইরূপ ঘটে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যে সকল দোষ বা প্রতিবন্ধক, তাহা সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে যথা;—

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয় ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।"

অতি দূরত্ব হেতু প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন সুদূর আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর প্রত্যক্ষ হয় না। অতি সামীপ্যহেতু যথা নিজ নেত্রস্থ কজ্জলের প্রত্যক্ষ হয় না। অন্ধত্ব বধির-ত্বাদিকে ইন্দ্রিয়াভিঘাত বলে; অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না ইত্যাদি, মনের অনবস্থা, মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে অন্য বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হইলেও উপলব্ধি হয় না; কামক্রোধান্ধ ব্যক্তিরা ইহার নিদর্শন। সূক্ষ্মতা যথা, ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পরমাণুপুঞ্জ অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেও দেখা যায় না। ব্যবধান যথা, প্রাচীর বা পটাদি ব্যবহিত বস্তুর অপ্রত্যক্ষতা। অভিভব যথা, সূর্য্য প্রভাভিভূত বলিয়া দিবাতে তারকাদির প্রত্যক্ষ হয় না। সমানাভিহার বা মিশ্রণ যথা, বর্ষাকালে মেঘমুক্ত বৃষ্টির জল জলাশয়ের জলে মিশ্রিত হইয়া একরূপ হয়, উহার পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

পূজা।

হৃদয়ের বিল্বমূলে পাতি প্রেম-ঘট—
ভক্তিমন্ত্রে করিয়া শোধন,
প্রণয় সলিলে ভরি, শুভলগ্ন দেখি
স্থাপিয়াছি পবিত্র বোধন।
পরাণ প্রতিষ্ঠা করি, নিশিদিন পূজি,
পদে রাখি মন-কোকনদ;
বৃথা খোঁজা, কিছু নাহি আর, সঁপিয়াছি—
যাহা ছিল জীবন সম্পদ্।
তুমি দেব আর কারো নহ ধরণীর,
আমিই করিব পূজা তব;
আছে যত অধিকার সবি তুমি মোর,
নহ কোথা নিত্য অভিনব।
নয়নের পূতজলে ধুয়ে দিব নাথ!
সুপবিত্র ও রাঙা চরণ;
যেথা থাক চিরদিন, পূজিব তোমারে,—
এ পূজায় নাহি বিসর্জ্জন।
রজনী অঞ্চল পাতি, ধরণীর বুকে
যবে ধীরে ঘুমাইতে আসে;
নিভৃতে এ মৌনপূজা, উঠে দীর্ঘশ্বাসে—
অভাগীর হৃদয় আকাশে।
নাহি দুর্ব্বা, ফুলদল, তুলসী, চন্দন,
গুপ্তমন্ত্র নীরব আরাব;
যে করিবে এই পূজা, সে দেখিবে মনে,
দেবতার পুণ্য আবির্ভাব।
ওরে পুণ্য আবির্ভাব॥

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

যদি তুমি নাহি হও বশ।

(১)

পরাণে পশে না শঙ্কা,
ভয় পরমাদ;
ধরে এনে দিতে পারি—
আকাশের চাঁদ।
ভালবাসা লালসায়—
রহি পরবশ
আঁখি দুটি রবে তব
রূপ-নিদ্রালস;
যদি তুমি নাহি হও বশ॥

(২)

কবরীতে দিতে পারি
মুকুতার জাল,
কাঁদায়ে ভাসাতে পারি
এ ভরা বাদল;
মরাল নিন্দিত গুরু
নিতম্বে সরস—
বসাতে, আনিতে পারি
সোণার কলস;
যদি তুমি নাহি হও বশ।

(৩)

লঙ্ঘি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ
মান-সরোবরে,—
এনে দিতে পারি নব
নীল ইন্দীবরে;
রূপা গাছে কোথা যদি
ফুটে সোণা-ফুল;
তাও এনে দিতে পারি
অলকে অতুল।

(৪)

বৈশাখে আকাশ ভরা
কাল মেঘ হতে,—
তোরই তরে ল'তে পারি
বজ্র বুক পেতে;
যদি নাহি হয় বিন্দু
বাসনা পূরণ,
দগ্ধ এ কলিজা ছিঁড়ি
দিতে পারি দান;

(৫)

যৌবনেতে যোগী সাজি
শিরে জটাভার,—
সাঁতারি চলিতে পারি
মায়ার সংসার।
হাসি চেয়ে, সেও ভাল—
কান্না, অপমান;—
যদি তুমি ভালবাসা
নাহি কর দান।

(৬)

জপ তপ তুমি মোর,
ত্যক্ত শত কাজ;
চরণ ধরিতে পারি,
নাহি তাহে লাজ।
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তব
নিষ্ঠুর নীরস
সকলি সহিতে পারি;
বাসনা বিবশ।
যদি তুমি নাহি হও বশ॥

* * * *

আর যদি কভু তুমি হও মোর বশ;
শত অনাদর পাও,—বচন কর্কশ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র—গায়ত্রি

পুষ্পোদ্যানের সার যেমন প্রসূন এবং প্রসূনের সার যেমন তাহার সুরভি; হিন্দুর সার তেমনই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের সার তাঁহার গায়ত্রি। বস্তুতঃ জল বিনা মীন, আলোক বিনা দিন এবং চৈনিক বিনা চীন যেমন সামর্থ্যসংরক্ষণে সমর্থ হয় না, গায়ত্রিহীন ব্রাহ্মণ তেমনি কোন সামাজিক গৌরব বা সৌরভ সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে না। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রি জানে না, অথবা গায়ত্রির গৌরব রক্ষা করে না, ব্রাহ্মণ বলিয়া গৌরব করিবার তাহার কিছুই নাই। কারণ, গায়ত্রিই ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র, গায়ত্রি দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তির পত্তন হয়। গায়ত্রির অপর নাম প্রণব, ইহা ওঁ এই স্বরিতের নামান্তরমাত্র।

> ওঁ মিতিব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলি মাহরন্তি।
> মধ্যে বামনামাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥

যিনি ওঁকারের প্রতিপাদ্য, তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতা তাঁহারই সেবা ও উপাসনা করেন।

> অথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বাস্মা ল্লোকাৎ
> প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এই দুঃখময় সংসার হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ওঁকার রূপ প্রণব বা গায়ত্রি দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জন্মে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষা হয়, সুতরাং গায়ত্রিকে জ্ঞাত হওয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের কয়জন গায়ত্রির অর্থ বুঝেন এবং বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য পথে চলিয়া থাকেন? বাজারের ব্যবসায়ী বেদিয়াগণের মুখস্থ করা সাপের মন্ত্রের ন্যায় অনেক ব্রাহ্মণ শুদ্ধাকারে বা অশুদ্ধাকারে গায়ত্রি আবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু কয়জন প্রকৃত অর্থ বুঝে? কয় জন গায়ত্রি-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া "ব্রাহ্মণ" উপাধির গৌরব বা সৌরভ রক্ষা করিয়া থাকে? শাস্ত্রে বলে, গায়ত্রি-জ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও অধমতর। যে ব্রাহ্মণ নিত্য গায়ত্রি জপ করে না, সে ব্রাহ্মণ নহে, জঘন্য শূদ্র সমতুল্য। অনেক ব্রাহ্মণের ব্যবহার এবং গায়ত্রি-জ্ঞান দর্শন করিলে, মুসলমানদিগের পাঠশালাকে স্মরণ হয়। মুসলমান বালকদিগের পাঠশালার নাম মকৃতব্। মকৃতবে বসিয়া, পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া, মুসলমান-বালকেরা কোরাণ পাঠ করে। ভাদ্র মাসের তরঙ্গভরা ভাগি-রথী জলের মত শরীরকে হেলাইয়া দোলাইয়া যবন বালকগণ কোরাণ পড়ে বটে, কিন্তু কয়জন বালক কোরাণ বুঝে বা বুঝিতে পারে? চল্লিশ সহস্র যবন বালকের মধ্যে একজনও প্রকৃতরূপে কোরাণের অর্থ বুঝে কিনা সন্দেহ। ব্যবসায়ী বেদিয়া জাতি সাপের মন্ত্র আবৃত্তি করে, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ জানে না; মুসলমান বালকের কোরাণ শিক্ষাও ঠিক তদ্বৎ। কেবল মুসলমান কেন, ব্রাহ্মণের দশাও কি ঠিক তাহাই নহে? আমরা প্রতিদিন দুইবেলা অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণকে চলিতে, বসিতে, দৌড়িতে, হাসিতে, কাঁদিতে ও কথোপকথন করিতে দেখিতে পাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে বা পড়িয়াছে? কয়জন ব্রাহ্মণ বেদ বুঝিতে পারে? মুসলমান বালক, কোরাণ বুঝুক আর নাই বুঝুক, খৃষ্টান বালক বাইবেল বুঝুক আর নাই বুঝুক,

কোরাণ বা বাইবেলকে তাহারা পড়িয়া থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান বেদ পড়ে না, বেদ বুঝে না এবং বেদ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই রাখে না। শাস্ত্রকর্ত্তারা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ বেদ না জানে, সে অব্রাহ্মণ। প্রকৃত কথায় বলিতে হইলে, এবম্প্রকার অব্রাহ্মণের সংখ্যাই আজিকালি অধিক এবং তাহারাই সর্ব্বত্র বিরাজমান। ব্যবস্থাকর্ত্তা ঋষি মহোদয়গণ লিখিয়াছেন, সমস্ত বেদ পড়িতে অক্ষম হইলে অন্ততঃ বেদের কিয়দংশও পাঠ করা এবং বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রি বেদের একটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক; অন্ততঃ ইহাও যদি শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে এবং বুঝিতে পারে, তাহা হইলেও বেদজ্ঞান-হীনতার অপবাদ ও মহাপাপ হইতে ব্রাহ্মণ সন্তান মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহাই বা কয়জন ব্রাহ্মণে জানে? কয়জন ব্রাহ্মণ প্রকৃতরূপে গায়ত্রি উচ্চারণ করিতে ও বুঝিতে পারে? উচ্চারণ বা বুঝা দূরে থাকুক, অনেক ব্রাহ্মণ আদৌ গায়ত্রি জানে না, অথবা অংশতঃ মাত্র জানে। বেদ পড়া দূরে থাকুক, গায়ত্রির অর্থ বুঝে না, এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অগণ্য। এইজন্য আমি এক্ষণে গায়ত্রি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে গায়ত্রির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অদীক্ষিত ব্যক্তি অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য। দীক্ষাহীন হিন্দুর হস্তের অন্ন ও জল অপবিত্র। ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্রবিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত; অন্য জাতির দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। কিন্তু পরমহংস, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সিদ্ধপুরুষেরা ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে বা ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণাপেক্ষা অধিকতর পূজ্য ও অধিকতর শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইঁহারাও দীক্ষা দানের উপযুক্ত অধিকারী। ব্রাহ্মণেরাও ইঁহাদের শিষ্য হইতে পারেন। যদি ইঁহারা ব্রহ্মকুলোদ্ভব হয়েন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত না হইলেও ক্ষতি নাই।

ব্রাহ্মণের গুরু যে কোন মন্ত্রই প্রদান করুন, ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্রের নাম গায়ত্রি। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর মন্ত্র আর নাই। ইহাপেক্ষা অধিকতর সুফলদায়ক মন্ত্র, ব্রাহ্মণের পক্ষে আর নাই। গায়ত্রি শিখিলে ও বুঝিলে বেদ পাঠের ফললাভ হয়, এইজন্য বেদের অপর নাম গায়ত্রি এবং গায়ত্রির অপর নাম বেদ। প্রত্যেক সুব্রাহ্মণ, শাস্ত্রমতে আচার্য্য বা উপদেশক; যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রি জানে না, তাহাকে গায়ত্রি শিখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া সুব্রাহ্মণের অতীব কর্ত্তব্যকর্ম্ম। উপবীত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ-বালককে বিশুদ্ধরূপে গায়ত্রির উচ্চারণ শিখাইয়া দেওয়া তাহার অভিভাবকের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য কাজ। উপবীত না হইলে সেই বালক কোন প্রকার ক্রিয়ার অধিকারী হয় না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে উপবীত হইবার পূর্ব্বেও গায়ত্রি শিক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তানের আছে।

ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র গায়ত্রি। যদি আর কোন মন্ত্র না লইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কেবল গায়ত্রি মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তাহাই জপে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দিবারাত্রের মধ্যে অন্ততঃ অষ্টাদশবার গায়ত্রি উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক সুব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই শাস্ত্রবিধি। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনবার, স্নানের পর তিনবার, মধ্যাহ্নভোজন কালে তিনবার, সায়াহ্নে তিনবার, রাত্রিতে ভোজনকালে তিনবার এবং রাত্রিতে শয়ন-কালে তিনবার, এই আঠার বার গায়ত্রি উচ্চারণ করিতে হয়। যদি কেহ সম্পূর্ণ গায়ত্রি উচ্চারিণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে কেবল মনে মনে ওঁ ইহাই উচ্চারণ করিলে যথেষ্ট হয়। সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের পরে এবং রাত্রিকালে সূর্য্যদেব অদৃশ্য থাকেন, এইজন্য এই দুই সময়ে সমস্ত গায়ত্রি উচ্চারণ না করিয়া মাত্র ওঁ উচ্চারণ করিতে হয়। সূর্য্য দৃশ্যমান থাকিলে সমুদয় গায়ত্রি উচ্চারণ করিতে পারেন।

দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ হইলেও শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্যক্তি হইতে পারেন। কিন্তু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়ে সুব্রাহ্মণ হইলে আরও ভাল হয়। যদি শিষ্যের সৌভাগ্যক্রমে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই সুপণ্ডিত ও সুব্রাহ্মণ হয়েন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অন্য জাতির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিলে, গুরু পরিত্যাগের পাপ জন্মে না। দীক্ষাগুরু যেমন আছেন, তিনি তেমনই থাকিবেন, কিন্তু শিষ্যের সুবিধা ও প্রবৃত্তি অনুসারে অন্য জাতীয় সুপণ্ডিত, সদাচার ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় অপরাধ হয় না। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে গৃহীগুরু প্রশস্ত; অগৃহীর পক্ষে পরমহংস বা সন্ন্যাসী প্রশস্ত। গৃহিগণ ইচ্ছা করিলে পরমহংস বা সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা লইতে পারেন। কিন্তু অগৃহিগণ কোনমতেই গৃহিগুরুর শিষ্য হইতে পারেন না। গুরু ভিন্ন, পরমহংস ও সন্ন্যাসীর নিকট কেহই প্রণম্য নহেন।

শাস্ত্রকর্ত্তা মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ;—

"মধুলব্ধা যথা ভৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানং লব্ধা তথা শিষ্যা গুর্ব্বাং গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ, মধুমক্ষিকা মধু পাইবার জন্য এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করে, তেমনি জ্ঞানলাভ করিবার কারণ শিষ্য গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকটে গমন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গায়ত্রিই ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র। গায়ত্রির প্রধান নাম প্রণব। ওঁ ইহাই প্রণব। অ উ ম এই তিন অক্ষরে প্রণব অর্থাৎ ওঁ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ওঁ এই প্রণবের নাম ব্রহ্ম, বেদ, গায়ত্রি, মূলমন্ত্র, বীজ, বীজমন্ত্র, প্রণব, পর-মাত্মা, প্রাণ, বিশ্ব, শক্তি, মাতা ইত্যাদি। সমস্ত বৈদিক গায়ত্রিটী এই—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ
ওঁ সত্যং ওঁ তৎ—
সবিতুবরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো-
য়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই মন্ত্রে সপ্তবার ওঁ সমাযুক্ত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ওঁ এই যুক্তাক্ষর অ উ ম এই তিন অক্ষর সমাযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অ অর্থে ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, উ অর্থে বিষ্ণু অর্থাৎ পালনকর্ত্তা এবং ম অর্থাৎ মহাদেব (প্রলয়কর্ত্তা)। ভগবান্‌কে কেবল অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ন্যায়বান এবং পবিত্রতম বলিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না, তাঁহাকে আমাদের ও সমগ্র চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্, গ্রহ, নক্ষত্রাদিময় সমুদয় বিশ্বসংসারের সৃজনকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ওঁ এই মন্ত্রে ভগবানের সৃজনশক্তি, পালনশক্তি ও সংহারশক্তি একত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা এবং শিব-রূপে সংহারকর্ত্তা। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে

পিতা, পালনকর্ত্তারূপে রাজা এবং সংহারকর্ত্তা-রূপে বিধাতা। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ কহিয়াছেন, "অক্ষরং (ওঁ) পরমং ব্রহ্ম"। মনু কহিয়াছেন, "একাক্ষরং (ওঁ) পরং ব্রহ্ম"। মনু আরও কহেন, অ উ ম এই তিনই ব্রহ্ম। "ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম"। (মনুসংহিতা ১১ অ, ২৬৬ শ্লোক)।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নির দুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥
(মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়)।

গীতায় ভগবান্ পুনরপি বলিয়াছেন, "গিরামস্ম্যেকমক্ষরং"। "সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ (ওঁ)। গীতার নবম অধ্যায়ে আছে, "বেদাঞ্চ পবিত্রেমোঙ্কার," অন্যত্রে ভগবান্ কহিয়াছেন, আমিই প্রণব (ওঁ)। গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে ঈশ্বর কহিতেছেন, "ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রি"। বেদের ব্রাহ্মণভাগে, বেদান্তে ও স্মৃতিতে এই প্রণব বা ওঁকার ওঁতৎসৎ রূপে বিদ্যমান আছে। মনুসংহিতায় ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; "স্রষ্টা স পুরুষো লোকে ব্রহ্মা ইতি কীর্ত্ত্যতে"। গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন, "আমি অ" (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা) "অক্ষরা নাম অকারোস্মি"। মনুসংহিতা ও পাণিনি এবং বহু শাস্ত্রে উ বিষ্ণুর নাম এবং ম মহাদেবের (শিবের) পরিচয়। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন, "আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত, অর্থাৎ আমিই জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর কারণ।" সুতরাং তিনিই জন্মদাতা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা।

১। "অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।"

২। "অবিভক্ত ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূত ভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।"

অর্থাৎ—ঈশ্বর পোষক, উৎপাদক ও ভক্ষক (নাশক)। সাত্বিক প্রকৃতির লোকেরা ভগবান্‌কে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে বিশ্বাস করিয়া কৃতজ্ঞ হয়েন, পালকরূপে বিশ্বাস করিয়া অনুগত ও ভক্ত হয়েন এবং নাশকরূপে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে মান্য ও ভয় করেন; ইহাতে কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য, ভক্তি ও ভয়ের শিক্ষা হয়, সুতরাং পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে, পাপকর্ম্ম করিতে মনোমধ্যে ভয়ের উৎপাদন হয়। "The fear of God is the beginning of wisdom."—এই ওঁ মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই জ্ঞান নিহিত আছে। মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ Trinity, হিন্দুর অ উ ম (ওঁ) অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রকার ভেদমাত্র। সাধারণভাবে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা নিম্নলিখিতরূপে গায়ত্রি উচ্চারণ করেন;—

ওঁ ভূঃ ওঁঃ র্ভব ওঁ স্বঃ তৎসবিতু র্বরেণ্যম্
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

পূর্ব্বে ওঁ মন্ত্রের অর্থ করা হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত গায়ত্রির অর্থ করা যাইতেছে। পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি দৃষ্টিপথের অতীত; সেই কল্পনাতীত জ্যোতিষ্মান্ ভগবান্ দৃষ্টিপথে আসিলে মানব তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সূর্য্য অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ কিছুই নাই; সূর্য্যমণ্ডলে ভগবানের অবর্ণনীয় সামর্থ্য এবং সৃজন পালন ও সংহারশক্তি এবং অভাবনীয় জ্যোতিঃ নিহিত আছে। সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষা আর কোথাও তাঁহার অধিকতর জ্যোতিঃ প্রকাশ নাই, এই জন্য সূর্য্যই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সমস্ত গায়ত্রি মন্ত্রে সূর্য্যের স্তোত্রচ্ছলে ভগবানের উপাসনা করা হইয়াছে। পরমেশ্বরের যত প্রকার উপাধি বা নাম আছে, তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দ এই নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। ইহা সৎ চিৎ এবং আনন্দ এই তিন শব্দে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সৎ শব্দের অর্থ নিত্য, অর্থাৎ তিনি নিত্য বর্ত্তমান ; চিৎ শব্দের অর্থ প্রকাশ (জ্যোতিঃ) এবং আনন্দ শব্দের অনেক অর্থ। আনন্দ শব্দের অর্থ শান্তি, ধর্ম্ম, সুখ, প্রাণ, ইত্যাদি। শান্তি ভিন্ন সুখ হয় না, সুখ ভিন্ন প্রাণধারণ হয় না, এবং প্রাণ না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না ইত্যাদি। ঈশ্বরের অপর নাম জ্যোতিঃ বলিয়া তিনি অগ্নি, তেজ, চিৎ প্রভৃতি উপাধিতে খ্যাত। ঋক্ বেদের প্রথম শ্লোক এই ;—

"অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্ন ধাতমম্।"

এস্থলে ভগবান্‌কে অগ্নিরূপে যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ ও দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূতরত্নধারী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্লোকে বিভাবসু মধ্যস্থিত মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ পর-ব্রহ্মের উপাসনাই বুঝাইতেছে, কিন্তু আরও পরিষ্কার করিয়া কয়েকটি বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম ;—

গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং
গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চ রথাং॥
আদ্রৌ চিদস্মা অং তর্দুরোণে
বিশাং ন বিশ্বো অমৃত স্বাধীঃ। ১
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
সং প্রশ্নং ভুবনা যং তানা॥২

অর্থাৎ—"যে অগ্নি (মহাতেজ) জলের মধ্যে, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্থের মধ্যে, জঙ্গমের মধ্যে, যজ্ঞগৃহে, পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তিনিই সকলের নিকট হব্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবৎসল রাজার ন্যায় হিতকারী, তিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, বিধাতা, তিনি একেশ্বর, তিনিই সমস্ত ভুবনের জিজ্ঞাস্য এবং তিনিই এক হইয়াও অনেক দেবতার নামে উপাহিত। তিনি জীবাত্মা ও বল দিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকলে মান্য করে, তিনি অমৃতস্বরূপ, তিনি সকলের প্রভু, তিনি স্রষ্টা, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার পূজা করিব?" এই শ্লোকে ভগবান্ পিতা, বিধাতা, ঈশ্বর, স্রষ্টা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রভু প্রভৃতির পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে। যাহারা বলে, বেদের সময়ে ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরপূজা ছিল না, কেবল পদার্থপুঞ্জের স্তোত্র ছিল, তাহাদের ভ্রম এক্ষণে দূরীভূত হউক। যাহারা বলে, বেদের সময়ে ভারতের আদিম পুরুষেরা অসভ্য ছিল, তাহারা এই শ্লোকে "রাজা"র শব্দে উল্লেখ দেখিতে পাইবে, ইহাতে বুঝা যায়, তখন সভ্যজাতির ন্যায় রাজ্যপালন ও শাসনপ্রথাও বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক, ভগবানের অপর নাম অগ্নি। ব্রাহ্মণেরও অপর নাম অগ্নি, অগ্নি তেজোময় ; তেজো-ময় পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ সূর্য্য সমতুল্য জ্যোতিঃস্বরূপ। গায়ত্রি দ্বারা সূর্য্যের স্তব করা হইয়াছে অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা করা হইয়াছে।

সূর্য্য না থাকিলে তেজের (অগ্নির) উৎপাদন হয় না ; সূর্য্যের অপর নাম সবিতা ; এই সবিতাই অগ্নির প্রসূতি, সুতরাং ব্রাহ্মণের মাতৃস্বরূপিণী। ওঁ দ্বারা ভগবান্‌কে পিতারূপে স্তব করা হয় ; সমস্ত গায়ত্রি দ্বারা ভগবান্‌কে মাতৃরূপে ভজনা করা হইয়া থাকে। এক্ষণে সমুদয় গায়ত্রির অর্থ শ্রবণ কর ও বুঝিতে চেষ্টা কর। ওঁ তৎসবিতু—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ শ্রীভগবান্‌কে, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা শ্রীভগবান্‌কে, অর্থাৎ সৃজন-শক্তি পালনশক্তি এবং প্রলয়শক্তি সমন্বিত শ্রীশ্রীভগবান্‌কে আমি (ওঁ কহিয়া) স্তুতি করি, সেই ভগবান্ সবিতা (সূর্য্য), সুতরাং "বরেণ্যম্" (শ্রেষ্ঠম্) ; "ভর্গদেব" অর্থে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ ; অর্থাৎ আমি সেই

সৃজন, পালন ও প্রলয় শক্তিশালী, মহা তেজোময় ভগবান্‌কে সূর্য্যনারায়ণরূপে স্তুতি করি;" এইজন্ত সূর্য্যদেবতার অপর নাম ব্রহ্ম। "ধী" অর্থে বুদ্ধি, "মহী" অর্থে পৃথিবী, "ধিয়ো" অর্থে জ্ঞান এবং "প্রচোদয়াৎ" অর্থে প্রেরণ করা। অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের বুদ্ধি (কৌশল) স্বরূপ, তিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া প্রকৃত (ব্রহ্ম) জ্ঞান দান করুন। ভূঃ শব্দে পৃথিবীলোক, ভুবঃ অর্থে অন্তরীক্ষলোক এবং স্বঃ অর্থে স্বর্গলোক। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত আকাশের এবং সমস্ত স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি, তিনি আমাদিগকে জ্ঞানজ্যোতি প্রদান করিয়া আলোকিত করুন। সম্পূর্ণ বৈদিক গায়ত্রি মন্ত্রে সপ্তবার ওঁ বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই, ওঁকার রূপ পরব্রহ্ম সপ্তভাবে প্রকাশ হইয়া বিশ্বমণ্ডলে বিস্তার হইয়াছেন। তদ্যথা—সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, সপ্ত ঋষি (সপ্তর্ষিমণ্ডল), তদ্ভিন্ন ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্য (এই সপ্ত), তদ্ভিন্ন দেহ, মন, আত্মা, হৃদয়, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও বিবেক (এই সপ্ত), তদ্ব্যতীত সত্ব, রজ, তম, পুরুষ, প্রকৃতি, সত্য, তপঃ এই সাতভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। এক্ষণে গায়ত্রির নিষ্কাসিত অর্থ শ্রবণ কর।

> বয়ং দীনজনাঃ তৎসবিতু সৃষ্টিকর্ত্তুঃ
> জ্যোতিঃ স্বরূপঃ ব্রহ্মণেঃ বরেণ্যং শ্রেষ্ঠঃ।
> স্বয়ং সিদ্ধং ভর্গো বর্চ্চসং বেদোক্তং
> যংজ্ঞান মস্তি।
> তদেব তেজসং ধীমহি যো
> দেবো নোস্মাকম্।
> ধিয়ঃ শুভ কর্ম্মানি প্রচোদয়াৎ
> প্রেরণং কুর্য্যাৎ।

অতঃপর সূর্য্যনারায়ণের তর্পণমন্ত্র শ্রবণ কর ;—

> ওঁ নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে ইদমর্ঘং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ওঁ জবাকুসুম সাঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

জটায়ু—প্রসিদ্ধ পক্ষিবিশেষ। অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। জ্যেষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে জয় করেন। পরে সূর্য্যকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি প্রচণ্ড রবিতেজে পীড়িত ও হতচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হন। তখন সম্পাতি স্বীয় পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহাঁর প্রাণরক্ষা করেন; কিন্তু নিজে দগ্ধপক্ষ হইয়া ভূপতিত হন। অযোধ্যাপতি দশরথের সহিত জটায়ুর মৈত্রী ছিল। যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন জটায়ু সীতামুখনিঃসৃত "রাম, রাম" বলিয়া রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাবণের গতিরোধের চেষ্টা করেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে ইনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে, রাক্ষসনাথ

সীতাকে লইয়া প্রস্থান করেন। অতঃপর রামচন্দ্র ভার্য্যার অন্বেষণ করিতে করিতে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, জটায়ু তাঁহাকে রাবণকর্ত্তৃক সীতার অপহরণবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জটাসুর—রাক্ষসবিশেষ। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে এই রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগের কুটীরে উপস্থিত হয়। সে সময়ে অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সহিত কিছুকাল থাকিয়া ভীমের অনুপস্থিতি সময়ে দ্রৌপদীসহ অবশিষ্ট পাণ্ডবত্রয়কে হরণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ইতোমধ্যে একদিন ভীম মৃগয়ার্থ গমন করিলে, দুষ্ট রাক্ষস অগ্রে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ও দ্রৌপদীকে হরণ করে। ভীম কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগের অদর্শনে আকুল হইয়া দুর্বৃত্তের অনুসরণে ধাবিত হইয়া অবশেষে ইহার প্রাণবধ করেন। এই জটাসুরের পুত্র অলম্বল

জটিল—হরিভক্ত সাধুপুরুষবিশেষ। কথিত আছে যে, জটিল এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের সংসারে আর কেহ ছিল না। একদিন পাঠশালায় যাইবার সময়ে বালক জটিল পথে ভয় পান। বাটী আসিয়া জননীকে ভয়ের কথা বলায়, ধর্ম্মশীলা মাতা পুত্রকে "গোবিন্দ" নাম স্মরণ করিতে বলিয়া দিলেন। গোবিন্দ কে, এই কথা মাতাকে জিজ্ঞাসা করায়, মাতা বলিলেন, "গোবিন্দ" বালকদিগকে বড় ভালবাসেন; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকেন, এবং বালকদিগের সহিত খেলাও করেন।" এই কথা শুনিয়া জটিলের আনন্দের সীমা রহিল না।

অতঃপর এক দিন পাঠশালায় যাইবার সময় পথে ভয় পাইয়া জটিল "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া অতি ব্যাকুলভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকিতে লাগিলেন। সরলচিত্ত ভক্তের ব্যাকুলতায় ভয়ত্রাতা, বিপদ্‌ভঞ্জন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, দয়াময় হরি বালকবেশে উপস্থিত হইয়া জটিলের ভয় মোচন করিলেন। অনন্তর দুইজনে তথায় খানিক খেলা হইল। ইহার পর জটিল প্রায়ই পথে সখা গোবিন্দের সহিত খেলা করিতেন।

ইহার কিছু দিন পরে, একদা জটিলের গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছাত্রবৃন্দের কে কোন্ দ্রব্য সরবরাহের ভার লইবে গুরুমহাশয় তাহা বাটীতে জানিয়া আসিতে বলায় জটিল সখার উপদেশানুসারে আবশ্যক দধি সরবরাহের ভার লইলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে ইনি এক ভাণ্ড মাত্র দধি লইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়াই গুরুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তুমি এ কি করিয়াছ, এই এক ভাণ্ড দধিতে কি হইবে?" জটিল উত্তর করিলেন, "আমার সখা বলিয়াছেন যে, এই এক ভাণ্ড দধিতেই সকল লোকের পর্য্যাপ্ত আহার হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।" কার্য্যতঃ তাহাই হইতে দেখা গেল। গুরুমহাশয় দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সখা কোথায় থাকেন?" জটিল বলিলেন, আমাদের বাড়ী যাইবার পথে তেঁতুল গাছের নিকট বনে তাঁহাকে আমি

দেখিতে পাই। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন ত আসুন।" গুরু শিষ্যের অনুগামী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট তেঁতুল তলায় গুরুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জটিল বনমধ্যে "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গুরুকে বলিলেন, "সখে বলিয়াছেন যে, তিনি আপনাকে দেখা দিবেন; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে বসিয়া তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে, তত বৎসর তপস্যা করিতে হইবে। শ্রীহরির দর্শনাশয়ে গুরু তাহাই করিতে বসিয়া গেলেন।

জড়ভরত—ব্রাহ্মণবিশেষ। জন্মান্তরে ইনি রাজর্ষি ভরত ছিলেন। ভরত মৃত্যুকালে মৃগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করায়, পরজন্মে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। সে কারণ তিনি সঙ্গপরিহারবাসনায় সর্ব্বদা জড়বৎ অবস্থান করিতেন। তাহাতেই তিনি জড়ভরত নামে খ্যাত হন। এই হেতু কাহাকেও নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম দেখিলে লোকে তাহাকে জড়ভরত বলিয়া থাকে।

জনক—মিথিলারাজ। জনক কোন এক-জন রাজার নাম নহে, ইহা মিথিলাধিপতিগণের একপ্রকার সাধারণ উপাধি। যেমন রঘুনামক সূর্য্যবংশীয় রাজার উত্তরবংশীয়েরা রঘু নামে পরিচিত, তদ্রূপ জনক নামক চন্দ্রবংশীয় রাজার বংশধরেরা জনক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম জনক মিথি নামক রাজা। ইনি নিমির পুত্র। নিমি স্বনামে মিথিলানগর নির্ম্মাণ করেন, পরে নগরের জনন-সামর্থ্যপ্রযুক্ত তাঁহার নাম জনক হয়। ইহার পর যখন যিনি মিথিলার রাজা হইতেন, তখনই তিনি জনক নামে খ্যাত হইতেন।

পরন্তু অধুনা জনক বলিলে অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের শ্বশুর রাজর্ষি জনককেই বুঝায়। ইহাঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। ক্ষত্রিয় হইয়াও ইনি জ্ঞানে ব্রাহ্মণদিগের পূজ্যার্হ ছিলেন এবং রাজা হইয়াও সর্ব্বদা ঋষিতুল্য আচরণ করিতেন বলিয়াই 'রাজর্ষি জনক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, সীরধ্বজ জনক একদা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে সীতামধ্যে অর্থাৎ লাঙ্গল পদ্ধতিতে একটী অলোকসামান্য রূপবতী কন্যা প্রাপ্ত হন, এবং সীতা মধ্য হইতে উত্থিত হওয়ায় কন্যার নাম 'সীতা' রাখেন। সীতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সুধন্বা নামক এক রাজা ইহাঁর নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্যে স্বীয় ভ্রাতা কুশধ্বজকে রাজা করিয়া দেন।

অতঃপর সীরধ্বজ সীতার বিবাহের জন্য এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, যিনি সুবৃহৎ হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতার ভর্ত্তা হইবেন। পরে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলে সীরধ্বজ তাঁহার সহিত সীতার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার, এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করেন।

জনমেজয়, জন্মেজয়—মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের প্রপৌত্র। কলিযুগের প্রথমাবির্ভাব কালে

ইনি রাজত্ব করিতেন। পিতার মৃত্যুকালে ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের উপদেশানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। কালক্রমে ইনি একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। তক্ষশীলা হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইঁহার পদানত হইয়া পড়িল। ইনি কাশী-রাজদুহিতা বপুষ্টমার পাণিপীড়ন করেন।

জনমেজয় প্রাচীন অমাত্যগণের নিকট স্বীয় প্রপিতামহের বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তক্ষক দংশনে পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ইনি তক্ষকপ্রমুখ সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে উতঙ্কমুনি উপস্থিত হইয়া তদীয় পিতৃহন্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে ইঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে শত শত সর্প যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয় মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। তখন যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ আশ্রয়সহ তক্ষকের নাম উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তক্ষক হত-জ্ঞান হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বাসুকি-প্রেরিত আস্তিক মুনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধ বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ রহিত করিয়া দিলেন। তখন তক্ষক অব্যাহতি পাইলেন। ইহার পর জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইনি বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করেন।

জমদগ্নি—ঋষিবিশেষ, বিখ্যাত ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের পিতা। ঋচিক মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জমদগ্নি বেদজ্ঞ হইয়াও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া-ছিলেন। রাজতনয়া রেণুকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে ভুবনবিদিত পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। জমদগ্নি একদিন শরক্রীড়া করিতেছিলেন, এবং রেণুকা নিক্ষিপ্ত শরগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিতে-ছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে রেণুকা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন ঋষিবর সূর্য্যকে তাঁহার তেজ সংবরণ করিতে বলেন। পরন্তু জগতের অহিতা-শঙ্কায় সূর্য্যদেব তেজ সংবরণ না করিয়া ইঁহাকে পত্নীর নিমিত্ত ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

অনন্তর একদা রেণুকা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া তথায় গন্ধর্ব্বদিগের ক্রিয়া-দর্শনে কলুষিতচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া সহধর্ম্মিণীর বধার্থ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আদেশ করিলেন। তিনি মাতৃ-হত্যায় অসম্মত হওয়ায় পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন সহোদরও ঐরূপে পিতৃনিদেশ পালনে অস্বীকৃত হইয়া সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে কলুষিত জননীর জীবননাশের আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র পরশুরাম স্বীয় কুঠারাস্ত্রে রেণুকার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি কাতর-কণ্ঠে জননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন।

ঋষিবরের প্রসাদে রেণুকা পুনর্জীবিত ও তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় জড়ত্ব মুক্ত হন। অতঃপর একদিন রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সসৈন্তে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে তাঁহাদের সকলেরই যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। রাজা কামধেনুর এতাদৃশ গুণ দেখিয়া ঋষির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। কামধেনুর সহায়তায় সৈন্তসৃষ্টি করিয়া জমদগ্নি রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার শরে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের প্রতি জাতক্রোধ হন।

জয়—বিষ্ণুর পার্শ্বচরবিশেষ। এই জয় ও ইহাঁর ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বার-রক্ষক। একদা সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণু-দর্শনমানসে বৈকুণ্ঠের দ্বারে উপস্থিত হইলে, জয় ও বিজয় তাঁহাদিগের গমনে বাধা দেন। তাহাতে ঋষিগণ কোপাবিষ্ট হইয়া ইহাঁদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইহাঁদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তখন ভ্রাতৃদ্বয় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীহরি বলিলেন, "ঋষিবাক্য অন্যথা হইবার নহে; তোমাদিগকে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে; তবে তোমাদের জন্ত আমি এই মাত্র করিতে পারি যে, যদি তোমরা আমার মিত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলে সাত জন্ম, আর শত্রুরূপে জন্মিলে তিন জন্ম পরে তোমরা পুনরায় স্বস্থানে আসিতে পারিবে; এতদুভয়ের যাহা তোমাদের ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।" ইহাঁরা শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর ইহাঁরা সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, এবং দ্বাপরে শিশুপাল ও দণ্ডবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—ইনি একজন বঙ্গদেশবিখ্যাত পণ্ডিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। উক্ত গ্রাম অধুনা যশোহর জেলার অন্তর্গত। ইহাঁর পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবলরামের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে রঘূত্তম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও জয়গোপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হন। জ্যেষ্ঠপুত্র রঘূত্তম নাটোরে পিতৃপদ লাভ করিয়া "বাণীকণ্ঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজসভায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া একখানি তালুক লাভ করেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই তালুক ভোগ করিতেছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রঘূত্তমের নিকট একখণ্ড হস্তলিখিত উত্তরচরিত পাইয়া কাশীতে প্রাপ্ত অপর একখণ্ডের সহিত মিলাইয়া সর্ব্বপ্রথম উত্তরচরিত মুদ্রিত করেন। জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর প্রথম বিবাহ হয়। ৪৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইলে ইহাঁর সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি শ্রীরামপুরের পাদরি কেরি সাহেবের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৬ বৎসর তথায় কার্য্য করেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলেই ইঁহার ছাত্র। ইনি তখন সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ-পণ্ডিতও ছিলেন। বিখ্যাত পাদরি কেরি ও মার্শমান শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত জয়গোপাল কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষার উন্নতির সূত্রপাত ইউরোপীয় মিসনারিদিগের যত্নেই হইয়াছিল, আর জয়গোপাল সেই মিসনারিদিগের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। বাঙ্গালীমাত্রেই জয়-গোপালের নিকট প্রভূতপরিমাণে ঋণী। এক পক্ষে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া ইনি যেমন দরিদ্র বঙ্গবাসীর অশেষ উপকার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত অপকারও করিয়াছেন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত আর পাইবার উপায় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। জয়গোপাল তাহা না করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংশোধিত ও তাহাতে নিজের রচনা সংযোজিত করিয়া তাহা বিকৃত করিয়াছেন। তবে জয়গোপাল যে এক-জন সুকবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি কবি বিল্বমঙ্গলকৃত হরিভক্ত্যাত্মিকা সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং ষড়ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইনি পারসী অভিধান নামে এক খানি কোষগ্রন্থও সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল ইহলোক ত্যাগ করেন।

জয়চন্দ্র—কান্যকুব্জের শেষ স্বাধীন হিন্দু-রাজা। ইনি দিল্লীশ্বর শেষ অনঙ্গপালের দৌহিত্র। অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি জয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপর দৌহিত্র পৃথ্বীরায়কে আপনার সিংহাসন দান করিয়া যান। ইহাতে পৃথ্বীরায়ের উপর জয়চন্দ্রের বিশেষ বিদ্বেষ জন্মে। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য জয়চন্দ্র নানা চক্রান্ত করেন, কিন্তু তাঁহার অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিবলে ইনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্ত রাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরায় সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না; জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাকে দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন।

জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যা ছিল। জয়চন্দ্র এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ের অসাধারণ বীরত্বাদির পরিচয় অবগত হইয়া সংযুক্তা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ও তাঁহার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী, তাহা জানিতে পারিয়া তিনি সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন এবং সৈন্যদিগকে কিছু দূরে রাখিয়া

স্বয়ং ছদ্মবেশে বজ্ঞভূমির নিকট লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সমাগত রাজগণমধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া দ্বারস্থিত পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। জয়চন্দ্রের মাথা কাটা গেল। এদিকে পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পার্শ্বদেশে বসাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। জয়চন্দ্র অপমানে ও ক্ষোভে জিঘাংসু ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সবন্ধুবান্ধবে সসৈন্যে পৃথ্বীরায়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরায় সকলকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া স্বজাতিদ্রোহী জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। যবনরাজ মহানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন। এবার জয়চন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। দিল্লী ও আজমীর চিরদিনের জন্য যবনের করতলগত হইল (১১৯৩ খৃঃ)।

রাজ্যলোলুপ মহম্মদ পর বৎসর কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। এইবার স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, আত্মবিদ্রোহীর স্বহস্তরোপিত পাপতরুর বিষময় ফল ফলিতে চলিল। স্বার্থান্ধ জয়চন্দ্র তখন আপনার অবমৃষ্যকারিতার পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। খাল কাটিয়া বেনো জল আনিলে কিরূপ ফল হয়, জয়চন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নাই,—মহাবীর পৃথ্বীরায় ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এমন বীর কেহ নাই যে, যবনসেনার গতিরোধে সমর্থ হয়। তথাপি জয়চন্দ্র একবার যুদ্ধ করিয়া দেখিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মনে করিলেন, আমিও না হয় পৃথ্বীর ন্যায় সমরশায়ী হইব। কিন্তু পাপী কাপুরুষের ভাগ্যে কি তাহা ঘটিতে পারে? জয়চন্দ্র রাজ্যরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, এবং গঙ্গা পার হইবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া মরিলেন। জয়চন্দ্রের আত্মপাপের অপমৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

জয়দেব—ইনি একজন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। ইঁহার রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্গদেশান্তর্গত বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। ইনি অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। পরে পদ্মাবতী নাম্নী এক গুণবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। এই বিবাহসম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা তনয়াকে উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন পদ্মাবতীর পিতা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে জয়দেবের

নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বলিলেন। পদ্মাবতী অতি বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, "জগন্নাথ দেবের আজ্ঞায় পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আপনাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব, সুতরাং অন্য কাহাকেও স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না; এক্ষণে আপনি আমাকে ছাড়িলেও আমি আপনাকে ছাড়িব না, সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আপনার চরণসেবা করিব।" এক হিন্দু রমণী ভিন্ন অন্য কোনও জাতীয় রমণীতে এরূপ পতিপরায়ণতা সম্ভব নহে।

অতঃপর জয়দেব পদ্মাবতীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের পর গৃহী হইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। কথিত আছে যে, জয়দেব স্বপ্রতিষ্ঠিত এক বিগ্রহের জন্য অর্থসংগ্রহার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে একদিন পথে দস্যুরা ইঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অতঃপর বহুকষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া জয়দেব সস্ত্রীক দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সম্মানার্থ অদ্যাপি কেঁদুলিতে প্রতি বৎসর 'জয়দেবের মেলা' নামে প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি। ধৃতরাষ্ট্রতনয়া দুঃশলার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের বনবাস সময়ে ইনি দ্রৌপদীহরণমানসে তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং কুটীরে অন্য কেহ না থাকায় দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া পলায়নপর হন। এমন সময়ে পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং ইঁহার রক্ষিগণের প্রাণবধ করিলেন। তখন জয়দ্রথ বিপদ্ বুঝিয়া দ্রৌপদীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন, এবং অতি দ্রুতবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন ক্রোশান্তর হইতে শরক্ষেপ করিয়া ইঁহার রথের অশ্বদ্বয় বধ করিলেন। অশ্ব হত হইলে, জয়দ্রথ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পলাইতে লাগিলেন। তখন ভীম ইঁহার অনুসরণ করিয়া ইঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অবশেষে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া পাণ্ডবগণ ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

এইরূপে অপমানিত হইয়া জয়দ্রথ প্রতিশোধ গ্রহণাভিপ্রায়ে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব ইঁহাকে বর দেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়কে ইনি পরাভূত করিতে পারিবেন। অতঃপর কুরুক্ষেত্র সমরে অভিমন্যুবধের দিন জয়দ্রথ কৌরবপক্ষের ব্যূহদ্বার রক্ষা করায় পাণ্ডবেরা কেহই ব্যূহভেদ করিয়া অভিমন্যুর সাহায্য করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন সে সময়ে অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে জয়দ্রথের প্রাণবধ করেন।

জয়ন্ত—দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণ সসৈন্যে স্বর্গ জয় করিতে গমন করিলে যে যুদ্ধ হয়,

তাহাতে ইনি ভীম বিক্রমে যথাসাধ্য দেবসেনা রক্ষা করেন। অবশেষে রাবণ-তনয় মেঘনাদ মায়াবলে দশ দিক্ তমসাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তখন ইহাঁর মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা ইহাঁকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন।

জরৎকারু—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনিবিশেষ। মুনিবর তপস্তাদ্বারা ধর্ম্ম-জগতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং অধিকতর উন্নতি কাঙ্ক্ষী হইয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বহুকাল দারপরিগ্রহে বিরত থাকেন। অবশেষে বংশরক্ষার্থ পিতৃগণের আদেশে দারপরিগ্রহের অভিলাষী হন। অতঃপর ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসা-দেবীকে বিবাহ করেন। পত্নীর গর্ভ-সঞ্চার হইলে, মুনিবর পুনরায় তপশ্চরণার্থে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। সেই গর্ভে লোকবিশ্রুত আস্তিক মুনির জন্ম হয়।

২। জরৎকারু মুনির পত্নী, মনসা-দেবী। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। জরৎকারু মুনির সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে ইহাঁর গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হয়। গর্ভসঞ্চারের পর ইহাঁর স্বামী তপস্যার্থ গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃ-গৃহেই রহিলেন। মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নাগকুল নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইলে, ইনি স্বীয় পুত্র আস্তিককে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ নিবারণ করেন।

জরাসন্ধ—মগধের বিখ্যাত রাজা, বৃহদ্রথ নৃপতির পুত্র। বৃহদ্রথ পুত্রাভাবে সংসারে বীতরাগ হইয়া তপস্যার্থ পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। একদা গৌতমাত্মজ চণ্ডকৌশিক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীতভাবে স্বীয় দুঃখবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। মহাতপাঃ ঋষিবর তাঁহাকে একটি আম্রফল প্রদান করিয়া বলিয়া দেন যে, এই ফল ভক্ষণ করিলে তোমার পত্নীর সন্তান হইবে। রাজা মহানন্দে রাজধানীতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক উক্ত ফলটি মহিষীদ্বয়কে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিলে কিছুকাল পরে উভয়েই গর্ভবতী হন এবং নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে প্রত্যেকে অর্দ্ধ-খণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। ইহাতে বৃহদ্রথ দুঃখিত হইয়া খণ্ড দুইটী শ্মশানে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করেন। এদিকে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ স্থানে আসিয়া খণ্ডদ্বয় একত্রিত করায় একটি অপরূপ রূপসম্পন্ন জীবিত বালক হইল দেখিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিয়া বলে যে, দুই খণ্ডে পুনর্বিভক্ত না হইলে বালকের মৃত্যু হইবে না। জরা কর্ত্তৃক সংযুক্ত দেহ হওয়াতেই বালক জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল। জরাসন্ধ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠেন। ইহাঁর বিংশ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, এবং অনেক রাজ্যও ইনি জয় করেন। চিত্রাঙ্গদ-রাজ-দুহিতার স্বয়ংবরকালে ইনি মহাবীর কর্ণের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, এবং কর্ণের অসামান্য বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালিনী নাম্নী নগরী প্রদান করেন।

জরাসন্ধ মথুরারাজ কংসের সহিত স্বীয় কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ দেন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে, কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের বিনাশার্থ জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ইনি কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইনি ভীষ্মকরাজ-দুহিতা রুক্মিণীর সহিত চেদিরাজ শিশুপালের বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং রুক্মিণীকে হরণ করায় ইনি তাহাতেও বিফলমনোরথ হন।

জরাসন্ধ রুদ্রদেবের উদ্দেশে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে নৃপতি-দিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। এই অভিপ্রায়ে ইনি অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আপনার পুরীতে আনিয়া রাখিয়া দেন। কৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া সেই সকল রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভীমার্জ্জুন-সহ ইহাঁর পুরীতে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ইহাঁকে রাজগণের মুক্তিবিধান অথবা যুদ্ধদান করিতে বলেন। ইনি যুদ্ধই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়া ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। মহাবল ভীম ইহাঁকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইহাঁর প্রাণ বিনাশ করেন। অতঃপর জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

জলন্ধর—শিবানুচর অসুরবিশেষ। এই অসুরসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিত আছে;—একদা দেবরাজ ইন্দ্র শিবলোকে এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর প্রদান না করায় ইন্দ্র কুপিত বজ্র দ্বারা তাঁহাকে সমাহত করেন। তখন সেই পুরুষের ললাটদেশ হইতে বহ্নি নির্গত হইয়া দেবরাজকে দগ্ধ করিতে থাকায় ইন্দ্র তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া জানিতে পারেন। তখন দেবরাজ তাঁহাকে স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করিলে রুদ্র সেই অনল সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে এক বালক উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর সমুদ্র সেই বালককে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তাহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহার্থে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে লইবা-মাত্র সে ব্রহ্মার দাড়ি ধরিয়া টানাতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে জলধারা নির্গত হইল। তাহাতেই তিনি শিশুর নাম রাখিলেন জলন্ধর। পরে ব্রহ্মা জলন্ধরকে অসুরগণের অধীশ্বর ও শিবভিন্ন অন্যের অবধ্য হইবার বর প্রদান করেন।

ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া জলন্ধর অসুর-রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাল-নেমি-তনয়া বৃন্দার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। অতঃপর এই অসুর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হইলে তিনি দুর্বৃত্ত অসুরের প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পতিপ্রাণা সাধ্বী অসুররমণী বৃন্দা পতির মঙ্গলকামনায় একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় বিষ্ণুর প্রসাদে জলন্ধর শিবেরও অবধ্য হইয়া উঠিলেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে, দেবতাদিগের হিতার্থে বিষ্ণু জলন্ধরের বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার তপোভঙ্গ হইল। সেই সময়ে জলন্ধরও শিবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত

হইলেন। বিষ্ণুর এইরূপ অন্যায়াচরণের নিমিত্ত সতী বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তুমি পতির অনুমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।" অতঃপর বৃন্দা বিষ্ণুর উপদেশমত কার্য্য করিলে, তদীয় ভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ, ও অশ্বত্থ, এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

জহ্নু—গঙ্গাপায়ী রাজর্ষিবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম সুহোত্র। ইনি অতিশয় তপঃপরায়ণ রাজা ছিলেন, এবং সর্ব্বদা যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকিতেন। সগর-বংশের উদ্ধারার্থে যে সময়ে ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া আসেন, সেই সময়ে গঙ্গার জলপ্রবাহে ইহাঁর যজ্ঞদ্রব্যাদি ভাসিয়া যায়। তাহাতে জহ্নু রোষাবিষ্ট হইয়া তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করিয়া) গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তাহাতেই গঙ্গার এক নাম হয় 'জাহ্নবী'।

জাজলি—তপোনিরত ব্রাহ্মণবিশেষ। ইনি অথর্ব্ববেদজ্ঞ পথ্যের শিষ্য ছিলেন। সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং যোগীর বিভূতি-স্বরূপ সর্ব্বত্র গতায়াত ও সর্ব্ববিষয় দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তখন জাজলি মনে করিলেন, আমি একজন অদ্বিতীয় লোক হইয়া পড়িয়াছি। সেই সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল যে, সেরূপ মনে করা তাঁহার উচিত নয়, এমন কি কাশীর তুলাধারও সেরূপ মনে করিতে পারেন না। অতঃপর জাজলি কাশীধামে গমনপূর্ব্বক তুলাধারের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন।

জাম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যাবিশেষ, ভল্লুক-রাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তক-মণির জন্য যুদ্ধে জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া মণিসহ জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থে প্রাপ্ত হন। জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের শাম্ব প্রভৃতি দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পতির মৃত্যুর পর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইনি হস্তিনায় নীত হইলে কৃষ্ণের উদ্দেশে জলন্ত হুতাশনে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

জাম্ববান্—ভল্লুকরাজ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র ও কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি রামরাবণের যুদ্ধের সময় উপস্থিত থাকিয়া রামের বিস্তর সাহায্য করেন। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রা-জিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। পরে প্রসেন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সিংহকর্ত্তৃক নিহত হইলে, জাম্ববান সেই সিংহকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই মণির জন্য জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করেন। জাম্ববান্ পরাজিত হইয়া কৃষ্ণকে মণিসহ আপনার কন্যা জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থে অর্পণ করিয়া সন্ধি করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

বাহন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বলা বাহুল্য, এই সকল মিথ্যা বর্ণনা দ্বারাই হিন্দুর পবিত্র গ্রন্থ সকল অনাদরের বস্তু হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে শিবের আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি একটা শিব হইয়া যায়, তাহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পায়, তাহার তিনটী চক্ষু ও পাঁচটী মুণ্ড ও দশখান হাত হয়, আর সে শিবের পিনাক ধনুকধারী হইয়া শাদা বলদে চড়িয়া বেড়ায়! "ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং"এর প্রলোভন, আর এই শিবত্বপ্রাপ্তির প্রলোভন একই, ইহা মহর্ষি বায়ুর পবিত্র লেখনী-বিনির্গত বস্তু নহে। এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ অধ্যায়গুলি যাঁহাদের, এই বর্ণনাও তাঁহাদের হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। যে যুগের লোকেরা পৌরাণিক ভ্রান্তিতে পড়িয়া শিবকে একটী বুড়া বলদে চড়িতে দিয়াছিলেন, সেই যুগের কোন কেহ ইহার জন্মদাতা। সুতরাং আমরা অশ্রদ্ধার সহিতই এ প্রমাণের পরিহার করিলাম। মানুষের পেটে গরু জন্মে, যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন, আমরা তাঁহাদিগকে "মা তুমি কে?"র যুগের জীব বলিয়া মনে করিব। ফলতঃ এই গো, বৃষ, বানর প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যদিগের সংজ্ঞাবিশেষ। এখনও রঙ্গপুরে মানুষের নাম শিয়ালু, কুকুরিয়া ও বাঘা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কায়স্থদিগের মধ্যে বাঘ ও সিংহ উপাধির লোক এখনও রহিয়াছেন। পাবনাতে কতকগুলি কায়স্থ—"পাঁঠা-মহাশয়", "ভেড়া মহাশয়" ও "ঘোড়া মহাশয়" প্রভৃতি নামে সংজ্ঞিত আছেন। কেবল হরিবংশ নহে, যে কোন পুরাণেই মনুষ্যগণ যে, গো, বৃষ, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি উপাধিতে বিশেষিত হইতেন, তাহা দৃষ্ট হয়। কেবল পুরাণে নহে—বেদেও মনুষ্যদিগের হংস ও বৃষ উপাধির কথা বিবৃত আছে, সামবেদ বলিতেছেন,—

> প্রহংসাস তৃপলা বগ্নুমচ্ছা
> মাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।—৬০৩ পৃষ্ঠা।
> জীবানন্দী সংস্করণ।

তত্র সায়ণঃ "হংসাসঃ," শক্রুভির্হন্যমানা হংসাইব আচরন্তো বা "বৃষগণাঃ" এতন্নামকা ঋষয়ঃ অমাৎ শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ অস্তং যজ্ঞগৃহং প্রায়াসুঃ প্রায়াসিষুঃ প্রগচ্ছন্তি।

হংস ও বৃষনামা ঋষিগণ শত্রুর ভয়ে সত্বর হইয়া যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বেশ জানা গেল যে, মানুষের বৃষ ও হংস আখ্যা ছিল। সুতরাং শিব বৃষগণের বাহন বা নেতা বলিয়া বৃষবাহন ও ব্রহ্মা হংসাখ্য দেবগণের বাহন বলিয়া কেন হংসবাহন বিশেষিত হইতে পারিবেন না? অবশ্য মানুষ পাহাড়ী জবর দস্ত দেশোয়াল বলদে চড়িয়া বেড়াইতে না পারেন তাহা নহে, কিন্তু ময়ূর, হংস ও মূষিকের বেলা কঃ পন্থাঃ? মানুষ যখন পরমহংস বিশেষণ দ্বারা বিভূষিত হইতেছেন, তখন উহার এক ডিক্রী নীচের হংসোপাধিতে তাঁহার অধিকার থাকিবে না কেন? আমরা বায়ুপুরাণ ও ভাগবত হইতে মানুষের হংস বিশেষণের কয়েকটী প্রমাণ দিব। বায়ুপুরাণ—

> আসেদুশ্চ ততস্তস্মিন্ তদন্তস্তে মহার্ণবে।
> ১ বিষ্ণুং কপিলরূপেণ হংসং নারায়ণং প্রভুম্।
> ১৪৬—২৬ অ।
> উত্তর খণ্ড।

অনন্তর তাঁহারা মহার্ণবে কপিলরূপে বর্ত্তমান হংস নারায়ণ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগবত—

ভাবাখাস্ত জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহ নারদঃ।
হংসো হংসেন যানেন, ত্রিধাম পরমং যযৌ। ২০

২৪ অ—৩ স্কন্ধ।

উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্ত কিল্বিষাঃ।

১১—১৭ অ—১১ স্কন্ধ।

পাপহন্তা জগৎস্রষ্টা হংস ব্রহ্মা, কুমারগণ সহ তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া হংসচিহ্নিত বিমানযোগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ লোকেরা হংস আমার উপাসনা করে।

আমরা সামবেদে দেখাইয়াছি, ঋষিরা হংসোপাধিক ছিলেন, আবার এইক্ষণে দেখাইতেছি যে অদিতিনন্দন মানুষবিষ্ণু ও সুর-জ্যেষ্ঠ মানুষ ব্রহ্মাও হংসোপাধিক ছিলেন। সুতরাং তৎকালের দেবগণ ও ঋষিগণ যে হংসনামা ছিলেন, তাহা কেন বিশ্বাস করিতে হইবে না? ব্রহ্মা এই হংসাখ্যদেবগণের বাহন বা নেতা ছিলেন বলিয়াই হংসবাহন-বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার বিমানও যে হংস চিহ্নে চিহ্নিত থাকিত, তাহাও স্বীকৃত সত্য। কিন্তু তিনি যে রাজহাঁসে চড়িয়া বেড়াইতেন না, ইহাও ধ্রুব সত্য। অতএব আমরা যে চারিমুখ মানুষ ব্রহ্মার নীচে একটী হাঁস বসাইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তাহা দুই কারণেই অযৌক্তিক হইতেছে।

একটী কারণ এই যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্রষ্টা; যিনি বেদের কর্ত্তা তিনি হিন্দুগণের বিশ্বাসানুসারে পরমেশ্বর। সুতরাং স্রষ্টা ব্রহ্মা পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ। যিনি সৃষ্ট তিনি উপাস্য নন্, তাঁহার চারিখানি মুখও ছিল না, উহা তাঁহার চতুর্ব্বেদবেত্তৃত্ব-নিবন্ধন সামাজিকগণপ্রদত্ত উপাধি-বিশেষ। এবং জীবন্ত কোন হাঁসও তাঁহার বাহন ছিল না বলিয়া তাঁহাতে জলচর হংসমূর্ত্তির সংযোজনা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব যদি হংস ও বৃষভাদি মনুষ্যসংজ্ঞা হয় ও উহা ব্রহ্মাদি নেতৃবৃন্দের বিমান-চিহ্ন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে রামায়ণ যে লিখিতেছেন,—

ততো বৃষভমাস্থায় পার্ব্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনং।

২৭—৪ সর্গ উত্তরকাণ্ড।

এই বর্ণনার বৃষভটী সশৃঙ্গ সলাঙ্গুল আস্ত জীবন্ত বৃষভ ছিল না, নিশ্চয়ই ইহা শিব চন্দ্রের বিমান-বিন্যস্ত কাষ্ঠময় বৃষভ মূর্ত্তি বটে। অতএব যাঁহারা শিবকে একটা চতুষ্পদে চড়াইয়া পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করাইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত ঐতিহ্যের অপরিপন্থী নহেন। কেহ কি ব্যোমযানে চড়িয়া প্রতিবেশ পল্লীতে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারেন না? অপিচ রামায়ণের বর্ণনাদৃষ্টেও প্রতীতি হইবে যে, বলদ কখন আকাশমার্গে বায়ুপথে গমন করিয়া থাকে না। ইহা দ্বারাও বুঝিয়া লইতে হইবে, ইহা শিবমহাশয়ের বিমানসংস্থ কাষ্ঠময় নির্জ্জীব বৃষই বটে। বলিবে কোন শাস্ত্রে কি শিবের বিমান থাকার কথা বিবৃত আছে?

কেবল শিবের নয়, প্রত্যেক দেবতারই ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একটী বিমান ছিল। নারদও ঐরূপ বিমানে চড়িয়া যখন তখন ভারতে আসিয়া দৈনিক সংবাদপত্রের কাজ সারিয়া যাইতেন। এখন যেমন জনে জনে বাইসিকেলে দেখা যায়, তখন দেবগণও সেইরূপ বিমান ব্যবহার করিতেন। পঞ্চম বেদ মহাভারত স্বর্গের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

বৈশম্পায়ন উবাচ—

পাণ্ডুরুখায় সহসা গন্তুকামো মহর্ষিভিঃ।
স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাদুদঙ্মুখঃ। ৮

প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যামব্রবংস্তং চ তাপসাঃ।
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদঙ্মুখাঃ॥ ৯
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বয়ম্।
বিমানশত সংবাধাং গীতস্বরনিনাদিতান্॥ ১০
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ॥

১১—১২০ অ আদিপর্ব্ব।

প্রত্যেক দেবতার বিমান ছিল, তাই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, "বিমানশতসংবাধাম্"। কেবল মহাভারত নয়, রামায়ণ ও নানা পুরাণাদিতেও বিমানের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। মহাযোগী শিবেরও যে বিমান ছিল, তাহা বায়ুপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই।

তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্য বর্চসম্।
মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিম্না বর্ত্ততে সদা॥

৭৩—৩৪ অ।

কৈলাসং দেবভক্তানা মালয়ং সুকৃতাত্মনাম্। ১
তত্র তৎপুষ্পকং নাম নানারত্নবিভূষিতম্॥
মহাবিমানং রুধিরং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্॥ ৬
মনোজবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্।
বাহনং যক্ষরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ॥

৭—৪১ অ।

ঈশান বা শিবের বিমান সহস্রসূর্য্যপ্রভ ও কুবেরের বিমান বা পুষ্পক রথ অতি সুদৃশ্য ছিল, এবং তাঁহাদিগের বিমানসকল যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই চালাইতে পারিতেন। এ কালের পাশ্চাত্য বেলুনের ন্যায় সমুদ্র, পর্ব্বত বা নালে খালে পড়িয়া আরোহীকে বিপন্ন করিত না, এবং উহাদের গতিও অতি তীব্র ছিল। ঐ সকল মহাবিমানের জানালা সকল স্বর্ণখচিত থাকিত। এবং দেবগণ যখন সমবেত হইয়া বিমানযোগে আকাশে উড্ডীন হইতেন, তখন বোধ হইত যেন আকাশ পক্ষীর ঝাঁকে আবৃত হইয়াছে।

বিমানযানৈ রাকাশং পতত্রিভি.রিবাবৃতম্॥

৩৪—১১ অ বাল্, উত্তরকাণ্ড।

তাহা হইলেই জানা গেল, এ কালের হিন্দুরা দেবগণের বাহনসম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়া থাকেন, উহা দুষ্ট, পরন্তু সত্য নহে। অন্যে পরে কা কথা, জ্ঞানগরীয়ান্ শঙ্করও পৌরাণিক ভ্রান্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন;—

"ইদানীং চেৎ ভীতো মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ।

কিন্তু বস্তুতই কি গলায় ঘণ্টা বাঁধা একটা মহিষে চড়িয়া যমরাজ বাড়ী বাড়ী মড়া কুড়াইবার জন্য যাতায়াত করিয়া থাকেন? যমের বাহন মহিষ, ইহাও কি প্রকৃত সত্য? আমরা যে যে প্রমাণ ও যুক্তির অবতারণা করিয়াছি, তাহা হইতে কি সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে, মহারাজ যম, মহিষাখ্য মানবগণের নেতা বা বাহন ছিলেন, পরন্তু বনের একটা দ্বিশৃঙ্গ মহিষ তাঁহার বাহন ছিল না। ইহাই কি প্রকৃত সত্য নহে যে, যমরাজ মহিষমূর্ত্তি উপলক্ষিত বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশ বিহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার গলঘণ্ট মহিষ বাহনের কথা পৌরাণিক ভ্রান্তি? যম কে? যম কি আমাদের পিতৃলোকের (Father Land বা মানবের আদি জন্মভূমি) এক জন মানুষ রাজা ছিলেন না? তিনি মৃত পাপী লোকদিগের দণ্ডদাতা, তাঁহার কিঙ্করেরা অর্থাৎ যমদূতেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরা মানুষ লইয়া যায়, ইহাও কি অশ্রদ্ধেয় পুস্তির গল্প নহে? ধন্য ভারতীয় অন্ধ কুসংস্কার! শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি মহিষাসুর ভগবতীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের কি দুরন্ত দুর্ভাগ্য যে পৌরাণিকেরা তাঁহাকে একটা শৃঙ্গপুচ্ছবিলসিত বনের মহিষে পরিণত করিলেন? ভগবতীর অসিপ্রহারে আহতপৃষ্ঠ সেই পুরুষ মহিষটার পৃষ্ঠ হইতে একটা খড়্গাচর্ম্মধারী [illegible]

কখন সম্ভব হইতে পারে? আজি ভারতের হতভাগধেয় আমরা মনে ইহাও বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইলাম! আমরা নিম্নে মার্কণ্ডেয় ও বায়ু পুরাণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপাদান গুলি কিরূপ ভ্রান্তির মধ্য দিয়া আমাদিগের নিকটে আসিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্। ২০
কাংশ্চিৎ তুণ্ডপ্রহারেণ, খুরক্ষেপৈস্তথা২পরান্।
লাঙ্গূলতাড়িতান্ চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্। ২১
ততঃ সোপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাৎ ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যাবীর্য্যেণ সংবৃতঃ। ৩৮
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা, শিরশ্ছিত্বা নিপাতিতঃ। ৩৯
৮৩ অধ্যায়।

বায়ুপুরাণ—

ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরের্নগরোত্তমং।
সুপর্ব্বণঃ সুলোম্নশ্চ নগরং মহিষস্য চ। ৩৮
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্।
৪১—৫০ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ—

দেবাসুর মভুদ্যুদ্ধং পূর্ণ মব্দ শতং পুরা।
মহিষে২সুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে। ১
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যের্দেবসৈন্যং পরাজিতং।
জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রোভূন্ মহিষাসুরঃ। ২
৮২ অধ্যায়।

উপরি লিখিত প্রমাণগুলি দ্বারা বেশ সপ্রমাণ হইতেছে যে, মহিষাসুর একজন পাতালবাসী (আমেরিকাবাসী) অসুর ছিলেন। নিম্নের প্রমাণও প্রথমে তাঁহার মনুষ্যত্বের নির্দ্দেশ করিয়া শেষে তাঁহাকে মহিষ, গজ ও নানা আকারবিশিষ্ট বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। মানুষ কোন কৌশলে একটা সপুচ্ছ সশৃঙ্গ মহিষ বা হাতী হইতে পারে, ইহা যুক্তি নির্দ্দেশ করে না। মহিষ কাটা গেলে তাহার দেহ হইতে অসিচর্ম্মবিশিষ্ট রণদুর্ম্মদ যুবকের বহির্নিঃসরণও যে কতদূর সত্যগন্ধি সংবাদ, তাহা চেতস্বান্ প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। এই কুসংস্কারই আজি ভারতবাসীকে সকলের পদানত করিয়াছে। উপধর্ম্ম কখনই মানুষকে তেজঃপূর্ণ ও নির্ভীক হইতে দেয় না। তবে বস্তুতই কি মানুষেরা কেহ মহিষ-নামা ছিলেন? অবশ্যই ছিলেন। না থাকিলে কেন বায়ুপুরাণ তাঁহার ও তাঁহার নগরের নাম নির্দ্দেশ করিবেন? হরিবংশও বলিয়াছেন,—

নকাযবন কাম্বোজাঃ পারদাশ্চ বিশাম্পতে।
কোলি সর্পা মহিষাশ্চ দার্দাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ। ১৮
সর্ব্বে তে ক্ষত্রিয়া স্তাতে ধর্ম্ম স্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠ বচনাৎ রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা। ১৯—১৪ অ

বেশ বুঝা গেল, পূর্ব্বে মানুষের সংজ্ঞা সর্প ও মহিষাদিও ছিল। মহারাজ মানুষ যম, উক্ত মহিষাখ্য ক্ষত্রিয়কুলের নেতা বা বাহন ছিলেন, এবং তপোলোকনিবাসী বামন বিষ্ণু যেমন পক্ষিবংশের প্রধান গরুড়ের নেতা ছিলেন বলিয়া গরুড়ধ্বজ বা গরুড়বাহন নামের বিষয়ীভূত, তেমনই মহিষ বংশের প্রধান পুরুষ পৌণ্ড্রকের নেতা বা বাহন ছিলেন বলিয়াই যমের নাম "মহিষ-বাহন"। পুরাণ বলিতেছেন,—

পৌণ্ড্রকো নাম মহিষো ধর্ম্মরাজস্য নারদ।

অর্থাৎ হে নারদ, পৌণ্ড্রক নামক মহিষ ধর্ম্মরাজ যমের বাহন। ফলতঃ পৌরাণিক ভ্রান্তি হইতে শঙ্করাদির মনে এই বিপর্য্যয়ের সমাগম ঘটিয়াছে। গলঘণ্ট বনের মহিষ যমের বাহন ছিল না, যমই মানুষ মহিষ পৌণ্ড্রকের বাহন ছিলেন। তাঁহার বিমানে মহিষ মূর্ত্তি থাকিত মাত্র। ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-সভার মাসিক অধিবেশনের বিবরণ।

১। ১৩১১ সালের ২২শে ভাদ্র, ইংরাজী ৮ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় সাহিত্য-সভার পঞ্চম বার্ষিক বিশেষ অধিবেশন হয়।

২। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় এফ, ই, পার্জিটার (The Hon'ble Mr. Justice F. E. Pargiter) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। সভাস্থলে ন্যূনাধিক ৫০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার "ইংরাজাধিকারে ভারতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচারের ইতিহাস" (The History of civil and criminal justice under British rule.) নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৫। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত আমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হয়:—

Dear sir,

A special meeting of the "Sahitya-Sabha" will be held on Thursday, the 8th September, at 6-30 p. m. when Raja Binaya Krishna Dev Bahadur will read a paper on "The History of civil and criminal justice under British rule."

The Hon'ble Mr. Justice F. E. Pargiter has kindly consented to preside. Messrs N. N. Ghose. F. R. S. L. Bar-at-law, K. S. Banerjee. B. A. Bar-at-law, A. E. Michæl and Babu Chandra Nath Basu M. A. B. L. are expected to take part in the proceedings.

Your presence on the occasion is respectfully solicited.

৬। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধপাঠক রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন এবং সেই সূত্রে রাজা বাহাদুরের সাধু উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

সেই সারগর্ভ প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র এইখানে প্রদত্ত হইল।

"প্রায় ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরী প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন হইতে ফোর্ট উইলিয়াম নামেই প্রেসিডেন্সি আখ্যাত হইতে থাকে। এক জন সভাপতি ও একটী কাউন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রণা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ লইয়া উক্ত মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইয়াছিল। যথা;—

(ক) হিসাবরক্ষক (accountant) (খ) গুদাম-রক্ষক (warehouse keeper) (গ) সামুদ্রিক বিভাগের কর্ম্মচারী (Marine purser), (ঘ) কলিকাতার কলেক্টর (collector of Calcutta or Receiver of Revenue.) জন বীয়ডি নামক সাহেব সর্ব্বপ্রথম সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠাপিত হন। সর্ব্ববিধ কার্য্যই ঐ কাউন্সিল ও সভাপতির করতলগত ছিল। উহা ব্যতীত তৎকালে কোন বিচারালয়ও স্থাপিত হয় নাই। ১৬০১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী এলিজাবেথের সনন্দের বলে 'ইংলণ্ডীয় বণিক্‌সম্প্রদায়' কতিপয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। সেই বণিক্‌দল স্বেচ্ছানুসারে আইনের পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। অধিক কি, তাঁহারা (ঐ বণিক্‌সম্প্রদায়) অবস্থাবিশেষে এবং

ঘটনাবিশেষে দণ্ডবিধানাদি,জরিমানা ইত্যাদি কার্য্যে অধিকারী ছিলেন। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজজাতির পক্ষে অতীব অনুকূল ছিল। ১৬১৫খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের রাজদূত সার্ টমাস্ রো সাহেব ভারতীয় তদানীন্তন সম্রাট্ জাহাঁগীরের রাজধানী দিল্লী নগরে সমাগত হন। তিনি সম্রাটের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, ভারতীয় বাণিজ্যকারী স্বজাতির অনুকূলতামূলক বিস্তর সাহায্য ও সুবিধালাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কাউয়েল সাহেবের মতে ইংরেজেরা এই সুবিধাও পাইয়াছিলেন যে, ইংরাজে ইংরাজে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিলে, তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শেষ হইতে না হইতেই "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" মান্দ্রাজে ও কলিকাতায় দুর্গাদি নির্ম্মাণের অধিকার লাভে সমর্থ হন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ কুঠী সমূহের সীমার ভিতর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন এবং বলাই বাহুল্য যে, তাহাতেই তাঁহারা আত্মরক্ষণের অধিকারও প্রাপ্ত হন। এই অধিকার লব্ধ হওয়ায় য়ুরোপীয়গণ ও ভারতীয়গণ ইংরেজাধিকৃত দুর্গ ও কুঠীর সীমার মধ্যে স্ব স্ব গৃহাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই অধিকৃত স্থানে নবাব যখন বিচারার্থ কোন কাজি (বিচারক) প্রেরণ করিতেন, ইংরাজ-বণিক্‌দল, তাহাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া ঐ বিচার হইতে তাহাকে নিরস্ত করিতেন। ১৬০২ ও ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে বারদ্বয়ে ১৬০১ খৃষ্টাব্দের সনন্দ কোম্পানীকে পুনঃ প্রদত্ত হয়। কিন্তু ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে লর্ড গডল্‌ফিন্ (Godalphin) সাহেবের অনুমোদনে বৃটিশ বণিক্‌সমিতিদ্বয় একীভূত হইয়া যায় এবং উক্ত কোম্পানিদ্বয় "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" এই নামেই তদবধি আখ্যাত হইতে থাকে। নূতন সনন্দপ্রভাবে এই কোম্পানি ইংরাজের তাবৎ দুর্গ, কুঠী ও কৃষিবিষয়ক প্রভৃতি ব্যাপারে প্রাধান্য প্রাপ্ত হন। কেবল রাজকীয় শক্তি মাত্রই ইংলণ্ডাধিপতির আয়ত্ত রহিল। পূর্ব্ববৎ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু তৎকালে আইনকানুন সম্বন্ধে কোন সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল না। আনুমানিক ১৭৩০ খৃঃ অব্দে কতিপয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনের সামর্থ্য কলিকাতার তদানীন্তন জমিদারবর্গের উপর ন্যস্ত হইল। যিনি কাউন্সিলের সদস্য অথচ উল্লিখিত কোম্পানির অন্যতম কর্ম্মচারী,এবম্ভূত ব্যক্তিই "জমিদার" বলিয়া নির্ব্বাচিত হইতেন। তদানীন্তন বিচারালয় "ফৌজদারী আদালত" নামে পরিচিত ছিল। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে উহা স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে (১৭৩০ খৃঃ অব্দ) ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাবু গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় হলওয়েল সাহেবের ডিপুটী অথবা দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। "ফ্রিক" নামক এক সাহেব প্রথম "জমিদার" ছিলেন। জমিদারের প্রধান বিচারালয় অথবা 'সদর কাছারি' নিজ কলিকাতাতেই ছিল। তথা হইতে জমিজমার বিলি বন্দোবস্ত হইত। যে যে প্রজা কর (খাজনা) আদায় দিতে অশক্ত হইত, তাহারা এই জমিদারের "সদর কাছারিতে" কারাবদ্ধ থাকিত; স্থলবিশেষ তাহারা বেত্রাহত হইত। জমিদারের এই "সদর কাছারি" স্বাধীন ছিল—অর্থাৎ উহা তৎকালীন অপরাপর বিচারালয়ের অধীন ছিল না। ১৭২৬ খৃঃ অব্দে মেয়ার্স কোর্ট (Mayor's court) স্থাপিত হয়।

এই বিচারালয় স্থাপনের সহিত নানাবিধ বিষয়ক কথাই স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে। বিলাতস্থ কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের (Court of Directors) অনুজ্ঞাক্রমেই "মেয়ার্স কোর্টের" স্থাপনা হয়।

এক জন মেয়র (Mayor) ও নয় জন অল্‌ডারমেন্‌ (Aldermen) লইয়া উক্ত বিচারালয় সংগঠিত হইত। এতদ্বিষয়ে এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল যে, উল্লিখিত নয় জনের মধ্যে সাতজন এবং মেয়র স্বয়ং ও ইঁহারা ইংলণ্ডজাত হইবেন। অবশিষ্ট দুইজন বৈদেশিক প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান হইলেও কোন প্রকার হানি ছিল না। কিন্তু তাঁহারা যে রাজ্যের বা যে রাজার অধীন প্রজাই হউন না কেন, ইংরাজরাজের সহিত সেই রাজ্যের ও সেই রাজার সম্প্রীতি থাকা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। "মেয়র" ও "অল্‌ডারমেন্‌"—ইঁহাদের নিয়োগ গবর্ণর অথবা সভাপতির সম্মতিসাপেক্ষ ছিল। রেণি (Rainey) সাহেব লিখিয়াছেন যে, সভাপতি (President) মহাশয় প্রত্যেক বর্ষেই "অল্‌ডারমেন্‌" কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। "অল্‌ডারমেন্‌" পদ আ-মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু স-কৌন্সিল গবর্ণর যে কোন যুক্তিযুক্ত কারণে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইতেন। যেখানে তাঁহাদের বিচার হইত, তাহার নাম কোর্ট অব্‌ রেকর্ডস্‌ (Court of Records); তথায় সর্ব্বপ্রকার দেওয়ানি কার্য্যাদির বিচার চলিত। সেখানে "উইল" মঞ্জুর হইত ও লেটার অব্‌ এড্‌মিনষ্ট্রেশন (Letter of administration) প্রভৃতি কার্য্যও সম্পাদিত হইত। নানারূপ ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, সেই প্রাচীনকালে এই আদালতগুলি দ্বারা তৎকালে প্রভূত উপকার হইত। তদানীন্তন বিচারালয় দ্বারা সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি ব্যাপার এতই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এতদ্দেশীয় বিচারালয় সমূহের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ভাব-ধারণ করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। মুসলমান সুবাদারের কর্ণধারত্বে বিচারবিভাগাদির ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইত। গুরুতর রাজনীতিঘটিত কারণ পরম্পরার নিমিত্ত তদানীন্তন মুসলমানের হস্তেই রাজ্যশাসন কর্ত্তৃত্বভার সমর্পিত থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইত। সুতরাং রাজ্যশাসন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য্যাদি মুসলমান রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হইত। এস্থলে নির্দ্দেশিত হওয়া বিধেয় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—ইংলণ্ডাধিপ এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধীনত্বে পরিচালিত হইতেন। ইংরাজী ও মুসলমানীয় এই আইন দুইটীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রথায় পরিচালিত এই দ্বিবিধ রাজস্ব প্রণালীর ফলাফল, ভারতবর্ষে অচিরেই সুব্যক্ত হইয়া পড়িল। এদেশীয়গণের আচার ব্যবহারাদির উপর য়ুরোপীয় রাজ্যশাসন প্রণালীর প্রভাব প্রকাশ তাদৃশ প্রার্থনীয় ছিল না। বস্তুতঃ য়ুরোপীয় ধরণে রাজস্ব পরিচালন ব্যাপার এক অভিনব দ্রব্য। আদালতের ব্যয়ভার বহন এতদ্দেশবাসিগণের পক্ষে সহজ ব্যাপার কি না, ইতিহাস তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। ইংলণ্ডীয় রাজনিয়মসমূহ উন্নতিশীল, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহাবসানে যখন ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং ভারতীয় রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তদবধি রাজ্যশাসনতন্ত্র-নির্দ্দিষ্টরূপে পরিচালিত হইতে থাকে। অধুনা ভারত ইংলণ্ডরাজের রাজ্যের অংশবিশেষ। সুতরাং ভারতের শুভাশুভ কার্য্যও, ইংলণ্ডের রাজাধিরাজের নিকট স্বল্প উপেক্ষার বস্তু নহে। ইত্যাদি।

(৬) প্রবন্ধ পাঠাবসানে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (F. R. S. L.) মহাশয় প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ করিলেন। তিনি প্রবন্ধ সম্বন্ধে এইরূপ মতামত ব্যক্ত

করিলেন যে উহা সুলিখিত, সুচিন্তিত, সারবান্ অথচ প্রীতিপ্রদ। প্রবন্ধের ভাষাও মার্জ্জিত, সরল, সুন্দর ও বিশুদ্ধ। তৎপরে হাইকোর্টে আদিম বিভাগের (Original side of the Calcutta High Court) মোকদ্দমার ব্যয়বাহুল্যের বিষয় সুদীর্ঘভাবে কীর্ত্তন করিলেন।

(৭) অতঃপর শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ শেলি বানার্জ্জি বি, এ, (K. S. Banerjee B. A., Bar-at-law) মহাশয় প্রবন্ধকারের যথাযোগ্য গুণ-কীর্ত্তন করিলেন। তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগের ব্যয়বাহুল্য অস্বীকার করিলেন। তাঁহার মতে বারিষ্টার প্রভৃতি ব্যবহারাজীবগণ যদ্রূপ গুরুতর শ্রম করেন, তদনুরূপ পারিশ্রমিক তাঁহারা বিবাদীয় পক্ষগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

(৮) তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, বি, এল, মহাশয় বলিলেন;—তিনি আইনের বিপক্ষ হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠক রাজা বাহাদুর মহানুভাবের সুন্দর সন্দর্ভের পক্ষপাতী, অথবা উহার গুণগ্রাহী। কারণ যেরূপ শ্রম, যত্ন, দক্ষতা ও ধীরতা সহকারে প্রবন্ধটী সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে উহার সুখ্যাতি না করিয়া নীরব থাকিলে নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইত্যাদি।

(৯) ইহার পরে সার ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রবন্ধপাঠক মহানুভাবের যথোপযুক্ত সদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, রাজা বাহাদুর যেরূপ বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী তদ্রূপ স্বয়ং একজন বিদ্যাবান্ ব্যক্তিও বটেন। ইত্যাদি।

(১০) সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় মুক্তকণ্ঠে প্রবন্ধপাঠকর্ত্তার সরলভাবে অজস্র সুখ্যাতিবাদ করিলেন।

(১১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করিবার প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় উক্ত ধন্যবাদ প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

৫ম বার্ষিক ৫ম মাসিক অধিবেশন।

১৩১১—২রা আশ্বিন।

১৯০৪—১৮ই সেপ্টেম্বর।

(রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা)

১। গত ২রা আশ্বিন (১৯০৪—১৮ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় ১০৬।১ নং গ্রে-ষ্ট্রীটে (সভার কার্য্যালয়ে) "সাহিত্য-সভার" পঞ্চম বার্ষিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল।

২। অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। ন্যূনাধিক দেড়শত সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

৪। এই অধিবেশনের "আলোচ্য বিষয়াদির তালিকা এই"।

(১) "সময়" (১৩১১ সাল) ২রা আশ্বিন [১৯০৪—১৮ই সেপ্টেম্বর] রবিবার অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকা।

(২) "সভাপতি"—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।

(৩) "আলোচ্য বিষয়"।

(ক) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ।

(খ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম, এ, মহাশয় কর্তৃক "কর্ম্মফল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

(গ) বিবিধ বিষয়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সভ্যগণের অনুমোদনে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৬। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সম্পাদক শাস্ত্রী রায় বাহাদুর মহাশয়ের সমর্থনে দশজন (১০ জন) গ্রন্থোপহারদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৭। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সকলের অবগতির নিমিত্ত বলিলেন যে, যিনি "স্বাস্থ্যতত্ত্ব—একাল ও সেকাল"—বিষয়ে উৎকৃষ্টতম প্রবন্ধ রচনা করিতে সমর্থ হইবেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, সাহিত্য-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটী রৌপ্য-পদক প্রদান করিবেন। প্রবন্ধটী সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রবন্ধ, সভার সম্পাদকের নামে সভার কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, ইহাও বিদ্যানিধি মহাশয় সভ্যগণের গোচর করিলেন।

৮। তদনন্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম, এ, মহাশয় "কর্ম্মফল" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৯। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন শর্ম্মা কিছু বলিবার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকের গদাধর ভট্টাচার্য্য সম্মত এক ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই;—গদাধর মতে কর্ম্মনাশক কারণ উপস্থিত থাকিলেই উহার নাশ হয়, নতুবা হয় না। ইত্যাদি।

১০। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মগতি বড়ই গহন, সংস্কার নিকরও দুষ্পরিহর। মীমাংসাদর্শন কর্ম্মপ্রধান। কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বের উৎপত্তি ও সেই অপূর্ব্ব হইতেই ফললাভ হয়। ইত্যাদি।

১১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন;—প্রবন্ধ-প্রণেতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান্ ছাত্র। তিনি স্বীয় প্রবন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের ভাষাও ভাল বটে, প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কর্ম্মফল। উহা দৈব ও পুরুষকারের জন্য হইলেও, স্থান বিশেষে পুরুষকার দ্বারা দৈবের প্রতিঘাত করা যাইতে পারে। যদ্ ভবিষ্যতা শাস্ত্রের অভিমত নহে। গ্রহাদির মানব-নিয়তির পরিচালকতা-শক্তি নাই। প্রায়শ্চিত্তাদিরও পাপনাশকতা শক্তি আছে, তিনি প্রবন্ধকারের ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। ইত্যাদি।

১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহাশয় বলিলেন;—তিনি ধন্যবাদ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছেন। তৎপরেই বলিলেন প্রস্তাবের যে, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনের সহিত জ্ঞানাগ্নির কর্ম্মনাশকতা পদের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছেন। ইত্যাদি।

১৩। পরে রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ, মহাশয় বলিলেন;—অদ্যকার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়টী অতীব গুরুতর। প্রবন্ধের দুইটী অংশ। প্রথমাংশে কর্ম্মবাদের দার্শনিকতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে মানবজীবনে কর্ম্মগতির প্রভাব আলোচিত হইয়াছে। দৈব, পুরুষকার, প্রায়শ্চিত্ত, জীবের স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল কথাই প্রবন্ধে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। এনি বেশান্ত প্রভৃতি পরাবিদ্যানুশীলনকারিগণ যেরূপ প্রণালীতে দুরূহ কর্ম্মতত্ত্বকে বিশদ করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন, প্রবন্ধে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে তিনি স্বীয় আর কোন বক্তব্যের অবকাশ দেখিতেছেন না। তবে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধের দার্শনিক অংশ স্থানে স্থানে অধিকতর বিশদ হওয়া আবশ্যক। ইংরাজি শব্দের অনুবাদও সর্ব্বত্র যথাযথ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও নির্দ্দেশিত হওয়া উচিত যে, অনুবাদ কার্য্য যে দুরূহ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ প্রবন্ধ সাধারণতঃ বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য কথা আলোচ্য। যথা ;—"মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনের অর্থ এই যে, দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু আরব্ধ বিপাকসঞ্চিত কর্ম্মাদির তুষশস্য ধান্যাদির অগ্নিদাহের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের মীমাংসা। গদাধর শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা সদ্ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে স্থলে ভোগাদি জন্য কর্ম্মনাশ স্বীকার করা যায়, তথায় ভোগাদিরই নাশকতা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শিরোমণি মহাশয় নূতন কি বলিয়াছেন, বুঝা গেল না। কর্ম্মবাদ নিতান্ত জটিল। উহার সকল কথার মীমাংসা সকলের হৃদয়গ্রাহিণী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। তবে কর্ম্মবাদ যে, হিন্দুশাস্ত্রের একটী সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রবন্ধকার সুবক্তা হইয়াও যে, ঐ মতবাদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা। তদনন্তর তিনি বিশেষভাবে প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ করিলেন।

১৪। সভাপতি তৎপরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—কর্ম্মবাদ হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট তত্ত্ব, "As thou sowest, so thou reapest"—অর্থাৎ যেমন তুমি বপন করিতেছ, তেমনই তুমি ফলভোগী হইবে, ইত্যাদি খৃষ্টের উক্তিকেও একরূপ কর্ম্মফলবাদ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু খৃষ্টান ইউরোপ উক্ত মতবাদের অর্থ সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রবন্ধের দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখপূর্ব্বক সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সংস্কৃত দর্শন বিদ্যায় তাঁহার তাদৃশ অধিকার নাই, তিনি কেবল অনূদিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন মাত্র। অতএব তদ্বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ সুশোভন হইবে না। যাঁহার সহজ জ্ঞান আছে, তিনি কর্ম্মফলের বিচারে সমর্থ।

মন্দলোকেরাও ভাল হইতেছে। সুতরাং কর্ম্মফল অন্যথাভাব হয় না, এ কথা কিরূপ স্বীকার্য্য হইবেন ?

ইহাতেই বোধ হয়, পুরুষকারের অপেক্ষা আছে। এই সহজ বিষয় লইয়া এত মতভেদের কারণ কি ? বিলাতীয় দর্শনকারদিগের মতে "Free will" অর্থাৎ 'স্বাধীন ইচ্ছার' দার্শনিক ভিত্তি নাই। কিন্তু পুরুষকারকে অদৃষ্টের একাংশ বলিয়া বিবেচনা করিলে, কোনই বিশৃঙ্খলা হয় না। তিনি স্বপ্রণীত "হিন্দুত্ব" নামক গ্রন্থে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর জন্মান্তরবাদের কথা। জন্মান্তরের কর্ম্মফলসমষ্টি লইয়া ব্যক্তিগত পাপপুণ্যের বিকাশ হয়। আমাদের মতে ব্যক্তিগত চরিত্র লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী কার্য্যের ফল। ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আমাদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব কতদূর, তাহা কল্পনা দ্বারাও নির্ণয় করা যায় না। কেবল টেনিসনের (Teneyson) ডিপ্রোফণ্ডি (Deprofundy) নামক গ্রন্থে এই দায়িত্বের কথার উল্লেখ আছে। হিন্দুর এই দায়িত্ব বোধ ছিল বলিয়াই হিন্দু অন্তর্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আর, সেই দায়িত্ব নাই বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান নৈতিক

অবনতি ও ঔদাসীন্য ঘটিয়াছে। প্রবন্ধটী যারপরনাই সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। উহার কুত্রাপি দুর্ব্বোধ হয় নাই। আশুতোষ বাবুর লিখিত "সাহিত্য-সংহিতায়" মুদ্রিত অন্যান্য প্রবন্ধও সভাপতি মহাশয় পাঠ করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, আশুতোষ বাবু এতজ্জাতীয় প্রবন্ধাবলীর পক্ষপাতী। ফলতঃ ইহা গৌরবের বিষয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার প্রার্থনা—আশুতোষবাবু এই সকল বিষয় সকলের বোধগম্য করিয়া স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন, ইত্যাদি।

১৬। সর্ব্বশেষে অন্যতম জয়েণ্ট সেক্রেটারি (সহযোগী-সম্পাদক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, সভাপতি মহাশয় ও প্রবন্ধপাঠক আশুতোষ দেব, এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ করিবার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয়, এই প্রাচীন বয়সেও এই সুদীর্ঘ-সময়-ব্যাপক কাল, যেরূপ 'নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপ' প্রায় অটল অচলভাবে অচলবৎ ধীর-স্থিররূপে গম্ভীরভাবে আসীন থাকিয়া সমবেত সভ্যসকলের বাদ প্রতিবাদ শ্রবণপূর্ব্বক শেষে নিজের সমীচীন সময়োচিত মতামত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও নিপুণ সাহিত্য-সেবকের নিকট "সাহিত্য-সভা" অনেক আশাই করে। আশা করি, সেই সকল আশা কালক্রমে অতীব ফলবতী হইবে। অতঃপর পণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়, প্রবন্ধকর্ত্তার ধর্ম্মপ্রাণতা, উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রাঞ্জলতা ও বিশুদ্ধি প্রভৃতির প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ পুরঃসর বলিলেন যে, আশুতোষ বাবু যদ্রূপ বিনীত, উপচিকীর্ষু, সদ্বংশসম্ভূত, উন্নত-চিত্ত ও স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিবৃত্ত প্রভৃতিতে সুশিক্ষিত ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাদির অকপট উপাসক, তাহাতে অনায়াসেই ভরসা করা যাইতে নারে যে, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা জন্মভূমির যথেষ্ট ইষ্টই সংসাধিত হইবে। বর্ত্তমানেও তিনি স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যাদির পরিপুষ্টিপক্ষে প্রভূত কল্যাণকর কার্য্যাদি করিতেছেন। অতএব তিনি আমাদের সকলেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ও ধন্যবাদের পাত্র। শেষে তিনি তাহাকে বিশেষভাবে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন।

সম্পাদক। সভাপতি।

পর্টুগিজ্‌গণের সিংহলাধিকার।

পূর্ব্বকালে, বাণিজ্য-উপলক্ষ্যে পর্টুগিজেরা পুরাতন মহাদ্বীপের প্রায় সকল প্রদেশেই যাতায়াত করিত। তৎকালে, ভারতবর্ষ বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থল মধ্যে পরিগণিত ছিল। হুগলীর সন্নিহিত ব্যাণ্ডেল্ এবং গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে বিশ্ববিদিত সপ্তগ্রাম, বঙ্গবিভাগে এই দুইটী বিখ্যাত বন্দর ছিল। পর্টুগিজেরা তাহাদিগের স্বদেশজাত দ্রব্যাদি এই দুই বন্দরে আনয়ন করতঃ বিক্রয় করিত এবং সেই বিক্রয়লব্ধ ধনে, এতদ্দেশীয় পণ্য ক্রয় করিয়া, বিক্রয়ার্থ অপর দেশে রপ্তানী করিত। এইরূপে, বহুকালাবধি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে সংবদ্ধ থাকায়, পর্টুগিজগণ ভারতবর্ষের কোন কোন স্থান ও বন্দর সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছিল এবং সেই সকল অধিকৃত স্থানে,

তাহাদিগের বাসনানুরূপ বাসভবন, কুঠি ও ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তৎকালে, সময়ে সময়ে, মুরগণও ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিত। কিন্তু তাহাদিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার এত অধিক ছিল যে, সে অত্যাচারে ভারতবাসিগণ অতীব উৎপাড়িত হইয়াছিল। তাহারা প্রায়ই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ভারতের নানা স্থানে যথেষ্ট উৎপাত করিত। তাহাদিগের অসহ্য অত্যাচারের প্রতিকারার্থ, পর্টুগিজদিগের অধিকৃত প্রদেশ সমূহের গভর্ণর ফ্রান্সিস্কো ডি আল্‌মিডা, ১৫০৫ খৃঃ অব্দে, এই ভীষণ অত্যাচারী জলদস্যু মুরদিগের জাহাজ ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত, স্বীয় পুত্র লোরেঞ্জোকে নিযুক্ত করেন। ইতঃপূর্ব্বে মাল ও লাক্ষা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের অনতিদূরে মুরদিগের কয়েকখানি জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। মুরদিগের সেই সকল জাহাজ ধরিবার নিমিত্ত, আবশ্যক দ্রব্য ও যথোপযুক্ত লোক সমভিব্যাহারে লইয়া, লোরেঞ্জো বঙ্গোপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রতিকূল বায়ু তাঁহার প্রকাণ্ড জাহাজখানিকে—বিপরীত পথে—সিংহলদ্বীপে লইয়া যায়। পর্টুগিজগণের দিগ্‌ভ্রম ও ইহার অন্যতর কারণ। তখন তাহাদিগের সকল পথ জানা ছিল না। কলম্বো বন্দরের সমীপবর্ত্তী উপকূলে উপস্থিত হইলে, তথায় নঙ্গর ফেলিয়া, জাহাজখানিকে সেই স্থানেই রাখা হয়। কোথায় বা কোন্ পথে গমন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এতাবৎ বিষয় মীমাংসা করিবার ও আহার্য্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত জাহাজখানিকে কতিপয় দিবসের জন্য, তথায় রক্ষা করিবার বিশেষ আবশ্যক হইল। পর্টুগিজ্ দিগের এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, সিংহলদ্বীপের অধিবাসিগণ নিরতিশয় ভীত, চকিত ও বিচলিত হইল। বৃথা কাল বিলম্ব না করিয়া, তাহারা অবিলম্বেই, কোটার অধীশ্বর শ্রীশ্রীধর্ম্মরাজ পরাক্রম বাহুকে এই সমাচার প্রদান করিল। ইতঃপূর্ব্বে পর্টুগিজ্‌গণ আর কখন সিংহলদ্বীপে আগমন করে নাই। কোটার অধিপতি পরাক্রমবাহু সংবাদ পাইলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে পর্টুগিজ্‌দিগের একখানি অদ্ভুত অর্ণবযান আসিয়া, কলম্বো বন্দরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। পর্টুগিজ্‌দিগের উদ্দেশ্য কি, তাহা তাহারা এতাবৎকাল কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। এই লোকগণ শুভ্রবর্ণ, প্রভূত শক্তিশালী, পরিশ্রমী ও সুন্দরদর্শন। তাহারা নিরন্তর সমরসজ্জায় সুসজ্জিত, অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট, কখনও স্থির নহে, সর্ব্বদাই কর্ম্মনিরত। ইহারা লৌহময় কঠিন বিনামা ব্যবহার করে, মস্তকে বৃহৎ বৃহৎ টুপি পরিয়া থাকে, শ্বেত প্রস্তর ভক্ষণ ও শোণিত পান করে; তাহাদিগের তাবৎ কার্য্যই অদ্ভুত, আকৃতি ও অবয়ব দর্শন করিলে ভীত ও চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা রাক্ষসাদির সদৃশ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিতে বড়ই ভালবাসে। একটা মৎস্য প্রদান করিলে, তাহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করে ও তাহার বিনিময়ে দুই চারিটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদিগের কামানাদি আগ্নেয় অস্ত্রের শব্দ বজ্রশব্দ-সমতুল্য; এই সকল ভয়ঙ্কর কামান হইতে বৃহদাকার লৌহময় গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই সকল ভীষণ গোলা, বহুদূরে গমন করতঃ কঠিন প্রস্তর বা লৌহময় অট্টালিকাও, অনায়াসে উড়াইয়া দিতে পারে। পর্টুগিজ্‌গণ যে অতীব শক্তি ও ক্ষমতাশালী মনুষ্য, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কলম্বো বন্দরবাসিগণের প্রমুখাৎ এই সকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কোটাধিপতি ধর্ম্মরাজ শ্রীশ্রীপরাক্রম বাহু অতীব বিস্মিত, চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন। বৃথা

কালহরণ না করিয়া, এই আসন্ন বিপদের প্রতিকারার্থ কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহার অবধারণ জন্য প্রধান প্রধান রাজ পারিষদ ও অমাত্যগণকে স্বীয় সমীপে আহ্বান করিয়া, অতি সংগোপনে তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। মন্ত্রিগণকে কহিলেন—"এই বিদেশীয় ব্যক্তিগণ অতীব প্রবল, পরাক্রান্ত, কৌশলী, কার্য্যক্ষম ও যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। অতএব ইহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত, অথবা সন্ধি-স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত, তদ্বিষয়ে আপনারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন। প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত মিত্রতা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যে উপায় অবলম্বন করিলে রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সংসাধিত হয়, তাহাই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ।" এই সকল বিষয় সবিশেষ শ্রবণানন্তর, অমাত্যগণ পরস্পর বিভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন; পরে, অনেক তর্ক বিতর্কের পর, চক্রনামা জনৈক বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ মন্ত্রী প্রস্তাব করিয়া কহিলেন;—"মহারাজ! আপনারা ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক দুই চারি দিবস এ বিষয়ে নিরস্ত থাকুন, আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে গমন করিয়া, পর্টুগিজ্‌দিগের কার্য্যপ্রণালী ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া আসি; সকল বিষয় বিদিত হইয়া, পশ্চাৎ যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাই করা যাইবে। আপাততঃ উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যকতা নাই। বৃথা চিন্তায় ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই, সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া যে পর্য্যন্ত না আমি এস্থানে ফিরিয়া আসি, সে কাল পর্য্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন।" ইঁহার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। পরদিবস, অমাত্য চক্র, ছদ্মবেশে কলম্বো নগরে গমন করিয়া, পর্টুগিজ্‌দিগের ভাব, কার্য্য ও অভিপ্রায়, উৎকৃষ্ট কৌশলে—অতি সহজেই পরিজ্ঞাত হইলেন এবং রাজসমীপে পুনরাগমন করতঃ, তদ্বিষয় রাজার জ্ঞানগোচর করিলেন। কহিলেন;—"মহারাজ! এই পর্টুগিজ্‌জাতি যেরূপ উৎসাহী ও প্রভূত ক্ষমতাশালী, তাহাতে সংগ্রামে ইহাদিগকে পরাস্ত করা সুদূরপরাহত। অতএব সন্ধি করিয়া, ইহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত। এই জাতির শক্তি অপরিসীম, কার্য্য অলৌকিক, দেবতার সদৃশ সুন্দর ও বলিষ্ঠ। কিন্তু, তাহাদিগকে দর্শন করিলে মনোমধ্যে আতঙ্ক-সঞ্চার হয়।" বিচক্ষণ মন্ত্রী চক্রের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিচক্ষণ রাজা ধর্ম্মরাজ শ্রীশ্রীপরাক্রম বাহু জনৈক বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান এবং সুচতুর পারিষদকে পর্টুগিজ্‌দিগের নিকট প্রেরণ করতঃ, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। তদনন্তর, রাজার ইচ্ছায় ও অনুরোধে, পর্টুগিজেরা দুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দূতস্বরূপ কোটারাজ-সদনে প্রেরণ করিল। নরপতি স্বয়ং সেই পর্টুগিজ দূতদ্বয়কে যথোপযুক্ত সম্মানসহকারে রাজসভায় অভ্যর্থনা করিলেন। সর্ব্বত্র প্রচলিত রাজ-প্রথানুসারে পরস্পর উপহার আদান প্রদান শেষ হইলে পর, পরস্পরে সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন।

এই সকল কার্য্য যথানিয়মে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে পর, এক পক্ষ অন্তে পর্টুগিজেরা সিংহলদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। ইহার পর ১৩ বৎসরের মধ্যে আর তাহারা সিংহলদ্বীপে আগমন করে নাই। পরে, ১৫১৮ খ্রীঃ অব্দে, লোপেজ্ সুয়ারেজ্ আলভারাঙ্গো নামক জনৈক পর্টুগিজ্ উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত আবশ্যক দ্রব্যে সুসজ্জিত ১৯ খানা জাহাজ লইয়া, একদিন সহসা সিংহলদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই ব্যক্তি সিংহলে পদার্পণ করিয়াই, কলম্বোর নিকট সমুদ্রতীরবর্ত্তি স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতে লাগি-

লেন। তাঁহার যত্ন ও সমধিক চেষ্টায়, অতি অল্পকালের মধ্যেই তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মিত ও তাহা আবশ্যক দ্রব্যে সুসজ্জিত হইল। ক্রমে পর্টুগিজ্‌দিগের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; তাহারা সিংহলদেশবাসিগণকে অগ্রাহ্য—এবং তাহারাই যেন সমগ্র সিংহলের শাসনকর্ত্তা ও প্রভু, এই ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ঘটনা দৃষ্টে, সিংহলস্থ মুরগণ চিন্তা করিল যে, পর্টুগিজেরা সিংহলের নানা প্রদেশ ও উৎকৃষ্ট বন্দর নিকর অধিকার করিয়া লইলে, এখানকার সমুদায় বাণিজ্যই উহারা একচেটিয়া করিয়া লইবে, তাহাতে মুরগণের বাণিজ্যের বিশেষরূপ ক্ষতি হইবে। এই সমূলক আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া, মুরগণ পর্টুগিজ্‌দিগের নব নির্ম্মিত দুর্গটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্ত, রাজা পরাক্রমবাহুকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং উত্তরকালে পর্টুগিজ্‌দিগের দ্বারা সিংহলরাজ্যে বহুতর অনিষ্ট সংসাধিত হইবে বলিয়া বুঝাইয়া দিল। এইরূপে মুরগণের অনবরত উত্তেজনায়, পরিশেষে কোটাধিপতি শ্রীশ্রীধর্ম্মরাজ পরাক্রমবাহু, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, এক দিবস সহসা পর্টুগিজ্‌গণকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ পর্টুগিজ্‌জাতির অদ্ভুত রণ-কৌশলে ও কার্য্যতৎপরতায়, অত্যল্পকাল মধ্যেই কোটাধীশ্বর সসৈন্যে পরাজিত হইলেন। পর্টুগিজ্ সৈন্যগণের অসাধারণ রণ-কৌশল, বীরপণা এবং কামানাদির ভয়ঙ্কর কার্য্য দর্শনে, সিংহলদ্বীপের সমগ্র অধিবাসী চকিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইল। এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত বাতুল বা নির্ব্বোধের কার্য্য জ্ঞান করিয়া, কোটা ও অপরাপর প্রদেশের কয়েকজন ক্ষুদ্র রাজা পর্টুগিজ্‌দিগের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করতঃ তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই আসন্ন বিপদে একান্ত বিপদাপন্ন হইয়াই, ধর্ম্মরাজ পরাক্রমবাহুপ্রমুখ নরনায়কগণ পর্টুগিজ্‌দিগের প্রভুত্ব স্বীকার ও অধীনতা শিরোধার্য্য করিয়া, নিজ নিজ রাজ্য, জীবন ও প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিলেন, এবং করস্বরূপ, প্রতি বৎসর, পর্টুগিজ্‌গণকে হীরা, মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, হস্তী ও সিংহলদেশজাত বিবিধ উৎকৃষ্ট পণ্য প্রদানে অঙ্গীকৃত হইলেন। ইহার পরে, রাজা ধর্ম্মরাজ শ্রীশ্রীপরাক্রমবাহুকে আর কখনও, সংগ্রামাদিতে সংলিপ্ত হইতে হয় নাই। অতঃপর তিনি নিরাপদে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জের উন্নতি ও হিতকল্পে ইনি বহুবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধকাম ও সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। প্রজাগণ ইঁহার বিশেষ বাধ্য ও অনুরক্ত ছিল।

পর্টুগিজেরা সমুদ্রের উপকূলে, কলম্বো বন্দরে, সর্ব্বপ্রথমে যে দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা মৃত্তিকাময় ছিল। ১৫২০ খৃঃ অব্দে, সিংহলে বহুসংখ্যক পর্টুগিজ্ সৈন্যের সমাগম হইলে, তাহারা কঠিন প্রস্তর দ্বারা, অপর একটী অতি দৃঢ় ও প্রশস্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সুযোগ মতে ক্রমে তাহারা সিংহলদ্বীপের অধিকাংশ স্থান ও বন্দর অধিকার করিয়া বহুকালাবধি সিংহলদ্বীপ নিবাসিগণের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল। সিংহলদ্বীপের বিভিন্ন প্রদেশের, প্রায় সমুদায় রাজাই, পর্টুগিজ্‌দিগের করদ ও অধীন ছিলেন। কেবল জাফনা প্রভৃতি দুই একটী প্রদেশের রাজগণ পর্টুগিজ্‌দিগের করদাতা হইলেও, অনেক পরিমাণে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন ও রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিংহলদ্বীপের মধ্যে জাফনা একটী উৎকৃষ্ট বন্দর। ১৫৯১ খৃঃ অব্দে ইহা পর্টুগিজ্‌গণের হস্তগত হইয়াছিল।

১৫৩৬ খৃঃ অব্দে, রাজা ধর্ম্মরাজ শ্রীশ্রীপরাক্রমবাহুর পরলোকে প্রাপ্তি হইলে, পর্টুগিজ্‌দিগের সম্মতিক্রমে ভুবনেকবাহু কোটার করদ রাজা হইয়া, অতি সুন্দররূপে ও সুনিয়মে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিংহলের ঘটনাবলী বড়ই বৈচিত্র্যময়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

অতৃপ্তি।

শান্ত নদী তীরে, ভ্রমি বালা ধীরে,
চাহে নদীপানে ব্যাকুল।
রূপে বনবালা, ফুল করে আলা,
জাগে আঁখিতারা অতুল।
নিশা ঘুম আশে, ডাকে উষা শেষে,
বহে শীত বায় অবশ।
প্রাণে নাহি তৃপ্তি, রহে দূরে সুপ্তি,
আঁখি মেলি বালা অলস।
দুলি স্রোতে মরি, এলো ক্ষুদ্র তরী,
বালা চাহে প্রেমে পাশরি।
হেরি প্রাণপতি, বালা প্রেমে অতি,
যায় দ্রুতগতি শিহরি।
আসি তরী পাশে, কহে প্রেমভাষে
স্ফুট হাসি রেখা চকিত।
নদী বহে যায়, তরী নাচে হায়,
জাগে হৃদে গাঁথা অতীত।
"গেছো আমা ফেলি, কোথা তুমি চলি,
হায় কতকাল—কুদিন।
আজি তোমা হেরি, প্রাণে সুখ ভরি,
ডাকি এসো কাছে স্বামিন্‌।"
শুনি তার কথা, যুবা পায় ব্যথা,
বহে নাহি প্রাণে প্রশ্বাস।
অনুক্ত স্বরে, কহে কাঁপি থরে,
যুবা প্রাণে পূর্ণ হতাশ।
"প্রাণ মম তুমি, প্রেম তব আমি,
স্থিরব্রত করি যাপন।
তব দেহ স্পর্শ, দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ,
ভালে নাহি মম ;—বারণ।"
কহি যুবা দূরে, যায় ধীরে ধীরে,
রহে পড়ি পথে আবাস।
ছুটি বালা ধায়, তত সরে যায়,
শূন্য বনভূমি আকাশ।
বালা প্রাণ মাঝে, ভয়তন্ত্রী বাজে,
চলহীন যত ধমনী।
হেরি বালা মূর্ত্তি, ম্লান নিশা দীপ্তি,
চন্দ্র নভঃ তারা অবনী।
কহে যুবা হায়, নাহি ফিরে চায়,
"কেন প্রিয়ে তুমি চঞ্চল।
নাহি মম কায়া, আমি প্রেতছায়া,
ভালবাসা শুধু সম্বল।
বড় আশা করি, ছাড়ি পর পুরী,
দেখিবারে তোমা প্রেয়সী।
পথিমাঝে হায়, তরী ডুবে যায়,
আমি প্রাণহারা প্রবাসী।
প্রেত কায়া ছাড়ে, তবু তোমা তরে,
রহে প্রাণে সদা অতৃপ্তি।
ত্যক্ত রূপ ধরি, আসিয়াছি ফিরি,
নাহি মম কোন মূরতি।"
নিশা লয় পায়, দিবা হাসে হায়,
নাহি প্রেত কোথা ;—নির্জন।
বালা ধরাতলে, মহানিদ্রা কোলে,
শান্তিপথে করে গমন।
ভ্রমি সেই পথ, পান্থজন কত,
দিবা সমাগমে ললিত।
পথে পড়ি বালা, শুষ্ক ফুলমালা,
হেরি দুঃখ ভরে চকিত।

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু।

সাধ।

(১)

অসীম আকাশে, আনন্দ-অন্তরে,
নিয়ত নিরখি যাঁ'রে ;
নিকুঞ্জ-নিলয়ে, কুসুম-হৃদয়ে,
হেরি অবিরত তাঁ'রে।
চন্দ্র চন্দ্রিকায়, উল্কা-তারা-গ্রহে,
তাঁহাকে দেখিতে পাই ;
অরণ্যে আরামে, পাদপে লতায়,
নিরখি নিখিল ঠাঁই।
তীব্র মরু-মাঝে, নদ-নদী-নীরে,
অচল জঙ্গল হ্রদে,
হেরি এককালে, সে মূর্ত্তি প্রথিত,
কুবলয় কোকনদে।
শ্মশান মশানে, কান্তারে প্রান্তরে,
খাল-বিল-সরোবরে,
নিরখি বিস্ময়ে, বিমুগ্ধ মানসে,
সে মূর্ত্তি বিরাজ করে।
অনন্ত-বিমানে, বিশাল ধরায়,
পদার্থ নিবহে যিনি ;
স্থিত পূর্ণভাবে, দিবা-বিভাবরী,—
কে কহিবে কেবা তিনি !
নাহি ত আকার ; নিত্য নিরাকার ;
বিকার রহিত জন ;
ভক্তব্রাত তরে, বহু [illegible]
স্বকীয় স্বভাবে হন।

মীমাংসা অতীত স্বরূপ তাঁহার,
জ্ঞান-অগোচর যাহা ;
আদি—মধ্য—অন্ত রহিত পুরুষ,
শুনি বেদাগমে তাহা।
সুহৃদ্-বান্ধব, মিত্র-সখা-অরি,
নাহি কোথা' কিছু তাঁ'র ;
কিন্তু অনুক্ষণ পরম সুহৃদ্
হন তিনি সবাকার।
ক্ষুদ্র ক্ষীণ জ্ঞানে, বুঝে'ছি নিশ্চয়
তিনিই জীবের গতি ;
প্রাণিনিকরের সুখের কারণ,
কৃপাসিন্ধু বিশ্বপতি।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিসমবায়
সে মোহন-রূপ-ছায়া ;
নিত্য নিরঞ্জন, অতীত সৃষ্টি—
প্রপঞ্চ তাঁহার মায়া।
জানিলে শাশ্বতে, ঘুচে মায়ামোহ—
পাপ-পুণ্য নাহি রয় ;
কু-বর্গ ত্রিতাপ, ধ্বংস হয় মূলে,
হইলে তাঁহাতে লয়।

(২)

ভক্তি-শতদলে, প্রেম-পূত-নীরে
পূজি' হৃদে প্রেমময়,
মিলিব আনন্দে, পদ-প্রান্তে তাঁ'র ;
'সাধ' যেন পূর্ণ হয়

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তোলপাড় করে মাটি দামামার ঘায়।
অজয়া হইল পার চাপিয়া নৌকায়॥
লম্ফ দিয়া তটে উঠে মহাবলবান।
সমরে নামিল তখন বলে হান্ হান্॥
আচম্বিতে লোহাটা সংগ্রামে ডাক ছাড়ে।
বারভুঞ্যা রাজার চৌদিকে এসে লড়ে॥
দুই দলে হানাহানি সমর প্রলয়।
লোহাটার প্রতাপে বাসুকি পাইল ভয়॥
ঘোড়া হস্তী দম্ফে হানে পঞ্চানন জিনি।
রাউৎ মাহুৎ পড়ে লোটায়ে ধরণী॥
এক মাথা হানিতে শতেক মাথা হানে।
লোহাটার পক্ষাবল দেবী আইল রণে॥
ডাক দিয়া ভদ্রকালী রণে দিল হানা।
চৌষট্টি যোগিনী আইল তিন কোটি দানা
প্রলয় সমর হয় ঢেকুর ভিতর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুনে মায়াধর॥
দানা সঙ্গে সমরে নামিল ভগবতী।
দলেবলে নড়িছে গৌড়ের মহামতি॥
নড়িছে প্রধান বীর চূড়া কুন্দকার।
ফরিকাল বন্দুকি নড়ে বাহান্ন হাজার॥
মানসিংহ রাজা নড়ে কাঁপিল ঢেকুর।
বড় গোলার শব্দ শুনিতে স্তর স্তর॥
কত বাদ্য বাজে রণে লেখা জোখা নাই।
তিন কুড়ি মাদল বাজিছে এক ঠাঁই॥
কেহ রণে নড়ে কেহ ভঙ্গ দিয়া যায়।
আগু দলে রণ করে কর্ণসেন রায়॥
আপনার দেশ যায় প্রাণপণে যুঝে।
ছয় পুত্র মরিল সেনের রণ মাঝে॥
রণে ভঙ্গ দিল সেনা শোকেতে ব্যাকুল।
পলাইয়া যায় সেনা নাহি বাঁধে চুল॥
গণ্ডগোল সমরে উঠিল কলরব।
ঘরমুখে পলায় রাজার সেনা সব॥
আকাশে দেবীর দানা ছাড়ে সিংহনাদ।
রাজা পাত্র ভঙ্গ দিল শুনিয়া প্রমাদ॥
এইরূপে পাইল রাজা গৌড় সহর।
রণ জিনে হাসে বীর লোহাট বজ্জর॥
সেনার রুধিরে বাণ অজয়া উছলে।
ঢেকুর ঈশ্বরী গিয়ে বসিল দেউলে॥
কর্ণসেন পুত্রশোকে না দেখে নয়নে।
ছয় পুত্র কাটা গেল ঢেকুরের রণে॥
পুত্রশোক পাইল রাজা অতি বৃদ্ধকালে।
কাঁদিতে কাঁদিতে যান গোউড় মণ্ডলে॥
রাধা জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ, গোপাল, জনার্দ্দন।
কোথা গিয়ে রহিলে মাধব নারায়ণ॥
বাসঘরে উপনীত হ'ল মহীপতি।
কর্ণসেনের পাটরাণী নামে শিলাবতী॥
রাণীর নিকটে সেন কাঁদিয়া কহিল।
ছয় পুত্র তোমার ঢেকুরে যুঝে মোলো॥
শিলাবতী পুত্রশোকে কাঁদিয়া বিকল।
জীবন ত্যজিল রাণী খেয়ে হলাহল॥
ছয় বধূ অনুমৃতা হইল তখন।
অশৌচান্তে পিণ্ডদান করিল রাজন॥
কর্ণসেন বলে আর ঘরে না রহিব।
উদাসীন হ'য়ে আমি তীর্থবাসে যাব॥
দেখিব মথুরা কাশী দ্বারকা নগর।
পুত্রশোকে উদাসীন হ'ল নৃপবর॥
গলায় তুলসীমালা মাথায় টোপর।
কৌপীন পরিল রাখি পাটের অম্বর॥
হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ সদাই মুখে বলে।
বৈরাগ্য হইয়া রাজা কর্ণসেন চলে॥
মনে করে বৃদ্ধকালে হব তীর্থবাসী।
রাজা গৌড়েশ্বর সঙ্গে দেখা করে আসি॥
আচম্বিতে মায়াজাল বিধির লিখন।
এইরূপে রাজার দরবারে দরশন॥

কর্ণসেন কাঁদিল রাজার বিদ্যমানে।
গৃহশূন্য বিধাতা করিল এতদিনে॥
রাজ্য লয়্যা ইছাই গোয়ালা রাজা হল্য।
পুত্রশোকে রাজরাণী শিলাবতী মল্য॥
উদাসীন হয়্যা যাই তুমি আজ্ঞা দিলে।
রাজা বলে কর্ণসেন অবোধ হইলে॥
বৃদ্ধকালেতে কেন হবে দেশান্তরি।
ঘরে বসে কৃষ্ণ ভজ দৃঢ় মন করি॥
তবে দেখি যদিস্যাৎ করেন ঈশ্বর।
আজকেলে বিভা দিব গৌড় সহর ভিতর
পরমসুন্দরী কন্যে যার ঘরে পাব।
আপন হুকুমে ধরি আনি বিভা দিব॥
খলখল হাসে সেন রাজার দরবারে।
বুড়াকালে কন্যাদান কে দিবেক মোরে
নিরানব্বই বচ্ছর বয়স্ গেল প্রায়।
পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে কেন দেহ রায়
হাতে ধরে বসাইল রায় গৌড়েশ্বর।
আমি বিভা দিব আজি রাত্রের ভিতর॥
শ্যাম ঘোষের পুত্র যদি হইল মহাবল।
আর এক রাজ্য দিব ঢেকুর বদল॥
কথা শুনে তুষ্ট হল কর্ণসেন রায়।
পাশরিল পুত্রশোক রাজার কথায়॥
বসন ভূষণে রাজা করিল সম্মান।
রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যে ধর্ম্মের গীত গান॥
কর্ণসেনে প্রবোধিয়া রায় গৌড়েশ্বর।
দরবার ভাঙ্গিয়া রাজা চলিল্ল সত্বর॥
আগে পিছে চলিল নফর লোকজন।
অন্দরমহলে রাজা দিল দরশন॥
ভানুমতী পাটরাণী পরমসুন্দরী।
কাছে বসে আছে তার রঞ্জা বিদ্যাধরী॥
ব্যস্ত হয়্যা প্রক্ষালিতে চরণ কমল।
সোণার ঝারিতে রঞ্জা যোগাইল জল॥
রঞ্জাকে দেখিয়া রাজা বিস্ময় ভাবিল।
পরমসুন্দরী কন্যা কোথা হতে এল॥
রম্ভাবতী, অরুন্ধতি, কিবা তিলোত্তমা।
রাধিকা গোপিনী গৌরী কিবা সত্যভামা
কুচগিরি দাড়িম্ব বদনে মৃদু হাসি।
মনোহর যৌবন মদন বাণের রাশি॥
আইবড় কন্যে জানিল চলনে॥
এই কন্যা বিভা দিব রাজা কর্ণসেনে।
রাজা বলে ভানুমতী না কহিলে নয়।
কার কন্যা এসেছেন আমার আলয়॥
ভানুমতী বলে প্রভু কর অবগতি।
কনিষ্ঠা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী॥
ভগিনীকে আনায়েছি লোক পাঠাইয়া।
হাসিতে লাগিল রাজা পরিচয় পাইয়া॥
রাণীর সহিত রাজা যুক্তি আরম্ভিল।
এই কন্যা কর্ণসেনে বিভা দিতে হ'ল॥
বনিতা বিহনে আইল উদাসীন হোয়া।
কর্ণসেনে রাখিব রঞ্জাকে বিভা দিয়া॥
রাণী বলে কর্ণসেনের বয়েস বিস্তর।
বড় ভাই মহামদ বুদ্ধির সাগর॥
যদি শুনে ভাই মোর বিবাহের কথা।
কর্ণ রেনে দিবে দুঃখ করিয়া খলতা॥
রঞ্জাবতী ছোট বোন মা বাপের প্রাণ।
ইহার উপায় কর হয়্যা সাবধান॥
পিতামাতা তোমার কথার ছাড়া নয়।
দেশে পাত্র থাকিলে কেমনে বিভা হয়॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর করিল গমন।
পুনর্ব্বার দরবারে দিল দরশন॥
রাজা বলে মহাপাত্র শুন মোর রাণী।
কাউর জিনিতে তুমি করহ উঠানি॥
কামাখ্যার বরে রাজা ধরে মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া উঠে গণ্ডকীর জল।
তুমি সেজে না গেলে উপায় নাহি দেখি।
নব লক্ষ রাহুৎ রেখে জমা হল বাকী॥
হেতের বাঁধিয়া যাও কাউর উপরে।
কর্পূর বলে বেঁধে থান গৌড়ে সহরে॥
বার হাজার সেনা লহ যমের দোসর।
মহামদ পাত্র গেল কাউর উপর॥
পার হইতে না পারিল গণ্ডকীর বাণ।
হেথা গৌড়েশ্বর লয়্যা কর অবধান॥

রমতি নগরে থাকে বেণু নৃপবর।
লোক দিয়া আনাইল রায় গৌড়েশ্বর॥
রাজা বলে মহাশয় কর অবধান।
তোমার কন্যে কর্ণসেনে কর সম্প্রদান॥
বেণু রাজা বলে তুমি প্রধান জামাতা।
তোমার বচন নাহি করিব অন্যথা॥
রঞ্জাবতীর বিভা হবে আনন্দ সবার।
রাজার মহলে লোকে আনে পরিবার॥
গণনা করিয়া রাজা অধিবাস করে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের বরে॥
শুনিয়া এই কথা, সেনে দিতে সুতা,
সুন্দরী রঞ্জা বিদ্যাধরী।
হরষিত মনে, যতেক বধূগণে,
আনাল আমন্ত্রণ করি॥
বাদ্যেতে উঠে রোল, ভোরঙ্গ জয় ঢোল,
কুলান দড় বাজে সানি।
মৃদঙ্গ বাজে ডম্ফ, ঠমক জগজম্ফ,
কাঁসর রুদ্র বিনোদিনী॥
পঞ্চজনে পুঁতে খুঁটা, মাণিকের হেম ঘটা,
উপরে দিল সামিয়ানা
বসিয়া দ্বিজবর, যেমন দিবাকর,
কৌতুকে বসে সর্ব্বজনা॥
সকলে হরষিত, দ্বিজতে পড়ে বেদ,
আনন্দ বেণু মহারাজা।
আরোপে শুন্যে কুম্ভ, করিয়া আরম্ভ,
ঘাটেতে গণেশাদি পূজা॥
হরিদ্রাম্বিত ভুনি, গিঠেতে দোলে মণি,
বরণ হেরিলে তিমির নাশে।
অলঙ্কারে জ্যোতি, প্রফুল্ল হল অতি,
বসিল গিয়া পিতার পাশে॥
প্রশস্ত পাত্র নিলা, মহীগন্ধ শিলা,
ধান দূর্ব্বা পুষ্প ফল।
দধি ঘৃত সিন্দূর, দিলেন নৃপবর,
সস্তিক আদি শঙ্খ কর জল॥
সিদ্ধার্থ গোরোচনা, দর্পণ রূপা সোণা,
তাম্রাদি দিল তার পর।
আনিয়া স্বর্ণ থালে, কন্যার কপালে,
দিতেছেন বেণু নৃপবর॥
করিয়ে যতন, বেণু তপোধন,
অতি হরষিত মনে।
কণক সিঁথি মাথে, সুতা বাঁধি হাতে,
আশীষ করে দ্বিজগণে॥
বাজিল শঙ্খধ্বনি, আনন্দে নৃপমণি,
মাতৃকা পূজে হরষিতে।
আনন্দ হয়্যা ভূপ, করিল নান্দি মুখ,
দিলেন বসুধারা ঘৃতে॥
অধিবাস সারি, বসিল অধিকারী,
হইয়া আনন্দ অপার।
যতেক এয়ো দাসী, হরষিতে আসি,
রঞ্জাকে করে সমাদর॥
রূপেতে সত্যভামা, যতেক এয়ো রামা,
কাঁখে কুম্ভ ঝারি।
কৌতুকে সমাদরে, জল সহিবারে,
চলিল যতেক সুন্দরী॥
দুর্জ্জন সিংহ সুত, গোপাল সিংহ খ্যাত,
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান।
তস্য দেশে বাস, ধর্ম্মের ইতিহাস,
দ্বিজ রামচন্দ্র গান॥
জল সহিবারে এল যত এয়োগণ।
পরিহাস কৌতুকে মহলে দরশন॥
হেথা বরবেশ সাজাইল কর্ণসেনে।
প্রণাম করেন গিয়া ব্রাহ্মণ চরণে॥
বরসজ্জায় কর্ণসেন চাপি চতুর্দ্দলে।
উপনীত হোল গিয়ে রাজার মহলে॥
যত মেয়ে বর দেখে হায় হায় করে।
এমন সুন্দরী কন্যে দিবে বুড়ো বরে॥
অঝর নয়নে কাঁদে রাজার শাশুড়ী।
বর দেখি সুন্দরী মাথায় ভাঙ্গে হাঁড়ি॥
রঞ্জার কপালে বুঝি ছিল বুড়া বর।
কেহ বলে বা করিল রাজা গৌড়েশ্বর॥
বেণু রাজা জামাতার করিল বরণ।
সুগন্ধি চন্দন চুয়া বসন ভূষণ॥

সুবর্ণ চিরুণি দাসী ধরিল তখন।
আঁচুড়িল কুন্তল জিনিয়া নব ঘন॥
মালতী মল্লিকে দামে বাঁধিল কবরী।
লোটনের আগেতে বাঁধিল ঝাঁপা ঝুরি॥
সিন্দুর পরান প্রভাতের দিনমণি।
বিধুমুখে মৃদু হাসি কনক বরণী॥
চন্দনের বিন্দু দিল অলকার কাছে।
নব ঘন দেখিয়া ময়ূর যেন নাচে॥
বরের বদনে বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়ে।
চারিজনে কন্যে তুলে পাটায় বসায়ে॥
যোড় হাতে সুন্দরী রহিল হেঁট মুখে।
অঙ্গের বরণ যেন বিজুরি ঝলকে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করে বসাইল।
বর কন্যে দু'জনার মাল্য বদল হোল॥
ছাউনি পড়িল বলে করে জয়ধ্বনি।
তবে কন্যে দান কৈল বেণু নৃপমণি॥
অনেক যৌতুক দিল করিয়ে সম্মান।
ব্রাহ্মণে গিরস্ত বাঁধে বেদের বিধান॥
অরুন্ধতী যাগ হোম হল সব সারা।
বর কন্যে ঘরে নিল দিয়া জলধারা॥
ক্ষীর খণ্ড ভোজনেতে বঞ্চিল বাসর।
এত দূরে পালা সাঙ্গ শুন মায়াধর॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সব পালা হৈল সায়॥
রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা সমাপ্ত।

কর্ণসেন যান রাজ্য ময়না ভুবন।
আগে পিছে চলিল নফর লোকজন॥
নিশান ঠমক বাজে গৌড়ের রাজার।
ভেরবী গঙ্গার ঘাটে নায়ে হইল পার॥
দেখাদেখি রমতি রাখিয়া চলে বেগে।
বারুইপাড়া বেউঙ্গা বাজার ডান ভাগে॥
শীঘ্রগতি চলে যান সঙ্গেতে ধাবক।
মঙ্গল কোট এড়াইয়া পেল্যাক লুওক॥
কর্জনা সরাই বর্দ্ধমান দিয়া গণ।
পার হোয়ে দামোদর পেল্যাক উচালন॥
রাঙ্গা মেট্যা ঘুসি ঘাটা পশ্চাৎ করিয়া।
পারমার গোবিন্দপুরে উত্তরিল গিয়ে॥
কাশীযোড়া কোতুলপুর দ্রুত রাখি চলে।
উপনীত হোল সবে পদুমার বিলে॥
কালিনী গঙ্গার ঘাটে নায়ে পার হোয়ে।
চণ্ডরা ময়নায় রাজা উত্তরিল গিয়ে॥
শুনিল ময়না পেল কর্ণসেন রাজা।
জয়পতি মণ্ডল এল আর যত প্রজা॥
হাজার মোহর দিয়া যত প্রজাগণ।
সম্ভাষণ করিল এসে রাজায় চরণ॥
দেশে রাজা হোল যদি কর্ণসেন রায়।
আনন্দিত প্রজাগণ হইল ময়নায়॥
বাড়ী ঘর তোলা হোল রাজা কর্ণসেন।
রামের সমান প্রজা পালন করেন॥
রজনী প্রভাত হল উদয় তপন।
সর্ব্বলোক গা তুলিল ত্যজিয়া শয়ন॥
মনে মনে গৌড়েশ্বর করিল বিচার।
মহাপাত্রে না বলে ভগিনী দিলাম তার॥
কর্ণসেনে ডাকি রাজা কহেন তখন।
ছোট শালি তোমারে করিলাম সমর্পণ॥
মহাপাত্র শুনিলে হবেক সর্ব্বনাশ।
চণ্ডরা ময়নায় তুমি করগে নিবাস॥
কাণ্ডর হইতে এলে পাত্র মহামদ।
তোমার উপর বড় পড়িবে বিপদ॥
লক্ষ তঙ্কা দাম দিহ বৎসরে বৎসরে।
আজি হোতে রাজা হোলে ময়না উপরে॥
রাজকন্যা সঙ্গে লেহ রঞ্জাবতী রাণী।
দুই দাসী লেহ সঙ্গে মাণিক কল্যাণী॥
যৌতুকার্থে এক হাতী দিলেন রাজন্।
বলদে করিয়া রাজা দিল বহু ধন॥
সঙ্গে নিল চতুর্দ্দোলে রাণী রঞ্জাবতী।
কল্যাণী মাণিক চলে সেনের সংহতি॥
রঞ্জাবতী জান যদি ময়না অবনী।
সঙ্গিনী চলিল সাথে মধ্যম ভগিনী॥
কন্যা পুত্র তাহার সংসারে কেহ নাই।
ধর্ম্মের গাজনেতে কামিনী সর্ব্ব ঠাঁই॥

সবাকার ঠাঁই রঞ্জা হইল বিদায়।
হস্তীর উপরে চড়ে কর্ণসেন রায়॥
দিনে দিনে সম্পদ্ বাড়িল অভিলাষ।
ইন্দ্রের মহল জিনি রাজার আবাস॥
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ জিনি কর্ণসম দানে।
দাস দাসী ঘোড়া হাতী বাড়ে দিনে দিনে
রঞ্জাবতী রাণী কহে রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ভাবি শম্ভাসুর।
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে বজ্জর পড়ুক॥

রাণী বলে প্রাণনাথ কর অবধান।
গোউড় সহরে যাহ রাজার দিয়ান॥
বিবাহ অবধি প্রভু ময়না কে জানে।
রাজার সঙ্গেতে পুন দেখা করিনে॥
কাঙর মহলে গেছে মহামদ ভাই।
ভাল মন্দ সমাচার কিছুই না পাই॥
এত বলি কাঁদে রঞ্জা করি অভিমান।
গোউড় সহর তবে কর্ণসেন যান॥
ভেট ঘাট লয়্যা চলে একশত ভার।
পাল্কী উপরে চলে রাজার দরবার॥
ময়নাকে রাখি চলে গোউড়ের পথে।
হেথা মহামদ আইল কাঙর হইতে।
দশ হাজার কাঙরেতে কাটায়ে লস্কর।
রাজার সাক্ষাতে আইল মহামদ পাতর॥
নিজ দুঃখ গৌড়েশ্বরে করি নিবেদন।
নিজ বাড়ী রমতি নগরে দরশন॥
সমাচার পাইল পাত্র আপনার ঘরে।
বুড়া রাজা কর্ণসেন রঞ্জা বিভা করে॥
ভীষ্মকের দুহিতা রুক্মিণী ঠাকুরাণী।
যে কালে হরিয়া নিল দেব চক্রপাণি॥
রুক্মিণীর ভাই জেনে রুষিল অন্তরে।
সেই মত মহামদ পাত্র মনে করে॥
রঞ্জাবতী হ'তে মোর কুলে হৈল কালী।
আজি হতে তার নামে দিল জলাঞ্জলি॥

আর আমি না দেখিব রঞ্জাবতীর মুখ।
কর্ণসেনে মন্ত্রণা করিয়ে দিব দুখ॥
বৈরী হয়ে অতঃপর ভগিনী আমার।
ঐরূপে চলে পাত্র রাজার দরবার॥
রাজার দক্ষিণে বৈসে মহামদ খল।
প্রহরী সকল বৈসে লয়্যা দলবল॥
দলবলে দরবারে বসেছে গৌড় রায়।
কর্ণসেন দেখা করে রাজার সভায়॥
বারভুঞ্যা কর্ণসেনে করিল আদর।
এস ভাই বলেন ভূপতি গৌড়েশ্বর॥
কোল দিয়া আসনে বসান গৌড় রায়।
দেশের বার্ত্তা রাজা সেনেরে সুধায়॥
জ্ঞাতির প্রধান তুমি তাহে সাঁড়ু ভাই।
নিরবধি তোমার মঙ্গল আমি চাই॥
কেমনে আছয়ে রঞ্জা শুনি সমাচার।
কর্ণ সেন বলে রাজা মঙ্গল সবার॥
আপনি চন্দন দিল কর্ণসেন গায়।
তা দেখিয়া পাত্র রাজার পানে চায়॥
মনে ভাবে মহামদ গৌড়ের পাতর।
কর্ণ সেনের বড়াই ঘুচাব অতঃপর॥
রাজার সাক্ষাতে বলে হোয়ে যোড় হাত।
অবধান শুনহে গৌড়ের মহীনাথ॥
শুন পাত্র তোমার লবণ সবে খাই।
ভাল মন্দ বুঝাতে আমার প্রাণ যায়॥
কর্ণসেন অভাগাকে বিধি হোলো বাম।
অতি বৃদ্ধকালে হোলো আঁটকুড়ো নাম॥
ভগিনী আমার দিলে তায় নাহি দুখ।
আপনি কেমনে দেখাও আঁটকুড়ো মুখ॥
শুনেছি সকল কথা জ্যোতিষীর ঠাঁই।
এ জন্মেতে রঞ্জার বালক হবে নাই॥
উড়িষ্যা দেশের রাজা বাগান ঈশ্বর।
ছত্রপতি বোলে কেবা আছে তোমার পর
রাম রাজা সমান সকল লোকে বলে।
আঁটকুড়া আলাপনে আপনি ঘুচালে॥
কর্ণসেনে বসাইয়া আসন উপর।
এতদিনে গেল রাজা গৌড় সহর॥

মনে কয়ে যে জন যাহার দোষ থাকে।
আপনার মর্য্যাদা আপনি সেই রাখে ॥
বিধি বাম হোলে তার সর্ব্বনাশ হয়।
তোমার আসনে বসে বুকে নাহি ভয় ॥
এত শুনি চায় পাত্র কোটালের পানে।
দরবার হইতে উঠাইল কর্ণ সেনে ॥
অবিচার করিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল।
সভা মধ্যে কর্ণসেনে অমর্য্যাদা কৈল ॥
অমর্য্যাদা হোয়ে বসে রাজার দিয়ানে।
মনে দুঃখ কর্ণসেনের বড় অভিমানে ॥
পাল্কী যোগান আনি দ্বাদশ কাহার।
অবিলম্বে ছাড়ে সেন রাজার দরবার ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় ময়না নগর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ভাবী মায়াধর ॥
অমর্য্যাদা পেয়ে বড় রাজার দরবারে।
কর্ণসেন উপনীত ময়না নগরে ॥
কারে কিছু না বলিয়ে গৌড়ের ভারতী।
নিজঘরে শয়ন করিলেক নৃপতি ॥
কল্যাণী মাণিক দাসী দেখেছিল সেনে।
সমাচার কহিল রঞ্জার বিগুমানে ॥
গৌড় হোতে কর্ণসেন আইল এখন।
কারে কিছু না বলিয়ে করিল শয়ন ॥
উভরড়ে ধায় রঞ্জা এই কথা শুনি।
স্বামীর চরণে পড়ি কাঁদে রঞ্জারাণী ॥
কহ প্রভু কেবা কি কহিল কুবচন।
কেন প্রাণনাথ দেখি বিষণ্ণ বদন ॥
রাজা বলে এ দুঃখ রাখিতে নাই স্থান।
বড় পেলাম রাজার সভাতে অপমান ॥
ভাই তোর মহামদ গৌড়ের পাতর।
অমর্য্যাদা করিল মোরে সভার ভিতর ॥
আর আমি না রাখিব এ পাপ শরীর।
বলিতে বলিতে রাজার চক্ষে বহে নীর ॥
রঞ্জা বলে প্রাণনাথ না কাঁদিহ আর।
প্রিয়ভাবে পতিরে কহিছে পুনর্ব্বার ॥
ঠাট্টা পারা করেছেন বোনাই বলিয়া।
মরিতে যাইবে কেন ইহার লাগিয়া ॥

স্বামী নিন্দা শুনিয়া কাঁদেন রঞ্জাবতী।
এই অভিমানে প্রাণ ত্যজেছিল সতী ॥
বিপদ বাড়িল বড় পুত্রের বদল।
পঞ্চাননে পূজা করে ষষ্ঠীকে ছাগল ॥
রঙ্গিনী বাসুলী পূজা করে একমনে।
শ্রীফলের দল দিল শিবের চরণে ॥
হরিবংশ ভারত মহলে করাইল।
তথাপি রঞ্জাবতীর পুত্র নাহি হল ॥
পুরদত্ত বারুই অসৎপুর হ'তে।
যত জাতি ল'য়ে চলে চাঁপাই সেবিতে ॥
ধর্ম্মজয় শব্দে সঘনে উঠে রোল।
কুলে উঠে ভক্ত সব বলে হরিবোল ॥
ধর্ম্মের গাজনে সঙ্গে সেতাই পণ্ডিত।
ময়না নগরে সবে হৈল উপনীত ॥
নগরে মাগিয়ে ভিক্ষা পাইল নানাধন।
বেত হাতে নৃত্য করে যত ভক্ত্যাগণ ॥
নৃপতির মহল দুয়ারে দাণ্ডাইল।
রাজা কর্ণসেন নামে আশীষ করিল ॥
নানা ধন স্বর্ণথালে নিল শীঘ্রগতি।
গাজন দেখিতে চলে রাণী রঞ্জাবতী ॥
ভিক্ষা দিয়া দণ্ডবৎ করিল তখন।
যোড় হাতে সুন্দরী করেন নিবেদন ॥
জিজ্ঞাসিল সেতাই পণ্ডিতে সবিনয়।
কোন্ দেবতার পূজা কর মহাশয় ॥
সেতাই বলেন রাণী কর অবধান।
এই ধর্ম্মদেবতা অনাগু ভগবান্ ॥
কহ রাণী মনে কিবা করেছ বাসনা।
অবশু পূরাবে ধর্ম্ম মনের কামনা ॥
পূজিলে ধর্ম্মের পদ পরকালে জয়।
নির্ধনের ধন হয় বন্ধ্যার তনয় ॥
পুত্র কোলে নাই গোঁসাই বড় অভাগিনী
বলিতে বলিতে কাঁদে রঞ্জাবতী রাণী ॥
ধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদি সঙ্গীত ॥
বংশ বিনে স্বামীর সংসারে বল দুঃখ।
অপুত্রক বলে কেহ নাহি দেখে মুখ ॥

সেতাই পণ্ডিত বলে শুন পাটরাণী।
পূর্ব্বকথা তোমার সকল আমি জানি॥
পুত্রবর পাবে তুমি বিস্তর কঠোরে।
যদি ঝাঁপ দিতে পার শালের উপরে॥
সাত নায়ে মণি লহ বার ভক্ত্যা সাথে।
নৌকায় চাপিয়ে চল চাঁপাই সেবিতে॥
সালে ভর দিয়া যদি ত্যজহ পরাণ।
তবে পুত্রবর দিবে দেব ভগবান্॥
রঞ্জা বলে হয় যদি মোর বংশধর।
আমি প্রাণ দিব গোঁসাই সালের উপর॥
একদণ্ড এখানে করিবে বিলম্বন।
কহিব স্বামীর কাছে সব বিবরণ॥
মহল ভিতরে রাণী গেল ত্বরা করি।
স্বামীর চরণে পড়ে কাঁদেন সুন্দরী॥
এই দুঃখ আমার কপালে বড় আছে।
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দরবারে দিয়েছে॥
আপনি না তোল মাথা রাজার হুজুরে।
আঁটকুড়ো অপবাদ বচনের তরে॥
ধর্ম্ম সেবা করিবারে চাঁপাই নদী যাব।
পুত্রের কারণ আমি সালে ভর দিব॥
মহাজ্ঞান পাইলাম আমি পণ্ডিতের ঠাঁই।
ধর্ম্মরাজ বিনে দুঃখ ঘুচাতে কেউ নাই॥
সেতাই পণ্ডিত যান ধর্ম্ম সেবিবারে।
দেখা করিবারে চল ফটক দুয়ারে॥
অন্দরমহল হতে যাইয়া তখন।
সেতাই পণ্ডিত কাছে দিল দরশন॥
কর্ণসেন বলে শুন সেতাই পণ্ডিত।
বিবরিয়া আমাকে বলহ ধর্ম্মরীত॥
দেব ঋষি সকলে উদ্দেশে কর পূজা।
যারে দেখিবারে সাধ করে ইন্দ্ররাজা॥
যোল যুগ তপস্যা করে ভবানী শঙ্কর।
তথাপি না জানিল কেমন মায়াধর॥
হস্ত নাই পদ নাই একি শুনি কথা।
আদি অন্ত নাহি যার সে কেমন দেবতা॥
ধর্ম্ম পূজা কৈল কেবা পুত্র হোল কার।
এই কথা কহিবে মোরে করিয়া বিস্তার॥

কি বলিব আমারে বিধাতা নিদারুণ।
শত্রুর বদনে কিসে লাগে কালি চূণ॥
চাঁপাই সেবিতে তবে রঞ্জাকে পাঠাব
বার ভক্ত্যা লয়ে মণি সঙ্গে দিব॥
নাহি হোলে বৃথা কেন যে থাকে কপালে
এত শুনি সেতাই পণ্ডিত কিছু বলে॥
কহ রাণী মনে কিছু করেছ কামনা।
অবশ্য পূরাবে ধর্ম্ম মনের বাসনা॥
ধর্ম্মের সবাই বলে নাহিক শরীর।
তবে কিসে জন্মিল ভূপতি যুধিষ্ঠির॥
যোগেন্দ্র পুরুষ ধর্ম্ম সেই নিরঞ্জন।
সৃজন পালনকর্ত্তা প্রলয় কারণ॥
সেই ধর্ম্ম দেবতা অনন্ত মায়া ধরে।
ত্রিভুবনে তার মায়া কে বুঝিতে পারে।
ধর্ম্ম পূজা কোরে যে পেয়েছে পুত্রবর।
আমার বচনে রাজা অবধান কর॥
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা অমরা ভিতরে।
মদনা তাহার রাণী বিদিত সংসারে॥
আঁটকুড়া বোলে তার মুখ নাহি দেখে।
রাজা রাণী বনবাসী হইল সেই পাকে॥
রাজ্য দেশ রহিল রতনসিংহাসন।
উদাসীন রাজা রাণী ভ্রমেন কানন॥
কি করিবে ধন জনে কিসের সংসার।
সেইজন অভাগিনী পুত্র নাহি যার॥
গণ্ডার মহিষ ব্যাঘ্র যেখানে বিস্তর।
মরিতে চলিল দোঁহে অরণ্য ভিতর॥
রাণী সঙ্গে বনে ভ্রমে হরিশ্চন্দ্র রায়।
সিংহ ব্যাঘ্র বন্য জন্তু কেহ নাহি খায়॥
নিরাহারে দুই জনে করয়ে ভ্রমণ।
রাণী বলে শুন রাজা মোর নিবেদন॥
বনবাসে কতকাল এমন বাঁচিব।
কোন দেবতার বরে কোলে পুত্র পাব॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাইল বলুকার তীর।
শানবাঁধা ঘাট দেখে রতনমন্দির॥
রাজা রাণী উত্তরিল বলুকার তীরে।
মুনিকন্যা সকল ধর্ম্মের পূজা করে॥

ধর্ম্ম পূজা করি সবে কুটীরে গমন।
হরিশ্চন্দ্র মদনা সহিত দরশন॥
একে সে মুনির কন্যা রূপে বিম্বাধরী।
বচনে পীযুষ খসে চলন মাধুরী॥
ধর্ম্মটিকা কপালে কাঞ্চন বাটি হাতে।
হরিশ্চন্দ্র মদনা সহিত দেখা পথে॥
রাজা রাণী রূপেতে কানন কৈল আলা।
শ্রীরাম জানকী কিম্বা কিশোরী কমলা॥
কন্যাগণ চরণে মদনা প্রণিপাত।
হরিচন্দ্র প্রণাম করিয়ে যোড় হাত॥
পরিচয় তখন মাগিল কন্যাগণ।
যুবতী পুরুষ সঙ্গে কাননে কেমন॥
হরিচন্দ্র মদনা তখন কিছু কয়।
যোড় হাতে সম্মুখে বচন সুধাময়॥
রাজারাণী ভ্রমি মোরা অরণ্য ভিতর।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাড়ী অযোধ্যানগর॥
হস্তী ঘোড়া রাজপাট যত দাস দাসী।
সকল ছাড়িয়া মোরা হলাম বনবাসী॥
অতুল সম্পদ বটে নাহিক কুমার।
চন্দ্র বিনে শর্ব্বরী যেমন অন্ধকার॥
পুত্র বিনে সংসারে হলাম অভাগিনী।
বিস্তর কাঁদেন তবে রাজা আর রাণী॥
হাড়ি না দেখিল মুখ আঁটকুড়া বলি।
তেকারণে সকলে দিলাম জলাঞ্জলি॥
কন্যাগণ বলে শুন হরিশ্চন্দ্র রাজা।
বল্লুকায় দুই জনে কর ধর্ম্ম পূজা॥
মহাদাতা হরিশ্চন্দ্র প্রতাপে কেশরী।
মান্ধাতার কন্যা তুমি মদনা সুন্দরী॥
যাহ যাহ বল্লুকায় কর ধর্ম্ম পূজা।
পুত্রবর অবশ্য দিবেন ধর্ম্ম রাজা॥

উপদেশ পেয়ে রাণী করিল গমন।
ধর্ম্ম পূজা বল্লুকাতে কৈল আরম্ভন॥
রাজহংস ভাসে কত বল্লুকার জলে।
কত শত সন্ন্যাসী তপস্যা করে কূলে॥
সোণার মন্দির কিবা দূরে যায় দেখা।
একমনে পূজে যেবা অর্জ্জুনের সখা॥
করিল বনে পূজা বল্লুকার তীরে।
রাজারাণী তপস্যা করিল অনাহারে॥
তপস্যা করিল ধ্রুব কৃষ্ণের কারণ।
শঙ্কর পূজিল যেন রাজা দশানন॥
অনেক করিল পূজা ধর্ম্মের উদ্দেশে।
সাক্ষাৎ হইল প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে॥
বর মাগে হরিশ্চন্দ্র জানি ধর্ম্মরায়।
হরিশ্চন্দ্র মদনা ধরিল রাঙ্গা পায়।
অনেক করিলাম পূজা কহিব সত্বর।
কৃপান্বিত হোয়ে প্রভু দেহ পুত্রবর॥
ধর্ম্মরাজা বলে যদি পুত্রবর নিবে।
আমার সাক্ষাতে এক শপথ করে যাবে॥
লুইচন্দ্র নাম থুবে হইলে সন্তান।
বার বৎসরের কালে দিবে বলিদান॥
হরিচন্দ্র রাজা বলে এ কথা কেমন।
মদনা রাণীর পানে চাহিল রাজন॥
রাণী বলে সে কথা অনেক দিন আছে।
অঙ্গীকার কোরে লই ঠাকুরের কাছে।
বর দিয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন মায়াধর।
রাজা রাণী পাইল রাজ্য অমরা নগর॥
দেশেতে সকল গ্রামে পাঠান লিখন।
ঘরে ঘরে ধর্ম্ম পূজা করান রাজন্॥
কতদিন বই রাজার সন্তান জন্মিল।
আঁটকুড়া বাদ তখন রাজার ঘুচিল॥

ক্রমশঃ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে আর্য্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রন্থাবলী অতুলনীয়—বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাহিত্য-বিষয়ক।

১। **সাহিত্য-চিন্তা**। এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্য্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **কাব্যচিন্তা**। রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **কাব্যসুন্দরী** দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সৃষ্টিচাতুর্য্য এবং সুন্দরীগণের চরিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সামাজিক।

৪। **সমাজতত্ত্ব**। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

৫। **সমাজচিন্তা**। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ধর্ম্মবিষয়ক।

৬। **দেবসুন্দরী**। হিন্দু দেবদেবীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৭। **হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ**। প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হওয়াতে এই গ্রন্থ সর্ব্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে। মূল্য ১।০ মাত্র।

৮। **সৃষ্টিবিজ্ঞান**। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থপ্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২০১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৭ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল,

এফ, আর, জি, এস।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'সাহিত্য-সভা' কর্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্য-সভা।

PATRON :

SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.—*Lieutenant-Governor, Bengal.*

VICE-PATRONS :

THE HON'BLE MR. H. H. RISELEY, C. I. E.—*Secy. Government of India*
THE HON'BLE MR. A. EARLE, I. C. S.—*Director of Public Instruction, Bengal.*

SIR A. PEDLER, ESQ., F.R.S. C.I.E.

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র,
সহযোগী সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য সভার সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা।

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

বাসন্তী।

অয়ি জোছনারূপিনী সুন্দরী কনক-প্রেম-প্রতিমা ;
এলান কুণ্ডল মরালী জিনি সুচারু গ্রীবা-ভঙ্গিমা।
আকুলি ব্যাকুল চঞ্চল চরণ,
খঞ্জননিন্দিত চকিত চলন,
অধীরে শিথিল দুকূল বসন,
কপোল-পুলিনে ভ্রমর গুঞ্জন,
উছলে রূপ গরিমা ;
অধরে বিকাশি জোছনা হাসি,
পরশে কুসুম ফুটিছে রাশি,
চামেলী বকুল যূঁথিকা মিশি,
সৌরভে চুমিত হতেছে দিশি,
সান্ধ্য গগনে চন্দ্রমা।
গাহিছে গীতিকা তটিনী সনে,
বীণা বাজিছে সুদূর কাননে,
ধ্বনিছে মধু চন্দন পবনে,
সরম খেলিছে নয়ন-কোণে,
নব-অরুণ রক্তিমা।
নির্ঝর মুকুরে নীলিম নয়নে,
কুঞ্চিত চিকুরে চম্পক বরণে,
কুসুমিত সিঁথি কে তুমি ললনে,
প্রেমের অতিথি পঙ্কজ বদনে,
চিত্র-মাধুরী-পূর্ণিমা।
চন্দ্র-করোজ্জ্বল নিভৃত নিশীথে,
পুষ্পিত গুঞ্জিত অটবিত পথে,
কোকিল-কূজন নব-বধূ-সাথে,
মদির-অলস মুগ্ধ মনোরথে,
ফুল্ল যৌবন কম্প্র ফোয়ারাতে বুঝি তুমি অনুপমা ;
মধুমুখী বিনোদিনী বিধাতা গৌরব রূপ-মহিমা।

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু

শ্রীহট্টের গ্রাম্য-ভাষা।

অনেক দিন শ্রীহট্ট বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসামের শাসানাধীন হইয়াছে। শ্রীহট্টের ভাষা পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। ইহাদের বিবাহ প্রভৃতি অল্পপরিমাণে ময়মনসিংহের অতি পূর্ব্বাঞ্চলে ও কুমিল্লা জেলার কোন কোন স্থানে সংঘটিত হয়। কিন্তু নিজ জেলাতেই ইহাদের বিবাহাদির আদান প্রদান বেশী হয়। আসামের অপরাপর জেলার সঙ্গেও হইয়া থাকে। শ্রীহট্টের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। শ্রীহট্টের লিখিত ভাষার সহিত গ্রাম্য ভাষার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে পথকরের সমধিক বৃদ্ধি হেতু শ্রীহট্ট অনেকাংশে বিধ্বস্ত হইয়াছে। শ্রীহট্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদিও ভগ্ন করা হয় নাই, কিন্তু পথকরের জ্বালাতনে গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতিক্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষাই সংস্কৃতের ভাঙ্গা ভাষা, তবে প্রদেশবিভাগে সুবিধা বুঝিয়া উচ্চারণের প্রভেদ হইয়াছে। বহুপূর্ব্বে, দেশে রেল বা ষ্টীমার ছিল না এবং এখনকার মত সকল প্রদেশেই লোকের যাতায়াত ছিল না; তজ্জন্য যেখানে যে ভাষা ও উচ্চারণ সুবিধা, সেইরূপই প্রচলিত হইয়াছে। এখনকার দিনে হইলে ভাষা অনেকটা মার্জ্জিত হইত। শ্রীহট্টের ভাষা এক প্রকার শ্রীহীন উচ্চারণ, ঐ ভাষা তদ্দেশবাসীরা অন্যত্র গিয়াও প্রায় পরিত্যাগ করিতে পারে না। এখানকার শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনেকেই স্বকীয় গ্রাম্য ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীহট্টের সঙ্গে পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার নিকট সম্বন্ধ। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের পূর্ব্ব সীমায় অনেকটা শ্রীহট্টের ভাষা প্রচলিত। এই সকল উচ্চারণ না শুনিয়া লিখিয়া প্রকাশ করা সহজ নহে।

শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণে ঢাকা গ্রামে ৺জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে ভগবান্ চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। এখনও সে গ্রামে নানাবিধ বৈষ্ণব-উৎসবে বিশেষ আমোদ হইয়া থাকে। এ জেলার বিতাঙ্গল নামক স্থানে এক বিশেষ প্রসিদ্ধ আখ্ড়া আছে। এখানে বহু বৈরাগী বাস করে। এই সকল বৈরাগী উদাসীন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবী রাখার প্রথা না থাকায় তাহাদের দ্বারা পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম কলঙ্কিত হয় নাই, পরন্তু প্রকারান্তরে বৈষ্ণব বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাদের ছেলে হয় না, এরূপ স্ত্রীলোক তাহার প্রথম পুত্রকে এই আখড়ায় দান করিবে বলিয়া মানসিক করে, ও সন্তান হইলে প্রথমটীকে দান করে। এই জন্যই আখড়ায় বৈষ্ণব-সংখ্যা সর্ব্বদাই অনেক থাকে। ইহারা আখড়ার সেবা চালায়, ভিক্ষা করিয়া যাহা পায়, তাহাও তাহারা আখড়ায় দান করে। মুসলমানেরাও অতি শিশু পুত্রগুলিকে এই রূপে দান করিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট জেলা কমলা নেবু, চা ও চূণের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সকলের ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে এখন নানাদেশীয় লোক আসিয়া বাস করিতেছে। শ্রীহট্টে বড় বড় বিল বা হ্রদ আছে। এখানকার অধিকাংশ স্থান ছোট ছোট পাহাড়ে পরিবৃত। শ্রীহট্ট সহরেও অনেক পাহাড় দৃষ্ট হয়। এখানে আর একটা ব্যবসায় (মধুর ব্যবসায়) আছে, অল্প মূলধনে তাহাতে লাভ বেশ। কমলা নেবুর সময় কমলামধু প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। কোন কোন

স্থানে দুর্লভ পদ্মমধুও অনেক সময় পাওয়া গিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য-ভাষার কতকগুলি ক্রিয়াপদ।

আইমু ... ... আসিব।
যাইমু ... ... যাইব।
আইব ... ... আসিবে।
আইছিল ... ... আসিয়াছিল।
গেহলায় ... ... গিয়াছিলেন।
করিছিলায় ... ...করিয়াছিলেন।
হুনি যাও ... ... শুনিয়া যাও।
হুতি রইলায় ... শুইয়া রহিয়াছেন।
মাতিও না ... ... ক্ষেপিও না।
পারলায় ... পারিল, পারিলেন।
যাইল্ ... ... যান।
আইল্ ... ... আসেন।
ডাইও ... ... ডাকিও।
গদাইব ... ... মারিব।
বউখা ... ... বসুন।
যাউখা ... ... যান।
আউখা ... ... আসুন।
দেখুয়া ... ... দেখুন।

কতকগুলি বিশেষ্যপদ।

আত্তি ... ... হাতী।
গুড়া ... ... ঘোড়া।
পাটখরি ... ... পাকাঠি।
হুমুর ... ... সরিসা।
মুং দাইল ... ... মুগ ডাইল।
পিড়ী ... মাচিয়া, চেয়ার।
পাখান ... ... চৌকা, চুল্লী।
পুরইন ... সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।
বিচুইন ... ... পাখা।
মেকুর, বিলাই ... ... বিড়াল।
পায়্ ... ... কবুতর।
আননাশ্ ... ... আনারস।
হুঁয়া ... ... শশা।
ডুগী ... ... ডেঙ্গা, ডাঁটা।
ঝেঙ্গা ... ... ঝিঙ্গে।
গুয়া ... ... সুপারি।
তেতৈ ... ... তেঁতুল।
হুরুরতা ... ...ছেলে, মেয়ে।
পুরা ... ... ছেলে, পুত্র।
পুরী ... ... মেয়ে।
কাকৈ ... ... চিরুণী।
তাগা ... ... ঘুন্সী।
রুক্ ... ... কাষ্ঠ।
পুঙ্গিরপুয়া ... এক প্রকার গালি।
হউ ... ... সেই।
এওলা ... ... আমলকী।
নালিয়া ... ... পাট।
অর্ত্তকী ... ... হরিতকী।
বিয়া ... ... বিবাহ।
হালা ... ... শালা।
কুহিলা ... ... কোকিল।
ঘরৎ ... ... ঘরেতে।
নাও ... ... নৌকা।
কিতাইন্ ... ... কি।
ছমাসৎ ... ... ছয় মাসেও।
জাং ... ... জঙ্ঘা।
উরাৎ ... ... উরু।
ডাবা ... ... হুকা।
বাগ ... ... বাঘ।
হুয়র ... ... শুকর।
হিয়াল ... ... শেয়াল।
কাউয়া ... ... কাক।
ট্যাহা, টেকা ... ... টাকা।
শুকি ... ... শিকি।
পইসা ... ... পয়সা।
বাই ... ... ভাই।
ধাইর ... ... বারান্দা।

কিয়ের লাগি ... ... কি জন্য।
ছেইছ্ ... ...বারান্দার নীচ্।
মুত ... ... প্রস্রাব।
হাপ ... ... সাপ।
হাতার ... ... সাঁতার।
উড়া ... ... টুকরি।
খেড় ... ... খড়।

মাসের নাম।

বৈশাগ ... ... বৈশাখ।
জেঠ্ ... ... জ্যৈষ্ঠ।
আশার ... ... আষাঢ়।
সাউন ... ... শ্রাবণ।
ভাদর ... ... ভাদ্র।
আশিন ... ... আশ্বিন।
কাত্তিক ... ... কার্ত্তিক।
আগুণ, আঘন ... ... অগ্রহায়ণ।
পুষ ... ... পৌষ।
মাগ ... ... মাঘ।
ফাগুন ... ... ফাল্গুন।
চৈৎ ... ... চৈত্র।

বারের নাম।

রব্বার ... ... রবিবার।
সুম ... ... সোমবার।
মঙগল ... ... মঙ্গলবার।
বুইদ ... ... বুধবার।
বিস্যুইদ ... ... বৃহস্পতিবার।
শুক্কুর ... ... শুক্রবার।
হনি ... ... শনিবার।

গরু বাঁধা ও হল কর্ষণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শব্দ।

পাগা ... গরু বাঁধার দড়ি।
দড়া ... ... দড়ি, রশি।
জোয়াল ... গরুর কাঁধের কাষ্ঠ।
তেতে ... বক্র ও শীঘ্র যাওয়া।
হেরের ... শীঘ্র যাওয়ার বুলি।
হরাইয়া ... ... সিধা যাওয়া।
পাজান ... ... জাবর কাটা।
ডেকা ... ... ষাড়।
ডেকি ... ... বকন।
চেনা ... ... গো প্রস্রাব।
দামা ... ... বলদ।
পর অইছে ... প্রসব হইয়াছে।

শ্রীহট্টের কতকগুলি প্রচলিত শব্দ।

এর ... ... হের, দেখ।
এচ্চু ... ... হের, চাও।
এদ্রু, উদ্রু ... ... এই যে।
ছাওয়াল, ছালিয়া ...ছেলে, বালক।
বইন ... ... ভগ্নী।
দেয়র ... ... দেবর।
ভাউর ... ... ভাসুর।
জান ... দেবর বা ভাসুর-পত্নী।

এইরূপ মায়ে, তাঐ, পুতুরা, হউর, বেয়াইন ইত্যাদি।

সকল স্থানেই হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। শ্রীহট্টেও সেইরূপ। সামান্য বা ইতর মুসলমান শ্রেণীর ভাষা অতি কদর্য্য, অপর জেলার লোকেরা সহসা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইবে না।

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং ঢাকা জেলা হইতে বহু লোক অনেক কাল হইল শ্রীহট্টে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা এক্ষণে শ্রীহট্টের ভাষার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট জেলায় দুগ্ধ ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এ জেলায় মৎস্য ও দুগ্ধ ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশী। বল্লাল-সেনের আমলে যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার অনু-শাসন অনুসারে চলিতে অসম্মতি প্রকাশ

করিয়াছিল, তাহারা পলাইয়া শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আসিয়াছিল। শ্রীহট্টে সেই সকল ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। তাহারা পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থ আনিতে পারে নাই। সুতরাং শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই দরিদ্র। এই সকল ব্রাহ্মণ নানা জেলায় সামান্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা অলস, কাজেই ইহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে না।

শ্রীহট্টের গোপগণ অনেকে ব্রহ্ম, শ্যাম, আকীয়াব প্রভৃতি প্রদেশে দধি, দুগ্ধের ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত তদ্দেশে বাস করিয়া থাকে।

শ্রীহট্টবাসীরা ভাষার উচ্চারণে হ স্থানে অ ও স স্থানে হ উচ্চারণ করিয়া থাকে। যেমন হস্তী স্থলে অস্তি ও সকল স্থলে হগল ইত্যাদি।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মাতব্বর শ্রাদ্ধ লোপ।

পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরে উত্তমরূপ দেখান হইয়াছে যে, তিথির দশক্ষয়ে শ্রাদ্ধ লোপ হয় এ কথা শাস্ত্র অনুসারে কাহারও বলিবার অধিকার নাই। তথাপি কুতর্ক নিবৃত্তি না হওয়ায় বিশেষ করিয়া দেখান যাইতেছে। রঘুনন্দন সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধবিষয়ে চারি প্রকার কালের বিধান করিয়াছেন। "রাত্র্যাদি পর্য্যুদস্তের কাল (১) কুতপাদি মুহূর্ত্ত পঞ্চক (২) রোহিণাদি মুহূর্ত্ত চতুষ্টয় (৩) দশমাদি মুহূর্ত্তত্রয় (৪) রূপ কাল চতুষ্টয়ং আপরাহ্ণিক শ্রাদ্ধে বিহিত প্রশস্ত প্রশস্ততর প্রশস্ত তমত্বেন বোধ্যম্" রাত্র্যাদীতর কালের নাম বিহিত কাল (১) অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ মুহূর্ত্তরূপ প্রশস্তকাল (২) নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ মুহূর্ত্তরূপ কাল প্রশস্ততর, (৩) দশম, একাদশ, দ্বাদশ মুহূর্ত্তরূপ কাল প্রশস্ততম কাল (৪)। ১

উভয় দিনে প্রশস্ততম কালে তিথির অপ্রাপ্তিতে ব্যবস্থা করিতেছেন। "উভয় দিনে মুখ্য কালালাভেতু পরদিনে গৌণাপরাহ্নাদিলাভাৎ তত্রৈবশ্রাদ্ধম্" উভয় দিনে মুখ্যকালে তিথি না থাকিলে পরদিনে গৌণাপরাহ্নাদিতে তিথি পাইলে সেই দিনই শ্রাদ্ধ করিবে। যদি গৌণাপরাহ্নে তিথি না থাকে, তাহা হইলে বিহিতকালে অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং দশক্ষয়ে বা রসক্ষয়ে শ্রাদ্ধ লোপের সম্ভাবনা নাই। ইহা লইয়া কোন আপত্তিই আসিতে পারে না, কিন্তু সমালোচক আদি পদটী ত্যাগ করিয়া 'গৌণাপরাহ্ণ লাভাৎ' এই পাঠ ধরিয়া গৌণাপরাহ্নে কদাচিৎ তিথির অলাভ সম্ভাবনা করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা আদিপদযুক্ত পাঠ দেখাইয়া সে আপত্তি নিরাস করিয়াছি এবং রসক্ষয়মতে ও সর্ব্বত্র গৌণাপরাহ্নে কর্ম্মযোগ্য তিথি পাওয়া যায় না, ইহা তিন, চারিটী উদাহরণ দ্বারা উত্তমরূপে দেখাইয়াছি, অতএব আদিপদ অবশ্যই বলিতে হইবে।" এক্ষণে বলিতেছেন, গৌণাপরাহ্নের

কিঞ্চিৎ অংশযুক্ত বিহিতকালের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া কেবল এক মুহূর্ত্তকাল তাঁহার মতে আদিপদ গ্রাহ্য, কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ হইলে রাত্র্যাদীতর কালই বিহিতকাল নাম ধারণ করিবে কেন? তাহা হইলে গৌণাপরাহ্নের কিঞ্চিৎ অংশযুক্ত বিহিতকালের কিঞ্চিৎ অংশই বিহিত কাল হইত, এই অসার কথা প্রমাণ করিতে একটী যুক্তি দেখাইয়াছেন। সেইটী এই "যেখানে ঘটের লাভ হয় না, অন্ন মাত্রের লাভ হইয়াছে, সেইস্থলে ঘটাদিলাভ হইয়াছে এ কথা কদাচ সঙ্গত হয় কি? সঙ্গত হয় না" দশক্ষয় মতে কোন দিনেই গৌণাপরাহ্নে লাভ হইবে না। প্রতি তিথিতে কেবল বিহিতকাল লাভ হইবে, এই নিশ্চয় করিয়াই উক্ত যুক্তি লিখিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার ভ্রম। দশক্ষয় মতেও কখন গৌণাপরাহ্ণ মাত্র লাভ হইবে, কখন বা গৌণাপরাহ্নের অংশযুক্ত বিহিতকাল লাভ হইবে। কোন অধ্যাপক মহাশয় ঘড়াদি বিদায় পাইয়া থাকেন। কোন স্থানে তাঁহার ঘড়া লাভ হয়। কোন স্থানে ঘড়া ও কাপড় দুই বস্তুর লাভ হয়। কোন স্থানে কেবল কাপড় লাভ হয়। কিন্তু ঘড়ার কাদাযুক্ত অথবা ঘড়ার কিঞ্চিৎ পিত্তলযুক্ত কাপড় লাভ না হইলেও তাঁহার ঘড়াদি লাভ হইয়া থাকে, এ কথা যেমন অসঙ্গত হয় না, সেইরূপ কদাচিৎ গৌণাপরাহ্নে কোন দিন তিথির অলাভ হইলেও "গৌণাপরাহ্লাদি লাভাৎ" এই হেতু অসঙ্গত হইবে কেন? সমালোচক মহাশয় রসক্ষয়েও গৌণাপরাহ্নে কদাচিৎ তিথির লাভ হয় না, ইহা কোন এক গ্রন্থের টিপ্পনে পাইয়াছেন।

"পূর্ব্বদিনে যৎকিঞ্চিদধিকৈকাদশ মুহূর্ত্তেগতে তিথেলার্ভঃ পরদিনে কিঞ্চিন্ন্যূনমষ্টম মুহূর্ত্তে তিথের্লাভঃ তদা পরদিনে এব" এই সন্দর্ভে দুইবার "তিথের্লাভঃ" ও কিঞ্চিন্ন্যূনং এই পদের অনুস্বার, ইহা স্মার্ত্তের লিখন নহে, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। এরূপ সংস্কৃত স্মার্ত্ত লিখিলে স্মার্ত্তকে কেহ পণ্ডিত বলিত না। শ্রাদ্ধতত্ত্বের যে সকল পুস্তক সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহার কোন পুস্তকেই ইহা নাই। আমরা পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরে চারিটী উদাহরণ দেখাইয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছি, তাহাই ইহাতে বলা হইয়াছে। আমাদের প্রথম উদাহরণটী ৪১ অংশ ২৫ কলা অক্ষাংশ দেশে ১।।০ দেড় দণ্ড মুহূর্ত্তবিশিষ্ট দিনের জন্য ছিল। কারণ সমালোচক ১।।০ দণ্ডে মুহূর্ত্ত স্বীকার করিয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। কাশ্মীর, রঙ্গপুর ও কলিকাতার জন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পর্শও করেন নাই, কাশ্মীরে রসক্ষয় মতেও ২৬ পল মাত্র তিথি গৌণাপরাহ্নে থাকিতে পারে, ইহা দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিপাতও হয় নাই। তিনি প্রথম উদাহরণটীই ধরিয়াছেন, তাহা যে দিন পূর্ব্বোক্ত দেড় মুহূর্ত্ত দেড় দণ্ডে হইবে, সেই দিনে কোন তিথি ৫ দণ্ড ৫৫ পল দিনশেষে আরম্ভ হইয়া পরদিন ১০ দণ্ড ৩৫ পল আছে, এরূপ কল্পিত হইয়াছিল। তিথির মান ৫৪ দণ্ড ধরা হইয়াছিল। সমালোচক দিনশেষে ৫ দণ্ড ৫৫ পল থাকিতে তিথির আরম্ভ এই অংশটুকু মাত্র লইয়া নিজ বাস-ভবনে চলিয়া গিয়াছেন, বিছানায় বসিয়া গুপ্তপ্রেশ পাঁজী খুলিয়া ঐ পাঁজীর পরমায় দিন বাহির করিয়া মিলাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "পরদিন তিথি ১০ দণ্ড ৩৫ পল থাকিবে কেন? ১৫ দণ্ড ১৫ পল অবশ্য থাকিবে। মুহূর্ত্ত ১ দণ্ড ৪৫ পলের কম কখনই হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে প্রতারণা করা অতি গর্হিত, যিনি একার্য্য করেন, তিনিই নিগ্রহস্থান ইত্যাদি, ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারের ক্ষমতা অধিক থাকিলে এইভাবের উত্তরই শুনিতে হয়। এক দেশের দ্রব্য অন্য দেশে বা বাড়ী লইয়া

গেলে এক প্রকার অপহরণ হয়! যে স্থানের জন্ত যাহা কল্পিত, তাহা সেই স্থানে রাখিয়াই সদসৎ বিচার করুন, তাহা হইলে আর কিছুই প্রতারণা দেখিতে পাইবেন না। ১০ দণ্ড ৩৫ পলই পরদিন তিথি থাকিবে। সে দেশে ত আর গুপ্তপ্রেশ নাই। সেথানে অক্ষাংশ ৪১ অংশ ২৫ কলা।

তিথি ক্ষয় বৃদ্ধিতে রঘুনন্দনের মনের ভাব লইয়া টানাটানি।

রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। এজন্য তিনি ক্ষয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে উদাসীন ইহা নিশ্চয় করাই কর্ত্তব্য। তিনি কর্ম্মের ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। তাহা দশক্ষয়ে ও রসক্ষয়ে সমান ভাবেই উপপন্ন হয়। সমালোচক মহাশয়, দশক্ষয়ে সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থার অনুপপত্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দশক্ষয়ে ব্যবস্থা হয়, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন। আমরা পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরে বলিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ সন্দর্ভের ভাবার্থ কল্পনা করিয়া রসক্ষয়বাদী বলিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে দশক্ষয়বাদীও বলা যায়। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "বাসর তৃতীয়াংশা প্রাপ্তৌ শ্রাদ্ধ লোপাপত্তেঃ" দিনের তৃতীয়াংশে উভয় দিনে তিথির অপ্রাপ্তি দশক্ষয়ে অনায়াসে হয়, রসক্ষয়ে মুহূর্ত্তের ভঙ্গ লইয়া কোন মতে সঙ্গত হয়। (পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরের ১১ পৃষ্ঠা দেখুন) একণে তিনি আর একটি সন্দর্ভ তুলিয়া রসক্ষয় প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহা এই যত্র পূর্ব্ব দিনে দিবা সার্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্রে অমাবস্যা পরদিনে সার্দ্ধ দশম মুহূর্ত্তমাত্রে তত্র চোত্তর দিনে কর্ম্ম যোগ্যামাবস্যা ন প্রাপ্যতে।"

এইটী উভয় দিনে কিরূপ তিথি থাকিলে কর্ম্মযোগ্য অমাবস্যার অভাব হইতে পারে; সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত। ইহা দ্বারা রসক্ষয় প্রমাণ হইতে পারে না। রসক্ষয়ের সহিত ইহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্ব দিনে ১॥০ মুহূর্ত্ত দিন থাকিতে অমাবস্যার আরম্ভ, পরের দিনে তাহা ১০॥০ দশ মুহূর্ত্ত মাত্র আছে। এরূপ স্থলে উভয় দিনেই কর্ম্মযোগ্য অমাবস্যার প্রাপ্তি নাই। এ ঘটনা দশক্ষয়েও হয়, রসক্ষয়েও হয়, সুতরাং রসক্ষয় নিশ্চয় কিসে হইবে? কিন্তু সমালোচক বলেন, দিন ত্রিশ দণ্ড। মুহূর্ত্তমান দুই দণ্ড। রাত্রিমান ত্রিশ দণ্ড। সুতরাং ৩ দণ্ড ও রাত্রি ৩০ দণ্ড এবং পরদিন সাড়ে দশ মুহূর্ত্তে ২১ দণ্ড, ইহার সমষ্টি ৫৪ দণ্ড, ইহাই রঘুনন্দন বলিয়াছেন; ইহা দেখিয়া রসক্ষয়ে সন্দেহ দূর করিতে বলেন। যিনি বিচার পূর্ব্বক দেখিবেন, তিনি অবশ্য বলিবেন, যেদেশে বৎসরের মধ্যে ত্রিশ দণ্ডে দিন, দুই বার হয়, এই দুই দিনের জন্যই কি স্মার্ত্ত ৫৪ দণ্ডে তিথি বলিয়াছেন। তাহা বলা উচিত নহে। কাজেই অন্য দিন আসিল তিথিরও ৫৪ দণ্ডের তারতম্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে রসক্ষয়েও তারতম্য ঘটিল। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ক্রান্তি ও অক্ষাংশভেদে দিনের প্রভেদ হয়। সেই সঙ্গে মুহূর্ত্তেরও প্রভেদ হইবে। স্মার্ত্তের সন্দর্ভে মুহূর্ত্ত শব্দ আছে, মুহূর্ত্ত ভেদে এই দৃষ্টান্ত লইয়াই সপ্তক্ষয়, অষ্টক্ষয় ইত্যাদি সুসঙ্গত হইবে। স্মার্ত্ত যে পরমায় তিথিমান লইয়াই এ উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। তাহার কোন প্রমাণ নাই, কাজেই ইহা সামান্য উদাহরণ মাত্র, ইহার দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না।

কাশ্মীরে উত্তর অয়নান্ত দিনে এই উদাহরণ-অনুসারে তিথির কত ক্ষয় সমালোচকের মতে হয় দেখা যাউক।

সে দিনে তথায় দিনমান ৩৫।৪২ রাত্রিমান ২৪।১৮ মুহূর্ত্ত ২।২৩ পূর্ব্বদিন সার্দ্ধ-১ মুহূর্ত্ত

রাত্রি	২৪।১৮
পরদিনের সার্দ্ধ দশ মুহূর্ত্ত	২৪।৫৯
তিথি মান=	৫২।৫১

দশক্ষয়ের বাকী কত আরও উত্তরে গেলে ক্ষয় বাড়িবে, দক্ষিণে গেলে কমিবে, এই অনিশ্চিত উদাহরণ দ্বারা রসক্ষয় প্রমাণ! তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষাশ্রিত শুদ্ধতিথির খণ্ডন! দেশের লোকের বিচার নাই। কাহাকে বলিব, কেই বা শুনিবে। লোকে বিচার শুনিতে কষ্ট মনে করে, কাজেই যাহা ইচ্ছা একটা প্রমাণ করিলেই হইল।

পারিভাষিক তিথি।

সমালোচক মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি স্মার্ত্তের "পারিভাষিক ক্ষয়োৎপত্তি পরন্তং ন তু তৎ বাস্তবং স্মৃতি জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিরোধাৎ" এই সন্দর্ভে পারিভাষিক শব্দ পাইয়াছেন। গোভিল, চন্দ্র সূর্য্যের যোগকে অমাবস্যান্ত বলিয়াছেন। সুতরাং তৎসম্বন্ধ বিশিষ্ট গত্যন্তরে রাশি দ্বাদশাংশ ভোগ কালকে স্মার্ত্ত ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রকারেরা অমাবস্যা স্থির করিয়াছেন। কাত্যায়ন,চতুর্দ্দশী শেষের দুই আনা এবং অমাবস্যার প্রথম চৌদ্দ আনা লইয়া এক অমাবস্যা বলিলেন। ইহা জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইল। সর্পে সর্পজ্ঞান যেমন সত্য, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান মিথ্যা, সেইরূপ গোভিলোক্ত অমাবস্যায় অমাবস্যাজ্ঞান সত্য, আর কাত্যায়নের অমাবস্যায় তাদৃশ জ্ঞান মিথ্যা। এই জন্য স্মার্ত্ত লিখিলেন, "ন তু তৎ বাস্তবং" কাত্যায়নের অমাবস্যা বাস্তব নহে। তাহাকে বাস্তব বলিলে জ্যোতিঃশাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়। জ্যোতিঃশাস্ত্র যাহাকে অমাবস্যা বলিয়াছে তাহাই সত্য, তদ্বিরুদ্ধ মিথ্যা। কিন্তু তাহা পারিভাষিক কাত্যায়ন তাদৃশ পরিভাষা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ ব্যবস্থাতে এ পরিভাষা মান্য হইবে। ইহা দেখিয়া আমরা কাত্যায়নের পারিভাষিক অমাবস্যাকে স্মার্ত্তের বাক্যের অনুবাদ করিয়া মিথ্যা বলিয়াছি। এখানে পারিভাষিক অর্থ মিথ্যা হইলেও সর্ব্বত্র পারিভাষিক অর্থ মিথ্যা হইবে কেন, তাহা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু দোষজ্ঞ সমালোচক এই সূত্রে বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন। তিনি কাত্যায়নের পরিভাষা অনুসারে সকল তিথিকে পারিভাষিক বলিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাত্যায়নের পরিভাষা লইয়া সকল তিথিকে পারিভাষিক বলিলে স্মার্ত্তের সকল ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়, এই যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অস্পৃষ্ট আছে। তিনি উক্ত প্রকারে পারিভাষিকতা স্থাপন ছাড়িয়া অন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে স্মার্ত্তের নামোল্লেখ নিতান্ত অসঙ্গত; স্মার্ত্তের কথা ছাড়িয়া তাঁহার নাম করিয়া পারিভাষিক বলিতে ইচ্ছা এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি বলিতে চান, লাক্ষণিক শব্দের ন্যায় পারিভাষিক শব্দেরও দুইটা অর্থ থাকে, একটা মুখ্যার্থ ও একটা পারিভাষিক অর্থ! কিন্তু প্রকৃতে তাহা নহে। শাস্ত্রকারেরা যখন পরিভাষা করিয়া পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাদের মুখ্যার্থের প্রতি দৃষ্টিই থাকে না। যেমন গণিত শাস্ত্রে, ত্রিভুজ, সমকোণ কেন্দ্র, বৃত্ত ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রে, ব্যাপ্তি, জাতি, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কোথাও মুখ্যার্থ সম্বন্ধ কিছু আছে কোথাও নাই। অনেক স্থলে মুখ্যার্থের অনুসন্ধান বিনাও পারিভাষিক শব্দ দেখা যায়। গণিতশাস্ত্রে কেন্দ্র, বলন ইত্যাদি ব্যাকরণ শাস্ত্রে কী, ঘী, গী, ঘী, ইত্যাদি। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় পারিভাষিক শব্দের যে লক্ষণ আছে, তাহার দ্বিতীয় লক্ষণ এইরূপ;—

যত্রার্থে যন্নাম আধুনিক সংকেতবৎ তদেব তত্র পারিভাষিকং। যথা পিত্রাদিভিঃ পুত্রাদৌ সংকেতিতং চৈত্রাদি। যথা বা শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ সিদ্ধ্যভাবাদৌ পক্ষতাদি।

আধুনিকেরা যে শব্দের যে অর্থে সঙ্কেত করিয়াছেন, সে শব্দ সেই অর্থে পারিভাষিক। যেমন পিতা পুত্রের নাম চৈত্র রাখিয়াছেন। অথবা যেমন নৈয়ায়িকেরা সিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা বলিয়াছেন। এই লক্ষণ অনুসারে সমালোচক মহাশয়ের কামাখ্যা নাথ নামটী পর্য্যন্ত পারিভাষিক হইল এবং "চন্দ্র সূর্য্যের তাৎকালিক গতি অনুসারে সাধিত রাশি দ্বাদশাংশ ভোগকাল তৎকালে তিথিপদের মুখ্যার্থ" এই যাহা নিজ হস্তে বিচার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, তাহাই পারিভাষিক হইতেছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত শাস্ত্রকার।

অর্কাদ্বিনিঃ সৃতঃ প্রাচীং যদযাত্যহরহঃ শশী।
ভাগৈর্দ্বাদশভিস্তৎস্যাত্তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনং॥

এই পরিভাষা দ্বারা তাদৃশ অর্থেই তিথি শব্দ সঙ্কেতিত করিয়াছেন। শাস্ত্রকার সঙ্কেতিতার্থকে পারিভাষিক বলিতে তাঁহার কোন আপত্তিই নাই, কিন্তু "যুগের প্রারম্ভ কালীন সূর্য্য চন্দ্রের গতি অনুসারে সাধিত রাশি দ্বাদশাংশ ভোগকাল ইদানীন্তনকালে তিথিপদের পারিভাষিক অর্থ" এই যাহা ধর্ম্মবিচারে প্রতারণার্থ লিখিয়াছেন, তাদৃশ সঙ্কেত কোন শাস্ত্রকারই করেন নাই। করিলে শাস্ত্রে থাকিত, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক সূর্য্য কোন টেলিগ্রাফ পাঠান নাই তবে স্বপ্নযোগে যদি সমালোচক মহাশয়কে বলিয়া থাকেন তাহা কে জানে। সুতরাং ইহা পারিভাষিক হইতে পারে না। যুগের প্রারম্ভের চন্দ্র সূর্য্য গতি অনুসারে তিথি যুগ প্রারম্ভেই থাকিবে, তাৎকালিক লোকেরই তাহা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার্য্য। এক সময়ের গতি লইয়া অন্য সময়ে কাল নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। যেমন বর্ত্তমান দিনে বর্ত্তমান সূর্য্যের গতি অনুসারে যখন সূর্য্য ঠিক স্বদেশের যাম্যোত্তর বৃত্তে আইসে, সেই সময়েই রঘুনন্দন স্মার্ত্তকথিত আবর্ত্তন কাল। তাহা যুগপ্রারম্ভের গতি অনুসারে কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে? এইরূপ এক সময়ের গতি লইয়া অন্য সময়ে তিথ্যাদি গণনা করিয়া পঞ্জিকা নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদি বলেন, আমার ইচ্ছা, আমি এইরূপ আঁক কাটিয়া খেলা করিব। তাহার উত্তর কে দিবে? যদি সত্যযুগের প্রারম্ভের গতি লইয়া বর্ত্তমান সনের পঞ্জিকা হইত, তাহা হইলে লোকে একখানি পঞ্জিকা করিয়া চিরকাল রাখিয়া দিত। সকল লোকেই বলিত যে, এই আমার পূর্ব্বপুরুষের পঞ্জিকা। ইহাতে যে মাসের যে তারিখে যে তিথি আছে আমি তাহাই মানিব। এরূপ হইলে আর প্রতি বৎসর নূতন পঞ্জিকার আবশ্যক হইত না। সকলেই জানেন যে, গত বর্ষের পঞ্জিকা লইয়া বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য চলে না। বর্ত্তমান বর্ষে সূর্য্যচন্দ্রাদির গতি যেরূপ হয়, তদনুসারে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে হয়। তখন সত্যযুগের প্রারম্ভের গতি লইয়া কিরূপে কার্য্য চলিবে? বর্ত্তমান গতি অনুসারেই স্বদেশে সূর্য্যের উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি হইয়া থাকে, সত্যযুগের প্রারম্ভের গতি অনুসারে নহে। বর্ত্তমান উদয়াদির সহিত তিথ্যাদির নির্দ্দিষ্ট নিয়ত সম্বন্ধ আবশ্যক। সত্য যুগের প্রারম্ভের গতির সহিত বর্ত্তমান উদয়াদির সম্বন্ধ না থাকায় কাল নির্ণয় কিরূপে হইবে? কাল নিরূপক তাদৃশ ঘড়ি, যাহা সত্য যুগের প্রারম্ভকালিক গতির সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহা কে নির্ম্মাণ করিয়া দিবে এবং যুগাদিতে যাইয়া কেইবা তাহা মিলাইয়া আনিবে। রঘুনন্দনের পুস্তকে কোন স্থানে সত্য যুগের প্রারম্ভকালিক

গতি লইয়া তিথি গণনা করিতে বলে নাই। সমালোচক মহাশয় তাঁহার পুস্তক হইতে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ সৃষ্টিছাড়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন কোথা হইতে তাহা বিচারক মহাশয়েরাই অনুসন্ধান করিবেন। ক্রমশঃ

শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

অদ্বৈতবাদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিলেই অদ্বৈতবাদের বিবিধ মণিখচিত অতুলনীয় প্রাসাদের উপসর্পণ অসঙ্গ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মার পরোক্ষাপরোক্ষ উভয় বিধ অনুভূতিই উহার অন্তর্গত। "দ্বয়োর্ভাবঃ দ্বিতাদ্বিতৈব দ্বৈতমিতি স্বার্থে অণ্‌ নাস্তি দ্বৈতং যত্র তদদ্বৈতং।" ফলতঃ দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববৎ ইহা অদ্বৈত পদের শব্দবোধ, অর্থাৎ যাহাতে দ্বিত্বসংখ্যা নাই, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অদ্বৈত পদের অর্থ। যাহাতে দ্বিত্বসংখ্যা থাকে না, তাহার ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও হইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্ম যেরূপ দ্বিত্বসংখ্যাশূন্য, তদ্রূপ ত্রিত্বাদি সংখ্যাও তাঁহাতে স্থান পায় না। তিনি কেবল একত্বেই সমলঙ্কৃত। এই স্থলে অনেকে এরূপ আক্ষেপ করেন যে, অদ্বৈত বলাতেই দ্বৈত সিদ্ধ হইল, কেন না অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগি জ্ঞান কারণ। ইহার উত্তরে নিবেদন করা যাইতে পারে যে, ভ্রমপ্রমাদ বিবরণ প্রতিযোগি জ্ঞানই অভাবজ্ঞানের কারণ, একমাত্র প্রতিযোগি প্রমা নহে; অজ্ঞানি সমাজের ভ্রান্তিসিদ্ধ দ্বৈতরূপে প্রতিযোগী অধিকার করিয়াই অদ্বৈত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং অদ্বৈত শব্দ দ্বারা দ্বৈতভ্রান্তিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেরূপে অদ্বৈত শব্দে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তদ্রূপ দ্বৈতশব্দ অধিকার করিয়া অশনি দৃঢ় আক্ষেপ হইয়া থাকে, যে দ্বিত্ব সংখ্যা সিদ্ধি একত্ব সংখ্যা সিদ্ধিসাপেক্ষ। একত্ব সংখ্যার উপর যে দ্বিত্বাদি সংখ্যা নির্ভর করিতেছে, ইহা পঞ্চম বর্ষের বালক পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে; সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বাক্য প্রয়োগ করা নিষ্ফল। এক্ষণে পাঠকগণ অবধান করুন যে, দ্বৈত বলাতেই অদ্বৈত প্রমাণিত হইয়া যায়। একত্বই বহুত্বের মূল, একত্বই বহুত্বের প্রলয়। একত্ব ব্যতিরেকে বহুত্বই অলীক হইয়া পড়ে। আমাদের সম্মুখে এই যে নানাপ্রকার বস্তু প্রতিভাত হইতেছে, এইগুলির মূলস্বরূপে একত্ব। একত্বই বহুরূপী হইয়া আমাদিগের আগন্তুক বেশের চমকে ভুলাইয়া ফেলিয়াছে। আবার একত্বই বহুত্ব হইতে আমাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। একত্বের সম্যক্‌ জ্ঞান হইলেই বহুত্ব বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ইহারই পশ্চাতে সেই চিৎপ্রভালোকিত দিব্যধাম মহানির্ব্বাণ। উহাতে উপনীত হইলে পুনর্ব্বার সংসারাবর্ত্তে পতিত হইতে হয় না, পুনর্ব্বার ত্রিতাপের দুর্ভেদ্য দুর্গে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না। বস্তুতঃ উহা সুখরূপ নিত্য পরম ধাম। এই কারণে মুমুক্ষুবৃন্দ ঐ ধাম প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তর

ব্রহ্মাভ্যাসে তৎপর হয়েন। তাঁহারা অদ্বৈত ব্রহ্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ সংস্থতিরূপ মহারণ্য দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ে বাক্যাবলীর ব্যবহার কেবল মার্গ প্রদর্শনার্থই হইতে পারে, কারণ শব্দশক্তি সসঙ্গ বস্তুতেই আবদ্ধ। উহা কিছুতেই মায়িক সম্বন্ধ অতিক্রম করিতে পারে না। যেরূপ শব্দ বৃত্তিরূপাশক্তি ত্রিবিধ ভেদশূন্য ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারে না, সেইরূপ তদ্‌বৃত্তি লক্ষণাও তাঁহাকে বিষয় করিতে অক্ষম বলিয়াই বোধ হয়, কেন না, লক্ষণার অর্থ শক্য সম্বন্ধ, যথা গঙ্গায়াং ঘোষ এই স্থলে গঙ্গাপদের তীরে লক্ষণার অর্থ গঙ্গাপদের শক্যার্থে যে প্রবাহ তীরের সহিত তাহার সামীপ্যরূপ সম্বন্ধ। এইরূপে শক্য সম্বন্ধ অসঙ্গ ব্রহ্মে মানিলে তাঁহার অসঙ্গত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ বিশিষ্ট ও উপহিত চৈতন্যই শক্তি ও লক্ষণার গম্য, শুদ্ধ চৈতন্য এই উভয়েরই পরপারে অবস্থিত। মহাবাক্যকে যে শাস্ত্রে ব্রহ্ম প্রমার করণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন মুমুক্ষুর মনে ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিশেষ উৎপন্ন হয়, আর ঐ বৃত্তি ব্রহ্মাবরণ ভঙ্গ করিয়া ফেলে, পশ্চাৎ বারিদপটলীর অপগমে যেরূপ অংশুমালী স্বয়ংই প্রকাশমান হন, তদ্রূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাত্মা স্বতই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে মহাবাক্য কেবল ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিশেষ দ্বারা আবরণ ভঙ্গরূপ ফল উৎপন্ন করে। পরন্তু অন্যান্য জড়বস্তু যেমন তদাকার বৃত্তিস্থ চিদাভাস দ্বারা প্রকাশিত হয় স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম তদ্রূপ প্রকাশিত হয়েন কৈ ? যদ্যপি একমাত্র সমাধি সংবেদ্য, মায়াতীত নিষ্কল, ব্রহ্ম বাক্‌শক্তির অনধিগম্য।, তথাপি সমাধির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থার সাক্ষীভূত, সোপাধিক ব্রহ্মের বর্ণনা বাক্য দ্বারা হইতে পারে, এই জন্য ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশকে নিষ্ফল বলা যাইতে পারে না। আবহমানকাল হইতেই ব্রহ্মোপদেশ সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা যদি অজাগলস্তনবৎ ব্যর্থ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইত, তবে কখন মহানুভাব মহর্ষিরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা সমাধিতে স্বয়ং স্বপ্রকাশদেবের উপলব্ধি করিয়া ব্যুত্থান অবস্থায় কখন তাঁহার আনন্দ সন্দোহনী স্মৃতিতে মগ্ন হইয়া যাইতেন, কখন করুণা পরবশ হইয়া স্মৃতিলব্ধ ঐ পরমারাধ্য দেবের উপদেশ অধিকারীর প্রতি করিতেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা নিরন্তর স্বরূপানুভূতি ও অনুভূত মহাপ্রাণের স্মৃতিতেই বিভোর হইয়া থাকিতেন, স্বল্পকালের জন্যও মায়িক জগতের দিকে দৃষ্টি দিতেন না, তবে আমাদের উদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িত। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই থাকিতাম। কখন জ্যোতির আভাস পাইয়া মানবজন্ম সফল করিতে পারিতাম না।

এই বিষয়ে অনেক আপাতদর্শীরা আপত্তি করিয়া থাকেন যে, বীতরাগ মহাপুরুষগণের সর্ব্বদাই ভজন করা উচিত, কেন অসার বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক তাঁহারা অমূল্য সময়ের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও সরস্বতীদেবীকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই, অথবা মালাজপ করিতে করিতেই শ্মশ্রু পলিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কি সর্ব্বদাই ভগবানের অস্পন্দ প্রণয়ানন্দে ডুবিয়া থাকেন? আমাদের কঠোর বিবেক ত ইহাই উপদেশ করে যে, বৈষয়িক চর্চ্চা অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, বিধাতা যাঁহাদিগকে মেধা প্রতিভা ও

অধ্যবসায় প্রভৃতি রত্নে বঞ্চিত বা বঞ্চিত-প্রায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাই বিদ্যার্জনে তটস্থ হইয়া ভজনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভগবদুপাসনা যে পরম উপাদেয় ও শান্তি নিলয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা যদি বিবেকপ্রণোদিত না হইয়া স্বেচ্ছাচারচালিত হয়, তবে হিতে বিপরীতই ঘটিয়া উঠে। উক্ত ব্রহ্মোপদেশ সম্বন্ধে ইহা বিবেচ্য যে, যিনি কদাপি ব্রহ্মসংদর্শনের অনাময় সুখ সংভোগে অবশ হইতে পারেন নাই, কেবল পুস্তকের পত্রোদ্ঘাটনেই সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি বাক্‌শক্তিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হউক না কেন কখন তাঁহার উপদেশে শ্রোতৃবর্গের প্রাণ শীতল হইবে না, কখন তিনি সমাজের আন্তরিক ভক্তিমাল্যে অলঙ্কৃত হইতে পারিবেন না, কেবল ধন্যবাদ লাভেই তাঁহার সন্তোষবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ স্বরূপানুভূতির নির্দ্দিষ্ট সাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পুস্তকের ভর-সায় থাকিয়া বাক্যের ছড়াছড়ি করিলে আপনার বা অপরের আশানুরূপ অভ্যুদয় সংসাধন করিতে পারা যায় না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির জড়তা বিদূরিত হয় এবং কুসংস্কার একমুখীন আগ্রহ ও সংকীর্ণ ভাব আসিয়া তাণ্ডব দেখাইতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে পরাচাপরাচেতি" (পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা জানিয়া লইবে) "নাবেদ বিমুনতেতং বৃহন্তং" (বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই ভূমা ব্রহ্মকে জানিতে পারে না)।

ব্রহ্মানুভূতির নিমিত্ত বিদ্যা ও সাধন উভ-য়েরই আবশ্যকতা রহিয়াছে। যিনি শাস্ত্র জলধি মন্থন করিয়া শুদ্ধ প্রজ্ঞা ও উদারতা রত্নে শোভমান হইয়াছেন এবং বহিরঙ্গ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অন্তরঙ্গ নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে মনো-বৃত্তি অন্তর্মুখ করিয়াছেন, তিনিই মহেন্দ্র দুর্লভ অনঘ ব্রহ্ম সন্দর্শনে অধিকারী, তিনিই স্বরূপ সম্বেদন স্পর্শে বিভোর হইয়া মায়িক জগত ভুলিতে পারেন। অনেকে স্বকীয় মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, সাধনে অগ্রসর হইলে স্বতঃই বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও মন উদার হইতে থাকে, সুতরাং তন্নিমিত্ত শাস্ত্রাধ্যয়নের কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, তাহাদের সাধ-নের অর্থ কি? যদি ইহার উত্তরে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই প্রযুক্ত হয়, তবে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত এই সাধনানুষ্ঠান অতীব অসম্ভব। মনে কর, আচার্য্য উপদেশ করিলেন "তত্ত্বমসি" ইতঃপূর্ব্বে যাহার উপ-দিষ্ট বিষয়ে অন্ততঃ পরোক্ষজ্ঞান ছিল না, সে কি ইহা শুনিবামাত্র জীবব্রহ্মের একত্ব বুঝিয়া লইতে পারে? অভিনব লৌকিক বস্তু সম্বন্ধে শ্রবণমাত্রে পরিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোকাতীত অসঙ্গ ব্রহ্মকে একবার শুনিয়া হৃদয়ে ধারণা করা শুকদেবের ন্যায় উত্তম অধিকারী ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়, এবং শ্রবণমাত্রেই যদি ব্রহ্মের অপরোক্ষানু-ভূতি সুসম্পন্ন হইয়া যায়, তবে মনন ও নিদিধ্যাসন বিধি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি বলা যায় যে, জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য মনন ও নিদিধ্যাসনের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তবে ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, অদৃঢ় জ্ঞান দ্বারা সংসৃতি বন্ধন ছিন্ন হয় না বলিয়া উহা পরোক্ষজ্ঞানসদৃশ নহে ত আর কি? পক্ষান্তরে অনধীত শাস্ত্রসাধকের পক্ষে মনন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করা অতীব কঠিন, কারণ, তাহা যুক্তিতর্কসাপেক্ষ। কোন কোন মহোদয় অধ্যয়নের অর্থ অক্ষরে চক্ষু সংযোগ পূর্ব্বক অর্থবোধই বুঝিয়া থাকেন; তাঁহাদের

মতে অঙ্কের অধ্যয়নই অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়নের অর্থ শব্দবোধ। ইহার সাধনপ্রণালী বিভিন্ন। অনেকে পুস্তক দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। কতিপয় আবার পণ্ডিতের উপদেশাবলী শুনিয়াই তাহা আয়ত্ত করিয়া লয়েন। বৈদিকযুগে একমাত্র শ্রাবণিক অধ্যয়নেরই প্রথা ছিল, এই জন্যই বেদের নাম শ্রুতি হইয়াছে। পরন্তু যে কোন প্রকারে হউক অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। সকল সাধনের মধ্যে মননই বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম করিতে পারে, কেননা মননের অর্থ বিচার। আবার এই বিচার দ্বিবিধ প্রণালীতে হইয়া থাকে। প্রথম পুস্তক পড়া আর দ্বিতীয় নির্জ্জন স্থানে যাইয়া বিচার্য্যবিষয়ে মনোনিবেশ করা। বিচারের অবলম্বন বিভিন্ন বলিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারিত হইতে পায়। যাহারা কেবল নাম জপ করিতে থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিবার নিমিত্ত অন্য বিষয়ে ব্যাপ্ত হইতে পারে কি? এজন্য দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই শ্রেণীর অধিকাংশ সাধকই নিরীহ বা শান্তপ্রকৃতি হইয়া থাকেন। কোন বিষয় লইয়া তাঁহারা তর্কবিতর্ক করিতে চাহেন না। যদি তাঁহারা বিচারক্ষম হইয়া এইরূপ গুণসম্পন্ন হইতেন, তবে শতবার তাঁহাদের ধন্যবাদ করা যাইত। ফলতঃ মননের অন্তিম সোপানে উত্থিত না হইতে পারিলে কোন প্রকারেই অসম্ভাবনার (সংশয়ের) ভীম আক্রমণ করিতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর অসম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট না হইলে কোন প্রকারে ব্রহ্মানুভূতি হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে মনন নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও আবশ্যক। অসম্ভাবনা বা সংশয় মানব মনের এক অরুন্তুদ ব্যাধি। এই ব্যাধি থাকিতে শান্তির ত কোন কথাই নাই, ছিন্নমস্তক অজের ন্যায় মন অবিরাম ছটপট করিতে থাকে। শোণিত পিপাসার্ত্ত জলৌকা যেরূপ শোণিতশালী জীবের গন্ধ পাইয়া দেখিতে দেখিতে এক এক তৃণ হইতে অপরাপর তৃণে চলিয়া যায়, কিন্তু কোন তৃণেই স্থিতিলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ সংশয়ার্ত্ত মন অনাময় ব্রহ্মকান্তির আভাস পাইয়া এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত পরিহার পূর্ব্বক অন্য শ্রেণীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে থাকে, পরন্তু কোন সিদ্ধান্তেই অবস্থিত হইতে পারে না। যাঁহারা মননের অন্তর্ব্যূহ ভেদ না করিয়াই নিদিধ্যাসনে তৎপর হয়েন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নহে। তাঁহারা পুনর্ব্বার সন্দেহাবর্ত্তে পড়িয়া বিষমদশা গ্রস্ত হইতে পারেন।

যেরূপ মনন নিখিল সন্দেহের সমূলে উচ্ছেদ করে, তদ্রূপ নিদিধ্যাসন নিঃশেষে বিপরীত ভাবনা (আত্মাতে অনাত্মাধ্যান অনাত্ম বস্তুতে আত্মাধ্যান অর্থাৎ ভ্রান্তি) বিধ্বংস করে। নিদিধ্যাসনের অর্থ ধারাবাহিকধ্যান, ইহাই অন্তিম ভূমিকাতে সমাধি আখ্যালাভ করে। সমাধিতেই স্বরূপ সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। "ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ শ্রুতিও অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" ব্যাসসূত্র ইহাই জ্ঞাপন করে। পঞ্চদশীকারও প্রথম বিবেকের শেষভাগে সমাধিব্যতিরেকে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না, ইহা সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মসন্দর্শন বিষয়ে বেদান্তাচার্য্য মনীষীদিগের দুই মত। প্রথম মতে বিচার দ্বারা ও দ্বিতীয় মতে সমাধি দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রথম মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বিচারের পরাকাষ্ঠাই সমাধি। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথম অবস্থাতে বিচার কেবল শুদ্ধ বিষয়ক হয় না, অনাত্মবস্তুর তিরোধান ও আত্মতত্ত্বের অভ্যুত্থান করিতে করিতে পরিশেষে কেবল আত্মবস্তুই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ অবস্থা ও সমাধির কোন পার্থক্য

দেখিতে পাওয়া যায় না। গীতাতে এই বিচার সাংখ্য নামে অভিহিত হইয়াছে, এক মাত্র ইহাই নহে, অধিকন্তু সাংখ্যকে নিখিল সাধনের শীর্ষস্থানে সংস্থাপিত করা গিয়াছে। বিচারকে ব্রহ্মানুভূতির কারণ নির্দ্দেশ কর, আর সমাধিকেই উহার কারণ নির্দ্দেশ কর, কিন্তু ধারাবাহিক ব্রহ্মাকারবৃত্তি উভয় পক্ষেই আবশ্যক। এই ত গেল উভয়পক্ষের সাধারণ তত্বের কথা, এক্ষণে এক এক পক্ষের বিশেষ তত্ব নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। বিচার দ্বারা যিনি ব্রহ্মানুভব করিয়াছেন, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রথ্যাতে উপবিষ্ট হইয়াও স্বরূপানুভূতি সুখে ডুবিতে পারেন, পরন্তু সমাধি দ্বারা ব্রহ্মানুভবকারী সেইরূপ পারেন কি না এ বিষয়ে সন্দেহ। পক্ষান্তরে ব্যুত্থানদশাতে প্রথম চিরকালের জন্য ব্রহ্মবিস্মৃতিপঙ্কে পতিত হয়েন না, আর দ্বিতীয়ের স্বরূপ বিস্মরণ দীর্ঘকাল ব্যাপীও হইয়া থাকে। ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ যখন ব্যুত্থান অবস্থায় অবতরণ করেন, তখন তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী বলা যায়, কিন্তু স্বরূপাবস্থিতিকালে তিনি অদ্বৈতবাদী শব্দেরও বাচ্য হইতে পারেন না, কারণ ইহাও অন্যসাপেক্ষ। এই কারণেই উপনিষদে ব্রহ্মাত্মা বাক্যাতীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহার কখন ধারাবাহিক অখণ্ড ব্রহ্মাকার বৃত্তি হয় নাই, তিনি মহামান্য অদ্বৈতশব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত হইতে পারেন কৈ? তাঁহাকে কদাপি অদ্বৈতবাদী বলা উচিত নহে। যিনি মায়িক প্রপঞ্চ ভুলিয়া দীর্ঘকালের জন্য না হউক, স্বল্পকালও সাগরে সরিতের ন্যায় শুদ্ধচিৎস্বরূপে মন একাকার করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহর্ষিলব্ধ এই মহান্ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিকারী।

অনাদিকালের পুণ্যরাশি ফলোন্মুখ হইলেই মানব-মনে অদ্বৈত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আবির্ভূত হয়। তখন আর জিজ্ঞাসুবৃন্দ মায়িক বস্তুর বিলোল চমকে আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারেন কৈ? যাহা বিষয়ীদিগকে স্বকীয় ক্রীড়া কুরঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কমনীয় কান্তি কনককান্তা তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারে না, তাঁহাদের প্রবল পরাক্রান্ত বৈরাগ্যের তীব্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন সংসারাশক্তি কোথা লুকাইয়া যায়। কাহার সাধ্য প্রচণ্ড অনল স্পর্শ করে। ফলতঃ পার্থিব বস্তুর ত কথাই নাই, ব্রহ্মলোকও জিজ্ঞাসু সমক্ষে তৃণায়মাণ বলিয়া বোধ হয়। ঈদৃশ জিজ্ঞাসুপ্রবরদিগকে কোন মায়িক বস্তুই গন্তব্যমার্গ হইতে স্খলিত করিতে পারে না। তাঁহারা প্রবলবেগে ঐ মার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন। কবে শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সাক্ষাৎ পাইব, কবে তাঁহার সুধাময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মসংস্পর্শে মন শীতল করিতে অধিকারী হইব, ইত্যাদি শুদ্ধ বাসনা ব্যতিরেকে কদাপি মলিন বাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে আসন জমাইতে পারে না, ঐ শুদ্ধ বাসনাই যেন হস্তধৃত করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত গুরুদেবের সমক্ষে লইয়া যায়; আর শিষ্যেরা অকপটভাবে আচার্য্য সেবায় তৎপর হয়েন। গুরু ও শিষ্যগণ পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর যোগ্যতানুপাতে গুরুদেব অনুকূল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিষ্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন। আর সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন শিষ্যবৃন্দ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের যথাবিধি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক আচার্য্যোপদিষ্ট অদ্বৈত তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হয়েন। পশ্চাৎ মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগমে ঐ নিরতিশয় সুখরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া প্রসাদনীরে ভাসিতে ও ডুবিতে থাকেন। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদিগকেই অদ্বৈতবাদী বলা যায়। গীতাতে অদ্বৈতবাদীই স্থিতপ্রজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ মহামুনিদিগের সমাধি এবং ব্যুত্থান দুই অবস্থা "স্থিত প্রজ্ঞস্য কাভাষা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। একমাত্র প্রথম অবস্থাতেই অদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অবস্থাতে সাধন তারতম্যে বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্ব ও কেবল দ্বৈততত্ত্বেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই স্থলে কোন কোন কষায়ম্বর-ধারী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন যে স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে ব্যুত্থান অসম্ভব; সুতরাং জ্ঞানীরা সর্ব্বদাই সমাধিস্থ থাকেন। তাঁহাদের যে ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে ইহার কারণ দর্শকবৃন্দের অজ্ঞান। আমরা ত বহু গবেষণা করিয়াও অদ্যাপি ঈদৃশ উক্তির কোন সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ স্বরূপ স্থিতিকালীন ব্যবহারই অসম্ভব; কেননা ঐ অবস্থাতে মনের লয় হইয়া থাকে, আর মন প্রবুদ্ধ না থাকিলে ইন্দ্রিয় ও শরীর সংক্রান্ত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানিবৃন্দের ব্যবহার অজ্ঞানীদিগের ন্যায় স্বরূপ বিস্মারক নহে।

স্থিতপ্রদ মহর্ষিদিগের ব্যুত্থান পরস্পর বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কেহ অবিরতই জগতকে ব্রহ্মদ্যুতি দ্বারা আবৃত দেখিতে পান, কেহ বা জগতের অভ্যন্তরে নিরন্তর ঐ দ্যুতি দেখিয়া প্রেমে অবশ হইয়া থাকেন। আবার কোন ব্যক্তি সময়ে সময়ে উক্ত অবস্থা যুগলের একটীতে উপনীত হয়েন। এই তিন শ্রেণীর স্থিতধিবৃন্দই শান্তি-সরিৎ প্রবাহিত করিয়া তাহার হিল্লোলে সমাজের ত্রিতাপ বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মকল্প মহামুনিরা দর্শন দানে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মহানুভাবগণ সঙ্গদ্বারা নরনারীদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই যে ব্যুত্থান অবস্থাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে অবস্থিতি করেন ইহা সত্য, কিন্তু প্রথম শ্রেণী কদাপি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সীমা লঙ্ঘন করেন না; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী কখন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ও কখন দ্বৈতবাদে অবস্থিত থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য শ্রেণীর লোকেরা কেবল দ্বৈতবাদেই বিচরণ করেন। অধিকন্তু প্রস্তাবিত সকল মহাত্মারই এক মহত্ব রহিয়াছে যে একেবারে স্বরূপকে ভুলিয়া যান না; আর যিনি চিরকালের তরে বিস্মৃতি-সুরঙ্গে স্বরূপকে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন তাঁহার ব্রহ্মদর্শিত্বেই সন্দেহ। নিরতিশয় সুখরূপে ভূমাত্মার ধ্যানে যে কি অতুলনীয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে, তাহা বাণীদ্বারা বর্ণন করা অসম্ভব। একমাত্র তদবস্থাপন্ন মুনিই তাহা অনুভব করিতে পারেন। অজ্ঞানীদিগের পক্ষে তদনুভূতি ত বহুদূরের কথা, কিন্তু তাহারা ঐ আনন্দের অস্তিত্বেই সন্দিহান হইয়া পড়ে। তাহারা মনে করে যে, সুখ একমাত্র বিষয়োপভোগেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ মনে করাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই, কারণ কখন ঐ অনাময় নিষ্পন্দ ব্রহ্মসুখের আভাস তাহারা পায় নাই। যে গ্রাম্য কৃষিবল জন্মাবধি মহানগরের প্রমোদ-উপবনের কমনীয় শোভা দেখে নাই, সে যে দাদাঠাকুরের পুষ্পবাটিকা তৎসংক্রান্ত শোভার কেন্দ্রস্থান মনে করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? অজ্ঞানীর কথা ত বায়ুতে মিলাইয়া যাউক, জিজ্ঞাসুও ঐ সুখের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যিনি ব্রহ্ম সংস্পর্শে একবারও অবশ হইতে পারেন নাই, সূক্ষ্ম বাসনা যাঁহার হৃদয়ান্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলেও তিনি কি সেই মায়াতীত অবাঙ্মনসোগোচর পরব্রহ্মের ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন? না, ইহাতে একমাত্র বৈরাগ্যশালী মুমুক্ষু ও প্রবুদ্ধ মহাত্মাই অধিকারী। অনেক ঐহিকাভ্যুদয়াভিলাষী কৃত-

কিন্তু যুবক এই বৈরাগ্য অধিকার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপর আপত্তি উত্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন যে, আত্মবিদ্যা যখন সংসার উপেক্ষা করিয়া বিজন কান্তারে যাইতে উপদেশ করে, তখন সমাজের হিতপ্রার্থী ব্যক্তিরা কি প্রকারে উহাকে হৃদয়ের অলঙ্কার করিতে পারেন, যাহা ভিক্ষুকের বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিতে ও বিষয়রসভোগজনিত প্রত্যক্ষ সুখকে বিষ বলিয়া জানিতে মানবসমাজকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করে; তাহা যদি মনীষিবৃন্দের উপাদেয় হয়, তবে অনুপদেয় বলিয়া জিনিষ থাকে কৈ? অবশ্যই ঈদৃশ আক্ষেপ আক্ষেপকারীদিগের সহৃদয়তা ও বিশিষ্ট ইচ্ছার জ্ঞাপন করে; নিঃসন্দেহে এইরূপ আপত্তি উত্থাপকদিগকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগকে পরিণামদর্শী মহানুভব বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না। তাঁহারা যদি একবার সিংহাবলোকন ন্যায়ে প্রাচীন ভারতের ঋষিসঙ্ঘসেবিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতি চাহিয়া দেখেন, তবে আর উক্ত আপত্তির কথা মুখে আনিবেন না। নিশ্চয়ই আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। বৈরাগ্যকে হৃদয়ের ভূষণ করিয়া ব্রহ্মচারীদিগের গুরুকুলে বাস করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্বেতকেতু প্রভৃতির মহর্ষির অভ্যুদয় হইত না; বৈরাগ্য-হুতাশনে জীবনের প্রথম চতুর্থাংশ ভাগ আহুতি করিবার বিধান না থাকিলে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষীশ্বরের চরণস্পর্শে ভারতভূমি পবিত্র হইত না। পাঠক, এই শুনিলেন বৈদিক যুগের মহর্ষিসম্বন্ধিনী গাথা। এক্ষণে একবার ঐ যুগোৎপন্ন রাজন্যজাতীয় কীর্ত্তি লতা বিতানের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য আগন্তুক মনস্তাপ দূর করুন। জনক ও অজাতশত্রু প্রভৃতি ভূস্বামিবৃন্দ বৈরাগ্যের প্রেরণায় নিবিড় অরণ্যানী সেবন করিয়াও পুনর্ব্বার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, বৈরাগ্য কাঙ্গাল সাজিয়া দ্বারে দ্বারে ভক্ষ্য বা পণ্য সংগ্রহপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা দেয় না। ইহা শিক্ষা দেয় যে, ভ্রান্তি সিদ্ধ বস্তুবৎ প্রতীয়মান অবস্তুর আসক্তি সমূলে উচ্ছেদ কর, ইহা শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্মদ্যুতি দ্বারা জগৎ আবৃত করা রূপ বেদোপদিষ্ট ত্যাগব্রতে ব্রতী হও ফলতঃ ভ্রান্তিসিদ্ধ বস্তুর প্রতি বৈতৃষ্ণ্যই বৈরাগ্য শব্দের অর্থ। পুরাকালের ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিবৃন্দ অথবা দ্বিজাতি মাত্র এইরূপে বৈতৃষ্ণ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাংসারিক কোলাহলশূন্য একান্ত স্থানে যাইয়া জীবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিতেন, ইহার পরিণাম যে পীযূষময় হইত, তদ্বিষয়ে উহাঁদের জীবনচরিতই প্রমাণ। জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়জন যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষি এবং কয়জন জনক ও অজাতশত্রু রাজন্য বহির্গত হইতেছেন? বৈদিকযুগ হইতে মহাভারতযুগে দৃষ্টি প্রত্যাহৃত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্মবিদ্যার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট বীরচূড়ামণি ভূপতিবৃন্দ যুদ্ধ সময়ে সুসজ্জিত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন।

আত্মবিদ্যা যদি কেবল গিরিকন্দরবাসী হইতে উপদেশ করিত, উহা যদি কূর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া থাকিতে নিয়োগ করিত, তবে কি কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রান্তরে স্থিতপ্রজ্ঞ ভীষণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ প্রভৃতি রাজন্য কুলতিলগণকে আমরা ঐতিহাসিক চক্ষুতে অবলোকন করিতে পাইতাম? ব্রহ্মবিদ্যার লোকান্তর বলে বলীয়ান্ হইয়াই ঐ বীরকেশরিবৃন্দ মোহের দুর্ভেদ্য সূর্য্য ভেদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্বকীয় জীবন দ্বারা জগৎকে পদ্মপত্রস্থিত জলের তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া

দিতেন। হে পাঠকগণ, এক্ষণে আর ব্রহ্মবিদ্যা যে ঐহিক অভ্যুদয়ের প্রতিকূল নহে, প্রত্যুত মহান্ অনুকূল, ইহা বুঝিতে কিছু পরিশিষ্ট রহিল না। প্রথম জীবনে ব্রহ্মবিদ্যার শরণ লইয়া বৈরাগ্যানুষ্ঠান না করিলে কদাপি গৃহস্থাশ্রমের যথার্থ সুখ মানুষ সম্ভোগ করিতে পারে না, সামান্য বিপদে অথবা সামান্য সম্পদেই অধীর হইয়া উঠে, আর উহার বিষময় পরিণাম ভোগ করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানীরা সম্পদে বিপদে অটল থাকিয়া সর্ব্বদাই আত্মপ্রসাদ-সুখ সম্ভোগ করেন। এই জন্যই বেদ হইতে ভাগবত প্রর্য্যন্ত আর্য্যগ্রন্থ বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রের আশয়ে যদি সকলের পক্ষে আজীবন বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া থাকাই হইত, তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে গৃহস্থাশ্রমের বিধি থাকিত না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম বিধানই বুঝাইয়া দেয় যে, প্রথমাশ্রমের বৈরাগ্য, বিধিপূর্ব্বক দ্বিতীয়াশ্রমের সম্যক্ অনুষ্ঠানার্থ। গৃহস্থাশ্রমের অভ্যুদয়ই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উদ্দেশ্য, তাহার আয়ত্তীকরণের প্রতি বৈরাগ্য না হয়, পৃথিবীতে মিত বিষয় অতি বিরল। বিদ্যার্থিবৃন্দের মধ্যে যিনি ভোজন-পরিপাটী ও বেশভূষার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, তিনিই সরস্বতীর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। যে সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনাপতি অর্দ্ধাঙ্গিণী ও সন্ততিবর্গের মমতা উপেক্ষা করিয়া সমস্ত শক্তি সৈন্য-পরিচালনাদি ব্যাপারে ব্যয়িত করেন, জয়লক্ষ্মী তাঁহার করতলস্থ না হইয়া থাকিতে পারে না। বৈরাগ্য কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠাবলই অবশ্যম্ভাবী কারণ নহে, লৌকিক কার্য্যেও ইহার অবশ্যকতা রহিয়াছে। এমন কি যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন, অথবা তদস্তিত্বে সন্দিহান, তাঁহাদেরও স্বকীয় মন্তব্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ার্থে বিরাগ দৃষ্টি হইয়া থাকে। তাঁহারাও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কারে তদ্গতচিত্ত হইয়া বিলাসসুখের ত কথাই নাই, কিন্তু সম্মুখস্থ রূপসী সুশীলা ভার্য্যার সহিত প্রীতিসম্ভাষণেরও অবকাশ পাইয়া উঠেন না। ইহা কি বৈরাগ্য নহে? কয়জন আস্তিক এইরূপ স্বর্গীয় বৈরাগ্য লাভ করিতে পারেন? এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, যেরূপ ধর্ম্মকল্পপাদপের ছায়ায় বিশ্রমে করিবার জন্য বৈরাগের প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইরূপ লৌকিক গরিষ্ঠ কার্য্য সাধন করিতেও তাহা আবশ্যক। ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ বৈরাগ্য যে ঐহিক অভ্যুদয়ের প্রতিকূল নহে, বরং অনুকূল, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

অদ্ভুত দেশাচার।

প্রকৃতি-ভেদে যেমন পৃথিবীর মধ্যে নানা জাতি মনুষ্যের আকার, বর্ণ এবং প্রবৃত্তি বিভিন্ন প্রকার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানব-জাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকলের উপর আবার দেশাচারের প্রভুত্ব সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। কি সভ্য কি অসভ্য সকল দেশের সকল জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, দেশাচারের নিকট সকলই অবনতমস্তক হইয়া রহিয়াছে। এমন কি স্থলবিশেষে ধর্ম্মানুষ্ঠান

বা নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপরও দেশাচারের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ইংরাজজাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং শৌর্য্য, বীর্য্যে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া মহাগৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ জাতি বলিয়া মহা দম্ভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, কত অভিনব ব্যাপারের পরিচয় পাইবে। পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ডে বিদ্যার বিমল আলোকে দেশ আলোকিত হয় নাই, তখন তত্রত্য অধিবাসী জনসাধারণে ডাইনকে অত্যন্ত বিভীষিকার চক্ষে দর্শন করিত। কুরূপা বৃদ্ধা শীর্ণদেহা দুঃখিনী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাকে ডাইন বলিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া মারিত। তাহাদের হৃদয়ে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, ডাইনের হস্তপদ দৃঢ় বন্ধনপূর্ব্বক, তাহাকে জলে নিমগ্ন করিয়া দিলে, যদি সে ভাসিয়া উঠিত, তবে তাহাকে ডাইন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিত, তখন তাহার আর জীবনের আশা থাকিত না। অনন্তর সেই হতভাগিনীকে জল হইতে তুলিয়া, প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিয়া, পৃথিবী হইতে তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিত। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! কিন্তু এক্ষণে বিলাতে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হওয়াতে সে ঘৃণিত নৃশংস দেশাচার তিরোহিত হইয়াছে।

যদিও বিলাতে এক্ষণে ঐরূপ জঘন্য দেশাচার উঠিয়া গিয়াছে, তত্রাপি আরও কয়েক প্রকার দেশাচার এখনও বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ-সমাজে রীতি আছে, বিবাহকালে বর-কন্যাকে লোকে জুতা ফেলিয়া মারিয়া থাকে। এই উদ্দেশে তথায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বিনামা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাহেবদিগের মধ্যে শ্যালিকা বিবাহ দেশাচারবিরুদ্ধ;—এই প্রথা রহিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভার মহা আন্দোলন হইয়া থাকে।

মিসর অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। পূর্ব্বকালে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ এক প্রকার ঔষধ মাখাইয়া, মৃতদেহ গৃহে রক্ষা করিত। ঔষধের গুণে উহা অবিকৃত থাকিত, অর্থাৎ পচিত না, বহুকাল পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকিত। কাহারও পিতা ঋণ পরিশোধ না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার পুত্রকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইত; এবং মৃতদেহ উত্তমর্ণের নিকট অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় বন্ধক রাখিতে হইত। এইরূপ বন্ধক-প্রথা অত্যন্ত অপমানব্যঞ্জক বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। এজন্য সন্তান, পিতার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত।

আফ্রিকা মহাদেশে বেকুমানা নামে একটী অসভ্য জাতি আছে। তাহাদের মনে অদ্ভুত ধারণা এই যে, মৃত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষার জন্য পরিচারকের প্রয়োজন। এই নিমিত্ত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার পরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে তাহারা দ্বাদশ জন দাসকে বধ করিয়া, মৃত ব্যক্তির সহিত কবরে সমাহিত করিত।

আমেরিকার কিউমেনা নামে একটী জনপদ আছে। পূর্ব্বকালে তথাকার অধিবাসীরা পরম সমাদরে ভেকের পূজা করিত। তাহাদিগের মতে ভেক জলের অধিপতি। অতএব কেহ ভেকজাতির প্রতি কোনপ্রকার অন্যায় আচরণ করিলে, দেশমধ্যে মহা অশুভ সংঘটন হইবে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। তাহারা ভক্তিসহকারে ভেকের নিকট বর প্রার্থনা করিত। আবার কাহারও কোন প্রকার আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অথবা খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলে, একটী জলপূর্ণ পাত্রে ভেক রাখিয়া, তাহাকে প্রহার করিত। তাহাদের মনের ধারণা এই যে, ভেক ডাকিলে

সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

উহারা কোন পশু ধরিয়া, তাহাকে বধ করিবার সময়, তাহার মুখে দুই এক বিন্দু মদ্য প্রদান করিত। ইহার কারণ এই যে, মৃত পশুর আত্মা, মদ্যপান করিয়া, ঐ পশুর দেহ হইতে বহির্গমন করিয়া, অন্যান্য পশু-দিগকে এই সুসমাচার বলিয়া দিবে এবং তাহারা সুরার লোভে শিকারী ব্যক্তির নিকট আসিয়া ধরা দিবে।

পলানেসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং সেণ্ডউইচ্ দ্বীপসমূহের অধিবাসিগণের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয় জাতিই স্ব স্ব দেহে বহুল পরিমাণে উল্‌কি পরিয়া থাকে। এই উল্‌কির চিত্রভেদে জাতিগত উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইতে দেখা যায়। হস্তপদ প্রভৃতি দেহের সর্ব্বাবয়বে উল্‌কির বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এমন কি বালিকারা পর্য্যন্ত শৈশবাবস্থা হইতে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে উল্‌কি ধারণের যাতনা সহ্য করিয়া থাকে। এই উল্‌কির দ্বারা তাহাদের সম্মান ও জাতীয় গৌরব সূচিত হইয়া থাকে।

ওটাহিট দ্বীপে এক সম্প্রদায় লোক আছে, তাহাদের পরিণীতা স্ত্রীদিগকে সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং সন্তান জন্মিলে তাহাকে মারিয়া ফেলে। ফলতঃ ইহাদের মধ্যে সতীত্বের আদর দেখা যায় না। স্ত্রী-লোকেরা নৃত্য করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদের অশ্লীলতাব্যঞ্জক নৃত্য ভদ্র সমাজের রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু কোন দেবারাধনার সময় যে নৃত্য করিয়া থাকে, সে সময় অশ্লীলতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

এই সকল দ্বীপবাসী লোকের মনে এইরূপ ধারণা যে, দেবোদ্দেশে কোন প্রাণীর দেহ বা নৌকা উৎসর্গ করিলে, তাহা আর কাহারও ব্যবহার করিতে নাই। কোন মন্দিরে দেবতার প্রীত্যর্থে কোন পশু বলিদান করিলে, তাহার মাংস ভক্ষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, ঐ মাংস আহার করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে।

চীনদেশে উদ্বাহ-প্রথা এইরূপ যে, কন্যা বরের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়। পিঞ্জরা-বদ্ধ শূকর ও শুষ্ক মৎস্য ইত্যাদি বিবাহের দানসামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় বর বিবাহের অগ্রে, কন্যাকে দেখিতে পায় না। কন্যা দেখিতে সুন্দরী বা কুৎসিতা তাহা জানিবার একটী রীতি আছে। কন্যার পায়ের জুতা দেখিয়া, সে সুরূপা কি কুরূপা তাহা স্থির করা হয়। চীনেদের মতে কন্যার পদদ্বয় যত ছোট, সে তত সুন্দরী। সুতরাং জুতা ছোট হইলে, কন্যা সুশ্রী হইবে।

পূর্ব্বে রাজপুতনা দেশে কন্যা জন্মিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিত। মারিবার সময় তাহাকে বলিত,—"তুমি যাও, গিয়া তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দিও"।

কোন কোন অসভ্য জাতীয় লোকে, রক্তে ঝুল গুলিয়া, মুখে মাখিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, ইহাতে মুখের অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি হয়। তাহারা শত্রুকে বধ করিয়া, তাহার মাথা গলদেশে ধারণ করিয়া থাকে। যে যত শত্রুর মাথা গলায় ঝুলাইতে পারে, তাহার তত অধিক সমাদর।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৫ম বার্ষিক ২য় বিশেষ অধিবেশন।

১। গত ১৬ই আশ্বিন (১৯০৪—২রা অক্টোবর) রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় সময় পঞ্চম বাৎসরিক দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

২। অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূর্ব্বস্থলীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। ন্যূনাধিক আড়াই শত সভ্য সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

৪। এতদধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা;—

১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব—ফার্কুহার (Farquhar) সাহেবের মতের সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

৬। বিবিধ বিষয়ের সংস্রবে জয়েন্ট সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সভাস্থ সভ্যগণের গোচর করিলেন যে, রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহানুভাবের History of Calcutta অর্থাৎ 'কলিকাতার ইতিহাস' এবং কাব্য বিশারদের সম্পাদিত 'মাইকেলের গ্রন্থাবলী' ও 'বিদ্যাপতির পদাবলী' এই গ্রন্থত্রয় সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত হইবে। এইজন্য তাঁহাদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। তৎসূত্রে বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, রাজা বাহাদুরের সঙ্কলিত গ্রন্থখানি প্রীতিপদ ও শিক্ষাদায়ক, সুন্দর ও সারগর্ভ এবং মাইকেল প্রভৃতির সংস্করণও সুন্দর ও সটীক—ইত্যাদি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আনন্দসহকারে প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

৭। তাহার পর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—ফার্কুহার সাহেবের মতের সমালোচনা" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৮। প্রবন্ধপাঠান্তে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, রায় বাহাদুর বলিলেন;—পঠিত প্রবন্ধের ভাব, ভাষা, দার্শনিকতা ইত্যাদি বিষয় অতীব প্রশংসনীয়। প্রবন্ধের ভাবতরঙ্গে তিনি চালিত হইয়াছেন। প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে তাহা ফার্কুহার সাহেবের মতামতবিষয়ক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ও সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ করিলেন।

৯। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তৎপরেই এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, প্রবন্ধটী উত্তম হইয়াছে। উহার বর্ণিত ভাষা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ও সুন্দর;—সুতরাং বক্তৃতাটী যার পর নাই হৃদয়গ্রাহিণী। বক্তা মহাশয় উপযুক্ত তাহাতে আর সংশয় কি? ইত্যাদি।

১০। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন;—প্রবন্ধটী অত্যন্তই শ্রুতিমধুর এবং ভাববিষয়ও সুন্দর;—অতএব উহা সাধারণতঃ মনোহর হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, জরাসন্ধ বধ ভীষণ হননেচ্ছা প্রভৃতি ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বের বিরোধী হইয়াছে। তৎপরে তিনি শ্রোতৃবর্গের পুনঃ প্রতিবাদে বিরক্ত হইয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

১১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সকাশে আমাদের সকলেরই অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকশ করা উচিত। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বিষয়ে একটী কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। সেই কথাটী এই :—ঈশ্বরাবতার—বর্গের স্ব স্ব উক্তিতে আমাদের নির্ভরতা, নিয়ত প্রার্থনীয়। যথা :— "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—ইত্যাকার বচনপরম্পরায় সর্ব্বসাধারণের আস্থা স্থাপিত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধ ও খৃষ্টও—ঐরূপ মর্ম্মে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতাকারক মহাশয় ইহার প্রসঙ্গ নির্দ্দেশে পরাঙ্মুখ কেন—তিনি তাহা বোধগম্য করিতে অক্ষম। ইত্যাদি।

১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ শ্রবণে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। এই সংস্রবাধীন ফার্কুহারও ধন্যবাদ পাইবার অধিকারী। কেননা, তদীয় আন্দোলন ব্যতীত অধুকার প্রবন্ধানুশীলন হইত না। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন যে, বৌদ্ধগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ ভাব হইলেও 'কালীয়নাগের' ও 'কালীয়দমনের' বিবরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের দৈত্য—কৃষ্ণ ও হিন্দুর দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ যে অভিন্ন, তাহার প্রামাণিকতা কোথায়? ইত্যাদি।

১৩। শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামবেদী মহাশয় বলিলেন যে, ঋক্‌সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের-নির্দ্দেশ থাকাতে, তদ্দ্বারা বেদের অনাদিত্বে সন্দিহান হইতে হয়। প্রবন্ধপ্রণেতা "রাসলীলার" কোন ব্যাখ্যান প্রদান করেন নাই। ইত্যাদি।

১৪। মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে ২য় বার বলিলেন যে, মোক্ষদাচরণ বাবুর বাক্যের উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য এই যে—"কল্প-ভেদাদিকৃদ্ধং" এতন্মতানুসারে 'শ্রুতি' শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গমূলক উল্লেখ, কোনও ক্রমেই দোষাত্মক হইতে পারে না। ইত্যাদি।

১৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অতঃপর বলিলেন ;—প্রবন্ধকারের শব্দার্থ-সম্পত্তি বিলক্ষণ সুপ্রচুর। কোন বিশেষ হেতুবশতঃ তিনি প্রবন্ধোল্লিখিত প্রতিবাদাংশের নির্দ্দেশে নিরস্ত হইলেন। তদনন্তর তিনি বলিলেন যে, তবে অক্ষুব্ধচিত্তে বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টের সাম্য-মৈত্রী করুণা-বাদ—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেই জগতে সর্ব্বপ্রথমতঃ, উক্ত ও কীর্ত্তিত, বিঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহ, উত্তরকালে উল্লিখিত মতের অধিকারী হন, তাহার পর 'বাইবেলে' এই মতটী পরিগৃহীত হয়। এই সুন্দর সন্দর্ভে রাসলীলা ব্যাপারের বর্ণন সর্ব্বথা সুশোভন হইয়াছে। কারণ তদ্বিষয়টী বহু-বিস্তৃত। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে পঠিতব্য অথচ একমাত্র প্রস্তাবে তাহার স্থান হওয়া অসম্ভব। ইত্যাদি।

১৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল ; ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক ; এফ্, আর, এস্, এল,) মহাশয় তৎপরেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, তিনি ঐতিহাসিক যুক্তিতর্কে ও শাস্ত্রীয় ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। তবে ইহাও বক্তব্য যে—গীতোপদেশ, বাইবেলের উপদেশ ও শিক্ষা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক উৎকৃষ্ট। এবম্ভূত অধিকাংশ বিষয়ই আছে—যাহা গীতায় বিশেষ বা অ-বিশেষভাবে বিবৃত, কিন্তু বাইবেল, তদ্বর্ণনে একেবারেই নির্ব্বাক্। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে তর্ক বিতর্কানুরোধে বাইবেলের প্রাচীনত্বে কেহ স্বীকৃত হইলেও, বিশেষ ক্ষতি হইবে না। ফলতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ও বাইবেলের তুলনায়, শেষোক্তের

উক্তিগুলি "বাল-ভাবিত"-বৎ বোধগম্য হইবে।

আত্মা অনাদি নহে; কিন্তু সাদি, পুনর্জন্মাভাব, কর্ম্মবাদাভাব, প্রভৃতি মতবাদ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়—সম্যক্ হেয়। শ্রীকৃষ্ণোপাসকবৃন্দ, তাঁহাদের আরাধ্যদেবকে স্বীয় স্বীয় চক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা ভগবানের অবতারত্বের আর অপর প্রমাণের প্রয়োজন কি? এই সকল কি অলীক অথবা অমূলক? খ্রীষ্টভক্তগণ খ্রীষ্টানের 'রেজারেক্‌শনে' (Resurrection) অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনে প্রত্যয়াপন্ন। হিন্দুগণ কিন্তু উহাতে বীতশ্রদ্ধ। এতদ্দেশে বহুল প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটে।

ভগবল্লীলা সম্বন্ধে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডামূলক বিষয় অস্মদ্দেশে বিচারিত ও অনুশীলিত ও আলোচিত হইয়া গিয়াছে। 'ভাগবতে' বিবৃত আছে—গোপিকাকুল আপনাপন ভর্ত্তৃ ভবনে অবস্থিত থাকিয়াই, দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারাদি করিতেন। থিওসফিষ্টেরা (Theosophists) অর্থাৎ পরাবিদ্যানুশীলক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—গোপীগণ, 'এষ্ট্রাল বডিতে' (Astral body) শ্রীকৃষ্ণ সমীপে ছিলেন। ইত্যাদি।

১৭। উপসংহার সময়ে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকর্ত্তা উপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিগুলি অতি উত্তম ও উপাদেয়। প্রবন্ধ শ্রবণে তিনি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছেন, অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিজের আসন গ্রহণ করিলেন।

১৮। মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদ করিবার পর সম্পাদক শাস্ত্রী ও সহযোগি-সম্পাদক (জয়েণ্ট সেক্রেটারি) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় যথাক্রমে উঁহার সমর্থন এবং পোষকতাপূর্ব্বক সভাপতি ও প্রবন্ধকার এতদুভয়েরই গুণকীর্ত্তন করিলে পর সভার কার্য্য নিঃশেষিত হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।

(১৩১১। ২৬শে অগ্রহায়ণ—১৯০৪। ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ—৫ (পাঁচ ঘটিকা)।

৫ম বাৎসরিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

১। গত ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৯০৪। ১১ই ডিসেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার সময় সাহিত্য সভার ৫ম বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল।

২। অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ F. R. S. L. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। সভায় শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

৪। এতদধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলি এইরূপ ছিল। যথা:—

"সময়।—(১৩১১ সাল) ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৯০৪) ১১ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার সময়।

"সভাপতি।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার এট, ল, F. R. S. L.

"আলোচ্য বিষয়।—(১) শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "স্বদেশীয় শিক্ষা"নামক প্রবন্ধ পাঠ (২) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রস্তাব, (৩) বিবিধ বিষয়।"

৫। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৬। সভায় রীতিমত কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ৺রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যুর নিমিত্ত সম্পাদক নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলে, মহা-মহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার সমর্থন করেন। তৎপরে মহারাজকুমার বনয়ারি আনন্দদেব বাহাদুর মহাশয় ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিলে, সর্ব্বসম্মতানুসারে নির্দ্ধা-রণটী (Resolution) গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব এই ;—

"ডাক্তার রায় ৺সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর মহোদয়, "সাহিত্য-সভার" স্থাপনা-বধি ইহার বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহোদয় বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতীয় ভাষার অকপট সেবক ও অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন। তদীয় শোচনীয় মৃত্যুতে কেবল "সাহিত্য-সভা" ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃখিত হইয়া-ছেন, তাহা নহে,—কিন্তু সমগ্র বঙ্গভূমি, এক মহারত্ন হারাইয়াছেন। অতএব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, এই নির্দ্ধারণের অবিকল একখণ্ড প্রতিলিপি, উল্লিখিত স্বর্গগত রায় বাহাদুর ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

৭। তৎপরেই সহযোগী-সম্পাদক—(জয়েণ্ট সেক্রেটরি) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বানু-মোদনে ৺কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের অকাল-মরণ-নিবন্ধন নিম্ননিবদ্ধ নির্দ্ধারণও, প্রেরিত হউক। কবিরাজ নিশিকান্ত সেন, মহাশয় "সাহিত্য-সভার" আসৃষ্টি ইহার বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণও ছিল। বিদ্যাবত্তা ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। এরূপ লোকরঞ্জন জনের যৌবনা-বস্থাতেই লোকান্তর ঘটায়, "সাহিত্য-সভা" অত্যন্ত দুঃখিত। ইহাও স্থির হইল যে, এই নির্দ্ধারণের একখানি প্রতিলিপি, তদীয় বৃদ্ধ পিতা কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের সকাশে প্রেরণ করা হউক।

৮। তৎপরে বিদ্যানিধি মহাশয় নিম্নোক্ত পুস্তকোপহার-দাতৃদিগকে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বানুমোদনে এই প্রস্তাবও, গৃহীত হইল। পশ্চাৎ উপহারদাতৃবৃন্দের নাম লিপিবদ্ধ হইল ;—

(১) শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।
(২) „ কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ দাস।
(৩) „ মিশ্র গোবিন্দনারায়ণ কুমুড়িয়া
(৪) „ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
(৫) „ শ্যামাচরণ কবিরত্ন।
(৬) „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৯। অনন্তর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় "স্বদেশীয় শিক্ষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

১০। প্রবন্ধপাঠান্তে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বলিলেন ;—প্রবন্ধে ইংরেজকে যত গালি দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজ তত গালির উপযুক্ত নয়। ইংরাজের গুণেই আজ হিন্দু শিক্ষিত হইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে Patriotism অর্থাৎ 'স্বদেশ-হিতৈষণা' বিদ্যমান ছিল না। প্রবন্ধ-কার মহাশয় ইংরাজি শিক্ষায় যত অনিষ্ট সংঘটনের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার মতে উহা তত অনিষ্টকারী নয়। তাঁহার মতে 'রামায়ণ' ট্র্যাজেডি (Tragedy) অর্থাৎ "বিয়োগান্তক" কাব্য নহে। হাম-লেট (Hamlet) ও 'রামায়ণে' বরং কতকটা সৌসাদৃশ্য অবলোকিত হয়।

১১। পরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে লাগিলেন যে, প্রবন্ধটী অতীব উৎকৃষ্ট। "সারস্বত আয়তনের" লক্ষ্য উচ্চতম। তাঁহার অগ্রবর্ত্তী কূট সমালোচন প্রথা পূর্ব্বে আমাদের লক্ষ্য ছিল না। শুভকরী-শিক্ষা-বিধান, ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রচলিত নাই।

শুভকরী শিক্ষার ন্যায় কার্য্যকারিণী শিক্ষা স্বল্পই আছে। ফলতঃ সন্দর্ভটী অত্যন্ত সুন্দরই হইয়াছে। ইত্যাদি।

১২। ডাক্তার চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর মহাশয় বলিলেন:—বক্তা তাঁহার মাননীয় আত্মীয় বন্ধু। বিশেষ অদ্যকার এই বক্তৃতা শ্রবণে তিনি পরম আনন্দিত হইবেন, তাঁহার ঈদৃশী ধারণা বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিল। বক্তৃতার ভাষা ও উহাতে বিবৃত বর্ণনা যৎপরোনাস্তি হৃদয়গ্রাহিণী। তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। ইংরাজি শিক্ষার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার অনাবশ্যক। কারণ উৎকৃষ্টতা স্বতঃসিদ্ধবৎ। তিনি তদীয় সারস্বত আয়তনে যে প্রণালী ও প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করিলেন, তাহা উপাদেয় বটে, রোগপ্রতীকারার্থ তদীয় নির্ব্বাচিত ঔষধ সময়োপযোগী, সুতরাং সুসঙ্গত। দারিদ্র্যজন্যই পাপের প্রাদুর্ভাব। ইংরাজ—আজ আমাদের রাজা। ইংরাজী, রাজা-ভাষা। উহা বর্ত্তমানে অর্থকরী বিদ্যা। অতএব বিদ্যমান সময়ে এতাদৃশ উপায়াবলম্বন আবশ্যক, যাহাতে সকল দিক্ বজায় হয়। তিনি যেরূপ করিতে চাহেন, তাহাতে সামান্য শিক্ষা চলিতে পারে, তদ্দ্বারা উচ্চ শিক্ষার সম্ভাবনা নাই। আর উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবর্ত্তনীয় শিক্ষা-প্রথা, সর্ব্বথা বহুব্যয়সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির বর্জন, সুবিধাজনক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইত্যাদি।

১৩। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহানুভাব এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, তিনি প্রবন্ধ শ্রবণে প্রীত হইয়াছেন। বক্তার প্রবন্ধ, উত্তম ও সমীচীন। তিনি অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। প্রবন্ধের গুরুত্ব, উপাধ্যায় মহাশয়, নিজেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। রাজপুরুষেরা প্রথমতঃ সংস্কৃত শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন। 'বারাণসী সংস্কৃত কলেজের' ও 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের' পূর্ব্বকালীন প্রাচীন রির্পোট (বিবরণী) পাঠে উহাই বিদিত হওয়া যায়। ডাক্তার রায়বাহাদুরের সহিত তাঁহার মতানৈক্য আছে। স্বদেশীয় শিক্ষায় স্বজাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হয়। রাজা বাহাদুরের ধারণা এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে উপাধ্যায়ের বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে, না—উচ্চতর নিয়মেই উহা পরিচালিত হইবে? বর্ত্তমানে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণগণের প্রভাব পরিরক্ষণ, সবিশেষ ভাবেই অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য উচ্চতম হওয়া প্রার্থনীয় ও অভিলষণীয়। এতদ্দেশের সকলেই যে চাকরি করিবে বা পাইবে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজী পড়িয়া কয়জনে সেক্ষপীয় ও মিল্‌টন্, বর্জিল ও ডান্টে, ড্রাইডেন ও কুপার (Cowper) ইত্যাদি হইয়াছেন, অথবা হইবেন? বস্তুতঃ আদর্শের উচ্চতারই প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আদর্শের খর্ব্বতার দিকে লক্ষ্য না থাকাই, সর্ব্বতোভাবে স্পৃহণীয়। সংস্কৃতের অনুশীলনার্থই অনেক সাহেব, অস্মদ্দেশেও আদৃত। স্বজাতির প্রতি প্রেমানুরাগ, একটী স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। তন্নিবন্ধনই জর্ম্মন্ জাতীয় মোক্ষমূলর (Max Muler) অতি পণ্ডিত হইলেও ইংলণ্ড তত সমাদৃত ছিলেন না। তাঁহাদের (ইংরাজের) স্বজাতীয় সার

মোলিয়ার উইলিয়ামস, যতদূর সম্মানিত হইয়াছিলেন। সমস্ত বস্তুই, দোষগুণাশ্রিত। শিক্ষা অতীব দুরূহ দ্রব্য। ভলটেয়ার বলিয়া গিয়াছেন, পৃথিবী দুই একটা বড় লোক দ্বারাই চালিত হইয়া আসিতেছে। বক্তা মহাশয় প্রায় সকল বিষয়ই সঙ্কেতে বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা যথেষ্ট সুমিষ্ট। সুতরাং, তদীয় সন্দর্ভ সম্যক্ সুন্দর। আর তাঁহার উদ্দেশ্য যে, অতীব সাধুতাময়, তাহাতে সংশয় কোথায়? ইত্যাদি।

১৪। পরে শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ বিন্তয়েৎ' ইত্যাদি বাক্যে যথেষ্ট সদুপদেশ নিহিত রহিয়াছে। তৎপরে তিনি প্রাচীন ভারতের বিদ্যানুরাগের প্রসঙ্গ তুলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংবাদ কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর তিনি "স্বদেশীয় শিক্ষা" বলিলে, 'ভারতীয় উপদেশ ও বঙ্গীয় উপদেশ' দুইই বুঝাইতে পারে, ইত্যাদি বলিলেন।

১৫। তদনন্তর আরও দুই একজন কিছু কিছু বলিলেন।

১৬। শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রাহা, বি, এ, মহাশয় বলিলেন,—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবক (Revivalists) এক সম্প্রদায়ের প্রভাব ও প্রাদুর্ভাবের নির্দ্দেশ করিলেন। এতদ্দ্বারা সামাজিক অগ্রগতি প্রতিহত হইতেছে। অধুনা (ক) সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলন ও প্রাধান্য, (খ) ব্রাহ্মণ প্রাধান্য, (গ) ব্রাহ্মণগণের স্ব-শ্রেণীর রক্ষণ ইত্যাদিই বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লক্ষ্য। ইহার কারণ ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যয়নে সমাজের গতি পরিবর্ত্তিত, স্থলবিশেষে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাতে বিপ্রবর্গের প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায়। অদ্যকার প্রবন্ধকারও উল্লিখিত সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে তাঁহার মতে প্রবন্ধকর্ত্তার আলোচ্য বিষয় সময়োপযোগী হয় নাই।

১৭। সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে প্রবন্ধপাঠক মহাশয় বলিলেন—ডাক্তার চুনী লাল বাবুর মতামতের সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, তদীয় শিক্ষা-প্রবর্ত্তন-প্রস্তাব, বাস্তবপক্ষে দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল নহে—বরং অনুপযোগী, তাহা তিনি জানেন। জানিয়াও তিনি সেই অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, ইংরেজী অর্থকরী বিদ্যা, তিনি তাহা বিলক্ষণ বিদিত। কথাটা কতকাংশ সত্য। "সারস্বত আয়তনে" অর্থকরী বিদ্যাধ্যয়নের ব্যবস্থা না থাকিবে এমন নয়। লণ্ডনে বি, এ, এম, এ, উপাধিধারীরা চাকরি পাইয়া থাকেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা চাকরি পান না। বেতন গ্রহণেই কি বিদ্যালয় উন্নত হয়? তাঁহার "সারস্বত আয়তনের" পরিচালনে তিনি কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন না, এ কথাও ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন।

১৮। শেষে সভাপতি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সকল কথার মীমাংসা অসম্ভব। ইংরাজি দ্বারা উপকার হয় না, বক্তার এরূপ উদ্দেশ্য নয়। বিদ্যাসাগর মহোদয় ৩৲ টাকা মাত্র বেতন গ্রহণে কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অত সুলভ বেতনেও বিদ্যালয়ের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। তৎপরে বক্তব্য এই যে ইংরাজ জাতি, দোষগুণমিশ্রিত। হিতৈষণা-বৃত্তি আমরা ইংরাজের সকাশে শিক্ষা করিয়াছি, এটা একটা যথার্থ কথা। কিন্তু, এই সংশ্রবাধীন বক্তব্য এই যে, ইংরাজসংসর্গবিবর্জ্জিত দেশেও হিতৈষণাদি গুণ বর্ত্তমান নাই কি? ইংরাজই বা কতদিন হইল উন্নত হইয়াছেন? বেস্থান বলিয়া গিয়াছেন "Every house is his

garrison" অর্থাৎ 'মানবের প্রতি আলয় দুর্গ সদৃশ'। অধুনা সাহেবেরা আমাদের উপর আত্যন্তিকরূপে বিরক্ত। প্যারিচরণ সরকার, রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকনাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, পরোপকারার্থ অকাতরে কতই দান করিতেন। ক্ষতি স্বীকার করাই যদি হিতৈষিতা হয়, তবে পুরাকালে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন যে, বেতন গ্রহণ করিলেই যে, বিদ্যামন্দির উন্নত হয় তাহা নহে। কেননা এ দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলে ও কালেজে তবে ছাত্রাধিক্য হয় না কেন? পাদ্রিদের স্কুলে ও কালেজ সমূহে যত অধিক বিদ্যার্থী বিদ্যাধ্যয়ন করেন, অন্যত্র কি কারণে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়? অধুনাতন বালিকা-বিদ্যালয়নিচয়েও কি উন্নততর প্রণালীর শিক্ষা হইয়া থাকে? অতএব বক্তার বাক্য অতীব সত্যতামূলক। মিশনারিরা বোর্ডিঙ্ স্কুল খুলিলে, তাহা অচিরেই ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমরা স্ব স্ব দোষবশে আপনাদের অনিষ্ট সংসাধনে অগ্রসর। ইহাতে অপরের দোষ দেওয়া এক প্রকার নিরর্থক। ফলতঃ, বক্তার উদ্দেশ্য, উত্তম ও সাধুতাসূচক। এ দেশে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিলক্ষণরূপেই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অস্মদীয় জাতীয়তা বিনষ্টপ্রায়। আমরা এখন প্রায় সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বাংশে স্বেচ্ছাচারপ্রিয়। বস্তুতঃ, আমাদের প্রকৃত জাতীয়তার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ইত্যাকার ব্যাপারের অভ্যুদয় প্রার্থনীয় ও প্রয়োজনীয় বটে। আমরা পরস্পরের সহিত অনৈক্য বিশিষ্ট। অসামঞ্জস্য, আমাদের প্রায় প্রতি পদেই ঘটিতেছে। একজন ইংরেজ কদাপি ফরাসি ভাষায় কাহাকেও পত্রাদি লেখেন না।

এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ একতা-রক্ষণে উদ্‌যুক্ত হউন। তাঁহারা এখনও সংস্কৃত ভাষার ও শাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন। কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজ আজকাল বিনষ্টপ্রায়। অধুনা লোকান্তরিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যদ্রূপ লক্ষাধিক মুদ্রাদানে মৃতপ্রায় সংস্কৃতের পুনরনুশীলনের পথ প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। পণ্ডিতসম্প্রদায় বিলাসিতা পরিত্যাগ করুন—অন্যথা উন্নতির পথ কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখা এক্ষণে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনতম সৎ প্রথার প্রত্যাবর্ত্তন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের সদ্গতির অন্য উপায় আর কিছুই নাই। তাহা হইলেই, বক্তা যে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, এরূপ ভাবে চলিলে আর কিঞ্চিৎ কাল পরেই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এইরূপ কোন প্রকার আতঙ্কই উপস্থিত হইবে না। কেননা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র শাশ্বত—নিত্য—সনাতন ইত্যাদি।

১৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সভাপতি ও প্রবন্ধপাঠক—উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ করিলে পর সভা ভঙ্গ হইল। ইতি

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদক।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ

সভাপতি।

১৩১১ সাল ১০ই পৌষ—১৯০৪। ২৫শে ডিসেম্বর। রবিবার।

বাহন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিতর্ক হইবে, বেদাদিতে এই সকল বানর, সর্প ও মহিষাখ্য লোকদিগের কোন কথা দৃষ্ট হয় না কেন? মূল বেদচতুষ্টয় ভিন্ন বহু বৈদিক গ্রন্থ আছে, যাহা অনেকের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই, সুতরাং অপ্রাপ্ত বেদ ব্রাহ্মণাদি কোন বৈদিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় নাই, তাহা বলা যায় না। আমরা মহাভারতাদিতে সরমা নামক এক দেবশুনীর নির্দ্দেশ দেখিতে পাইয়া থাকি, ঋগ্‌বেদেও উক্ত সরমার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত রহিয়াছে। বর্ণনা হইতে জানা যায়, সরমা পুচ্ছবতী কুকুরী ছিল না, পরন্তু অতীব প্রতিভাশালিনী মানুষী ছিলেন। মহাভারতে বিবৃত আছে;—

> তেষু তৎসত্রমুপাসীনেষু আগচ্ছৎ সারমেয়ঃ ১। জনমেজয়স্তু ভ্রাতৃভিরভিহতো রোরূয়মাণো মাতুঃ সমীপ মুপাগচ্ছৎ। ৩। তম্‌ মাতা প্রত্যুবাচ ব্যক্তং ত্বয়া তত্রাপরাদ্ধং যেনাস্যভি হতঃ। স তাম্‌ পুনরুবাচ নাপরাধ্যামি কিঞ্চিৎ ন অবেক্ষে, হবীংষি নাবলিহ ইতি। ৬। জনমেজয় এবমুক্তো দেবশুন্যা সরময়া ভৃশং সম্ভ্রান্তো বিষণ্ণ শ্চাসীৎ। ১০। ৩ অ—আদিপর্ব্ব।

জনমেজয়ের শ্রুতসেনাদি তিন ভ্রাতা যজ্ঞ করিতেছিলেন। দেবশুনী সরমার পুত্র তথায় গমন করিলে সে শ্রুতসেনাদি দ্বারা প্রহৃত হয়। সরমার পুত্র রোদন করিতে করিতে মাতাকে অবস্থা জানাইলে, সরমা বলিল, নিশ্চয় তুমি কোন অপরাধ করিয়াছিলে। সরমাতনয় বলিল, না কোন অপরাধই করি নাই, আমি কোন যজ্ঞীয় বস্তুতে দৃষ্টিও দিই নাই, যজ্ঞের ঘৃতও লেহন করি নাই। তাহাতে সরমা শাপ দেন, জনমেজয় শাপশ্রবণে সন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হয়েন।

মহাভারতের এই বর্ণনাও পৌরাণিক ভ্রান্তিসন্দুষ্ট। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও দেবশুনীকে জন্তু কুকুর বলা হইয়াছে, মহাভারত তাহার অনুগামী হইয়া কলুষিত। কুকুরে কথা কয়, কুকুরে শাপ দেয়, ইহা পুঁথির গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাস বা কোন কৃত্রিম ব্যাস সরমাকে কুকুরী ঠিক করিলেন, কাজেই তাহার বাচ্চাকেও কুকুরের বাচ্চা স্থির করিয়া তাহাকে কুকুরভাবেই বর্ণনা করিলেন যে, "আমি কিছুর উপর দৃষ্টি দিই নাই, ঘৃতও চাটি নাই।" ভ্রান্তির দাস নীলকণ্ঠও টীকা মুখে বলিলেন—"সারমেয়ঃ শ্বা"।

> কুক্কুটঃ পক্ষবাতেন শ্বা দৃষ্ট্যান্নং প্রদূষয়েৎ।

কোন খাদ্যে মুরগীর পাখার বাতাস ও কুকুরের দৃষ্টি পড়িলেই তাহা দূষিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই দেবশুনী সরমাও পুচ্ছবতী কুকুরী ছিলেন না, এবং তৎপুত্রও পুচ্ছবান্‌ সারমেয় বা শ্বা ছিল না। মেদিনী লিখিতেছেন;—

> সরমা কুক্কুরীদেবশুন্যোঃ স্যাৎ রাক্ষসীভিদি।

সরমা দেবশুনী তাহা ধ্রুবই, কিন্তু সরমার অর্থ জন্তু-কুকুরী নহে, এবং এখন যে সারমেয় বলিলে আমরা জন্তু-কুকুর বুঝিয়া থাকি, তাহাও এই ভ্রান্তির শাখা-প্রশাখা-বিশেষ মাত্র। ঋগ্‌বেদে এই দেবশুনী সরমার বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সায়ণ প্রথম মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ৩য় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

> সরমানাম দেবশুনী পণিভির্গোষু অপহৃতাসু তদ্গবেষণায় তাং সরমাং ইন্দ্রঃ প্রাহৈষীৎ। যথা লোকে ব্যাধো বনান্তর্গতমৃগান্বেষণায়

খানং বিসৃজতি তদ্বৎ। সা সরমা এব মবোচৎ হে ইন্দ্র অস্মদীয়ায় শিশবে তদ্গো সম্বন্ধি ক্ষীরাদ্যন্নং যদি প্রযচ্ছসি তর্হি গমিষ্যামীতি।

সরমা নামে একজন দেবশুনী ছিলেন। পণিনামক অসুরেরা (বর্ত্তমান ফিনিশীয়গণ) অঙ্গিরাদিগের গো অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে ইন্দ্র সেই গবান্বেষণের নিমিত্ত সরমাকে পণিদিগের দেশে পাঠাইয়া দেন। যেরূপ লোকে বনমধ্যগত মৃগের অন্বেষণে কুক্কুর পাঠাইয়া থাকে, দেবশুনী সরমাও সেইভাবে প্রেরিত হয়। তখন সরমা বলিয়াছিল, হে ইন্দ্র! যদি আপনি আমার পুত্রকে সেই গো-সমূহের দুগ্ধরূপ অন্ন দান করেন, তবে আমি যাইতে পারি। যাস্ক ও দুর্গাচার্য্য দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন,—

দেবশুনী ইন্দ্রেণ প্রহিতা পণিভিরসুরৈঃ সমূদে ইত্যাখ্যানম্। যাস্ক। "দেবশুনী ইন্দ্রেণ প্রহিতা" ইতি নিদান প্রখ্যাপনম্ মন্ত্রার্থাভিব্যক্তয়ে "সমূদে" সংবাদং কৃতভবতীত্যর্থঃ। ইত্যাখ্যান বিদঃ এবং মন্যন্তে।

সুতরাং বুঝা গেল, কি মহাভারত, কি নীলকণ্ঠ, কি যাস্ক, কি দুর্গাচার্য্য অথবা কি সায়ণাচার্য্য, কেহই "দেবশুনী" টা যে কি পদার্থ, তাহার অভিব্যক্তিবিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। নীলকণ্ঠ সরমাশুনীকে সাদা কথায় জন্তু-কুক্কুর ঠিক করিয়া লইয়াছেন, কেন না স্বয়ং মহাভারতই তদ্বক্তুকাম। সায়ণও ব্যাধদিগের কুক্কুরের সহিত সরমাকে তুলিত করিয়া যেন সরমার কুক্কুরত্বই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাস্ক ও দুর্গাচার্য্য ধরা পড়িবার ভয়ে উহার কোন কিনারা দিয়া পা বাড়ান নাই। বরং তাঁহারা ১ম মন্ত্রের যে এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, উহা আরও অত্যদ্ভুততম। যাহা হউক, দেবশুনী সরমা যে জন্তু-কুক্কুরী নহে, পরন্তু কুক্কুরাখ্যাধারিণী দেবকন্যা-বিশেষ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। বানর, ঋক্ষ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, ও কুক্কুর শব্দ তখন মনুষ্যদিগের আখ্যাবিশেষ ছিল। আমরা নিম্নে সরমাঘটিত কয়েকটী মন্ত্রের অধ্যাহার করিলাম, সকলে তৎপাঠেই বুঝিতে পারিবেন, সরমা জন্তু-কুক্কুরী ছিলেন না, পরন্তু প্রতিভাশালিনী দেবকন্যা ছিলেন।

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানট্
দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাঽস্মে হিতিঃ কাপরিতক্ম্যাসীৎ
কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি॥ ১

হে সরমে! তুমি কি জন্য আমাদিগের এখানে আসিয়াছ? পথ ত কম নয়? অতি-গমনসমর্থ ব্যক্তিও ত এত দূর আসিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? আসিতে কত রাত্রি লাগিল? নদীর জলই বা কিরূপে পার হইলে? সরমা বলিল,—

ইন্দ্রস্য দূতী রিষিতা চরামি
মহইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্ বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবৎ
তথা রসায়া অতরং পয়াংসি॥ ২

হে পণিগণ! আমি ইন্দ্রের দূতীরূপে প্রেরিত হইয়া এখানে আসিতেছি, এবং তোমাদিগের নিকট হইতে অঙ্গিরাদিগের অপহৃত গোরূপ মহাধন গ্রহণ করাই আমার অভিলাষ। আমার দ্রুতগমন দেখিয়া জল যেন ভয়েই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, কোন কষ্ট দেয় নাই। তাই আমি নদীর জল পার হইতে সমর্থ হইয়াছি।

কীদৃঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা
যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আচগচ্ছান্ মিত্র মেনা দধাম,
অথ গবাং গোপতি র্নো ভবাতি॥ ৩

হে সরমে! তুমি যাঁহার দূতী হইয়া অতি দূর দেশ হইতে এখানে আসিয়াছ, তোমার সেই ইন্দ্র কিরূপ পরাক্রমশালী? তিনি দেখিতেই বা কেমন? ইহা বলিয়া পণিরা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, এ যখন আসিয়াছে, তখন ইহাকে মিত্রভাবেই গ্রহণ করা হউক, আমরা যে গরু আনয়ন করিয়াছি, তাহাও লইয়া যাউক। সরমা বলিল,—

নাহং তং বেদ দভ্যম্ দভৎ স
যস্যেদং দূতী রসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা
হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে। ৪

হে পণিগণ! আমি যাঁহার দূতী হইয়া দূর দেশ হইতে আসিয়াছি, সেই ইন্দ্রকে কেহ হিংসা করিতে সমর্থ, ইহা আমি জানি না, তিনিই সকলকে হিংসা করিয়া থাকেন। এই খরতরস্রোতা গভীর নদীসকলও তাঁহার গতি রোধ করিতে সমর্থ নহে। হে পণিগণ! তোমরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রহস্তে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইবে। পণিগণ বলিল,—

ইমাগাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ
পরিদিবো অন্তান্ সুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অবসৃজাদযুধ্বী
উতাস্মাক মায়ুধা সন্তি তিগ্মা। ৫

হে সুভগে! তুমি সুদূর স্বর্গপ্রান্ত হইতে এখানে আসিয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে নিরাশ করিতে চাহি না। তুমি এই গাভী সমূহের মধ্যে যতগুলি ইচ্ছা হয় লইয়া যাও। কে তোমাকে বিনা যুদ্ধে এই সকল গাভী লইতে দিত? আমাদিগেরও তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বহু আয়ুধ আছে। সরমা বলিল,—

অসেন্যাবঃ পণয়ো বচাংসি
অনিষব্যা স্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা
বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ। ৬

হে পণিগণ! তোমাদিগের এই সকল উক্তি সৈনিকপুরুষের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা অপরাধী, তোমাদের এই দেহ যেন ইন্দ্রের শরব্য না হয়। তোমরা সারল্য অবলম্বন কর। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাদিগের গোহরণ-অপরাধ ও এই পরুষোক্তি ক্ষমা করিবেন না। তোমরা সহজে নম্রভাবে গাভী প্রত্যর্পণ না করিলে তোমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইবে। পণিরা বলিল,—

অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো
গোভিরশ্বেভির্বসুভি র্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা
রেকু পদ মলকমা জগন্থ। ৭

হে সরমে! এই আমাদিগের ধনভাণ্ডার, উহা পর্ব্বত দ্বারা সুরক্ষিত। আমাদের গো, অশ্ব ও অন্যান্য সমুদায় ধনরত্নে ইহা পরিপূর্ণ। ইহা স্বভাবতই দুরধিগম্য। তাহার পর ধনরক্ষণসমর্থ বহুসংখ্যক পণি ইহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এ অতি ভীষণ স্থান, তুমি এখানে বৃথা আগমন করিয়াছ। সরমা বলিল,—

এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা
অযাস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এত মূর্ব্বং বিভজন্ত গোনা
মথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ। ৮

হে পণিগণ! সোমপানপ্রমত্ত মহর্ষি অযাস্য ও নয় মাসে যজ্ঞসম্পাদনকারী অঙ্গিরোগণ এখানে আগমন করিবেন, এবং আপনাদের গোসমূহ ভাগ করিয়া লইবেন। সুতরাং তখন তোমাদের "সরমে কেন বৃথা আসিয়াছ" এই উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। পণিরা বলিল,—

এবাচ ত্বং সরম আজগন্থ
প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মাপুনর্গা
অপতে গবাং সুভগে ভজাম। ৯

হে সুভগে! দেবতারা তোমাকে বল পূর্ব্বক গো অন্বেষণে পাঠাইয়াছেন, তাই তুমি

আসিয়াছ। আমরা তোমাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া স্বর্গে যাইও না, এইখানেই থাক, তুমি গরুর ভাগ পাইবে। সরমা বলিল,—

নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্ব
মিন্দ্রোবিদু রঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গো কামা মে অচ্ছদয়ন্যদায়
মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ॥ ১০

হে পণিগণ! আমি ভাই ভগিনী সুবাদের কিছু জানি না। দেবরাজ ইন্দ্র ও ভীষণস্বভাব অঙ্গিরারাই তাহা জানেন। তাঁহারা আমাকে গরুর জন্যই পাঠাইয়াছেন। এবং যখন আমি এই জন্যই আসিয়াছি, তখন তোমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাও, উহাই তোমাদিগের পক্ষে মঙ্গলকর। সরমা আরও কহিল,—

দূরমিত পণয়ো বরীয়
উদ্গাবো যন্ত মিনতী র্ঋতেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগূঢ়াঃ
সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ॥ ১১—
১০৮সূ—১০ম

হে পণিগণ! যদি ভাল চাও, তাহা হইলে এখান হইতে দূরে পলায়ন কর। উৎপীড়িত গাভীসকল ভালয় ভালয় এখান হইতে চলিয়া যাউক। এই সংগোপিত গাভীদিগের কথা, ইন্দ্র, অঙ্গিরোগণ, মেধাবিগণ, এমন কি, সাম ও সোম নিষ্পেষক প্রস্তরখণ্ডেরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছে। তোমরা কিছুতেই এ গাভী রাখিতে পারিবে না।

এখন সকলে স্বাধীনচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, লোকাতীত প্রতিভাশালিনী বীরপুরুষোচিত দার্ঢ্যসম্পন্না হনুমানের ন্যায় স্বকার্য্যসাধনতৎপরা এই দেবশুনী সরমা বস্তুতই পুচ্ছবৎকুক্কুরগেহিনী,না কুক্কুরাখ্য মনুষ্যদুহিতা? সরমা ইন্দ্রের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র মরুদ্গণের সহায়তায় গোহরণকারী বলাসুর ও তদীয় অনুচর উক্ত পণিগণকে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত করিয়া গাভী সকল উদ্ধার করিয়া অঙ্গিরোগণকে প্রদান করেন। সরমার পুত্রকেও প্রতিশ্রুত পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ
সরমা তনয়ায় ধাসিং।
বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গাঃ
সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ॥ ৩—৬২সূ—১ম

“ইন্দ্র ও অঙ্গিরোগণ যে সরমাকে গাভী অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সরমা আপন পুত্রের নিমিত্ত অন্ন অর্থাৎ জীবিকার্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি অর্থাৎ সর্ব্বোপরি প্রধান ইন্দ্র যাইয়া পণিরা যে পর্ব্বতে গরু লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভেদ করেন অর্থাৎ অসুরগণকে বধ করিয়া গাভীসকল লাভ করেন, এবং সেই ইন্দ্রাদি নেতৃবৃন্দ গাভীগণের সহিত হর্ষসূচক আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই যে যাস্ক, দুর্গাচার্য্য ও ভট্ট মোক্ষমূলর এই সরমাঘটিত প্রথম ঋকটীর একটী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বেদার্থের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছেন। যাস্ক ও দুর্গাচার্য্য দ্ব্যর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, “বাক্ বৈ সরমা”—সরমা অর্থ মাধ্যমিকা বাক্ এবং ইহা একটী মেঘ ও গর্জনাদি বিষয়ক বিবৃতি। মোক্ষমূলার বলেন, সরমা অর্থ—উষা, গাভীগণ অর্থ পূর্ব্বরশ্মিরঞ্জিত মেঘখণ্ড। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সরমার পুত্রের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তিবিষয়ে কি অর্থ সঙ্গত করিতে হইত? ধন্য একদেশদর্শিতা! আরও আশ্চর্য্য এই যে, সরমাকে সকলেই দেবশুনী বলিলেন, অথচ তাহার কোন অক্ষরার্থ পরিষ্কার করিয়া দিলেন না। সায়ণ বলিলেন;—“সরমা সরণশীলা এতন্নামিকা দেবশুনী”। যাস্ক বলিলেন;—

"দেবশুনী ইন্দ্রেণ প্রহিতা, পণিভিরসুরৈঃ সমূদে" ইত্যাখ্যানং। দুর্গাচার্য্যও বলিলেন;—ইন্দ্রঃ সরমাং প্রাহিণোৎ"। সায়ণ উপরিধৃত ঋকের ব্যাখ্যাকালে একটী বিস্তৃত বিবরণও দিয়াছেন, অথচ "দেবশুনী" কথাটীর কোন ব্যাখ্যা ভাঙ্গিয়া দেন নাই। ফলতঃ এ দেশের লোকেরা বহুকাল যাবৎ এই হংসবাহন, বৃষবাহন, ময়ূরবাহন ও মহিষবাহন প্রভৃতি কথা শুনিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই যাস্ক সায়ণাদিও ধরা পড়িবার ভয়ে উহার আর কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। বানরে ব্যাকরণ পড়ে, সংস্কৃতে কথা কয়, শ্রাদ্ধশান্তি করে,'সেতুছাও' করে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়, এবং কুকুরে দৌত্যকার্য্য করিয়া পুত্রের জন্য পুরস্কার লয়, আমার বোধ হয়, মানুষের আত্মা লইয়া কোন ব্যক্তি ইহা প্রাণে স্থান দিবেন না। বোধ হয়,প্রত্যেক বিবেকশীল ব্যক্তিই অতঃপর মনে স্থান দিবেন যে,উপাস্য ব্রহ্মার চারিখানা মুখ ছিল না, উহা উত্তরকুরুবাসী বেদবিদ্‌ মানুষ-ব্রহ্মার উপাধি, এবং উপাস্য-ব্রহ্মার কোন রাজহংসও বাহন ছিল না, "হংস-বাহন" কথাটীও উক্ত মানুষ-ব্রহ্মার উপাধিবিশেষ ছিল, এবং শঙ্করাচার্য্য যে যমকে গলঘণ্ট মহিষে চড়াইয়া ভীত হইতেছিলেন, উহারও কোন নিদান নাই, শিবের বুড়া বলদে চড়ার কথাও গঞ্জিকা লীলাবিশেষ।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

ইরাণ মুলুক্‌।

আসিয়া মহাখণ্ডের যে দেশকে বঙ্গভাষায় আমরা পারস্য এবং ইংরাজিতে পার্শিয়া বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত নাম ইরাণ মুলুক্‌। যাবনিক ভাষায় মুলুক্‌ শব্দের অর্থ দেশ; বাঙ্গালায় অপভ্রংশে ইহাকে মুলুক বলা হইয়া থাকে। মুলুক্‌ শব্দ হইতে মিল্‌কিয়ৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সে কালের বাঙ্গালায় এই শব্দ নিত্য ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, ইহার অর্থ "সম্পত্তি"। ইরাণ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেশ, ইহার বৈদিকযুগের সমসাময়িক ইতিহাস অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইরাণ শব্দ সংস্কৃত আরিয়া (অর্থাৎ আর্য্য) শব্দের রূপান্তর মাত্র। অতি প্রাচীনকালে ইহা সনাতন হিন্দুর দেশ ও হিন্দুর রাজ্য ছিল, তদনন্তর অগ্নি-উপাসনাকারী এক সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুধর্ম্মকে রূপান্তরিত করিয়া অগ্নি-উপাসক পার্শী নামে প্রসিদ্ধ হয়েন; বহুকাল ব্যাপিয়া প্রাচীন পারস্যদেশে এই পার্শীকদিগের প্রভুত্ব, প্রভাব, নিবাস ও রাজত্ব ছিল। তদনন্তর এই দেশ মুসলমানের হস্তগত হয়। যবনেরা পারস্য আক্রমণ ও পারস্যে শাসন বিস্তার করিয়া পার্শীকদিগের প্রতি নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে; অগ্নির উপাসকগণ দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর ম্লেচ্ছের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া পৃথিবীর নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ডিউ বা দিউ নামক স্থানে পলায়িত পার্শীগণ আগমন করিয়া এক দ্বীপাকার গ্রামে সর্ব্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে, কালক্রমে সমগ্র গুজরাট, কাটিয়াবাড়, সিন্ধুপ্রদেশ প্রভৃতি স্থলে ইহারা বিস্তৃত হইয়া

পড়ে। উত্তরোত্তর অগ্নি-উপাসক পার্শীগণ গুজরাটে বাণিজ্য, ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা গুজরাটীদিগের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, গুজরাটী ভাষা এক্ষণে পার্শীকদিগের মাতৃভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পার্শীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম জেন্দাবস্তা, ইহা বাইবেল ও কোরাণ হইতে পুরাতন। ইহাদের আদিভাষার নাম জেন্দ, তাহা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। সমগ্র জেন্দাবস্তা এই ভাষায় লিখিত। পার্শীকগণ যখন ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছিল,তখন ইহারা ইহাদের সঙ্গে পাত্রমধ্যে উপাস্য অগ্নিদেবকে আনয়ন করিয়াছিল, যে পাত্র মধ্যে অগ্নি আনীত হইয়াছিল, সেই পাত্র এবং তন্মধ্যস্থ অগ্নি "উদ্বাড়া" নামক স্থানে এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহাপেক্ষা পুরাতন অগ্নি ভারতবর্ষে আর নাই। উদ্বাড়া গ্রাম, বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের উপরে একটা ষ্টেশন। তথায় ঐ অগ্নি এখনও তথাকার মন্দিরে দিবারাত্র জ্বলিতেছে। ইহা কখন নির্ব্বাপিত হইতে পায় না। প্রচুর পরিমাণে চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃত নিয়ত প্রস্তুত থাকে। পার্শীকগণ মাংসাশী; গো, শূকর প্রভৃতি সকল প্রকার মাংসই ব্যবহার করে; কিন্তু তামাকুর ধূমপান করে না, কারণ তাহা হইলে অগ্নিদেবকে উচ্ছিষ্ট করা হয়। প্রত্যেক পার্শী নরনারী বৈশ্বানরের উপাসক। এই প্রথা তাহারা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। পার্শীরা সূর্য্যদেবকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকে। ইহাদের মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত অথবা শ্মশানে দগ্ধ হয় না। "শান্তি-স্তম্ভ" (Tower of Silence) নামক উচ্চ স্তম্ভের উপরে মৃতদেহকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শকুনি, গৃধ্র, কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ তাহা আহার করে।

সমগ্র ইরাণ মুলুক্ এক্ষণে মুসলমানের হস্তগত। তথাকার নরপতি "সা" উপাধিতে আখ্যাত হইয়া থাকেন। পারস্যের যবনেরা তুরস্কদেশের যবনবৃন্দের ন্যায় সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। ইরাণ দেশের ম্লেচ্ছগণ "সীয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত। সীয়ারা মহম্মদের জামাতা ও তাহার পুত্রগণকে (অর্থাৎ মহম্মদের দৌহিত্রগণকে) খুব মান্য করে; সৈয়দগণ মহম্মদের জামাতা আলি নামক ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। সুন্নীগণ মহম্মদের পরবর্ত্তী চারিজন প্রধান লোককে "ইমাম" বলিয়া মান্য করে। সীয়া ও সুন্নী মধ্যে পরস্পর প্রায়ই কলহ হইয়া থাকে, কখন কখন ভয়ানক যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঘটিতে বাকি থাকে না। যাহা হউক, পারস্য দেশ দেখিবার যোগ্য। এখানকার শোভা নিতান্ত চিত্তহারিণী। যেখানেই যাও, কৃত্রিম এবং নৈসর্গিক শোভায় তোমার মনপ্রাণ মোহিত হইয়া যাইবে। নরনারীর সুন্দর মুখ, সুন্দর দেহ এবং সুন্দর পরিচ্ছদ অত্যন্ত শোভাময় বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বত্রই সুগন্ধ প্রসূনপুঞ্জ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এক এক স্থানের পুষ্পকুঞ্জ অতীব মনোমোহন। তদ্ভিন্ন সমুদ্রের শোভা, নগরের শোভা, নানাবিধ ফলফুল, নির্ম্মল সলিলের সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যকারিতা অতীব প্রশংসনীয়। পারস্যদেশ এবং পারস্যভাষা, পণ্ডিতপুঞ্জে এবং পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। অনেক ভুবন-বিখ্যাত কবি ও চিত্রকর এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পারস্যদেশ কবি ও ছবির দেশ। এক সময়ে ইহা ইউরোপের প্যারিসের ন্যায় সৌখীন ছিল। ইহা আসিয়া মহাদেশের প্যারিস সহর। এমন বিলাসিতাও কেহ কখন দেখে নাই, অথচ এত বিলাসিতার মধ্যে বীরত্বও কম ছিল না। কিন্তু এখন সে সকলের কিছুই নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের অপেক্ষা

বর্ত্তমান পারস্তের মুসলমানদিগের অবস্থা অধিকতর উন্নত বলিয়া বোধ হয় না। পারস্তের রাজা স্বাধীন হইলেও, ইরাণের সৌভাগ্য-সূর্য্য এক্ষণে নানা কারণে অনুন্নতি-রূপ অন্ধকারময় মেঘে সমাচ্ছন্ন।

ভারতবর্ষ হইতে পারস্তদেশে যাইতে হইলে, দুই তিনটি পথ দিয়া যাওয়া যায়। স্থলপথের মধ্যে আফ্‌গানিস্থান কিংবা বেলুচি-স্তানের পথ প্রশস্ত, কিন্তু নানা কারণে ভারতবাসীর পক্ষে জলপথই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাষ্পীয় তরণী-যোগে গমনাগমন করা অধিকতর সুবিধাজনক। বোম্বাই হইতে বৃটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টীমার-যোগে বুসায়ার নগরের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ১৮০৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৯০৲ টাকা। বশোরা নগরের ভাড়া, প্রথম শ্রেণীতে ২০০৲ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০০৲ টাকা। মস্কট নগরের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ১১০৲ টাকা। বাষ্পীয় তরণীতে আরোহণ করিয়া পরিব্রাজকেরা দুই তিনটি বা ততোধিক জলপথ দিয়া ইরাণ যাইতে পারেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলে গিয়া যদি ১লা জানুয়ারি তারিখে বৃটীশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম-নাভিগেশন কোম্পানীর ডাক-জাহাজে আরোহণ করা যায়, তাহা হইলে বেরাবল, মাংগোল, পোরবন্দর পার হইয়া ৩রা জানুয়ারী করাচিতে পৌছিতে পারা যায়। তাহার পরে শমি ও গদোর অতিক্রম করিয়া ৯ই জানুয়ারী মস্কটে এবং তদনন্তর জাশ্‌ক্, বন্দর আব্বাশ, দুবাল, লিংগা, বেরীং পার হইয়া ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বুসায়ারে উপনীত হওয়া যায়। ১৫ই জানুয়ারীতে করোট্, ১৭ই জানুয়ারী ফাও, ১৯শে জানুয়ারী মাহমারা এবং ২১শে জানুয়ারী দিবসে বশোরা নগরে পৌছিতে সক্ষম হওয়া যায়। মস্কট্ পারস্তরাজ্যের অন্তর্ভূত। বুসায়ার ইংরাজের অধীন। বন্দর আব্বাশে ইংরাজ ও পারস্তের অধিকার আছে। মস্কট হইতেই পারস্তোপসাগর আরম্ভ। মস্কট হইতে আরম্ভ করিয়া বশোরা পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক সুবিধামত পথিকেরা পারস্তদেশে প্রবেশ এবং ঐ দেশে পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

পারস্তের উত্তরে রুসিয়া এবং কাস্পীয়ান সাগর, পূর্ব্বে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে পারস্ত উপসাগর এবং পশ্চিমে তুরস্ক। এই দেশের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের নাম য়েল্‌বর্জ্জ, তাহার সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম দেমাবন্দ্, ইহার উচ্চতা অষ্টাদশ সহস্র ফিট। ইরানের পূর্ব্ব ও মধ্য অংশ মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। ইহার স্থানে স্থানে লবণের হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। উরুমায়া নামক হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। নদীর মধ্যে করুণানদী প্রধান। ইরাণদেশে গ্রীষ্মকালে যেমন প্রখর উষ্ণতা অনুভূত হয়, শীত ঋতুতে তদনুরূপ শৈত্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। গম, চাউল, তুলা, তামাক, পোস্তগাছ, তুঁতেগাছ প্রভৃতি সর্ব্বত্র যথেষ্ট। গোলাপফুলের গাছ এবং বহুবিধ সুন্দর ও সুস্বাদ ফলের গাছ প্রায় সকল স্থানে বিদ্যমান। সীরাজ নামক নগরে নানাবিধ পুষ্প ও ফলে মদিরা প্রস্তুত হয়। উষ্ট্র, অশ্ব, মেষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি সকল প্রকার পশু এ দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। গাভী ও বলদের সংখ্যা তুলনায় কম। জাঠ নামক হিন্দুজাতি পারস্ত দেশের প্রধান প্রধান স্থানে বাস করে, ইহাদের ব্যবসায় ও বাণিজ্য অতীব বিস্তৃত। পারস্ত মুল্‌কের নরনারী সুন্দর ও সুন্দরী, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বদনমণ্ডলে এত প্রকার রং ব্যবহার করে যে, তাহা দেখিলে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের

যাত্রাওয়ালার "সং" বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশিনী এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোক নীলবর্ণের "দোপাট্টা" ব্যবহার করে। পল্লীগ্রামে পর্দ্দার প্রচলন অধিক নাই। যশোরা নগরের রমণী যেমন সুন্দরী, তথাকার গোলাপফুলও তেমনি শোভা ও সৌন্দর্য্যের জন্ম ভুবনবিখ্যাত।

পারস্যের লোকেরা প্রধানতঃ রোটি খাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের রোটি অত্যন্ত স্থূল হয়। ডিম্ব, পনির, মাখন, মাংস, ফল ও সর্ব্বৎ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৎস্য সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বড় বড় গৃহস্থে গড়ে প্রতি সপ্তাহে তিনবার "পোলাও" প্রস্তুত হইয়া থাকে। আহারের প্রথমে "বিশ্‌মিল্লা" না বলিলে কেহ আহার করিতে পায় না। ভোজনের শেষে জল ব্যবহার করিয়া উত্তমরূপে হস্ত ও মুখ ধৌত করিবার প্রথা আছে। বড়লোকের আবাস-গৃহ আকারে বড়, কিন্তু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি সংখ্যায় কম; গরীব লোকের ঘর অধিকাংশ কর্দ্দমে নির্ম্মিত হয়। দরিদ্র লোকেরা দিবসে দুই তিনবার স্নান করে; প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামে গরম জলে স্নান করিবার জন্ম সরকারী স্নানাগার আছে।

পারস্যদেশে অতি শৈশবাবস্থায় কুমারীর বিবাহ হয়। অধিকাংশ বিবাহ এইরূপ; কখন কখন ততোধিক বয়সেও বিবাহ হইয়া থাকে। প্রথম দিনে বর ও কন্যা একত্র দণ্ডায়মান হইলে বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব, গ্রামবাসী, জ্ঞাতি প্রভৃতি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গীত গায়। দ্বিতীয় দিনে কন্যার হস্ত দুইটী হেনা ফুলের রসে চিত্রিত করা হয়। তৃতীয় দিবসে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, বর ও কন্যা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করে। চতুর্থ দিবসে বর একখণ্ড মিছরি কামড়াইয়া কন্যাকে খাইতে দেয়, এই ঘটনার পরে বিবাহটি শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ইরাণের মুসলমান, চারিজন স্ত্রীলোককে এক কালে বিবাহ করিতে পারে। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা অতি সুন্দর কার্পেট বুনিয়া থাকে। পারস্যদেশীয় কার্পেট অতীব মনোহর, মূল্যবান্ এবং ভুবনবিখ্যাত। শাল, রেসমী পরিচ্ছদ, তরবারির খাপ্, টুপি প্রভৃতির জন্যও ইরাণদেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইরাণীয় লোকেরা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী; কথায় কথায় দুইশত বার শপথ করে এবং দুইশত বারই অসত্য কথা কহিয়া থাকে। যাঁহারা পারস্যদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইরাণী পুরুষ ও স্ত্রীলোককে শত শতবার শপথ করিতে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন; শপথের প্রথা এইরূপ—"যদিও আমি ইরাণী, তথাপি আমার কথা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না, কারণ আমি শপথ করিয়া এই কথা কহিতেছি।" তাহা হইলেই বুঝা গেল, প্রাচীনকাল হইতে পারস্যদেশ যেন মিথ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। সত্যাসত্য বিষয়ে পারস্য অপেক্ষা তুরস্ক ভাল। তুর্কীরা ইরাণী অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তুরস্কের লোক "বাবুর"-ন্যায় উপবেশন করে, ইরাণী লোক গোলামের ন্যায় বসে। তুরস্ক টোপি ইরাণী টোপি হইতে অধিকতর সুন্দর। তুর্কীগণ গম্ভীর ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, পারস্যের লোক ছ্যাব্‌লা এবং বৃথা বাক্যবিশারদ। তুর্কীর লোক স্বার্থত্যাগী, ইরাণের লোক ঘোরতর স্বার্থপর।

প্রায় পঞ্চবিংশশত বৎসর পূর্ব্বে সাইরশ্ নামক বিদেশীয় নরপতি প্রাচীন পারস্যের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইরাণদেশ হস্তগত করেন। সাইরশের সময়ে পারস্যের খুব উন্নতি হয়। তদনন্তর খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ সেকেন্দর বাদসাহ সমগ্র ইরাণকে হস্তগত করেন, তাহার

পরে পার্থীয়ানগণ এবং তদনন্তর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানগণ পারস্যের শাসনকর্ত্তা হয়েন। ১৭৭২ অব্দে আফগানেরা পারস্য-দেশ জয় করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু অতি অল্প-কাল মধ্যে নাদির সা নামক রাজার বীর্য্য-বত্তায় ইরাণদেশ আবার স্বাধীন হয়।

পারস্যের রাজধানী টেহেরান, সমুদ্রতীর হইতে ইহা প্রায় ৩৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। রাজধানীর উত্তরে য়েল্‌বর্জ্জ পর্ব্বতমালার সুন্দর শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। নগর মধ্যে বহুসংখ্যক ফোয়ারা, উদ্যান, অট্টালিকা, পুষ্পকুঞ্জ এবং তদ্ব্যতীত রাজার ছয়টি প্রাসাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। টেহেরাণ হইতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ অন্তরে এক সুন্দর ও বৃহৎ মশিদ আছে, সম্রাটেরা তাহাতে প্রবেশ করিয়া ভগবানের উপাসনা করেন। এই মশিদ দেখিবার যোগ্য; সম্রাট্‌ আবদুল আজিম এই মশিদের নির্ম্মাতা। সিরাজ নগর ইরাণদেশের রাজ-ধানী নহে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত প্রাচীন এবং অত্যন্ত শোভাময়। আমার বিবেচনায়, সিরাজ নগর টেহেরাণ হইতে ক্ষুদ্রাকার হইলেও শোভায় ইহা রাজধানীকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছে। অনেক ভুবনবিখ্যাত কবি সিরাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরাজ সহরে অনেক বড় বড় লোকের জন্ম হইয়াছিল। সিরাজের ফুল, ফল, উদ্যান, বিলাস, সৌখীনতা, পারিপাট্য প্রভৃতি দেখি-বার যোগ্য। কোন কোন স্থান যেন ঠিক ইন্দ্রভবন বলিয়া ভ্রম হয়। সিরাজের পুরুষ ও স্ত্রীলোক টেহেরাণের নরনারী অপেক্ষা অধিকতর সৌখীন। তুরস্কের মুসলমানেরা যে একবারে সুরা পান করে না তাহা নহে, অনেক ঘোরতর মাতাল তুর্কীদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তুলনায় ইরা-ণের মোসলমানেরা অধিকতর মদ্যপায়ী। সিরাজের অধিবাসীরা পারস্যদেশীয় অন্যান্য স্থানের মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর সুরা-পায়ী, কিন্তু সিরাজের লোকেরা যে সুরা পান করে তাহা গুণকারক, সুগন্ধ সুরুচিকর এবং মূল্যবান্‌। সিরাজেরা মদিরা, ইউরোপে অতীব প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের সঙ্গে পারস্য দেশের তুলনায় কয়েকটা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভারত-বর্ষের মুসলমান ও পার্শীকের সঙ্গে ইরাণের মুসলমান ও পার্শীকের আচার, বিচার এবং শারীরিক ও মানসিক তেজের পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু এই পার্থক্য বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইহা-দের সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নীতি প্রায় এক; ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অধিক ভেদ নাই; সুতরাং "বিশেষ পার্থক্য" পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু পারস্যের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও সমরনীতি উচ্চ অঙ্গের নহে। হিন্দি, উর্দ্দু, গুজরাটী প্রভৃতির ন্যায় পারস্য ভাষা একটা Dialect নহে, ইহা একটা উচ্চ অঙ্গের Language; কেবল Language বলিলে যথেষ্ট হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ Classical language বলিয়া গণ্য। এই ভাষায় অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তথাপি ইহা অতীব উচ্চ অঙ্গের ভাষা। আরব্য, গ্রীক, হিব্রু, জেন্দ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন ভাষা হইতে পারস্য ভাষার যথেষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি পার্শী বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। পারস্য ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে লিখিতে ও পড়িতে হয়। আরব্য যেমন কঠিন ভাষা, পারস্য তেমনি সহজ। একজন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দেড় বৎসর কাল মধ্যে পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

পারস্যের শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিতে আমি সম্মত নহি। এখানকার উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের হৃদয় বিশেষ উন্নত নহে।

জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদ স্পষ্টরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। দরিদ্রের প্রতি ধনীর সহানুভূতি প্রায়ই নাই। ধর্ম্মভাব ও স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা তামসিকতা এবং স্বার্থপরতা অধিকতর প্রবল। রাজভক্তি কেবল মুখের কথা; প্রজাসাধারণ সততই অসন্তুষ্ট। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে রুশের ন্যায় ইরাণ দেশে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণ উত্থিত হইয়াছে। পারস্যের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, তথাকার অনেক নরপতি বিদ্রোহী প্রজার হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই জন্য সম্প্রতি প্রজাসাধারণতন্ত্র-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইবার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভারতীয় দর্শনোক্ত জ্ঞান সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অনুমিতি জ্ঞান। (Syllogistic knowledge or Inference.) ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণক জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অনুমিতি। অথবা পরামর্শজন্য জ্ঞান অনুমিতি।* যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নির অস্তিত্বজ্ঞান। এখানে যাহা অনুমিত হয় তাহাকে সাধ্য বলে, যথা বহ্নি। যাহাকে দেখিয়া বা যাহার উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ অনুমান করা যায় তাহাকে হেতু বলে, যথা ধূম। এবং সাধ্যের আশ্রয়কে অর্থাৎ সাধ্য (বহ্নি) যথায় থাকে তাহাকে পক্ষ কহে। যথা পর্ব্বত। সাধ্য বহ্নি পর্ব্বত ব্যতীত মহান্‌সাদি অন্য স্থানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মহান্‌সাদি কিন্তু পক্ষ নহে, উহাকে সপক্ষ কহে; সুতরাং সন্দিগ্ধ সাধ্যাশ্রয় পক্ষ ও নির্ণীত সাধ্যাশ্রয় সপক্ষ। সাধ্যবহ্নি যেস্থানে আদৌ থাকে না, অসম্ভাবিত বলিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে বিপক্ষ কহে, যেমন হ্রদ তড়াগাদি।

প্রথমতঃ বহু প্রত্যক্ষাদি দ্বারা হেতু সাধ্যাশ্রয় এইরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না, এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহার পর পক্ষে হেতুর সত্তা দেখিয়া (পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া) সেখানে সাধ্যের (বহ্নির) অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ইহাকে নৈয়ায়িক ভাষায় ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান বলা যায়।

অনুমান প্রমাণ দ্বারা অনুমিতি-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুমান দ্বিবিধ—স্বার্থ ও

* ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকং জ্ঞানমনুমিতিঃ অথবা পরামর্শ জন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ” মুক্তাবলী। (An inference is the knowledge that arises from deduction or syllogystic reasoning) পরামর্শ কাহাকে বলে? ব্যাপ্যস্য পক্ষধর্ম্মত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে। ভা, প, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বত ইতি জ্ঞানং পরামর্শঃ। তজ্জন্যং পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ইতি জ্ঞানমনুমিতিঃ। Deduction is the ascertaining that the subject possesses that character which is invariably attended by what we then predicate ofit. e. g. The knowledge that this hill is characterised by smoke which is avways attended by fire is a deductive application of general principle; the knowledge produced from which *viz.* 'this hill is fiery' is an inference.

যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ। তস্য জ্ঞানং ব্যাপ্তি জ্ঞানং। যেখানে ধূম থাকিবে সেইখানেই অগ্নি থাকিবে, একটী অপরটীর নিত্যসহচর অর্থাৎ ধূম বহ্নিব্যাপ্য ইত্যাকার জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞান। তর্ক সং।

পরার্থ। যে অনুমান প্রমাণ নিজের অনুমিতি-জ্ঞান জন্মাইবার জন্য প্রযুক্ত হয় তাহা স্বার্থ। অপরকে বুঝাইবার অপরের অনুমিতি জন্মাইবার জন্য যাহার আশ্রয় লওয়া যায় তাহা পরার্থ অনুমান। কোন ব্যক্তি পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ভূয়োভূয় প্রত্যক্ষ করিয়া শেষে এই স্থির করিল যে, যেখানে ধূম থাকিবে সেখানে অবশ্যই বহ্নি থাকিবে; পরে কোন দিন কোন পর্ব্বতের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, ঐ পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে; ধূম দেখিয়া প্রথমে একটু সন্দেহ হইল, ভাবিল, এ বিজন পর্ব্বতে অগ্নি কোথা হইতে আসিবে, এ ধূম নহে অন্য কিছু; কিন্তু ক্রমে যখন সে দেখিতে পাইল যে, পাকশালাদি-স্থানস্থিত বহ্নি হইতে যেরূপ ধূম নির্গত হয়, এ সেই প্রকার ধূম; তখন এ পর্ব্বতে যে নিশ্চয় বহ্নি আছে, সে বিষয়ে তাহার সংশয়মাত্র রহিল না। কারণ তখন তাহার স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বে যে যে স্থানে সে এই প্রকার ধূম দেখিয়াছে, সেই সেই স্থানে বহ্নিই দেখিয়াছে, বহ্নির অভাব দেখে নাই, এখানে অনুমান প্রমাণ সাহায্যে সে নিজে বুঝিল যে, এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে। ইহা স্বার্থানুমান। কিন্তু যখন সে এ বিষয়টী অপরকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ অনুমানের আশ্রয় লইবে, তখন ইহা পরমার্থানুমান হইবে। তখন উহার আকার এইরূপ হইবে যথা :—(১) এই পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত (২) যেহেতু ইহা ধূমবান্ (৩) যে যে বস্তু ধূমবান, সেই সেই বহ্নিমান, যথা পাকশালা (৪) ইহাও সেইরূপ বস্তু (৫) অতএব ইহাও বহ্নিযুক্ত। এইরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইলে অপর ব্যক্তি বুঝিতে পারে ও স্বীকার করে যে, ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে। প্রত্যেক অনুমানই পূর্ব্বোক্তরূপ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট। উহারা পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত। প্রথমটীর নাম প্রতিজ্ঞা। দ্বিতীয়টীর নাম হেতু। তৃতীয়কে উদাহরণ বলে। চতুর্থ উপনয় নামে খ্যাত এবং পঞ্চম নিগমন বলিয়া উক্ত হয়।

অনুমানকে প্রধানতঃ এইরূপে বিভাগ করা হয়। যথা,—অন্বয়মুখে প্রবর্ত্তমান বিধায়ক অনুমানকে বীত কহে। বীত দুই প্রকার, পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, দৃষ্ট স্বলক্ষণ সামান্য-বিষয় অনুমান পূর্ব্ববৎ। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান (ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান) এই শ্রেণীভুক্ত। এখানে বহ্নি পর্ব্বত ব্যতীত অপর স্থানেও দর্শনযোগ্য। অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয় অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট বলা যায়। যেমন ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ক অনুমান। ক্রিয়া থাকিলে তাহার করণও থাকে, যেমন ছেদন একটী ক্রিয়া, কুঠার তাহার করণ। জ্ঞানও ক্রিয়া, সুতরাং তাহার কোন না কোনরূপ করণ আছে। যাহা তাহার করণ তাহাই ইন্দ্রিয় নামে কথিত। পূর্ব্ববৎ অনুমানে বহ্নি যেরূপ পাকশালা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই—ইন্দ্রিয় বস্তু কি তাহা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, সেজন্য ইহা অদৃষ্টস্বলক্ষণ সামান্য বিষয় নামে অভিহিত। এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের বলে অতীন্দ্রিয় পদার্থাদির অনুমান হয়। "সামান্যতস্তুদৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।" (তত্ত্বকৌ) ব্যতিরেকমুখে প্রবর্ত্তমান নিষেধক অনুমান অবীত (Negative)। ইহা শেষবৎ নামেও প্রসিদ্ধ। কারণের অভাব দেখিয়া কার্য্যের অভাব অনুমান শেষবৎ। যথা,—মেঘোন্নতি বৃষ্টির কারণ। এখন বৃষ্টি হইবে না, যেহেতু মেঘোন্নতি নাই। কার্য্য দেখিয়া কারণানুমানকেও শেষবৎ বলে। বৃষ্টি নদীবৃদ্ধির কারণ। নদী বাড়িতেছে দেখিয়া 'দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে' এরূপ অনুমান শেষবৎ।

অনুমিতিজ্ঞানে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। যেখানে হেতু দুষ্ট, সেখানে ঠিক্ অনুমান হয় না। এইরূপ দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস কহে। এরূপ স্থলে হেতু সৎ বা যথার্থ নহে, দুষ্ট হেতুকে সৎ হেতু বলিয়া ভ্রম হয়—সৎ হেতুর মত দেখায় বলিয়া হেত্বাভাস বলে। যেমন, "আত্মা বিনাশী যেহেতু দেহ সম্বন্ধ"; এস্থলে 'দেহসম্বন্ধ' হেতুটী দুষ্ট কারণ দেহ সম্বন্ধ না হইলেও বিনাশী হইতে পারে, যথা সুখ দুঃখ ইত্যাদি।* আরও "শব্দ নিত্য, যেহেতু স্পর্শরহিত যথা আকাশ" এখানে স্পর্শরহিতত্ব হেতুটী দুষ্ট কারণ ইহা বুদ্ধি ইচ্ছা প্রযত্ন প্রভৃতি অনিত্য পদার্থেও আছে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার, যথা ;—

অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্য সিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্ত পঞ্চধা॥

বিস্তৃতিভয়ে এগুলি আলোচিত হইল না।

সকল বিষয়ই যে আমাদের প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা অসম্ভব। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমানই গতি। মনুষ্যের অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমানসাপেক্ষ। অনুমিতিজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক, সেজন্য প্রত্যক্ষের পরই অনুমানের উল্লেখ এবং অনুমান অন্যান্য প্রমাণাপেক্ষা অধিক প্রবল ও প্রয়োজনীয়।

উপমিতি জ্ঞান। কোন আরণ্যক ব্যক্তি কোন গ্রামবাসী লোককে কহিল যে, গবয় গোসদৃশ। গবয় এক প্রকার গোতুল্য বন্য জন্তু। পরে কালক্রমে বনে গোসদৃশ পশু দেখিয়াই সে স্থির করিল যে, এই গোসদৃশ পশুমাত্রই গবয়পদবাচ্য। তখন হইতেই এইরূপ পশুমাত্রই গবয় পদবাচ্য, তাহার এই জ্ঞান হইল। এই জ্ঞান উপমিতি। এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবয় পশুতে যে গো সদৃশ্যজ্ঞান, তাহা উপমিতিজ্ঞানের করণ বা উপমান প্রমাণ (Analogy) এবং পূর্ব্বে আরণ্যকের নিকট শুনিয়াছিল যে, 'গবয় গো সদৃশ', সেই বাক্যার্থ স্মরণই এই উপমান প্রমাণের ব্যাপার।* মহর্ষি গৌতম উপমান প্রমাণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মাৎ সাধ্যসাধন মুপমানং"; যেস্থলে সাধ্য বস্তুর বোধ প্রসিদ্ধ বা পরিজ্ঞাত পদার্থের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যের দ্বারা উৎপাদিত হয়, সেস্থলে সেই সাদৃশ্যজ্ঞান উপমান ও তদুৎপন্ন জ্ঞান উপমিতি। 'গবয় গো সদৃশ' এইস্থলে প্রসিদ্ধ গো পদার্থের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য তুলনা দ্বারা এই গোসদৃশ পশু যে গবয় নামে অভিহিত, তাহার জ্ঞান হইল। উপমান প্রমাণের ফলের নাম জ্ঞান।

শাব্দ জ্ঞান। বাক্যজনিত বাক্যার্থ জ্ঞানকে শাব্দ প্রমা বা শাব্দ বোধ কহে। শব্দ ও অর্থ পরস্পর নিকট সম্বন্ধ। শব্দ ও অর্থের সেই গূঢ় সম্বন্ধ জ্ঞান না হইলে কিরূপে অর্থপ্রতীতি হইতে পারে? কেবলমাত্র শব্দ শুনিলেই যে অর্থ প্রতীতি হয় তাহা নহে ; তাহা হইলে সকলেই সকল ভাষার সকল শব্দই সহজে বুঝিতে পারিত। শব্দ দুই প্রকার ধ্বনি ও বর্ণ স্বরূপ।† মৃদঙ্গ, বীণা, ধাতু প্রভৃতি হইতে যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহাকে ধ্বনি শব্দ কহে। উহারা কোন অর্থ প্রকাশ করে না। মানবকণ্ঠ হইতে প্রযত্নোচ্চারিত সুস্পষ্ট শব্দ বর্ণ শব্দ।

---

* সুখদুঃখ নৈয়ায়িক মতে দেহসম্বন্ধ নহে, উহারা আত্মসম্বন্ধকারণ 'জ্ঞানসুখাদিমানাত্মা' পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

* গ্রামীণস্য প্রথমতঃ পশুতোগবয়াদিকং।
সাদৃশ্যধীর্গবাদীনাং যা স্যাৎ সা করণং মতং॥
বাক্যার্থস্যাতিদেশস্য স্মৃতি র্ব্যাপার উচ্যতে।
গবয়াদিপদানাস্ত শক্তিধীরুপমাফলম্॥ ৮০

† শব্দোধ্বনিশ্চবর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবোধ্বনিঃ।
কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥
১৬৪ ভাঃ পঃ।

উহা আমাদের মানসপটে বাহ্য পদার্থসমূহের যথাযথ আকার, উহাদের ঠিক ছবি, আঁকিয়া দেয়। শব্দ বাহ্যবস্তু প্রকাশ বা বর্ণনা করিবার সঙ্কেতবিশেষ (Symbol)। বৃক্ষ শব্দ উচ্চারিত হইলে বহিঃস্থিত শাখা পল্লবাদিযুক্ত বস্তুবিশেষকেই বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং বৃক্ষ শব্দটী তাদৃশ পদার্থদ্যোতনের সঙ্কেতবিশেষ। এইরূপে এই জাতীয় শব্দ যখন উচ্চারিত হয়, তখন কেবল শব্দমাত্র প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে তদতিরিক্ত বাহ্যবিষয় বা অর্থসমূহকেও নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কেবলমাত্র মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত হইলেই শব্দ বর্ণাত্মক বা অর্থপ্রকাশক হয় না। অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রযত্নোচ্চারিত হওয়া আবশ্যক। যেমন বালক উন্মত্ত বা আর্ত্ত ব্যক্তিরা নানাপ্রকার শব্দ করিয়া থাকে, কিন্তু উহা বর্ণাত্মক নহে, যে হেতু নিরর্থক। বর্ণ শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, পদ, বাক্য, কথা প্রভৃতি বলা যায়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের নাম অব্যক্ত বা অনুকরণ শব্দ।

এখন দেখিতে পাই যে, শব্দবিশেষের অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার এক গূঢ় অলৌকিক শক্তি আছে। সেই শক্তিজ্ঞান ব্যতীত শ্রুত শব্দের অর্থবোধ অসম্ভব। শক্তিগ্রহের প্রকার নিম্ন দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হইবে। এক ব্যক্তি একটী বালককে বলিল 'গাভীটী লইয়া আইস'। ইহা শুনিয়া সে গাভী লইয়া আসিল। আবার 'রাখিয়া আইস' বলাতে সে রাখিয়া আসিল। তথায় এক অজ্ঞ তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সকল দেখিতেছিল। সে গাভী প্রভৃতি শব্দের কোন অর্থই জানিত না। সে দেখিল 'গাভী আন' বলাতে একটা পশু আনিল এবং 'গাভী রাখ' বলাতে উহা রাখিল। তখন সে বুঝিল যে, 'আন' বা 'রাখ' এই দুই পৃথক্ শব্দ একই পশুর এস্থলে অভিধেয় হইতে পারে না— উভয় বাক্যে যে 'গাভী' শব্দ আছে উহা এই পশুর বাচক আর 'আন' শব্দ আনয়ন ক্রিয়া ও 'রাখ' নয়ন ক্রিয়ার বাচক। এইরূপ ভূয়োভূয় ব্যবহার দর্শনে, "আবাপ উদ্বাপ" দ্বারা শব্দার্থ সম্বন্ধ গ্রহ হইয়া থাকে। এই শাব্দবোধে অনুমান প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। অনুমিতি জ্ঞান না থাকিলে শাব্দজ্ঞান জন্মে না—তাই অনুমিতির পর শাব্দজ্ঞানের উল্লেখ। এই স্থলে সেই অজ্ঞ তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করিল;—চেষ্টামাত্রই প্রবৃত্তির অধীন; যদি প্রবৃত্তি না থাকে, তবে কেহই কোন বিষয়ে চেষ্টিত হয় না, যেমন আমার পাক করিবার প্রবৃত্তি আছে, তাই পাকে প্রবৃত্ত হইতেছি। আবার ইষ্টসাধনতা জ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। আমি জানি যে পাক করিলে আমার ইষ্টসাধন হইবে, উদরপূর্ত্তি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে, তাই পাকে প্রবৃত্তি হইতেছে, নহিলে হইত না। বিষ ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ তাহা আমার ইষ্টসাধক নহে, যখন ইষ্টসাধক বলিয়া মনে করিব, তখন বিষ ভক্ষণেও প্রবৃত্তি হইবে ও তজ্জন্য চেষ্টিতও হইব। এখানে ঐ বালকের গাভী আনয়নরূপ চেষ্টার কারণ, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি এবং সেই প্রবৃত্তির হেতু এই যে, ইহা (গাভী আনয়ন) তাহার ইষ্টসাধক, (না আনিলে তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইতে পারে), এইরূপ তাহার বোধ আছে। আর এখানে প্রবৃত্তিজনক বা ইষ্টসাধনতা জ্ঞানোৎপাদক পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির বাক্যব্যতীত অন্য কারণ উপস্থিত নাই, অতএব উক্ত বাক্য শ্রবণই বালকের গো-আনয়নের হেতু, এইরূপ স্থির করিল। পরে গাভী শব্দের লাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষ অর্থ, 'লইয়া আইস' ইহার দূরনয়নরূপ অর্থ সিদ্ধান্ত করিল। এইরূপে ভূয়োব্যবহার দর্শন

হইতে প্রায় লোকের শব্দার্থ সম্বন্ধগ্রহ হইয়া থাকে।

ব্যবহার ভিন্ন ব্যাকরণাদি হইতেও শব্দ-শক্তি জ্ঞান হইতে পারে।

"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাদ্
ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্ত শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধ
পদস্ত বৃদ্ধাঃ॥

মুক্তাবলী। এই শব্দবোধে পদজ্ঞানই করণ বা উপায়ভূত। শব্দ পদাদির অর্থ না জানিলে শাব্দবোধ হইতে পারে না। পদ-জন্য পদার্থস্মরণ উহার ব্যাপার। প্রত্যক্ষাদি স্থলেও পদার্থজ্ঞান বা পদার্থ স্মরণ হয়, কিন্তু শাব্দবোধে পদার্থ উপস্থিত না থাকিয়াও উচ্চারিত হয়, শব্দ পদ বা বাক্যের দ্বারা তত্তৎ পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাকেই ব্যাপার কহে। শব্দ প্রমাণের দ্বারা শাব্দবোধ জন্মায়। এস্থলে শক্তিজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়, শাব্দবোধ জন্মাইবার ইহাই প্রধান সহকারী। ক্রমে ইহা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।*

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুগ্রহ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু বাক্য দ্বারাও পদার্থজ্ঞান হয়। বরং চক্ষুরাদি দ্বারা যাহা হইতে পারে না, বাক্যের দ্বারা তাহা হয়। চক্ষুরাদি দ্বারা আন্তরিক সুখদুঃখাদি জন্মায় না, কিন্তু বাক্য তদুৎপাদনে সমর্থ। আবার কোন বস্তুর রূপ, আকার, সংস্থানাদি বিষয়ে অপর ব্যক্তিকে পরিচিত করান বাক্যের দ্বারাই সহজসাধ্য হয়, কিন্তু চক্ষুরাদি দ্বারা উহা করা অসম্ভব। অনেক বিষয় যাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাও অনুমানযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু যে সকল বিষয় অনুমান বা যুক্তির গোচর নহে, তাহা কি একেবারে পরিত্যাজ্য? তাহা নহে। বিশ্বস্ত সত্যবাদী পুরুষের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিলে সেই সকল বিষয় সহজেই জানিতে পারি এবং আমরা এই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সংসারে থাকিয়া যদি সেই সত্যবাক্ সত্যৈকপ্রাণ মহাপুরুষদিগের সর্ব্ব-বিশ্বস্ত চিরপূজিত সত্যবাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারি, তবে সংসারযাত্রাও একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। বিলাত বোম্বাই প্রভৃতি দূরপ্রদেশে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের বিষয়ীভূত নহে; যদি মানব উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিত বা অনুমান-বলে নির্ণয় করিতে পারিত, তবে পত্রাদি লিখিবার দূতাদি প্রেরণ করিবার ও সংবাদপত্র প্রচারিত হই-বার কোন প্রয়োজনই থাকিত না; এবং ঐ সকল বিষয়ে এত কষ্ট ও বহু ব্যয়ভারও কেহ ইচ্ছা করিয়া মূর্খের ন্যায় বহন করিত না। আরও আমরা শৈশব হইতে জ্ঞানো-পার্জ্জন করিয়া ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর জ্ঞান-বৃদ্ধ হইবার যে আশা করিয়া থাকি, তাহা কেবলই দুরাশা হইত, যদি জগতে আপ্তবাক্য বলিয়া কিছু না থাকিত; আমাদের চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ই অক্ষুণ্ণ থাকুক, কিন্তু যদি জগৎ হইতে বাগিন্দ্রিয় তিরোহিত হয়, যদি জগতে কোথাও বাক্যের ব্যবহার একেবারেই না থাকে, তাহা হইলে আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির হই; তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যে কি হয়, তাহা বলিয়া জানাইবার অপেক্ষা সহজেই অনুমেয় হইতে পারে। জন্মিবামাত্র কোন শিশু যদি মানবের অগম্য কোন বিজন বিপিনে নীত হয় এবং দৈবকৃপায় সে যদি মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তবে বড় হইলে সে কিরূপ জীব হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে এবং দেখিতেও

* পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্রপদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্রশক্তিধীঃ সহকারিণী॥
৮১ ভাঃ পঃ।

কৌতূহল জন্মে। ফলতঃ বাক্যের ব্যবহার হইতেই আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট ও পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তি দেখিল যে পথ দিয়া এক বৃহদাকার পশু যাইতেছে। সে অনিমেষনয়নে উহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু উহা কি পশু, তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন তাহার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ হস্তীর দিকে এইরূপে চাহিয়া আছ কেন? সে উত্তর করিল, আমি ঐরূপ বৃহৎ পশু আর দেখি নাই, তাই চাহিয়া আছি; ইহাকে যে হস্তী বলে, তাহাও আমি জানিতাম না।" এখানে দেখা যাইতেছে যে, হস্তী তাহার চক্ষুর সম্মুখে থাকিলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহাকে বলিতেছে যে ইহা হস্তী, ততক্ষণ ইহাকে হস্তী বলিয়া তাহার জানা হইল না। অভিধানাদি হইতে যদি তাহার হস্তিলক্ষণ জানা থাকিত, তবে তাহার ইহাকে দেখিয়া হস্তিজ্ঞান কথঞ্চিৎ হইতেও পারিত, অতএব পদার্থাবধারণ বিষয়ে বাক্যই বিশেষ সাহায্যকারী, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য। ফলতঃ প্রত্যক্ষানুমানাদির ন্যায় সত্যবাক্যেরও একটী বিশেষ ও প্রধান প্রামাণ্য রহিয়াছে। সত্য বাক্য হইতেও যথার্থ বা প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, কিরূপ বাক্য সত্য, যাহার উপর আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে নির্ভর করিতে পারি। মহর্ষি কপিলদেব বলিয়াছেন যে "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"। আপ্তগণের উপদেশ, যথার্থ বাক্‌মহাপুরুষদিগের মহাবাক্যই আমাদের অবলম্বনীয় ও উহাই শাব্দ প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। রাগদ্বেষাদিশূন্য, সর্ব্বপূজিত, মহাত্মারাই আপ্ত নামে অভিহিত হয়েন। "স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ। জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্ন আপ্তোজ্ঞেয় স এব হি॥" আপ্তবাক্য সমূহই শাব্দপ্রমাণ এবং সেই সকল বাক্যজনিত জ্ঞানই শাব্দবোধ। 'আপ্ততা বাক্যের নহে, আপ্ততা পুরুষের।' ইন্দ্রিয়-দোষ, ইন্দ্রিয়বিকৃতি, পরপ্রতারণেচ্ছা প্রভৃতি দোষবর্জ্জিত ব্যক্তিরা আপ্তপদ-বাচ্য এবং তাঁহাদের বাক্যই 'আপ্তবাক্য।' আপ্তবাক্যজনিত জ্ঞান অন্য প্রমাণজনিত জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া এই সকল বাক্য শব্দপ্রমাণরূপে গৃহীত হয়। পিতা পুত্রকে বলিলেন যে, 'তোমার পিতামহ দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন।' এই অন্য প্রমাণ দ্বারা অবাধিত পিতামহের অতীত অস্তিত্বজ্ঞান শাব্দবোধ এবং পিতৃবাক্যই শাব্দপ্রমাণ। ঈশ্বর ও ত্রিকালজ্ঞ যোগিগণ আপ্ত নামে অভিহিত। বেদও আপ্তবচন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। বেদ বলিতেছেন, "যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, তিনি পরমেশ্বর।" এই বেদবাক্যজনিত জ্ঞান অন্য প্রমাণজনিত জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া ইহাও শাব্দবোধ।

"বেদ অপৌরুষেয়। বেদ অস্মদাদির ন্যায় কোন প্রাকৃত মনুষ্যের যাদৃচ্ছিক রচনাবাক্য নহে। বেদ ব্রহ্মার নিঃশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।" ব্রহ্মা বেদের কর্ত্তা বা স্মর্ত্তা, এইরূপ মতভেদ আছে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন। মহর্ষি কপিল যে সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা, ইহা আমরা কিরূপে অবগত হই? তাঁহার প্রণীত সাংখ্যদর্শনই উহার সাক্ষ্য প্রদান করে। মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত-প্রণেতা ইহা মহাভারত হইতেই জ্ঞাত হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায় যে, সেই সকল গ্রন্থ হইতেই সেই সকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থ প্রণয়ন প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হয়। সেইরূপ বেদও

বলিতেছেন, পরমেশ্বর আমার রচয়িতা, আমি তাঁহা হইতেই আবির্ভূত। ইহাতে এক আপত্তি হইতে পারে যে, মহর্ষিরা বেদ প্রণয়ন করিয়া প্রচারের নিমিত্ত উহা ঈশ্বরনামাঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু সে আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। যে ব্যক্তি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি যে সে গ্রন্থাপেক্ষা অন্যান্য নানা বিষয়ে ও শাস্ত্রে সমধিক জ্ঞানবান্, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত কথা। মহর্ষি বেদব্যাস যে মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য নানা শাস্ত্রে ও নানা বিষয়ে অতীব ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। তাহা না হইলে তিনি ঐরূপ বিপুল গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইতেন না। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক পূজ্যপাদ আদিবিদ্বান্ মহর্ষি কপিলদেবের বুদ্ধি যে কেবল স্বপ্রণীত কপিল সূত্রাদিগ্রন্থের ভিতরই আবদ্ধ ছিল, তাহা অসম্ভব; তাঁহার সেই কুশাগ্রতীক্ষ্ণ মেধা কত শত না শাস্ত্রে, কত শত না জটিল দুরবগাহ তত্ত্বে, স্বাধীন উন্মুক্ত বায়ুবৎ বিচরণ করিত। অতএব ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, যিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি সেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় অপেক্ষা আরও বহুতর বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান্, নহিলে সে সকল গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভব হইত। বেদেরও অবশ্য কেহ রচয়িতা আছেন। বেদশাস্ত্র অতি বিপুল, সর্ব্বার্থপ্রকাশক, বেদ সর্ব্বতত্ত্বের আধারভূত, বেদ সর্ব্বজ্ঞসদৃশ। এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, কাহার পক্ষে এইরূপ অতি বিপুল সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাসম্পন্ন চতুর্ব্বর্গসাধক অনন্তজ্ঞানের প্রস্রবণস্বরূপ এই মহাগ্রন্থের রচনা সম্ভবে? এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অল্পপ্রাণ পরিচ্ছিন্নশক্তি সাধারণ জীব কি তাহার প্রণেতা হইতে পারে? নিতান্ত অসম্ভব। যে বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের কিয়দংশ মাত্র লইয়া প্রাচীন মহাত্মগণ ঋষিত্ব দেবত্ব লাভ করিয়া পরমৈশ্বর্য্যবান্ হইয়াছেন, সেই মহর্ষিগণকেও ইহার রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিলে এই স্বীকার করা হয় যে, সে সকল মহর্ষি বেদপ্রতিপাদ্য সমগ্র বিষয় হইতেও অধিকতর বিষয় জানিতেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির বিরোধী। সুতরাং একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই বেদের রচয়িতা হইতে পারেন না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

জৈমিনি—মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট সামবেদ ও মহাভারতে শিক্ষিত হন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার প্রণীত জৈমিনিদর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা ও জৈমিনি ভারত ভারতবিখ্যাত। ইঁহার রচিত মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্বই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এবং বৈশম্পায়নাদি অপর পাঁচ জন বজ্রকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে বোধ হয়, ইনি তাড়িত বিদ্যাতেও সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

ঝিন্দনকুমারী—পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা পত্নী, এবং মহারাজ দলিপ সিংহের জননী। রণজিৎ

সিংহ তাঁহার বিবাহিতা পত্নীদিগের মধ্যে ঝিন্দনকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ঝিন্দন দলিপ সিংহকে প্রসব করেন। রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া অকাতরে ধন বিতরণ করেন। সেই সময়ে ১০১টি শিখ-তোপ গভীর নির্ঘোষে এই সুসংবাদ দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিয়াছিল। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহ, নেওনেহাল সিংহ, ও সেরসিংহ পর পর পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কেহই দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেরসিংহ নিহত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন, এবং তাঁহার মাতা ঝিন্দন অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীর-পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিতা ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় তেজস্বিনী রমণী জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। অনেকে ইহাঁকে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এত সদ্‌গুণ সত্বেও একমাত্র দোষেই ইনি রাজদণ্ড পরিচালনের সম্পূর্ণ অযোগ্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি নিজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই। লালসিংহ নামক একজন শিখসর্দ্দার ইহাঁর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। লালসিংহের প্রতি ঝিন্দন এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লালসিংহ মহারাণীর প্রাসাদেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে ঝিন্দনকে তিরস্কার করায় হীরাসিংহ প্রভৃতি মহারাণীর কোপে পড়িয়া লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে খালসা-সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এইরূপে ঝিন্দন নিজদোষে বীরবর হীরাসিংহের বিনাশ সাধন করিয়া শিখসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

এক্ষণে রাণীর ভ্রাতা জবাহির সিংহ ও তাঁহার প্রিয়পাত্র লালসিংহ রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আসীন হইলেন। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয়, কাপুরুষ এবং বীরপ্রকৃতি খালসা-সৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে খালসা-সৈন্য জবাহির সিংহের প্রাণবধ করিল। অতঃপর তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি হইলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ প্রধান সচিবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর ঝিন্দন ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভৈরওয়ালার সন্ধি-অনুসারে দলিপসিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করা হইল। ইতঃপূর্ব্বে লালসিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি সহ বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

মহারাণী ঝিন্দন রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিতা হওয়ায় অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং গোপনে শিখ্-সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের যাবতীয় অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট ঐ সকল কথা গবর্ণর জেনারলকে

বিজ্ঞাপিত করায় তিনি শিশু দলিপ-সিংহকে জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিলেন। সেই আদেশ পাইয়া রেসিডেণ্ট রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের মত লইয়া রাণীকে তাঁহার নিজ অলঙ্কারপত্রাদি সহ সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। এই দুর্গে অবস্থান কালে রাণীর বৃত্তি হ্রাস করিয়া মাসিক চারি সহস্র টাকা ধার্য্য করা হয়। ইহার পর মুলতানের কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অল্লায়াসে সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। এ বিদ্রোহে মহারাণী লিপ্ত ছিলেন না, এ কথা রেসিডেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি রাণীকে সেখোপুরের দুর্গ হইতে সমস্ত মণি-রত্ন অলঙ্কারাদি সহ বারাণসীতে প্রেরণ করা হইল, এবং তাঁহার বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা মাত্রে পরিণত করা হইল। কিছুদিন পরে ঝিন্দনকে পুনরায় বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মণিরত্ন-অলঙ্কারাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন। দুই জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজমহিলা দ্বারা রাণীর পরিচারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহসূচক পত্রাদির অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। তথাপি কিন্তু রাণী তাঁহার নিজ বিত্ত হইতে বঞ্চিতা হইলেন। এই সময়ে অর্থাভাবে তাঁহার ব্যয়সঙ্কুলান কঠিন হইয়া পড়িল।

এদিকে রণজিৎ-মহিষীর নির্ব্বাসনে খালসা-সৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার উপর তিনি এইরূপে নিগৃহীতা হইতেছেন শুনিয়া সমস্ত পঞ্জাববাসী ক্ষোভে ও ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অনেক নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ; ইহার পর চিলিয়ানওয়ালার ক্ষেত্রে ইংরেজ-সৈন্য শিখ-সৈন্যের নিকট পরাভূত হইলে ঝিন্দন গবর্ণর জেনারেলের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, 'আমাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক; আমি সহজেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব।' কিন্তু গবর্ণর জেনারেল সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে শিখ-সর্দ্দারগণ ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অতঃপর পঞ্জাবরাজ্য ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে শিশু মহারাজ দলিপসিংহ বৃত্তিসহ ফতেহপুরে প্রেরিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চনারে নীতা হইলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কৌশলে চনারের কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া অতিকষ্টে নেপালের প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়া নেপালরাজের শরণার্থিনী হইলেন। নেপালের বিখ্যাত মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ ঝিন্দনকে নেপালস্থ ইংরেজ-রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট রাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন, এবং রাণীকে এক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া নেপালে থাকিবার অনুমতি দিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই দলিপ সিংহ ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন। এদিকে রণজিৎ-মহিষীর নেপালে থাকাও নানা কারণে কষ্টকর হইয়া পড়িল। জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার উপর বিরূপ ছিলেন।

তিনি নেপাল দরবার হইতে ২০ সহস্র টাকা পাইতেন; সেটা জঙ্গবাহাদুরের অসহ্য। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ আপনার সম্পত্তির একটা মীমাংসা এবং জননীর একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন। গভর্ণর জেনারল ঝিন্দনকে নেপাল হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শনে অতিশয় পুলকিতা হইয়া বলিলেন, 'আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না'। মহারাণী ইতঃপূর্ব্বে চনারে যে সকল অলঙ্কারপত্র ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। অল্পদিন মধ্যেই দলিপ ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলে, মহারাণী ঝিন্দন বহু অনুচর ও অনুচরী সহ পুত্রের সহিত ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে ল্যাঙ্কেষ্টার গেটের নিকট একটি বৃহৎ বাটী তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতঃপূর্ব্বে দলিপসিংহ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মাতার সহিত একত্র অবস্থান হেতু তাঁহার খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রতি আস্থার হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ইংরেজরা মাতা-পুত্রকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে মহারাণীর জন্য একটী পৃথক্ বাটী নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। যতদিন ঐ শবদেহ সৎকারার্থে ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেনশালের সমাধি-ক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হতভাগ্যা রণজিৎ-মহিষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ জননীর মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হন, এবং নর্ম্মদা-তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এইরূপে পঞ্চনদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বীর-কেশরী রণজিৎ-মহিষী মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সুখদুঃখ ভোগ করিয়া বিদেশে বিদেশীর মধ্যে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

টিপুসুলতান—মহীশূররাজ হয়দর আলির পুত্র। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। আর্কটনগরে টিপু শাহ্ নামে একজন বিখ্যাত মুসলমান-ফকির ছিলেন। হয়দর আলি এই ফকিরকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। এই ফকিরের নামানুসারেই হয়দর আপনার পুত্রের নাম টিপু রাখেন। নয় বৎসর বয়সের সময়ে টিপু পিতার সহিত মার্হাট্টাদিগের হস্তে বন্দী হন। পরে সন্ধি হইলে আবার পিতার সহিত মুক্তিলাভ করিলেন। বাল্যকাল হইতেই টিপু বীরপ্রকৃতি ও সাহসী ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় কৈশোরেই অনেক স্থানের যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেন। হয়দর আলির সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জনৈক ইংরেজ সেনাপতি ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে অর্ণির নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সময় টিপু ইংরেজ-সৈন্যের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করায় তাহারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে; কাজেই টিপুরই জয়লাভ হয়। ঐ বৎসরের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হয়দর আলি নিজ শিবিরে প্রাণত্যাগ করিলে, টিপু 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ফরাসী-সেনাপতি বুসী ভারতে আসিয়া টিপুর অধীনে সৈনাপত্য-পদ

গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বুসী টিপুর সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

টিপু রাজা হইয়া প্রথমে যুদ্ধবিগ্রহে মনোনিবেশ করেন নাই; বরং কর্ণাটিকে তাঁহার যে সমস্ত লোকজন ছিল, তাহা-দিগকে উঠাইয়া আনিলেন। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কিন্তু টিপুকে দমন করিবার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টিত হইলেন। বোম্বাই হইতে জেনারেল ম্যাথু একদল সৈন্যসহ আসিয়া মহীশূরের অধিত্যকাস্থিত বেদনুর অধিকার করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে টিপু আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরেজরা পাঁচ মাস কাল অবরোধ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সন্ধি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। টিপু পরাজিত ইংরেজ-সৈন্যদিগকে মহীশূর দুর্গে আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন। বেদনুর হইতে টিপু প্রায় এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মঙ্গলোড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানেও ইংরেজরা কিছুদিন আত্মরক্ষা করিয়া শেষে অনুপায় হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে দুই দিক হইতে দুই দল ইংরেজ-সেনা টিপুর রাজধানী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। টিপুর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত হিন্দু প্রজারাও তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে ইংরেজ-দিগের বিশেষ সুবিধা হইল। তথাপি কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টনি গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুইজন দূত টিপুর নিকট প্রেরণ করি-লেন। টিপু তিন মাস কাল অকারণ তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়া শেষে আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মান্দ্রাজে পাঠাইলেন। লর্ড ম্যাকার্টনি আবার আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত ইংরেজ-দূত প্রেরণ করিলেন। এবার দূত দুইজন অত্যন্ত লাঞ্ছিত হই-লেন; তাঁহাদের জন্য দুইটি ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। তাঁহারা অতিকষ্টে পলা-য়ন করিয়া একখানি ইংরেজ-জাহাজে উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। ইহার পর বহুসাধ্যসাধনার পর টিপু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেই সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, অতঃপর উভয় পক্ষ আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না এবং পরস্পরের বিজিত প্রদেশ পরস্পরকে ফিরাইয়া দিবেন। ইতিহাসে ইহাই মঙ্গলোড় সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ (১৭৮৩ খৃঃ)।

মঙ্গলোড়ের সন্ধির পর টিপু আপনার বলবৃদ্ধি করিবার মানসে মহীশূরের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহীশূরের পশ্চিম প্রদেশ-সমূহের হিন্দুরা বার বার তাঁহার গতি-রোধ করিতে লাগিল। ইহাতে কুপিত হইয়া টিপু সেই সকল স্থানে হিন্দু ও খৃষ্টীয়ানদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়গের সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া টিপু দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল; চারি-দিকে অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা জীবনবিসর্জ্জন শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইহাতে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল। মার্হাট্টা পেশওয়ার সুদক্ষ মন্ত্রী ও সেনাপতি নানাফর্ণবিশ নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর

রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিছুদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে টিপু মার্হাট্টাদিগকে কতকগুলি প্রদেশ ও আদনি ছাড়িয়া দিয়া এবং নগদ ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ও ১৫ লক্ষ টাকা পরে দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৭ খৃঃ)।

মঙ্গলোড়ের সন্ধি-অনুসারে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য ইংরেজের আশ্রিত বলিয়া স্বিরীকৃত হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিলে ইংরেজরা ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের সাহায্যার্থ টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মার্হট্টাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। টিপুও বিপুল বিক্রমে রাজ্যরক্ষার আয়োজন করিলেন। এই যুদ্ধ ক্রমিক তিন বৎসরকাল চলিয়াছিল। টিপুকে দমন করা সহজ নয় দেখিয়া কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস অবিকেরা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুকে পরাজিত করিলেন। ওদিকে মার্হাট্টারা সিমোগা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুর সৈন্যগণকে পর্য্যুদস্ত করিল। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় টিপু অনন্যোপায় হইয়া আপনার দুই পুত্রকে ইংরেজশিবিরে প্রেরণপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথমে সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার অনুরোধে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হইল। এই সন্ধি-অনুসারে টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূস্বরূপ ইংরেজশিবিরে রহিয়া গেলেন। টিপু নগদ তিন কোটী টাকা এবং তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। এই বিজিত রাজ্য নিজাম, ইংরেজ, ও মার্হাট্টারা ভাগ করিয়া লইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড মর্ণিংটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই দেখিলেন যে, টিপু ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজাম আলি, নানা ফর্ণবিশ ও আফগানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। নিজামের অধীনে রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী সেনাপতি দ্বারা শিক্ষিত ১৫ হাজার সৈন্য ছিল; সিন্ধিয়ার সৈন্যগণও ফরাসী সেনানায়কগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছিল। ওদিকে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ঈজিপ্টে উপস্থিত; কখন আসিয়া ভারতে পদার্পণ করেন, তাহার স্থিরতা নাই। টিপু তাঁহার সহিতও পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। এই সময়ে আবার গভর্ণর জেনারেল কাবুলের সুলতান জেমান শাহ্‌এর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে, তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লর্ড মর্ণিংটন স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে টিপুকে চাপিয়া মারিতে হইবে। এই জন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মান্দ্রাজস্থ প্রধান সেনাপতি লর্ড হারিসকে অবিলম্বে টিপুর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে নিজামকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ইংরেজের

একুশ হাজার সৈন্য এবং নিজামের দশ হাজার সেনা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলোড় হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিল। টিপুও বিপুল আয়োজনে শত্রুসৈন্যের গতিরোধার্থে অগ্রসর হইলেন। টিপুর এক দল সেনা সেদাসির নামক স্থানে এবং স্বয়ং টিপু মালবেল্লি নামক স্থানে পরাজিত হইলেন (১৭৯৯ খৃঃ)।

অতঃপর টিপু রাজধানী রক্ষার্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। লর্ড হারিসও কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নগর অবরোধ করিলেন, এবং অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাকারের এক স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। টিপু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেনা ও সেনাপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভগ্ন স্থানে শত্রুর গতিরোধার্থে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। শত্রুগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, বীরতনয় বীর টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড মর্ণিংটন 'মাকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি' উপাধি পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। মহীশূরে মুসলমান-রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। মহীশূরের পূর্ব্ব হিন্দুরাজবংশীয় পঞ্চম বর্ষীয় একটি শিশুকে মহীশূরের রাজা করা হইল। টিপুর বংশধরেরা বৃত্তিসহ বেলোড়ে স্থানান্তরিত হইলেন। তাহার পর আবার সেখান হইতে আনীত হইয়া তাঁহারা কলিকাতার সন্নিহিত টালিগঞ্জ নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

ডিম্বক—রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হংসের সহিত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তপস্যায় তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অস্ত্রের অবধ্য হইবার বর লাভ করেন। এইরূপ বরদৃপ্ত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সকলের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। একদা দুর্ব্বাসা ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। ঋষিবর এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তদীয় পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া করদ রাজা বিবেচনায় তাঁহার নিকট কর চাহিয়া পাঠান। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হংস তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কালিন্দীতে ঝম্প প্রদান করেন, এবং হংসকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া ডিম্বকও যমুনাজীবনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

তক্ষক—নাগবিশেষ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইহাঁর সখ্য ছিল। খাণ্ডবারণ্যে ইহাঁর আবাস ছিল। নাগবর একদা স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে আবাসে রাখিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেই সময়ে অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় খাণ্ডববন দাহ করায় তক্ষকের স্ত্রী, পুত্র সহ পলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অর্জ্জুনের শরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অশ্বসেন ইন্দ্রের সাহায্যে রক্ষা পান।

উতঙ্ক মুনি গুরুদক্ষিণা প্রদানের নিমিত্ত যে সময়ে পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিয়া আনিতেছিলেন, সেই সময়ে তক্ষক পথে তাহা হরণ করেন। অতঃপর উতঙ্ক পাতালে গমনপূর্ব্বক

অনেক চেষ্টায় তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হন; তদবধি তিনি তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন।

শৃঙ্গীনামক ঋষিকুমার মহারাজ পরীক্ষিতকে তক্ষকদষ্ট হইবার অভিশাপ প্রদান করিলে, সেই শাপ সফল করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষক হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ বিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিতকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তক্ষক তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তক্ষক একটী সজীব বৃক্ষকে দংশন করায় বৃক্ষটী বিশুষ্ক হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে অর্থলোভী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক হস্তিনাগমনে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অনন্তর তক্ষক অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণপূর্ব্বক ফলমধ্যে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ফলটী ভক্ষণার্থ ছেদন করিবামাত্র তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর পরীক্ষিত-তনয় মহারাজ জনমেজয় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সতক্ষক নাগকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের উত্তরীয় মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্র আত্মরক্ষার্থ ইঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি ঋত্বিকগণের মন্ত্রবলে অগ্নিতে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাগরাজ বাসুকি-প্রেরিত আস্তিকমুনির অনুরোধে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ রহিত করিলে তক্ষক পরিত্রাণ লাভ করেন।

তাড়কা—রাক্ষসীবিশেষ, সুকেতু যক্ষের কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাড়কাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করেন। সুন্দ নামক অসুরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। অগস্ত্য ঋষির শাপে সুন্দের জীবনান্ত ঘটিলে, তাড়কা ও মারীচ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। অতঃপর তাড়কা অগস্ত্যের তপোবন প্রাণিশূন্য করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল, এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগত থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞার্থী ঋষিদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞরক্ষার্থ রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ইহার বধ কার্য্য সাধন করেন।

তানসেন—ভারতবর্ষের একজন অতি প্রসিদ্ধ গায়ক। আকবরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন, সহস্র বর্ষের মধ্যে এরূপ উচ্চশ্রেণীর গায়ক দেখা যায় নাই। তানসেন প্রথমে একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; পরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-রাজ রামচাঁদ ইহাঁর সঙ্গীত-পটুতাগুণে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে অতি সম্মানের সহিত আপনার সভায় রাখেন। কথিত আছে যে, তিনি ইহাঁর গানে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে প্রায় কোটী টাকা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাট্

ইব্রাহিম শূর অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাঁকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কিছুকাল পরে খ্যাতনামা মোগলসম্রাট্ আকবর তানসেনের অসাধারণ গীতশক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য ব্যগ্র হন, এবং জলালুদ্দিন কুর্চীকে রাজা রামচাঁদের নিকট প্রেরণ করেন। রামচাঁদ প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি সাশ্রুনয়নে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া গান শুনান, সেই দিনই আকবর তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

প্রবাদ আছে যে, তানসেন প্রথম প্রথম সম্রাটের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না; তাঁহার নিকট দিয়া যাইলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময়ে গোপনে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে একদিন আকবর আপনার দুহিতাকে তানসেনের নিকট প্রেরণ করেন। বাদসাহ্-তনয়ার রূপে তানসেন বিমুগ্ধ হইলেন; যুবতীও তানসেনের গানে উদ্‌ভ্রান্তা হইলেন। আকবরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তিনি উভয়ের বিবাহ দিয়া দিলেন। তানসেন তখন হইতে মুসলমান হইলেন এবং আকবরের একজন প্রধান সভাসদ্ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে তিনি গায়ক-চূড়ামণি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হন।

তানসেন যথার্থই সঙ্গীতসাধক ছিলেন। সাধকের ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখনও অন্তর্হিত হয় নাই। তিনি বৈদান্তিকভাবে ব্রহ্মকে জগতের একাকার ভাবিতেন। তানসেনের রচিত এই গানটিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ;—

"প্যারে! তুঁই ব্রহ্ম তুঁই
তুঁই শেষ তুঁই মহেশ।
তুঁই আদ তুঁই নাদ
তুঁই অনাথ তুঁই গণেশ॥
জলস্থল মরুত ব্যোম,
তুঁই অকার যম সোম,
তুঁই উকার তুঁই মকার,
শিরোকার তুঁই ধনেশ।
তুঁই বেদ তুঁই পুরাণ,
তুঁই হদীশ তুঁই কোরাণ,
তুঁই ধ্যান তুঁই জ্ঞান
তুঁই ভুবনেশ।
তানসেন কহে ব্যান,
তুঁই দেন তুঁই রমণ,
তুঁই ঘর পলমুন,
তুঁই বরুণ তুঁই দিনেশ॥"

তানসেনের মৃত্যুসম্বন্ধেও এক অশ্রুতপূর্ব্ব কিংবদন্তীর প্রচার আছে। অনেক ওস্তাদ সঙ্গীতসংগ্রামে তানসেনের নিকট পরাজিত ও অবমানিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের এক চক্রান্ত করে। তাহারা স্থির করিল, কোনও প্রকারে তানসেনকে দিয়া দীপক-রাগ গাওয়াইতে পারিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ প্রসিদ্ধি আছে যে, দীপক-রাগ গাহিলে গায়ক জ্বলিয়া যায়। একদিন রাজসভায় প্রসঙ্গক্রমে তাহারা দীপক-রাগের কথা উত্থাপন করিল। আকবর দীপক-রাগ শুনিতে চাহিলেন। তাহারা সকলেই বলিল, "আমরা দীপক-রাগ জানি না, কেবল মিঞা তানসেন জানেন।" সম্রাট্ তানসেনকে দীপক-রাগ গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তানসেন বলিলেন, "যদি আমাকে চান, তবে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন্"। আকবর সে কথা শুনিলেন না। তখন তানসেন

আপনার কন্যাকে মল্লার রাগ গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক-রাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মল্লার রাগালাপের প্রভাবে দীপকরাগের জ্বালা প্রশমিত হইবে। কিন্তু পিতার মরণা-শঙ্কায় তানসেনের কন্যার স্বরবিকৃতি জন্মিল। কাজেই তাহাতে ফল হইল না। তানসেন দীপক-রাগ গাহিতে গাহিতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ হইলেন। তানসেনের আদি লীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। গায়ক গায়িকা ও নর্ত্তকী-দিগের নিকট তানসেনের সমাধিক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। তানসেন যে কেবল একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ রাগি-ণীরও উদ্ভাবন করিয়াছেন।

তারক—অসুরবিশেষ, তারকাসুর। এই অসুর ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগের অনেক লাঞ্ছনা করায় তাঁহারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ইহার বধার্থ সকলে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাদেবের ঔরসে পার্ব্বতীর গর্ভে কুমার কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরের নিধন সাধন করেন। ইহাই মহাকবি কালি-দাসকৃত কুমারসম্ভব নামক কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

তারা—১। দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা। চন্দ্র ইহাঁকে হরণ করায় বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হন। চন্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রা-চার্য্য ও দৈত্যগণের শরণাপন্ন হওয়ায় দেবা-সুরে যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। তখন ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করায় যুদ্ধ নিবারিত হয়। চন্দ্রের ঔরসে ইহাঁর বুধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

২। কপিরাজ বালীর ভার্য্যা। বালীর ঔরসে ইহাঁর অঙ্গদ নামে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামকর্ত্তৃক বালী নিহত হইলে, তারা স্বীয় দেবর সুগ্রীবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

তারাবাই—বিখ্যাত মার্হাট্টা-বীর রাজা-রামের মহিষী। মার্হাট্টাকেশরী শিবজীর পৌত্র দ্বিতীয় শিবজী (সাহু) দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দিভাবে আগ্রায় নীত হইলে, তদীয় অভিভাবক ও কার্য্য-পরিচালক রাম রাজা স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ করেন। ১৭০০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৃতীয় শিবজী নাম ধারণপূর্ব্বক রাজা হইলেন এবং তাঁহার জননী বীররমণী বিধবা তারাবাই তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোগল-সৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপনার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে লইয়া নিয়ত গিরি-দুর্গে পলায়ন করিয়া বেড়াইতে হইল। অবশেষে তিনি প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে যবনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় সকলে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশা-তেই অনেকগুলি গিরিদুর্গ পুনরধিকার করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মোগলেরা ভেদনীতি অবলম্বন করিলেন। মার্হাট্টা-দিগের গৃহবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা বন্দী রাজকুমার সাহুকে মুক্তি দিলেন। সাহু ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে সাতারা নগরে রাজপদে অভিষিক্ত হইলে অনেক মার্হাট্টা-সর্দ্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তারাবাইএরও পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না। এইরূপে মার্হাট্টাদিগের

মধ্যে আত্মকলহের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে তাঁহাদিগের বলক্ষয় হইতে লাগিল।

তালবেতাল—তাল ও বেতাল নামক যক্ষদ্বয়। কথিত আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দ্বারা ইহাদিগকে তুষ্ট করিয়া তালবেতাল সিদ্ধ হন। অতঃপর ইহারা রাজার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাবহ অনুচর হইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্য ইহাদিগের দ্বারা রাজ্যের সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ কবি ও সাধু। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে পুণার নিকটস্থ দেহুগ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি জাতিতে বণিক্ ছিলেন। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না থাকায় ইনি মাতৃভাষায় সামান্য শিক্ষিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া সংসারের আনুকূল্য করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর ভার্য্যা সক্রেটীস্-পত্নী জ্যান্‌টিপির ন্যায় অতিশয় কোপনস্বভাবা ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়া সেগুলি প্রার্থী বালকবালিকাদিগকে দান করিয়া একখণ্ড মাত্র লইয়া গৃহে উপস্থিত হন। ইহাঁর গুণবতী সহধর্ম্মিণী সমস্ত কথা শুনিয়া সেই ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ইহাঁর পৃষ্ঠদেশে এমন প্রহার করিলেন যে, তাহাতে ইক্ষুটী দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। তিতিক্ষু তুকারাম সক্রেটিসের ন্যায় কেবল এইমাত্র বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি আমাকে এতই ভালবাস যে, আক্ গাছটী তোমার একলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।"

তুকারামের বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জনকজননীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। এই সকল ঘটনায় তুকারাম নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর ইহাঁর মনে ঈশ্বরসাধনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বপ্নে চৈতন্য শিষ্য জনৈক বাবাজীর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভজনপূজনেই মনোনিবেশ করিলেন। ইনি নিজে শ্লোক রচনা করিয়া কথকতা ও কীর্ত্তন করিতেন, এবং এই উপায়ে লোককে ধর্ম্মপথের পথিক করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে ইহাঁর অনেক শিষ্য হইল।

মার্হাট্টা-কেশরী শিবজী তুকারামের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আনয়নার্থে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তুকারাম রাজপুরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর উদারচেতা শিবজী স্বয়ং ইহাঁর কুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। মহারাষ্ট্রপতি ইহাঁকে প্রভূত উপহার দিলে, নির্লোভ তুকারাম তাহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রমে শিবজী ইহাঁর ভক্ত হইয়া পড়েন, এবং ইহাঁর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। শিবজির মাতা জিজাবাই তুকারামের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পুনরায় সংসারী করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন শ্রবণার্থ শিবজি উপস্থিত হইলে তুকারাম তাঁহাকে সার উপদেশ দিয়া পুনরায়

সংসারী করেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

তুলসী—তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বিষ্ণুপুরাণ মতে,—জলন্ধরপত্নী বৃন্দার দেহভস্ম হইতে তুলসীর জন্ম হয় [জলন্ধর দেখ]।

(২য়) ব্রহ্মপুরাণমতে,—তুলসী পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার সখী ছিলেন। কোন কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া অভিশাপ প্রদান করায় ইনি রাজা ধর্ম্মধ্বজের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভকালে তুলসী তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন। এই সময়ে একদিন ধ্যানমগ্ন গণেশ দেবকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হন, এবং তাঁহার তপোভঙ্গ করিয়া তাঁহার পত্নী হইবার অভিলাষ করেন। দারপরিগ্রহে ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া গণেশ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তুলসী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, "অচিরে তোমাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে।" তখন গণেশও তুলসীকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তুমি যেরূপ কামাতুরা, তাহাতে তুমি দেবভোগ্যা না হইয়া অসুরভোগ্যা হইবে।" অতঃপর শঙ্খচূড় নামক অসুরের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে শঙ্খচূড়ের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পতিপ্রাণা তুলসী বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন দেবগণের একান্ত অনুরোধে বিষ্ণু, শঙ্খচূড়ের বেশ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিলে, অসুররাজের পূর্ব্বপ্রাপ্ত বরের নিয়মানুসারে তিনি নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর পতিপরায়ণা তুলসী পতিবিরহে শোকাকুলা হইয়া বিষ্ণুর পদে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শরীর হইতে গণ্ডকীশিলার এবং কেশ হইতে তুলসীবৃক্ষের উদ্ভব হইল।

তুলসীদাস—সুবিখ্যাত হিন্দি কবি ও সাধু। ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম হয়। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া ইনি সংসারী হন। ইনি পত্নীপ্রেমে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, একদণ্ডও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, এজন্য কদাচ ভার্য্যাকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে দিতেন না। একদা শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজেও বাহকগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইঁহার পত্নী অতি দুঃখের সহিত মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, "হায়! এতটুকু অনুরাগ যদি তোমার ভগবানের প্রতি হইত, তাহা হইলে আজ ভাগ্যফল অন্যরূপ হইত।" ভার্য্যার এই কথায় তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। অতঃপর ইনি সেই অনুরাগ ঈশ্বরে অর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অতঃপর তুলসীদাস আর পত্নীর সমভিব্যাহারী হইলেন না, গৃহেও ফিরিয়া গেলেন না। সেই দিন হইতে তিনি ঈশ্বরান্বেষণে বহির্গত হইলেন, এবং সাধন ভজন দ্বারা ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, একদা একটী রমণীকে সহমরণে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া তুলসীদাস তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহার মৃত বা মৃতকল্প পতিকে জীবিত করিয়া দেন। এই সংবাদ শুনিয়া

দিল্লীশ্বর আকবর ইহাঁকে কোনরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে কারারুদ্ধ হন, এবং পরে মুক্তিলাভ করেন।

তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় রামচরিত প্রণয়ন করেন। ইহাঁর সেই গ্রন্থ "তুলসী রামায়ণ" নামে খ্যাত। নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক তুলসীদাসের দোঁহাবলী অমূল্য রত্ন; উহা অনেকেরই জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করিয়াছে।

ত্রিজটা—রাক্ষসীবিশেষ। রাবণ ইহাকে অশোককাননে সীতার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ত্রিজটা রাক্ষসী হইলেও তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের একান্ত অসদ্ভাব ছিল না। রাক্ষসী সীতার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া অশেষপ্রকার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও যত্ন করিত।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূর্য্যাস্তকালীন সমুদ্র-শোভা ও তত্তীরস্থ পুরুষোত্তম দর্শনে।

(১)

অগাধ জলধি আজ দেখিলে নয়ন!
সাগরের নীলকান্তি ঢালেরে হৃদয়ে শান্তি;
জটিল সংসার-ক্লান্তি না রহে এখন!!
অগাধ জলধি ওরে কে বলে ভীষণ?

(২)

অগাধ জলধি ওরে কে বলে ভীষণ?
তরঙ্গ-কল্লোলে তার সুধা ঢালে অনিবার;
লহরী সঙ্গীতে আহা! জুড়ায় শ্রবণ!!
বিশাল পয়োধি অতি শ্রুতিবিনোদন!

(৩)

বিশাল-পয়োধি অতি শ্রুতিবিনোদন!
তাই ওরে পীতাম্বর বট-পত্রে নিরন্তর;
সাগর-তরঙ্গ-রঙ্গে করেন শয়ন!!
সাগরে দেখিরে বড় চিত্ত-বিমোহন!

(৪)

সাগরে দেখিরে বড় চিত্ত-বিমোহন!
নাহি হেথা ভীষণতা, লক্ষ্মীর জনম যেথা;
হৃদে আসে পবিত্রতা করিলে দর্শন!!
সাগর হয় রে কিবা নয়নরঞ্জন!

(৫)

সাগর হয় রে কিবা নয়নরঞ্জন!
নীলগঙ্গা সম জল দূরে হেরি সমতল;
পড়ে আছে যেন এক শ্যামল আসন!!
নিকটে উত্তাল উর্ম্মি খেলেরে কেমন!

(৬)

নিকটে উত্তাল উর্ম্মি খেলেরে কেমন!
সলিলে-অনিলে যার জন্ম হয় বার বার,
বেলাভূমে ধ্বংস তার অনন্ত জীবন!!
সেই দেখে ঢেউ খায় লোকে চিরন্তন!

(৭)

সেই দেখে ঢেউ খায় লোকে চিরন্তন!
অপেতে শরীরারম্ভ, র'বে না দেহের দম্ভ—
জীবনতরঙ্গ আর হবে না এমন!!—
উর্ম্মি-অবরোধে দেহী পায় মুক্তিধন!!!

(৮)

উর্ম্মি অবরোধে দেহী পায় মুক্তিধন!!!
তাই এত অভিরাম সিন্ধু-নীর ঘনশ্যাম—
দেব-শ্রেষ্ঠ বরুণের শান্তি-নিকেতন!!—
সন্তপ্ত রবির তাই তথায় গমন!

(৯)

সন্তপ্ত রবির তাই তথায় গমন!—
সুনীল-সাগর জল হয় অতি সুশীতল,
জুড়াতে সকল জ্বালা সায়াহ্ণ যখন;—
আনন্দরঞ্জিত তাহে হয় রে তপন!

(১০)

আনন্দরঞ্জিত তাহে হয় রে তপন!
রক্তিম ভানুর বিভা, নীলিমা-সাগর-আভা,
দু'য়ে মিশে কি যে শোভা না হয় বর্ণন!—
অপূর্ব্ব সে মহাদৃশ্য হয় রে তখন!!!

(১১)

অপূর্ব্ব সে মহাদৃশ্য হয় রে তখন!
খসে পড়ে লাল ভানু হেলায়ে দোলায়ে তনু,
প্রীতির আবেগে যবে দিতে আলিঙ্গন,
সিন্ধুর সহিতে পেতে শান্তির জীবন।

(১২)

সিন্ধুর সহিতে পেতে শান্তির জীবন,
ইন্দ্রদ্যুম্ন মহামতি, তুষি' (স্তবে) বিশ্বপতি,
গোলক সমান "পুরী" করেন স্থাপন;
চির বর্ত্তমান যেথা দেব নারায়ণ!

(১৩)

চির বর্ত্তমান যেথা দেব নারায়ণ!
জগদ্বন্ধু জগন্নাথ, লীলাবশে বিশ্বনাথ
মহাপীঠ "বিমলারে" করেন রক্ষণ।
রুক্মিণী ত্রিভঙ্গ-বামে সুন্দর কেমন!

(১৪)

রুক্মিণী ত্রিভঙ্গ-বামে সুন্দর কেমন!
মরি কি সুন্দর হয়, রামকৃষ্ণ পার্শ্বে রয়—
ভগিনী সুভদ্রা মাঝে—স্নেহ নিদর্শন!!
আশা নাহি মিটে যত দেখরে নয়ন।

(১৫)

আশা নাহি মিটে, যত দেখরে নয়ন!
রত্ন-বেদী পদ্মাসন করে চিত্ত আকর্ষণ—
উজ্জ্বল করেছে যারে শ্রীমধুসূদন!!
আশা নাহি মিটে যত দেখেরে নয়ন!

(১৬)

আশা নাহি মিটে, যত দেখেরে নয়ন!
ইন্দ্রদ্যুম্ন-জলাশয় মার্কণ্ড-তড়াগ রয়;—
মহাতীর্থ স্নানে হয় পবিত্র জীবন!
সিন্ধুতীরে "স্বর্গ-দ্বার" ত্রিতাপ-নাশন!!

(১৭)

সিন্ধুতীরে "স্বর্গ-দ্বার" ত্রিতাপনাশন!!
শ্রীক্ষেত্র সুরম্য অতি, তাই হেথা রমাপতি
সদানন্দে লক্ষ্মী সনে করেন যাপন!
আনন্দে ভাসিয়ে দেখে লক্ষ্মীর ভবন!

(১৮)

আনন্দে ভাসিয়ে দেখে লক্ষ্মীর ভবন!—
অসংখ্য মানব যবে, একত্রিত হয় সবে,
প্রেমেতে দেখিতে আহা রথেতে "বামন"!!
সুপ্রতুলে করে মাতা অন্ন-বিতরণ!

(১৯)

সুপ্রতলে করে মাতা অন্ন-বিতরণ!
"আনন্দ বাজার" হয় অতি যে আনন্দময়,
মুক্তি-আশে করে লোকে প্রসাদ ভক্ষণ!
জাতি মান অভিমান ভোলে রে তখন!

(২০)

জাতিমান অভিমান ভোলে রে তখন!
তাই এত প্রীতি পায়, মনের বিকার যায়,
"মহাপুরী" এসে হয় আত্মপ্রসাদন!!
জয় জয় রবে গায় লক্ষ্মী জনার্দ্দন"।

(২১)

জয় জয় রবে গায় "লক্ষ্মী জনার্দ্দন"।
ডাকে যে পুরুষোত্তম, ফল পায় সে উত্তম,
"পূর্ণচন্দ্র" পায় যেন তব শ্রীচরণ;
তবে ত হইবে বিভো! আশার পূরণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সিরাজুদ্দৌল্লার হত্যা।

"তোয়াভাবে শুষ্ককণ্ঠ, ওষ্ঠাগত প্রাণ—
এ যেন রে বিশ্বগ্রাসী দুরন্ত পিপাসা।
কে আছ দুয়ারে দেহ করি বারি পান।"
বঙ্গেশ্বর সিরাজের অই মর্ম্মভেদী
অন্তিমের উদ্দাম সে প্রচণ্ড পিপাসা
না মিটিতে, রক্তভুক্ শ্বাপদের প্রায়,—
(সিরাজুদ্দৌল্লার চির-দলিত ঘৃণিত)
অন্নদাস, অনুচর, মহম্মদ বেগ
প্রতিহিংসা—নবাবের রক্ত-লেলিহান—
ভাতিছে নয়নে যেন শতসূর্য্য সম ;
প্রবেশিল রুদ্ধগৃহে খুলিয়া অর্গল,
হস্তে তীক্ষ্ণ খরশান উলঙ্গ কৃপাণ।
তৃষাক্লিষ্ট, দীর্ণ বক্ষ, নত জানুদ্বয়,
কৃতাঞ্জলিপুটে চাহি বেগের চরণে ;
কাতর প্রাণের দায়ে, নিবারিতে তৃষা,
সিরাজ কহিল যেন অজ্ঞান উন্মাদ,—
লাল মহম্মদ কেন আজি হেথা তুমি
আসিয়াছ অভাগার শৃঙ্খল মোচনে!
জল—জল—আন—দাও—করি বারি পান,
শেষে কর অভিরুচি বন্ধন মোচন"।—
তৃষ্ণার্ত্ত চঞ্চল চিত্ত রুদ্ধ কারাগারে,
নবাব তখন বুঝি পারেনি বুঝিতে,—
ঘাতকের বেশে পাপী পশিয়াছে গৃহে
ছিন্নমুণ্ডে জন্মশোধ মিটাইতে তৃষা।
কুক্কুর অধম বেগ, পালিত সেবক,
নরাধম, নবাবের চির-অন্নদাস,
উত্তরিল রুক্ষস্বরে কর্কশ গম্ভীর—
প্রাবৃটে প্রকৃতি-বক্ষে বজ্রধ্বনি সম!
"অহঙ্কারী ক্রূরমতি সিংহাসনে বসি
অবজ্ঞায় মুখপানে চাহিতে না কভু ;
আসিয়াছি দিতে আজ তার প্রতিশোধ।
স্থাখ্ স্থাখ্ চেয়ে স্থাখ্ তৃষ্ণার্ত্ত বিলাসী
হস্তে মোর জলপাত্র উন্মুক্ত কৃপাণ,
এখনি করাবে তোরে তৃষ্ণা-বারি-পান।"
তবে কি ঘাতক তুমি! তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনয় করি
আসিয়াছ ফেলাইতে মৃত্যু-যবনিকা!
রাজ্যপ্রাপ্তি আশা তবে হইল নির্ম্মূল!
তবে কি ইংরাজ-রাজ বঙ্গভূমি মাঝে
সিরাজেরে দিবেনা'ক সূচ্যগ্র-মেদিনী!
মৃজাফর! মৃজাফর! কিছু নাহি চাই,—
হও তুমি অধীশ্বর, বঙ্গ সিংহাসনে,
পুত্রতুল্য প্রজা পাল বসি মসনদে ;
একবার একদণ্ড চাহ মুখ তুলি,
প্রাণ-ভিক্ষা দাও আজ আশ্রিত নবাবে।
ঘাতক কহিল পুনঃ—"পাপিষ্ঠ, দুর্জ্জন—
ক্ষমা-ভিক্ষা আজ তোর সকলি বিফল,
এখনি হইবে অসি ও রক্তে রঞ্জিত।"
কহিল সিরাজুদ্দৌলা "বুঝিয়াছি সব—
ছিন্ন করি মীরণের চক্র-কুহেলিকা
সিরাজের যশ-সূর্য্য ভাতিবে না আর!
মজ্জিত দুর্জ্জয় পঙ্কে মদমত্ত করী ;
প্রায়শ্চিত্ত ;—আজি কভু নাহি পরিত্রাণ।
মহম্মদ বেগ, ছিলে আশ্রিত আমার,
কর তুমি অভিরুচি অভীষ্ট সাধন,
পাপ রক্তে কলুষিতা হ'ক বসুন্ধরা!
কিন্তু শুন কথা রাখ অনুনয় করি
দেহ ভাই দেহ মোরে তিল অবসর
একবার শেষ দিনে ডাকি ভগবান্ ;—
ওষ্ঠপ্রান্তে কথা ক'টী না হইতে শেষ
চকিতে পড়িল গলে বিদ্যুতের বেগে
ঘাতকের তীক্ষ্ণধার, উন্মুক্ত কৃপাণ!
ছিন্নমুণ্ড নিম্নমুখে চুমি পৃথ্বীতল—
উচ্চারিল কলুষিত রক্ত নদী মাঝে,
"এয়াচিন রহিমাল্লা মুস্কিলে আসান
প্রায়শ্চিত্ত কুলিখাঁর—বিশুদ্ধ বিধান।"

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

REG. No. C. 280.

মনে রাখিবেন—

কেশরঞ্জন আপনারই জন্য।

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, এজন্য যদি আপনার দিবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে, টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্ব্বদা হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিনরাত অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি আপনার প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে সুখী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাতগন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য ১, টাকা, মাশুলাদি ।/০ আনা; তিন শিশি ২॥০ টাকা, মাশুলাদি ৷৵০ আনা।

পঞ্চতিক্ত বটিকা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহার ব্যবহারে নূতন পুরাতন এবং প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত পালাজ্বর প্রভৃতি সমুদয় জ্বরই একবার আরোগ্য হইলে (কুইনাইনের ন্যায়) আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকলেই এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্তু মূল্য অল্প হইলেও উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা পৃথিবীর সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এক কৌটা—দুই রকমে ৩০টী বটিকার মূল্য ১, টাকা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৵০ আনা। উক্ত মাশুলে এককালে ৪ কৌটা যাইতে পারে। ডজন ১০, টাকা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

দশম সংস্করণ।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সার মন্থন। পুরু কাগজে দুই হাজার পৃষ্ঠারও উপর, পরিষ্কার সুন্দর ছাপা, বড় বড় আটটী খণ্ডে সমগ্র পুস্তক বিভক্ত। অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নহে, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও ইহা একখানি নিত্য ব্যবহার্য্য গ্রন্থ। নাড়ী পরীক্ষা, মূত্র ও তাপ-পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা-প্রণালী, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদির প্রস্তুত-বিধি এবং বিষচিকিৎসা, দীর্ঘজীবন লাভের উপায় স্বরূপ স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা, স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের পূর্ণ বিবরণ, রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি ইহাতে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। পরিশেষে দ্বিতীয় খণ্ডস্বরূপ মহর্ষিদের গৌরবের ধন—সুশ্রুত-সংহিতা ইহার অষ্টম সংস্করণ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে দশটী নূতন সংস্করণে ভারতের সর্ব্বত্রই কবিরাজি-শিক্ষার উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ৷৷০ বার আনা। বাঁধান পুস্তক ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা)

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৭ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বিদ্যারত্ন', এম, এ, বি, এল,

এফ, আর, জি, এস।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

কলিকাতা,

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, 'সাহিত্য-সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

☞ সাহিত্যসভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

সাহিত্য-সভা।

PATRON :

HIS HONOUR SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.-
Lieutenant-Governor, Bengal.

VICE-PATRONS :

THE HON'BLE SIR H. H. RISELEY, KT. C. I. E.—*Secy Government of India,*
A. EARLF, ESQ. I C S—*Director of Public Instruction, Bengal.*
SIR A. PEDLFR, ESQ., F.R.S. C.I.E.

দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্‌, এ, বাহাদুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সাহিত্য সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। যাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৬।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র,
সহযোগী সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা।

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমূদয়ের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্কার, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা, গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহায্যপ্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সাহিত্য সভার সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা।

সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, চৈত্র। [১২শ সংখ্যা।

পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রমাণান্তর শব্দের অর্থ কি ?

আমরা প্রমাণান্তর শব্দের অর্থ 'প্রত্যক্ষ' লিখিয়াছি। সমালোচক 'বিধ্যন্তর' অর্থ করিতেছেন। আমাদের অর্থের খণ্ডনার্থ এক যুক্তি লিখিয়াছেন, তাহা এই—একজন বালককে যদি কেহ বলে, পুষ্পান্তর আনয়ন কর ; তাহা হইলে সে পুষ্পই আনয়ন করে, বস্ত্র আনয়ন করে না'।এই বালকের কার্য্যের দ্বারা উক্ত অর্থের খণ্ডন হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি।

গৌতম সূত্র।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটীকে প্রমাণ বলে ; সুতরাং প্রমাণান্তর শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ লিখিবার কোনই বাধা দেখা যায় না। তবে প্রমাণান্তর শব্দের বিধ্যন্তর অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা কেহই বলিবে না। আবশ্যক হইলে প্রমাণান্তর শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষও হইবে, আবশ্যক হইলে বিধ্যন্তরও হইবে। এ বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ আবশ্যক না থাকায় পরিত্যাগ করিলাম। সকল অর্থেই তিথ্যাদি অবিধেয়, অতএব প্রামাণান্তরগম্য, সুতরাং প্রত্যক্ষাদি দ্বারা তাহার সংশোধন আবশ্যক

অপূর্ব্ব ব্যুৎপত্তি।

চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ।
পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণ বিচিন্তনে।

চক্ষুঃ, গণিতশাস্ত্র, জল, লেখ্য ও গণিত এই পাঁচটী গ্রহসংস্থান নির্ণয় করিবার হেতু। এখানে "হেতবঃ" পদে বহুবচন দেখিয়া সমালোচক মহাশয় ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের অবতারণাপূর্ব্বক বলিতেছেন, গ্রহনির্ণয়ে চক্ষুঃ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ হেতুতা মিলিত হইয়া দুইটী বা তিনটী হেতু নহে। যেমন তৃণবিশেষ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ অরণি নামক কাষ্ঠ হইতেও উৎপন্ন করা যায়, আবার কখন মণিবিশেষ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। অতএব অগ্নিরূপ কার্য্যে তৃণ, অরণি ও মণির পৃথক্ পৃথক্ হেতুতা, মিলিত হেতুতা নহে। সেইরূপ গ্রহসংস্থান নির্ণয়েও চক্ষুরাদির পৃথক্ হেতুতা। সমালোচক মহাশয় বহুবচনটী উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন, কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ হইয়া চক্ষুরাদির দ্বারা গ্রহসংস্থান নির্ণয় হয় কি না, তাহা চিন্তা করেন নাই। কেবল চক্ষুঃ, কেবল শাস্ত্র, কেবল জল, কেবল লেখ্য বা কেবল গণিত, গ্রহসংস্থান নির্ণয় করিতে পারে কি না, তাহা ভাবেন নাই। আমরা যদি একশত ঘড়া জল তাঁহাকে দেই, তাহা হইলে তিনি কি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া গ্রহসংস্থান নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন? যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কি ফল হইবে? ব্যুৎপত্তি কি হেতুতা উৎপন্ন করিতে পারে? অতএব চক্ষুরাদির পৃথক্ পৃথক্ কারণতা নহে। যেরূপে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপেই কারণতা।

রক্ষাকবচ।

হেমাদ্রির "স্থূলমার্গ সিদ্ধস্ত তিথিনক্ষত্রাদেঃ সাধনং যুক্তং" এই কথাটীর রক্ষাকবচের স্তায় সর্ব্বত্র আবৃত্তি দেখা যায়। কায়স্থজাতির বিচারপুস্তকেও ইহার এক আবৃত্তি দেখা গিয়াছিল। বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়ও এইরূপ, কিন্তু তাহা কোন পুস্তকে দেখাইতে পারেন না, এইজন্ত তাহা ভূতের মন্ত্রতুল্য। এই ভূতের মন্ত্র ও রক্ষাকবচের বলে যথার্থ, দৃকৃতুল্য, পরিশুদ্ধ, মুনিসম্মত, শাস্ত্রের ও দেশের উন্নতি হেতু, ধর্ম্মের আধার, মনের অন্ধকারনাশক, সূক্ষ্ম গ্রহগতি সাধন অনাবশ্যক স্থির করিতে চান। ভারতবর্ষে পঞ্জিকা সাধনই গ্রহগণিতের মুখ্যপ্রয়োজন। ইহাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াই গ্রহগণিতের অস্থিপঞ্জর অদ্যাপি লোপ পায় নাই।

যাহা হউক, হেমাদ্রি একটী স্থূল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার অর্থ কি? ইহাই যথার্থরূপে বিচারের বিষয়। এস্থানে স্থূল শব্দে গ্রহগতির স্থূল গণনা বা সূক্ষ্ম গণনা নহে। অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্রের আনয়ন স্থূল মার্গ ও অভিজিতের সহিত ২৮ নক্ষত্রের আনয়ন সূক্ষ্ম মার্গ। হেমাদ্রি স্বয়ং "স্থূল কৃতমিত্যাদি" সিদ্ধান্ত শিরোমণির শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাদৃশ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। সুগৃহীতনামা ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। এ পক্ষে "আহা কি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত" এরূপ লিখিতেছেন, কিন্তু কেন যে এ সিদ্ধান্ত নহে, তাহার কারণ কিছুমাত্র দেখাইতে পারেন না। যদি তিনি গতির স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা বুঝিয়া থাকেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল। "আহা কি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত" এরূপ বাক্য, কিছুই উপকার করিতে সমর্থ নহে। সর্ব্বত্র নির্ণয়, সংশয়পূর্ব্বক হইয়া থাকে। হেমাদ্রির গতির স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তিনি তাহা চিন্তাও করেন নাই। জন্মাষ্টমীতে রোহিণীনক্ষত্র স্থূল মার্গের চাই কি সূক্ষ্মমার্গের চাই, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ। তাই তিনি স্থূলমার্গের রোহিণী চাই, ইহা সমাধান করিয়াছেন। হেমাদ্রির পুস্তক যেরূপ অশুদ্ধ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ইহার অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন। শুদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলে অবশ্যই পাওয়া যাইত যে "স্থূলমার্গ সিদ্ধস্ত নক্ষত্রস্ত সাধনং যুক্তম্" শুদ্ধ পুস্তকের অভাবপক্ষে, তিথির ন্যায় যোগকরণও জানিতে হইবে। ইহার আর বৃথা পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন কেন?

হেমাদ্রির গ্রন্থ কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাধারণে দেখিবেন।

অত্র কেচিৎ সূক্ষ্মানয়নেন বক্তব্যাঃ, তাশ্চ স্থূলানয়নেন সিদ্ধ কৃত্তিকোত্তরার্দ্ধমধ্যবর্ত্তিস্তুদাভিপ্রেতাঃ। (?) নচ, তাসাং রোহিণীত্বং মুখ্যং সম্ভবতি, নহ্যস্তদন্তদ্ ভবতি, বিরোধাৎ। যথা দিনার্দ্ধং দিনমেব ন রাত্রিস্তস্মাৎ কৃত্তিকার্দ্ধস্য সূক্ষ্মানয়নাৎ যদ্রোহিণীত্বং তদ্গৌণ (?) রোহিণী ফলসম্বন্ধেন রোহিণীতুল্যত্বাৎ দেবদত্তস্য সিংহত্বমিব। এবঞ্চ সতি মুখ্যায়া সম্ভবন্ত্যা রোহিণ্যা রোহিণীসহিতত্বমষ্টম্যা গ্রাহ্যং, মুখ্যসম্ভবে গৌণাশ্রয়ণস্যান্যায্যত্বাৎ। কিঞ্চ প্রথম প্রতীতত্বেন স্থূলমার্গসিদ্ধস্য তিথি (?) নক্ষত্রাদের্গ্রহণং যুক্তং। জ্যোতিঃ শাস্ত্রমপি সূক্ষ্মানয়নেন মুখ্যকাল (?) মেবানবতি ন মুখ্যস্বরূপত্বং। যদাহ,—

> স্থূলং কৃতং ভানয়নং যদেতজ্জ্যোতির্ব্বিদাং
> সংব্যবহারহেতোঃ।
> সূক্ষ্মং প্রবক্ষ্যেঽথ মুনিপ্রণীতং বিবাহযাত্রাদিফল
> প্রসিদ্ধ্যৈ। ইতি (সিদ্ধান্ত শিরোমণি)

কিঞ্চ স্থূলাদন্যেন প্রকারেণাদৃষ্টার্থেষু বিধিনিষেধেষু নক্ষত্রাদীনাং গ্রহণে ব্যবস্থা (?) স্যাদ্ বারনক্ষত্রাদিবিশেষ বিহিতস্য প্রতিসিদ্ধস্য

স্থূলানয়ন সিদ্ধেঃ (?) তদংশেষু প্রসঙ্গাৎ অবিগীতশিষ্টাচারবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। তস্মাৎ স্থূলানয়নমেব আশ্রয়নীয়ম্॥

মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ।

অবিদ্ধানি নিবিদ্ধৈশ্চেন্নলভ্যন্তে দিনানি।
মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈ বৈকাদশী তিথিঃতু।

যদি কোন দিন দশমী যোগ রহিত একাদশী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পাঁচ মুহূর্ত্ত দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে। দশক্ষয় না মানিলে এ বচনের সদর্থ হয় না, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন। মাধবাচার্য্য এ বচন তুলিয়াছেন, কিন্তু অর্থ-বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহের কথা দেখা যায় না। নির্ণয় সিন্ধুতে কিছু বিচার আছে। কিন্তু নির্ণয়সিন্ধু, চার্য্য, হেমাদ্রি প্রভৃতি কেহই বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় মানেন না, ৺ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি প্রবীণ ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর এক কথায় ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার বচন এই—

ষট্ ষষ্টি দণ্ডাত্যধিকা তিথির্যা।
কৃৎস্না পরাহ্নদ্বয় মশ্নুতে সা॥

যে তিথি ৬৬ দণ্ডের অধিক, তাহাই দুই দিবসের সমগ্র অপরাহ্ণ ব্যাপ্ত হয়। প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারমাত্রেই কৃৎস্না পরাহ্ণদ্বয় ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত তিথিরই তাঁহারা উভয় দিনে কৃৎস্নব্যাপ্তি মানিয়া থাকেন। বাণ বৃদ্ধি, তাঁহাদের বুদ্ধি অধিকার করিতে পারে নাই।

উপসংহার।

সমালোচক মহাশয় তাঁহার পঞ্জিকা বিষয় সমালোচনায় পারিভাষিক, স্থূল, হেত্বঃ ও প্রমাণান্তর এই কয়টী শব্দ লইয়া, ঘটের লাভ না হইলে ঘটাদি লাভ হয় না, বালককে পুষ্পান্তর আনিতে বলিলে পুষ্পই আনে, এই দুইটী যুক্তি লইয়া, সত্য যুগের প্রারম্ভের গতি যাহা ছিল, তদনুসারে গণনা করিতে হইবে, এই স্বকীয় কল্পনা, ঋষ্যশৃঙ্গের একটী বচন ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তর্ক আশ্রয় করিয়া, সমালোচনা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহার সকল বিষয়েরই সমাধান আমরা করিয়াছি, নিবন্ধকারদিগের বার বার নাম করিয়া বিরোধী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে যে, পঞ্জিকা সংস্কার নিবন্ধকারদিগের বিরুদ্ধ নহে। তাঁহাদের কিছুই বিরুদ্ধ হয় নাই, সকল কার্য্যের ব্যবস্থাই ইহা হইতে হয়। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, তিনি বোম্বাই নগরে গেলে, যে সকল পণ্ডিত বোম্বাই গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত মতৈক্য করিয়া আসিতেন (৮ পৃষ্ঠা দেখুন) শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র, রাজকুমার সেন, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভগবতী চরণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি ইঁহারা সূক্ষ্ম গণিত অনুসারে পঞ্জিকা নির্ম্মাণে সম্মতি করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত যদি তাঁহার মতৈক্য থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। তাঁহারা ত আর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা চালাইতে মত দিয়া আইসেন নাই যে, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতৈক্য হইল। পঞ্জিকাতত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহাদের নামে বিস্তর ঠাট্টা, বিস্তর নিন্দা দেখিয়াছিলাম, এমন কি জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যকেও কটু বলিতে ছাড়েন নাই। এবার মিল হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। তবে তাঁহার মতামত, শালগ্রাম শিলার শয়নোপবেশনের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়, কায়স্থ মহাশয়েরা তাহা বেশ বুঝিয়াছেন। এই সমালোচনায় তিনি ন্যায় পড়ান, এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকারী আমি ব্যাকরণ পড়াই এজন্য আমার শাস্ত্রালোচনার অধিকার নাই। সংস্কৃত কলেজের নাম, প্রিন্‌সিপাল মহাশয়ের স্তব, শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ স্মৃতিতীর্থের সান্ত্বনা

ইত্যাদিতে ১০।১১ পত্র গিয়াছে। এ বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ আচার্য্য জ্যোতিষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ১০০৲ শত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়াছেন। এ কার্য্য বঙ্গদেশে এই নূতন তাহাও জানিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পাঠনা কে করিয়াছিল, তাহা দেখিতে পান নাই। অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়া কিরূপ নিন্দা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ দেখুন 'অতাত্ত্বিক কারণ যে তাত্ত্বিক কার্য্যের উৎপাদন করে, ইহা ঐ ঠাকুরের মুখে নূতন শুনিলাম' কিন্তু দার্শনিকেরা সকলেই জানেন, ইহা লইয়া থাকে।

ন্যায়মতে অহং ব্রহ্মাস্মি এই মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তির কারণ। স্বপ্নে অতাত্ত্বিক স্ত্রী-চিন্তা, আবরণ বস্ত্র আর্দ্র করে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, তাত্ত্বিক ভয় উৎপন্ন করে। বৃক্ষান্তরাল হইতে আগত জ্যোৎস্নায় পিচাশজ্ঞান, তাত্ত্বিক ভীতি কম্প ও মৃত্যু পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে। সুতরাং অতাত্ত্বিক কারণে তাত্ত্বিক কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা তিনিও জানেন, তবে বিচারে আত্ম-বিস্মৃত।

গুপ্তপ্রেসাদির গণকেরা যেমন গ্রহ-পাদি কোনরূপে মিলাইতে না পারিয়া ন্যাটি-ক্যাল হইতে গণনা করিতেছেন, অথচ বিশ্বকে বঞ্চনা করিবার জন্য স্ফুটচন্দ্রিকা মতে নাম দিয়া থাকেন, সেরূপ বিশ্ববঞ্চক আমরা নহি, তাহা হইলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হই-তাম। আমরা বিশ্ববঞ্চনাকে মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করি। সুতরাং অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। তাঁহার কথার প্রশংসা করিবার লোকের অভাব নাই। আমাদের ন্যায় একটা মুগ্ধবোধের পণ্ডিত অস্বীকার করিলই বা, ইহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই।

শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা।

আত্মারহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৮। মনের এবংবিধ গমনাগমন কর্ম্মজন্য।

কর্ম্মনিমিত্তং চেদং মনসো গমনাগমনং।

অর্থাৎ—কেবল কর্ম্মের নিমিত্তই মনের এবংবিধ গমনাগমন অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানাত্মা কি জন্য উক্ত অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হন ?

বিজ্ঞানাত্মা যে কেন উল্লিখিত অবস্থাত্রিতয়ের বশবর্ত্তী হন, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য।

কর্ম্মের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চ এই শব্দটীর দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানজনিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগার্থেই বিজ্ঞানাত্মার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্তি।

২৯। কর্ম্মফল ভোগার্থই বিজ্ঞানা-ত্মার প্রাগুক্ত অবস্থাত্রয় প্রাপ্তি।

স্বপ্ন জাগরিতে গচ্ছতি।

অর্থাৎ—কর্ম্মফল ভোগের উদ্দেশেই যে বিজ্ঞানাত্মার স্বপ্ন ও জাগ্রদাবস্থা প্রাপ্তি স্পষ্ট-রূপেই তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুষুপ্তি

অবস্থায় কর্ম্ম বা তৎফলভোগ কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। শ্রুতিও বলিতেছেন ;—আত্মা পাপপুণ্যে আবদ্ধ অবস্থায় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন। অতএব সুষুপ্তি অবস্থায় পাপপুণ্যের বিদ্যমানতা না থাকায় পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম নিমিত্ত অবস্থাত্রয় প্রাপ্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, পাছে এবংবিধ আশঙ্কা বা সংশয়ের সঞ্চার হয়, সেইজন্য পুনরায় কর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। সুপ্ত ও জাগরণ যে কর্ম্মজন্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৩০। জাগ্রত ও স্বপ্ন নিমিত্তক কর্ম্মজাত পরিশ্রমের অপনোদনার্থ বিজ্ঞানাত্মার সুষুপ্তি অবস্থা-প্রাপ্তি।

পুনঃ স্থানদ্বয়নিমিত্ত কর্ম্মোদ্ভূত শ্রমাপনোদায় সুষুপ্তিমপি গচ্ছতি।

অর্থাৎ—বিজ্ঞানাত্মা পুনরায় জাগ্রত ও স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় নিমিত্তক কর্ম্মোদ্ভূত যে পরিশ্রম, তাহার অপনোদনার্থ সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে সম্ভবতঃ এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কর্ম্মাদিরূপ কোনরূপ হেতুর বিদ্যমানতা না থাকায় কিরূপে তাহার সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্তি হয়? ইহার উত্তর এই যে, যেমন স্বপ্ন জাগরণানুকূল কর্ম্মপরবশ হইয়া তাহার ফলভোগের জন্য বিজ্ঞানাত্মা উক্ত স্থানদ্বয় প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সেই ভোগ দ্বারা যে শ্রম জন্মে, তাহার প্রশমনার্থই তাঁহার সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্তি। পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মকে সুষুপ্তির নিমিত্ত বা হেতু বলা যায় না—বলিলে শ্রুতির সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হয়। সুষুপ্তিকালে কর্ম্ম বা তাহার ফলের কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। আবার কর্ম্মরূপ কোন কারণের বিদ্যমানতা না থাকিলেই যে সুষুপ্তিপ্রাপ্তি একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সম্ভবপর নহে। উল্লিখিত অবস্থাদ্বয়জাত শ্রম-নিবন্ধন উপাধিস্বরূপ বীজভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ মনের অবিদ্যার লয় আদৌ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অন্য কোন আগন্তুক কর্ম্ম ব্যতিরেকে বিকার প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে; যেহেতু তাহা বস্তু মাত্রেরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু কারণে লীন হওয়া তাবৎ পদার্থেরই প্রকৃতি। বুদ্ধির কারণভূত যে অবিদ্যা তাহাতে লীন হওয়ার নামই সুষুপ্তি। সুতরাং কর্ম্মের অভাবেও তাহা যে স্বভাবতঃই সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা আদৌ অযৌক্তিক নহে। সুষুপ্তি অবস্থাকে তাই শাস্ত্রে জীবের দৈনন্দিন প্রলয় বলে। এইরূপে উপাধিভূত বীজভাব প্রাপ্তি দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি দ্বারা পরমানন্দের অনুভূতি সংঘটন হয় বলিয়া সুষুপ্তিকালে শান্তি লাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তি সুখ যে মুক্তি সুখেরই অস্ফুট আভাস, তাহার কারণই এই।

৩১। প্রাণ ও ভোগায়তন স্বরূপ দেহকে পরিচালনপূর্ব্বক অবস্থান করে।

প্রাণোঽপি তদ্বর্ম্ম বশাদেব শরীরং পালয়ন বর্ত্ততে, স্বপ্ন সুষুপ্তয়োর্জাগরিত ইব মৃতিভ্রান্তি পরিহারায়।

অর্থাৎ—প্রাণ ও কর্ম্মফল ভোগধর্ম্মের অধীন হইয়া জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে মরণভ্রান্তি নিরসন করিবার জন্য ভোগায়তন শরীরকে পরিচালন করিয়া অবস্থান করেন।

এস্থলে সম্ভবতঃ এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রাণও যখন ইন্দ্রিয়রাজিরই অন্তর্ভূত, তখন তাহাদের উপরতি কালে প্রাণও কি জন্য উপরত হয় না? এবং নিদ্রাদি সময়ে মরণ তথা অবস্থাই বা তাহার প্রাপ্তি নহে কেন? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য

যে, জীব চৈতন্তের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই ভোগায়তন পঞ্চভূতাত্মক এই বর্ত্তমান দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। নিদ্রাদিকালে প্রাণের অভাবে মরণতুল্য অবস্থাই যদি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমাদের শরীর কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে পারে; সে অবস্থায় তদ্দারা কর্ম্মফল ভোগের ব্যাঘাত অনিবার্য্য; এই কারণ বশতঃই নিদ্রাদিকালে মরণ ভ্রান্তি নিরাকরণ করিয়া প্রাণ ভোগায়তন দেহকে পরিচালন করিয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও উপরতি আদৌ সম্ভবপর নহে। এবং এই জন্তই প্রাণকে ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকারও করা যাইতে পারে না। প্রাণ যে ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, শ্রুতিও তারস্বরে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। অতএব এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। যে কোনরূপে হউক, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের সংঘটনই সংসারপ্রবাহের প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং তাহার ভোগার্থ যাবতীয় উপাদানই যথানিয়মে সুরক্ষিত হওয়াই আবশ্যক। নিদ্রাকালেও তাই প্রাণের বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় না, হইলে প্রত্যেক নিদ্রার অবসানে পুনরায় অভিনব শরীরের প্রয়োজনার্থ ফলভোগ কল্পে তুমুল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত।

৩২। অহং প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ অহঙ্কারও আত্মা নহে।

অহমিত্যপ্যাত্মা ন ভবতি সর্ব্বৈরাত্মত্বে নাস্তি
মতোঽপি প্রত্যগাত্ম বিবেক রহিতঃ॥

অর্থাৎ—প্রত্যগাত্ম বিবেকবিহীন জীব সমুদয়, আত্মভাবে অভিমান করিলেও অহং এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে অহঙ্কার তাহাও কখন আত্মা নহে। দৃশ্য, জীবন ক্রিয়াসাধন, অচেতন ও ভোগসম্পাদনের সহকারি কারণ বলিয়া প্রাণও যে আত্মা নহে, তাহা পূর্ব্বেই স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি, সার্ব্বজনীন এই অনুভব পর্য্যালোচনা করিয়া অহঙ্কারেই অভ্রান্ত অহং প্রত্যয় স্থির করিয়া সেই অহংপ্রত্যয়কেই "আত্মা" বলিয়া থাকেন। এক্ষণে উক্ত ভ্রান্তির নিরসনার্থ ইহা বলা যাইতে পারে যে—"এই আমি এবংবিধ জ্ঞান স্থলে এই শব্দের বহির্ভূত যে পদার্থ, তাহাই চৈতন্ত; আর এই শব্দনির্দ্দেশ্য যে পদার্থ, তাহাই অহঙ্কার। যাঁহারা এই অহঙ্কারের সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে ঐ অহঙ্কার হইতে নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক নিশ্চয় বলিতে আদৌ সাহস সম্পন্ন নহেন, সেই সমুদয় লৌকিক জনগণই অহঙ্কারকে আত্মভাবেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অহঙ্কারশালী প্রাগুক্ত জনগণের অহমভিমান আছে বটে, কিন্তু নিরভিমান মহাপুরুষগণের মধ্যে সে অভিমানভাবের বিদ্যমানতা যখন নাই, তখন অহঙ্কারও কখনই আত্মা নহে।

৩৩। ঘটাদির ন্যায় অহম্প্রত্যয়ের জ্ঞেয়ত্ব আছে।

দৃশ্যত্বাৎ ঘটাদিবদেব।

অর্থাৎ—ঘটাদির ন্যায় অহম্প্রত্যয়ের জ্ঞেয়ত্ব আছে। পূর্ব্বে বুদ্ধির দৃশ্যত্ব যেরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অহঙ্কারের দৃশ্যত্বও সেইরূপেই বুঝিতে হইবে এবং আত্মাও যে দৃশ্য নহে, তাহাও পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব দৃশ্যত্বরূপ হেতুর বিদ্যমানতায় কুণ্ডলাদির ন্যায় অহঙ্কারও আত্মা নহে।

৩৪। সুষুপ্তি অবস্থায় অহম্প্রত্যয়ের ব্যভিচারও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যভিচারাৎ।

অর্থাৎ—সুষুপ্তি অবস্থায় অহম্প্রত্যয়ের

ব্যভিচারও প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি জানিতেছি ইত্যাদি প্রত্যয়-রূপ অহঙ্কারের বিদ্যমানতা থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ, অথচ সে সময়েও যে আত্মার বিদ্য-মানতা থাকে, সর্ব্ববাদিরূপে ইহাও সাধারণের স্বীকার্য্য। অতএব প্রতিপন্ন হইল অহঙ্কারও আত্মা নহে।

৩৫। দেহের ন্যায় অহঙ্কার সুখ দুঃখ আদি বহুধর্ম্মবিশিষ্ট।

সুখ দুঃখাদ্যনেক বিশিষ্টত্বাচ্চ সংসারবিশিষ্ট-ত্বাচ্চ কৃশস্থূলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহবৎ।

অর্থাৎ—স্থূল ও কৃশত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহের ন্যায় অহঙ্কার ও সুখ দুঃখাদি বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট—অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্মও তাহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অহঙ্কার আত্মা নহে, কারণ অনাত্মদেহ প্রভৃতির ন্যায় তাহার বিদ্যমানতা কখন থাকে, কখন থাকে না। অতএব দেহ প্রভৃতি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থই যে ভ্রম ও অজ্ঞান বিজৃম্ভিত—স্পষ্টতরই তাহা প্রমাণিত হইল, দেহে অভিমান-ধর্ম্ম পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান। "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" "আমি সংসারী" ইত্যাদি লৌকিক ও প্রাকৃতজনসুলভ জ্ঞানসকল অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতেই তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা উচিত যে, অহঙ্কার কখন আত্মা নহে। শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মা সর্ব্বধর্ম্মরহিত, নাশোৎপত্তি ধর্ম্মশীল পদার্থ মাত্রই অনিত্য, কিন্তু আত্মা কখনই তাহার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না—পারিলে তাঁহার আত্মত্বই থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে। কৃশত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহ যেমন আত্মা নহে—সুখদুঃখগুণধর্ম্মী অহঙ্কারও সেইরূপ আত্মা নহে। অতএব এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, পরিদৃশ্যমান আমাদের এই স্থূল দেহ হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থই অনাত্মা, এবং তত্বৎ পদার্থে আত্মপ্রতীতিও ঘোর অজ্ঞানবিজৃম্ভিত।

৩৬। প্রশ্ন হইতে পারে, দেহাদিতে আত্মশঙ্কার আবির্ভাব কোথা হইতে?

যদ্যেবং দেহাদিষ্বনাত্মত্বমাত্মশঙ্কা কুত ইতি চেৎ।

অর্থাৎ—দেহ প্রভৃতি নশ্বর পদার্থে আত্ম-ভাব শঙ্কার সঞ্চার কোথা হইতে আইসে? দেহাদির অনাত্মত্ব অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দেহ যদি আত্ম না হইল তবে তাহাতে আত্ম-প্রত্যয় জন্মিবার কারণ কি?

কিন্তু—

৩৭। দেহে আত্মভ্রম জন্মে কেন?

দ্রষ্টৃদৃশ্য বিবেকাভাবাৎ।

অর্থাৎ—দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের বিবেকাভাব বশতঃই দেহাত্মভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহাদি যে দৃশ্যরাজি—তাহাদের অতীত, এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এমন একজন দ্রষ্টা আছেন, যাঁহার সত্বা অজ্ঞান জীবসাধারণের মায়া মোহ ও ভ্রান্তি কলুষিত বুদ্ধিতে আদৌ অনুভূত হইবার নহে। অগ্নিব্যাপ্ত লৌহপিণ্ডে পৃথকত্ব জ্ঞান না থাকায় যেমন দহনভ্রান্তির উৎপত্তি-চৈতন্য ব্যাপ্ত দেহাদিতেও পৃথকত্ব জ্ঞানের অভাববশতঃ আত্মত্ব ভ্রমও সেইরূপ অসম্ভব নহে। অতএব ভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয় আছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলি অযুক্ত হইতে পারে না। শ্রুতি এবং যুক্তি উভয়বিধ উপায় দ্বারাই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থের অনাত্ম ভাবই একে একে প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এ সমুদয়ে—আত্মভাব প্রতীতি নিঃসন্দেহই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত কল্পনামাত্র॥

আত্মানাত্মের প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

আত্মারহস্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১। সেই আত্মা কে?—

অথ স আত্মা ক ইতি।

অর্থাৎ—যে আত্মার সম্বন্ধে কতকগুলি রহস্যের উদ্ভেদ পূর্ব্বে করা গেল, সেই আত্মা কে? বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাইবে। দেহ প্রভৃতি যে আত্মা নহে, ইহা যখন সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তখন দেহ প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক আত্মা যে বিদ্যমান আছেন, অতঃপর তাহাই প্রতিপাদ্য, কিন্তু উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত আত্মার বিদ্যমানতা—মোহমুগ্ধ সাধারণ জনগণের সহজবুদ্ধির অগম্য—তৎপ্রতিপাদনপ্রয়াস সুতরাং যারপর নাই দুরূহ ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

২। দেহাভ্যন্তরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর্নিহিত বস্তুই আত্মা।

উক্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ব্যতিরিক্ত অন্তরতমঃ।

অর্থাৎ—পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত বস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর্নিহিত বস্তুই আত্মা। দেহ হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত যে সকল বস্তু অনাত্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তত্তৎ পদার্থ হইতে অন্তর্নিহিত যে সূক্ষ্মতম পদার্থ, তাহাই আত্মা। আত্মা যে সর্ব্বান্তরত্ববোধক—শ্রুতিও তাহাই বলেন।

৩। আত্মা কিরূপ?—

আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ—সূক্ষ্মঃ নিত্যঃ।

অর্থাৎ—আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম ও নিত্য পদার্থ। যদি বল আত্মা দেহের অন্তরতম প্রদেশেই নিহিত—তাহা হইলে বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ ঘটে, এ আশঙ্কা নিরসনার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা তাবৎ পদার্থ ব্যাপিয়াই যখন অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহাতে পরিচ্ছিন্নতা দোষের আরোপ আশঙ্কা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ যাহা পরিচ্ছিন্ন—খণ্ড পরিমাণ বিশিষ্ট তাহা সাবয়ব—দেহাদির ন্যায় তাহা সুতরাং ধ্বংসশীল ও অংশসমন্বিত এবং অংশবিশেষের সংযোগবিয়োগের ন্যায় তাহার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী—অতএব তাহা অনাত্মা। আত্মা সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী॥

আত্মার সূক্ষ্মত্ব।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা যদি সকলের কারণরূপেই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয় না কেন? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মা অতি সূক্ষ্ম—কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত পদার্থ তিনি নহেন।

আত্মার নিত্যত্ব।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে আত্মা প্রতিক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া নূতন হইতেছেন—এ অপসিদ্ধান্তের মূলে আদৌ সত্যের লেশ সম্বন্ধ নাই, ইহা ভ্রমমাত্র। আত্মা যদি প্রতিক্ষণেই নূতন হইলেন, তাহা হইলে "যে আমি পূর্ব্বক্ষণে বর্ত্তমানে ছিলাম—সেই আমি এই বর্ত্তমনে মুহূর্ত্তেও রহিয়াছি"—এবংবিধ প্রত্যভিজ্ঞান—পরিচয়জ্ঞান কখনই সম্ভবপর হইতে পারিত না, অতএব আত্মা যে অবিনাশী ও নিত্য পদার্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

৪। আত্মার স্বরূপ—

নিরবয়বঃ—নির্গুণঃ নিরঞ্জনঃ।

অর্থাৎ—আত্মা নিরবয়ব, নির্গুণ ও নিরঞ্জন। কেহ কেহ বলেন, আত্মা নিত্য বটে, কিন্তু অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের সমষ্টিস্বরূপ—কিন্তু এ সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত নহে। কারণ অংশবিশিষ্ট হইলে ঘটপটাদির ন্যায় তাঁহাতে অনিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় অংশ সমষ্টিময় যে পদার্থ—অংশের সংযোগ বিয়োগে তাহার অবস্থান্তর নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আত্মারও যদি সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে, অথচ আত্মা যে নিত্য পদার্থ, পূর্ব্বেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আত্মা সুতরাং নিরবয়ব॥

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের আধার। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এ মত আদৌ সমীচীন নহে। কারণ—আত্মা যে নির্গুণ ও শুদ্ধস্বভাব শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন, আবার অন্তঃকরণ নিজে যে গুণবিশিষ্ট, তাহারও প্রচুর প্রমাণ আছে। এ অবস্থায় আত্মার নির্গুণতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এবং সহজেই তাহা বোধগম্য।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জীবন-লীলা বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ জীবন্মুক্তি-সুখে অবিশ্রান্ত নিমগ্ন থাকিবার নিমিত্ত সংসারের কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া একান্তে বাস করেন, কেহ বিশ্বপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আচার্য্য-পদ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের পালনার্থ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। আবার কেহ বা জগতের হিতসাধনে জীবন সমর্পণ করেন। এই সকল শ্রেণীর মহাপুরুষেরাই জগতের পূজার্হ। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সদাশিবোপম মহর্ষিবৃন্দই বিশেষ ভাবে নরনারীর ভক্তি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মকল্প মহামুনিরা ইচ্ছাপূর্ব্বক উপদেশাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলেও তাঁহাদের দ্বারা আপনা আপনিই জগতের মহান্ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। তাঁহাদের দর্শনে ও পাবন অঙ্গের অনিলস্পর্শে মানবের কলুষরাশি বিনষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। পরন্তু এই শ্রেণীর মহাত্মা অতীব দুর্লভ। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী ঈদৃশ একজন মুনিপ্রবরেরও চরণসংস্পর্শে পূত হইতেছে কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জগৎহিতব্রত আচার্য্যের দ্বারা যে মহান্ শুভ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, এই বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধ ও শঙ্কর প্রভৃতির জন্মভূমি ভারতের অধিবাসীরা মনে কোন সন্দেহই আনিবেন না; সুতরাং ইহা লইয়া অধিক বাক্যবিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্যই এস্থলে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, হস্তামলকবৎ

অদ্বৈত তত্ত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে আচার্য্যত্বেই অধিকার হয় না। অব্রহ্মদর্শী আচার্য্য হইতে যে অন্ধপরম্পরানীতিরই অবতারণা হয়"অবিদ্যায়া অন্তরে বর্ত্তমানা" ইত্যাদি শ্রুতিই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে অদ্বৈতবাদে উপনীত না হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না; আর তাহার অভাবে আচার্য্যত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে,অদ্বৈতবাদী ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই উক্ত পদ লাভ করিতে পারেন না। যাহারা সাম্প্রদায়িকভাবে হতচেতন হইয়া অব্রহ্মদর্শীকেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন, তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়া আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কেননা অন্য সম্প্রদায়কে বিষনয়নে অবলোকন করাই যাঁহাদের একপ্রধান ব্রত, তাঁহাদের প্রতি উপদেশ, আর অরণ্যে রোদন, একই কথা। অথবা সাধনচতুষ্টয়সাপেক্ষ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে তাঁহাদের অধিকার কোথায়?

অদ্বৈতবাদের কথা শুনিয়া হয় ত অনেক অব্রহ্মদর্শী বা ব্রহ্মবিমুখ ব্যক্তি আপত্তি করিয়া উঠিবেন যে, সুখের উৎস, সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি, প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান, বিবিধ পদার্থে সুসজ্জিত বিধাতার পণ্যবীথিকাস্বরূপ জগত বর্ত্তমান রহিয়াছে ও বালকবৃদ্ধবনিতা মূর্খ পণ্ডিত সকলেই ইহার নানাত্ব উপলব্ধি করিতেছে। এইরূপ অবস্থাতে মাদক দ্রব্যের শরণ না লইয়া কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ শূন্য। এই আপত্তি শুনিতে শুনিতে অদ্বৈতবাদীদিগের কর্ণযুগল বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরও তাঁহারা বিবিধ প্রকারে ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অনেক অজ্ঞানী যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রহিয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহাদের অন্তঃকরণ মলিন ও বুদ্ধি অমার্জ্জিত রহিয়াছে, ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এজন্য শ্রীভগবান্ গীতাতে স্বমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন "ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনাং" তথাপি জিজ্ঞাসুবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অভ্যাস-নীতির অনুসরণপূর্ব্বক আমরা এই বিষয়ে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। জগতের নানাত্ব অথবা পরস্পর ভেদ আমরা অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্তু ঐ নানাত্বের আশ্রয় আকৃতি আদি গুণ ও গতি আদি ক্রিয়া, কিন্তু মূল বস্তু নহে। মনে কর, ১০টী পৃথগাকৃতিবিশিষ্ট মৃণ্ময় পুতুল তোমার নেত্রপংক্তির অতিথি হইয়া রহিয়াছে, ঐগুলির পরস্পর ভিন্নতা কেবল বর্ণ, আকৃতি ও পরিমাণগত, মূল বস্তু মৃত্তিকাসংক্রান্ত কিছু মাত্র ভেদ নাই। ঐ সকল গুলিরই উপাদান এক মৃত্তিকা। এই নিয়ম জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় বস্তুতে সংযোজিত করিয়া লও, দেখিবে যে ভেদ কেবল গুণগত, বস্তুগত ভেদ কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাইবে না। ইহাই ভৌতিক বস্তু সম্পর্কীয় নিয়ম। এক্ষণে ভূত সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। পঞ্চ ভূতের পার্থক্য কেবল গুণগত,বস্তুগত পার্থক্য কিছুই নাই। মনে কর, তোমার সমক্ষে ভূতচতুষ্টয়ের পরামাণুপুঞ্জ এক পাত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহাদের গুণ উপলব্ধি না করিয়া কি তুমি বুঝিতে পার যে, ইহা অমুক পরমাণু, উহা অমুক পরিমাণু। যখন ঐ পরমাণু পুঞ্জের পৃথক্ পৃথক্ গুণ বুঝিয়া লইতে পারিবে, তখনই তোমার নিকট উহাদের ভিন্নতা প্রতীয়মান হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কেবল গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই কিছু সমাচার দেয়, উহারা বস্তুগত কোন মীমাংসা করিতে পারে না। গুণাতিরিক্ত দ্রব্যপ্রত্যক্ষের কথা কেবল শ্রুত হইয়াই আসিতেছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈশেষিকেরা পরমাণু-তত্ত্ব-গবেষণায়

অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; পরন্তু বিভাজ্য বস্তুনিচয়ের অবিভাজ্য অন্তিম অংশরূপ পরমাণু সাবয়ব বা নিরবয়ব এইরূপ বিকল্প উত্থাপন করিলে তাঁহাদের বহু আয়াস-সংগঠিত ভিত্তি ভগ্ন হইয়া যায়; কেননা পরমাণুকে সাবয়ব মানিলে তাহার অবিভাজত্ব বিলুপ্ত হয়, আর নিরবয়ব স্বীকার করিলে নিরবয়ব বস্তুর পক্ষে সাবয়ব বস্তুর বাস্তবিক উপাদানত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ক্রমোন্নতি নিয়মে সাবয়ব ত্র্যসরেণু প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই স্থলে যদি বলা যায় যে, নিরবয়ব ব্রহ্মকে বৈদান্তিকেরা যখন জগতের উপাদান স্বীকার করিতেছেন, তখন নিরবয়ব পরমাণু যদি সাবয়ব বস্তুর উপাদান হয়, তবে দোষ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বেদান্ত মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদ-বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য কার্য্যকরণের অভেদ জ্ঞান দ্বারা অদ্বৈত-তত্ত্ব-বোধই নিরূপিত হইয়াছে। যদি নৈয়ায়িকদিগের সন্তোষ ও উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য নিরবয়ব বস্তুকে সাবয়ব বস্তুর উপাদান কারণ মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি সুদূরপরাহতই হইয়া পড়ে, কেননা, নিরবয়ব নিত্য বস্তুতে রূপাদি গুণ ও ক্রিয়ার নৈয়ায়িকাভিমত স্বরূপ লেপক সম্বন্ধে অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া তাহাদের পরস্পর ভিন্নতাই সিদ্ধ হয় না। আর ভিন্নতা সিদ্ধ না হইলে অখণ্ড এক নিত্য বস্তু বলিয়া পরমাণু পরব্রহ্মের স্থান অধিকার করিয়া বসে। ভিন্নতা কেবল নামে, বস্তুগত কিছুই ভেদ নাই। নৈয়ায়িকগণ নিখিল পদার্থবৃত্তি এক নিত্য সত্তা জাতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈদান্তিকগণ উহাকেই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া থাকেন। এই বিশ্বব্যাপিনী সত্তাই যাবতীয় গুণক্রিয়ার অধিষ্ঠান, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই গুণ ও ক্রিয়ারাশি স্বকীয় বিপণী সুসজ্জিত করিয়া অপ্রবুদ্ধ সমাজকে প্রলোভনদামে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মহীয়সী সত্তাই একমাত্র স্থায়ী বস্তু। গুণ ও ক্রিয়া প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সত্তাকে আবার জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, কারণ অজ্ঞাত সত্তা প্রমাণিত না হওয়াতে বাধ্য হইয়া জ্ঞান ও সত্তাকে একই বস্তু বলিতে হয়। মনে কর, তোমার সম্মুখে পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে, উহাকে তুমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিতেছ, এই চাক্ষুস প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান হইতে উহার অস্তিত্বকে কি বিশ্লেষণ করিতে পার? যদি না পার, তবে কেন বলপূর্ব্বক উহার এক কিম্ভূতকিমাকার পৃথগ্‌সত্তা মানিয়া ঝিভ্রাটে পড়। ফলতঃ সত্তা ও জ্ঞান একই বস্তু, এই জন্য বেদান্তশাস্ত্রে উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উভয়কে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া মানিলে বেদান্ত সিদ্ধান্ত ও যুক্তির অবমাননা করা হয়।

নানাত্ব গুণ ও ক্রিয়াগত বস্তু সংক্রান্ত ভিন্নতা কিছুমাত্র নাই, ঐ ভেদশূন্য বস্তু বিশ্বব্যাপিনী চিন্ময়ীসত্তাই গুণ ও ক্রিয়ার অধিষ্ঠান, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জ উহাদের সমবায়ী আশ্রয় নহে, ইহা যুক্তিপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ঐ গুণক্রিয়ার স্থিতি ও প্রতীতিসম্বন্ধে বিচার করা যাউক। আমাদের সমক্ষে এই যে গুণক্রিয়ার মেলা হইতেছে, ইহা কি সর্ব্বদাই একভাবে অবস্থিত থাকে ও প্রতীয়মান হয়? না, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ও আলোক সংযোগাদির পরিবর্ত্তনে উহাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানও প্রমাণিত করিয়াছে যে, পরমাণুপুঞ্জের বিনিময় হেতু প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তন-স্রোতে যেন নিখিল পদার্থ ভাসিয়া যাইতেছে। এই তত্ত্ব পুরাকালে

বৌদ্ধেরাও বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা স্বকীয় গ্রন্থে বারিপ্রবাহ ন্যায়ের অবতারণপূর্ব্বক জগতের অনিত্যত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদের কুশাগ্রবুদ্ধি ব্যষ্টি জগতের অন্তস্তত্ব ভেদেই সমর্থ হইয়াছিল; সমষ্টি তত্ত্বের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করা ত বহুদূরের কথা, তাঁহারা উহার সমাচার পর্য্যন্তও পান নাই। এই বূহ ভেদ করিতে একমাত্র বৈদান্তিক বীরবেশীরাই সম্পূর্ণ কুশলতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা অতল, নিষ্পন্দ, প্রশান্ত সমষ্টি জলধির গর্ভে ডুবিয়া অমূল্য মহারত্ন লাভ করিয়াছিল।

জগত যে পরিবর্ত্তনশীল ও জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ ক্ষণস্থায়ী, যোগবাশিষ্টের দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেয়। দৃষ্টি সৃষ্টিবাদের তাৎপর্য্য ইন্দ্রিয়বোধই নামরূপের লীলাক্ষেত্র এই জগৎ রচনা করিয়া লয়। ঐ বোধের পূর্ব্বে জগত ছিল না, আর পশ্চাতেও থাকিবে না। কেবল জ্ঞানকালেই বস্তুর সত্তা; অজ্ঞাত বস্তুর সত্তা আকাশকুসুমবৎ কেবল কথার কথা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর অজ্ঞানকালে যে আমরা প্রমাণ না পাইয়াই তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লই, ইহার কারণ বস্তুজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ এক প্রকার বস্তু পুনঃ পুনঃ দেখিয়া অন্ধপরম্পরাক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে,যখন সর্ব্বদাই উহাকে আমরা একইরূপে দেখিতে পাই, তখন উহা আমাদের অজ্ঞানকালেও বর্ত্তমান থাকে। এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া বহুল অনর্থ আনয়ন করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা অজ্ঞানকালে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন অব্যভিচারী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি না, আর দৃঢ় প্রমাণ না পাইয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া পরীক্ষকের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যেরূপ দৃষ্টি সৃষ্টিবাদজগতের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বুঝাইয়া দেয়, তদ্রূপ মনস্তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলেও তাহা যে প্রবাহের করিবৎ এই আছে এই নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

অনেকেরই এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, মন শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানবিশেষে বসিয়া আছে, আর বিবিধ অনন্ত জগত তাহার বাহিরে থাকিয়াও তাহারই মনন-শৃঙ্খলে বাঁধা রহিয়াছে অর্থাৎ মন শরীরের ভিতর থাকিয়াও বহির্জগতের জ্ঞান আনিয়া দিতেছে। মন ও ভাবরাশির (তত্বদাকার বৃত্তিপুঞ্জের) কার্য্যকারণ ভাব এবং স্বপ্নতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলেই এই ধারণা যে ভিত্তিশূন্য, অসম্বদ্ধ কল্পনামাত্র, ইহা বুঝিতে পারা যায়। জাগ্রতে মন ও ভাবরাশি বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং জাগ্রত অবস্থাতে কার্য্যভূত ভাবরাশির প্রতি কারণীভূত মনের অন্বয় প্রমাণিত হইতেছে। সুষুপ্তিতে মন ও ভাবরাশির অভাব হেতু ঐ অবস্থাতে উহার ব্যতিরেক সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, মন ভাবরাশির কারণ, সুতরাং মন নিরপেক্ষ ভাবরাশির প্রমাণ হওয়াই অত্যন্ত অসম্ভব। যখন মন নিরপেক্ষ, ভাবপুঞ্জ প্রমাণিত হয় না,তখন তাহার অতিরিক্ত বাহ্য কারণ কল্পনা করা - কখনও বিবেকানুমোদিত হইতে পারে না। বহিঃপদার্থবাদীরা যে বাহ্য অপ্রত্যক্ষ জড়কে ভাবরাশির অন্যতম কারণ মানিয়া থাকেন, প্রজ্ঞামুকুরে ইহার কোন সারবত্তা প্রতিভাত হয় না, কারণ স্বপ্ন অবস্থাতে উপযোগী দেশকাল নিমিত্তের অভাবেও মন জগৎ রচনা করিয়া লয়। যদি ইহাতেও পরম্পরারূপে ঐ কিম্ভূত কিমাকার বাহ্য জড়কে কারণ মানিয়া লওয়া যায়, তবে অসদাগ্রহই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে;

কেমনা এই অবস্থাতে উক্ত জড়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হওয়াই সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে জাগ্রত পদার্থের অনুভবজনিত সংস্কারকেই স্বপ্নের কারণ স্বীকার করিলে যে অভিহিত জড় অন্যথা সিদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না। পাঠকগণ যুক্তিতর্কের কথা ত শুনিলেন। এক্ষণে আসুন সকলে মিলিয়া পরম পূজনীয় ঋগ্বেদ কি আদেশ করিতেছেন, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করা যাউক। "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা করয়ো মনীষা" ঋগ্বেদ মং ১০। অং ১১। সূক্ত ১২৯। মন্ত্র ৪। "মন হইতে যে প্রথম কার্য্য স্পন্দন উৎপন্ন হইয়াছিল, উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালে তাহা সংকল্পরূপে বর্ত্তমান ছিল। মেধাবী পণ্ডিতেরা মনে মনে বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, উক্ত সঙ্কল্পই অব্যক্তে ব্যক্তের-বন্ধনহেতু অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগদাবির্ভাবের মূলে কামনা ছিল।" "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যু নৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়া অশনায়াহি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুত আত্মন্বীস্যামিতি।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অধ্যায়। ৩ ব্রাহ্মণ ২।

"মহাপ্রলয়কালে ব্যক্ত প্রপঞ্চ কিছুমাত্র ছিল না, এই সমস্তই মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল। ঐ মৃত্যু যেন বুভুক্ষারূপেই পরিণত হইয়াছিল। উহা সন্ততিশালী হইবে বলিয়া মন উৎপন্ন করিল।" এইস্থলে মৃত্যু শব্দের অর্থ মূল প্রকৃতি, আর সমস্ত সৃষ্টির আদিকারণ মন বুঝিতে হইবে। যোগবাশিষ্ঠে অসকৃৎ উক্ত হইয়াছে যে, এই চরাচর জগত মনোবিলাস মাত্র, মন হইতে ইহার উৎপত্তি, মনেই ইহার লয়। বস্তুতঃ জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থাতে মন বহুরূপীর ন্যায় বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া স্বয়ংই সেইরূপ রাশির কমনীয় ছটায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে; আবার কোনরূপের বিয়োগে শোকবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অধীর হইয়া উঠে। এইরূপ প্রণালীতে কৃত্রিমরূপ সাজিতে সাজিতে পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামসুখের নিমিত্ত সুষুপ্তিতে উপনীত হয়, এবং উপনীত হইবামাত্র মহাকারণে বিলীন হইয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে জগত শূন্যময় হইয়া উঠে। ঐ অবস্থাতে কোথায় ইন্দুবদনা অর্দ্ধাঙ্গিনীর হাসি, কোথায় স্নেহভাজন তনয়ের সুধামাখা পিতৃসম্বোধন, কোথায় সুবর্ণমুদ্রার জলদঙ্গার জ্যোতিঃ। ইহাদের জন্যই জাগ্রত অবস্থাতে জীব আত্মহারা হইয়া থাকে। এক কথায় বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, সুষুপ্তিতে এই দৃশ্যমান জগতের কিছুই থাকে না। এই কথা শুনিয়া হয়ত পরাবিজ্ঞানভিজ্ঞ পাঠক বলিয়া উঠিবেন যে, লেখকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, নতুবা ঐ সময়েই অন্য কোটী কোটী জীবের প্রতীয়মান জগতকে এক মনুষ্যের সুষুপ্তিতেই কোন বিলোপ করিবেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সময়ে যাঁহারা জগৎ দেখিতে পান, তাঁহারা কি সুষুপ্ত? যদি না হন, তবে সুষুপ্তি অবস্থায় জগত প্রমাণিত হইল কৈ? দেখিতেছি কেবল বাগাড়ম্বরই সার হইল। ফলতঃ মনের অভাব হেতু সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মা ও মূলাবিদ্যা ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বেদান্ত শাস্ত্রে যে জগতকে ভ্রান্তিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য জগৎ অবিরত পরিবর্ত্তন স্রোতে বহমান হইতেছে, এবং বস্তুকে অন্যরূপে জানাই ভ্রান্তি পদের অর্থ; সুতরাং সদা পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য জগতকে নিত্য বলিয়া জানা যে ভ্রান্তিমাত্র, ইহাতে কোন সন্দেহ আসিতে পারে না। যদ্যপি শুদ্ধ চিন্ময় পরব্রহ্মে মায়িক জড় জগতের প্রতীতি ও ভ্রান্তিরূপা, তথাপি সোপাধিক বলিয়া ব্যুত্থান অবস্থাতে উহার নিবৃত্তি হইতে পারে

কৈ? একমাত্র বিদেহমুক্তি ও সমাধিতেই ঐ ভ্রান্তি সুদূরপরাহত হয়। এইস্থলে কোন কোন ব্যক্তি অদ্ভুত আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, বৈদান্তিকেরা ব্যর্থই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রান্তির কথা বলে। বস্তুতঃ জগতেই ব্রহ্ম-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। কেননা মুষ্টিমেয় বেদান্তীকে বাদ দিলে এমন লোক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, যিনি বলেন যে, আমি ব্রহ্ম দেখিতেছি। পক্ষান্তরে বেদান্তী অবেদান্তী সকলেই জগৎকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতেছে; ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সমাধি অবস্থাতে সমাহিত ব্যক্তির সমক্ষে জগৎ থাকে না, কিন্তু ব্রহ্মদ্যুতি প্রকাশমান থাকে; সুতরাং ব্যতিরেক ব্যভিচার হওয়াতে জগতকে ব্রহ্মভ্রান্তির কারণীভূত অধিষ্ঠান বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। ফলতঃ অনিত্য-বস্তু কখন নিত্যবস্তু সংক্রান্তে ভ্রান্তির অধিষ্ঠান হইতে পারে না। অধিষ্ঠানের অর্থ যাহার জ্ঞান হইলে ভ্রমনিবৃত্তি হয়, যথা রজতভ্রমে শুক্তির নীলপৃষ্ঠ ত্রিকোণাদি। বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থে ভ্রান্তিসম্বন্ধে বিরাট ব্যাখ্যা হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত যুক্তি তর্ক অতীব সূক্ষ্ম। এই কারণে স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর অল্পাবকাশ পাঠকবর্গের পক্ষে তাহা অনুকূল হইবে কি না, এই আশঙ্কায় তৎসংকলন বিষয়ে বিরত থাকিলাম। এই অনাদি জগৎ-ভ্রম যে মনুষ্যকে পশুবৎ করিয়াছে, ইহা যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারের প্রবল পরিপন্থী, পক্ষান্তরে ইহার তিরোধান হইতে যে হৃদয়-প্রান্তরে শান্তিপ্রস্রবণ অবিরতধারে বহিতে থাকে, কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই বিষয়ে দ্বিভাব আনয়ন করিতে পারেন?

পাঠক আর অনাত্মচর্চ্চা লইয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই, আইস এক্ষণে আত্মতত্ত্ব, গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মানবজন্ম সফল করা যাউক। ইতঃপূর্ব্বে যে চিত্তাদাত্ম্যশালিনী সত্তা নিরূপিত হইয়াছে, উহা কি আত্মাতিরিক্ত বস্তু? উহা হইতে কি অহং প্রতীতির সাক্ষীভূত প্রত্যগাত্মা ভিন্ন? এই প্রশ্ন শুনিয়া হয় ত অনেক দেহাত্মবাদী বা দেহাত্মভ্রমী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিবেন যে, যখন সার্দ্ধ ত্রিহস্ত ভোগায়তন কলেবর ব্যতীত আত্মশব্দের অর্থ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন তাহা হইতে দার্শনিকদিগের ঐ অদ্ভুত সত্তা ভিন্ন এই বিষয়ে আপত্তি করিবার কি আছে? ইহার উত্তরে বৈদান্তিকেরা বলেন যে, ক্ষণবিধ্বংশী শরীরকে আত্মা মানিলে অনুভবকালীন আত্মা স্মৃতিকালে থাকে না বলিয়া স্মরণই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেননা অনুভব ও স্মরণের এক কর্ত্তা হওয়াই যুক্তি ও শাস্ত্রের অনুমোদিত। ইহাই দেহাত্মবাদীর বৃত্তান্ত, আবাব ইন্দ্রিয়াত্মবাদীরা ইন্দ্রিয় সমূহকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে বিকল্প উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আত্মা অথবা সকলে মিলিয়া আত্মা। প্রথম পক্ষে নষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তির পূর্ব্বস্মৃতি উক্ত নিয়মে অসম্ভব হইয়া উঠে। আর দ্বিতীয় পক্ষে জন্মান্ধ বা জন্মবধিরদিগের আত্মসংক্রান্ত কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপে মন ও বুদ্ধিকে আত্মা মানিলে উহাদের অভাবে সুষুপ্তিকালীন সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপনের অবসর আসিতেছে যে, যদি শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত কোন বস্তুই আত্মাসিদ্ধ হইল না, তবে উহা কি কল্পনা বা মনোরাজ্যসম্ভূত তুরগাণ্ডবৎ অলীক? পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নিকট এই প্রশ্নের উত্তরাশা মরু-মরীচিকার জলাশার ন্যায় বিফল বলিয়াই বোধ হয়; কেননা, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বুদ্ধির পরিখা ভেদ করিতে পারেন নাই। একমাত্র প্রাচ্য

দার্শনিকেরাই এই প্রশ্নের হৃদয়স্পর্শী উত্তর প্রদান করিয়া ধার্ম্মিক জগতে চিরস্মরণীয় রহিয়াছেন। অন্তর্জগতের তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিলে নিত্যবস্তু বলিয়া আমরা কাহাকে ধরিতে পারি? দেখিতেছি একমাত্র জ্ঞানেই এই বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার উপসংহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানকেই আমরা নিত্যবস্তু বলিয়া ধরিতে পারি। অন্য কোন বস্তুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এই জ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক স্বপ্রকাশ-জ্ঞান,অপর বৃত্তিজ্ঞান। পরীক্ষাতে প্রথম জ্ঞান নিত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অনেক দার্শনিক আদিমজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত না করিয়া দ্বিতীয় জ্ঞানের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়াই ভুলিয়াছিলেন, তাই জ্ঞানমাত্রকেই তাঁহারা ক্ষণিক বা ত্রিতয়ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন; পরন্তু শঙ্কর-মরিচীমালীর উজ্জ্বল কিরণে ঐ সকল তিমির দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। পাঠক একবার মনোবৃত্তি অন্তর্মুখ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হউন, দেখিবেন, ঐ স্বপ্রকাশজ্ঞান সর্ব্বদা সকল বস্তুতে একভাবে প্রকাশমান রহিয়াছে। এমন সময় অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না, যাহাতে উহার অনাত্ম নিস্পন্দ জ্যোতিঃ না রহিয়াছে; এমন কোন জিনিষই দেখিতে পাইবেন না, যাহা উহার পবিত্র দ্যুতিতে আলোকিত নহে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ঐ জ্ঞানেরই লীলাক্ষেত্র। ফলতঃ সর্ব্বত্রই উহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য, সর্ব্বত্রই উহার স্বাধিকৃত বাণিজ্য। উহাই যেন প্রলয়কালীন জলধির ন্যায় বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া অনন্ত জগৎ প্লাবিত করিতে উদ্যত হইতেছে। ইহাই হইল ব্যুত্থান অবস্থার বৃত্তান্ত। আবার সমাধিতে ঐ জ্ঞানসমুদ্রের বক্ষে এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্ব এমনভাবে বিলীন হইয়া যায় যে, ঐ সমুদ্র ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

যখন সিদ্ধ হইল যে, জ্ঞান সার্ব্বকালিক, সর্ব্বদেশিক ও একভাবাপন্ন, তখন উহা যে নিত্য বস্তু, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ রহিল না। যদিও ব্যুত্থান অবস্থাতে জ্ঞানকে আমরা বিষয় বিযুক্ত করিতে পারি না, তাহাকে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রকাশ রূপেই অনুভব করিয়া থাকি, তথাপি উহা যে সর্ব্বানুস্যূত এক অখণ্ড প্রকাশ, ইহা বুঝিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মনে কর, তোমার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটতরু বর্ত্তমান, উহার পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে থাক যে জ্ঞানবিযুক্ত কোন অংশ আছে কি না;—দেখিবে, উহার মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গই জ্ঞানময়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন এক পরমাণুও অনুসন্ধান করিয়া পাইবে না। এই উদাহরণ দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিষয়পুঞ্জ জ্ঞানের অবস্থামাত্র, মূলস্বরূপ নহে, মূলবস্তু অপরিবর্ত্তনশীল ও তাহার অবস্থা যে পরিবর্ত্তনশীল, ধীমান্ ইহা অনায়াসেই বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিষয় লইয়া লেখনী চালনা নিস্ফল। ইহা সত্য যে, সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের উল্লিখিত মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা শরীরের অভ্যন্তরেই তাহার বাসস্থান কল্পনা করিয়া লন। কিন্তু তাই বলিয়াই কি প্রবুদ্ধ মনীষীদিগের সিদ্ধান্ত অবহেলা করিতে পারা যায়? সহস্র সহস্র শৃগালের অব্যক্ত শব্দ অপেক্ষা কি কতিপয় সিংহের গর্জ্জন মূল্যবান্ নহে? বিষয়রাশিকে জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র স্বীকার করা, আর যুক্তি ও শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করা একই কথা, কেননা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানকে নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন* করে। পক্ষান্তরে প্রমাণশূন্য

বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব, যেহেতু প্রমাণই উহার সাধক। এই যুক্তি স্বতন্ত্র জড় বস্তুর অস্তিত্বকেই উড়াইয়া দেয়। জ্ঞান বিযুক্ত বস্তুকে যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করা ত বহুদূরের কথা, আমরা এইরূপ বস্তু ভাবিতেও পারি না। একমাত্র জ্ঞানের বিষয় রূপেই বস্তুচিন্তন সম্ভবপর। যাহাকে কোন জ্ঞানই বিষয় করিতেছে না বা করে নাই, তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারিলে কি আমরা ময়দানবের নভোমণ্ডলস্থ অদ্ভুত সৌধমালাকে না মানিলে থাকিতে পারি? কেননা উভয়ই তুল্য, উভয়ই জ্ঞানের অবিষয়। যাঁহারা জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুকে আত্মা স্বীকার করিয়া জ্ঞানকে তাহার ত্রিক্ষণস্থায়ী বিশেষ গুণ মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের মতে জ্ঞান উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে অথবা জ্ঞান শূন্য কালে আত্মার অস্তিত্ব একবারেই প্রমাণিত হয় না, কারণ জ্ঞানরূপ প্রমিতিই অভাবগ্রস্ত। যদি আক্ষেপ করা যায় যে, জ্ঞান উৎপত্তি কালে অনুমিতি দ্বারা আত্মার অতীত ও আগামী অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তবে ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য বস্তুর অনুমিতিই অসম্ভব, আমরা যে কোন বস্তুর অনুমান করিয়া থাকি, উহা কোন না কোন জ্ঞানের বিষয় হইয়াই অনুমিতির পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকে; পক্ষান্তরে ভবিষ্যদ্বস্তুর অনুমিতিও ঈদৃশ নিয়মেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনে কর, ঘনীভূত মেঘ দেখিয়া তুমি ভবিষ্যৎ বৃষ্টি অনুমান করিতেছ, কিন্তু তোমার ঐ অনুমীয়মান বৃষ্টি যে ভবিষ্যতের কোন না কোন জ্ঞানশীল জীবের অনুভূয়মান, ইহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবে। যেরূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞান নিত্য অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী সিদ্ধ হইল, তদ্রূপ উহা শুদ্ধ অসঙ্গ ও নির্গুণ বলিয়া প্রমাণিত হয়; কেননা মালিন্য, সঙ্গ ও গুণ জড় বস্তুরই দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর জ্ঞান জড় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উক্ত শুদ্ধত্বাদি ধর্ম্মের ন্যায় সুখধর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুখের অর্থ যে দুঃখাভাব ইহা "যো ভূমা তৎ সুখং" শ্রুতিই প্রমাণ করিয়া দেয়। যদি এই স্থলে সুখের অর্থ দুঃখাভাব না মানিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্মের সুখতাদাত্ম্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তিনি অনিত্যতা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সত্তা জ্ঞান ও সুখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগকে যদি এক অখণ্ড বস্তু না বলিয়া পরস্পর ভিন্ন বলা যায়, তবে ব্রহ্মই অব্রহ্ম হইয়া যায়। এই জন্য যুক্তির অনুমোদিত সত্তাজ্ঞান ও আনন্দের একত্ব স্বীকার করাই মনীষী মাত্রের উচিত। পরব্রহ্মের শাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণই জ্ঞানের সামঞ্জস্য হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞানই পরব্রহ্ম, জ্ঞানই তৎপর্য্যায় ভুক্ত আত্মা। আর জ্ঞান সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ ও প্রত্যক্ষ। জ্ঞান জানিতেছি না, বা জানিতে পারা যায় না, ইত্যাদি অসম্বদ্ধ প্রলাপের কি কোন অর্থ আছে?

শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, যাহাকে আমরা অজ্ঞানাবরণে আবৃত করিয়া জলদমালাভ্যন্তরস্থ তড়িৎ প্রকাশের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছি, প্রতিক্ষণে অলৎ সত্তা অনুভব করিয়াও যাহার সনাতনত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না, একমাত্র বিষয়রূপ অমেধ্য পঙ্কলেই যাঁহাকে প্রতিবিম্বিত বলিয়া মনে করি; সেই জ্ঞানই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, সেই জ্ঞানই হৃদয়ান্তর্জ্যোতি প্রত্যগাত্মা। এই বিশ্বব্যাপী স্বয়ং জ্যোতি চিদাত্মাই জলধিমেখলা ধরিত্রী, অনন্ত জ্যোতিষ্কনিকেতন মহাকাশ, জগৎপ্রাণ সমীরণ ও জীবন-দায়ক জীবন প্রভৃতি নিখিল বস্তু। অবিদ্যার ক্রীড়ণক হইয়াই জীব সদাশিব আত্মদেবকে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত কলেবরে আবদ্ধ বলিয়া মনে

করে। মানবের কি স্পর্দ্ধা! যিনি অনন্ত-কোটি জগতের একমাত্র আধার, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মন চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে, যাঁহার ব্যাপ্তির ইয়ত্তা করিতে পারে এইরূপ ব্যক্তি প্রমাণিত হয় না, তাঁহাকেও পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতেছে, তাঁহাকেও মূত্রপুরীষপূর্ণ শরীরের বন্দী জীব অবধারণ করিয়া বসিয়াছে! যখন যুক্তি, শাস্ত্র ও অনুভব আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বুঝাইয়া দেয়, তখন তাহাকে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত কলেবরের অধীন মনে করা বাতুলতা ভিন্ন আর কি? যেরূপ অন্যান্য বস্তু জ্ঞান-পারাবারের তরঙ্গ, শরীরকেও তদ্রূপ বলিয়া তত্ত্বদর্শীরা নিশ্চয় করিয়াছেন। এক চিদাকাশে অনন্তকোটি পৃথিবী আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকে ত আমরা আপন কলেবর মনে করি না; কিন্তু অস্থি, চর্ম্ম, মেধ ও মজ্জাদির সমষ্টিকে কেন শরীর বলিয়া অবধারণ করি? কেন ঐ অমেধ্য নিখিল দুঃখের উপাদান, ষট্‌বিধ বিকারের নিলয়, মাংসপিণ্ডের জন্য নিশিদিন ব্যাকুল থাকি? কেন উহাকে পরিপুষ্ট, সৌন্দর্য্যশালী ও স্নিগ্ধ করিবার নিমিত্ত বহু পুণ্যলব্ধ মানবীয় শক্তির অপব্যয় করি? ইহার উত্তরে কি আত্মা ও দেহের আদিকালপ্রবৃত্ত অন্যোন্যাধ্যাস প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ ভাষ্যকার নিখিল বন্ধনরূপ অনর্থের উপাদান ইহাকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সমাধি ও সুষুপ্তি অবস্থাতে ঐ দেহাধ্যাস না থাকিবার নিমিত্ত তৎকালে শারীরিক সুখ দুঃখ অনুভূত হয় না। জাগ্রত অবস্থাতে উহার প্রভাব অপ্রতিহত থাকে, এইজন্য ঐ অবস্থায় আমাদের তৎসংক্রান্ত সুখ দুঃখ স্ফীত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত মাংসপিণ্ডকে না ভুলিতে পারিলে মনুষ্য শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মেধাবীরই কলেবরের সুখকে মূল ভিত্তি করিয়া যে নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাকে পরাবিদ্যা অপেক্ষাও অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। বালুকাময় সেতু দ্বারা কূলঙ্কষা নদী পার হওয়া যে অতীব দুঃসাধ্য, ইহা কি তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন? অনাদিকাল হইতেই মহামায়া আত্মা ও জগতের মধ্যবর্ত্তী শরীররূপ এরূপ অদ্ভুত অস্থিচর্ম্মময় প্রাচীর খাড়া করিয়াছেন যে, কোন প্রকারেই আমাদের আত্ম-বোধ উহা লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে যাইতে পারে না। চিরদিনই কি আত্মজ্ঞান এইরূপ সংকুচিতভাবে থাকিবে? কখনও কি উহা সম্প্রসারণ নিয়মে জগৎ ছাইয়া ফেলিবে না? অপৌরুষেয় বাণী সুধামাখা স্বরে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছেন, "যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ।" প্রবুদ্ধ অবস্থাতে তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে নিখিল জগৎ আত্মা হইয়া যায়, শোক মোহ কিছুই থাকে না, কেননা তিনি একত্বানুভূতিতে ডুবিয়া যান। পাঠক নিগমের হৃদয়স্পর্শী উপদেশ শুনিলেন, এক্ষণে আসুন বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া শোক মোহাদির কারণ নিরূপণ করা যাউক।

ক্রমশঃ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব—একাল ও সেকাল।

মানব যতই অধঃপতিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও পরমুখাপেক্ষী হউক না কেন, যতদিন জীবিকায় আঘাত না পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে আত্মনির্ভরতা বা আত্মোন্নতি সাধনের চিন্তা জাগরূক হয় না। অন্নবস্ত্রের ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়াই; আজিকালি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিলুপ্তপ্রায় শিল্প বাণিজ্য ও বিবিধ দেশহিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনাদিগের দুঃখাপনোদনে মনঃসংযোগ করিতে দেখা যাইতেছে, পরাধীন জাতির পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তাহার চেষ্টারও সূত্রপাত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সুবাতাস বহিয়াছে, উপযুক্ত আদর্শও মিলিয়াছে। এখন ফলাফল অদৃষ্টসাপেক্ষ।

কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভিন্ন ব্যক্তিগত উন্নতিই অসম্ভব,—জাতীয় উন্নতি ত দূরের কথা। আধুনিক বাঙ্গালিজাতি সেই স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের কথা না ধরিলেও, গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালিজাতির শারীরিক অবস্থার নিতান্ত শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বলবীর্য্যশালী, সুদৃঢ়কায়, শ্রমসহিষ্ণু ও অসভ্য পিতামহের সহিত দুর্ব্বল, শীর্ণদেহ, অলস ও সুসভ্য পৌত্রের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পদের পরস্পর তুলনা করিলে, আমাদের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ বঙ্গের উচ্চতর জাতীয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া, আমাদের বড়ই দুর্ভাবনা হয়। কারণ গত পঞ্চাশবর্ষেই যখন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ স্বাস্থ্যহানি, বিবিধ রোগোৎপত্তি ও অকাল মৃত্যুর এত বাহুল্য ঘটিয়াছে, তখন তদনুপাতে আর শতবর্ষ পরে তাঁহাদের যে আরও কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে এবং অনেক প্রাচীন জমীদার-বংশীয়ের মধ্যে যেরূপ কুলক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে সে সকল বংশ স্থায়িত্ব লাভ করিবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া, আমরা একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছি। বাঙ্গালিজাতির উপর যেন শনিগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, আজি কালি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির বিষয়টা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা এ সময় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। আমরা গত পঞ্চাশদ্বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে "সেকাল," আর তৎপরবর্ত্তী কালকে "একাল" নামে অভিহিত করিব এবং একাল ও সেকালের লোকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার শোচনীয় বৈসাদৃশ্যের কারণানুসন্ধানে প্রয়াস পাইব।

আধুনিক বাঙ্গালিজাতির এই প্রকার নিদারুণ স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকালমৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বদেশীয় স্বাস্থ্যবিধানের আদেশ লঙ্ঘন ও বিদেশীয় বা জাতীয়প্রকৃতির বিরোধী আহারাচারের বাহুল্যই তাহাদের উক্ত সর্ব্বনাশের মূল। আহারব্যবহারাদির পক্ষে জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী হইলে, লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ বা অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় না হইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয় স্বাস্থ্যবিধান লঙ্ঘনের কথায় যদি কাহারও চিত্তে এরূপ কুতর্কের উদয় হয় যে, সেকালে কি দেশের সকল

লোকেই স্বাস্থ্যবিধানে পণ্ডিত ছিল এবং সকলেই কি সর্ব্বতোভাবে সেই সকল নিয়মের প্রতিপালন করিয়া চলিতে সক্ষম হইত? তাঁহাদিগকে আমাদের বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আজিকালি ইংরাজী শিক্ষা করিয়া এবং ইংরাজীশিক্ষিত, পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণের সংসর্গে বাস করিয়া, একালের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল ও শাস্ত্র বা ঋষিবাক্যে যেরূপ অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জন্মিয়াছে, সেকালের লোকের সেরূপ ছিল না। একাদশীর উপবাস, অষ্টমী নবমী বা ত্রয়োদশীতে নারিকেল, অলাবু ও বার্ত্তাকু ভক্ষণের নিষেধ, পূর্ণিমা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য মাংসাদির কঠোর অনুশাসন এবং এই জাতীয় সহস্র প্রকার খুঁটিনাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাইলে, এ কালের লোকেরা যেরূপ অগ্রাহ্য করে, সেকালের লোকেরা সেরূপ করিতে সাহস করিত না। কি ধর্ম্মনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি স্বাস্থ্যনীতি, যে কোনও বিষয়েই হউক না কেন, সে সকলের সমালোচনা করা বা কারণানুসন্ধান করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা কিছু আদেশ করিয়া গিয়াছেন, ভগবানের আদেশতুল্য তাহা জ্ঞান করিয়া, তাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ও অবনত মস্তকে তৎসমুদয়ের প্রতিপালনে সদাই সযত্ন থাকিত। আবার পক্ষান্তরে ঐ সকলের দৈবাৎ অপালনবশতঃ তাহারা আপনাদিগকে ঘোরতর প্রত্যবায়গ্রস্ত জ্ঞান করিয়া, নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে উহার প্রায়শ্চিত্ত সাধনে প্রয়াস পাইত। হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে যে সকল রীতিনীতি বা আচারব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই প্রায়শঃ এতদ্দেশীয় জনগণের শরীরের পক্ষে একান্ত অনুকূল। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের আদিষ্ট বিধিব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অতি তুচ্ছতম বিষয়টী পর্য্যন্ত সংসারিগণের স্বাস্থ্যের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং তৎপ্রতিপালনকালে সাধারণের—জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ রক্ষিত হইত এবং বিনা আয়াসে স্বাস্থ্যবিধানের জয়ঢাক না বাজাইয়াও, সুস্থশরীরে, প্রফুল্লচিত্তে সেকালের লোকেরা সুদীর্ঘ জীবন সম্ভোগ করিতে পারিত। শাস্ত্রাদেশের প্রতি অনাস্থাবশতঃই একালের লোকের প্রাগুক্ত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্যই সেকালের সেই সুস্থ, সুদৃঢ়কায়, বলবীর্য্যশালী ও দীর্ঘজীবী ব্যক্তিগণের পরিবর্ত্তে এক্ষণে অসুস্থ, শীর্ণদেহ, দুর্ব্বল ও অকালমরণশীল মানবশ্রেণী আবির্ভূত হইয়া, জগতে "ভীরু ও কাপুরুষ বাঙ্গালী" নাম ধারণপূর্ব্বক রত্ন ও বীরপ্রসবিনী জন্মভূমির কলঙ্ক বর্দ্ধিত করিতেছে।

মানবসৃষ্টির আদি হইতে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত জাতির অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে? কোনও জাতি বা সমাজবিশেষের পরমায়ু তাহার ভিত্তির গঠনপ্রণালীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে জাতির সমাজ ধর্ম্মনীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত এবং যে জাতির প্রত্যেক সামাজিক বন্ধন ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই জাতিই জগতে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়। আর যে জাতির ধর্ম্মবন্ধন নিতান্ত শিথিল এবং যাহাদের সামাজিক রীতিতে ধর্ম্মভাব তাদৃশ প্রাধান্যলাভ করে নাই, সে জাতির সমাজ পৃথিবীতে কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধিক কি, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, মহাবলপরাক্রান্ত সেই প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, যাহারা একদিন সভ্যতা-ও

বিদ্যালোক প্রজ্বলিত করিয়া, পৃথিবীর অর্দ্ধাংশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, যাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া, য়ুরোপীয়েরা আজিও আপনাদিগের গৌরব ঘোষণা করে, ধর্ম্ম-নীতির প্রাধান্তের অভাবে সে সমাজদ্বয়ও এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজি কালি আমরা যে গ্রীক ও রোমকদিগকে দেখিতে পাই, তাহারা সে প্রাচীন জাতি নহে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর গঠিত এবং তাহার প্রত্যেক বিধিব্যবস্থা ধর্ম্ম-নীতির কঠোর শাসনে শাসিত বলিয়া, বহু পুরাতন হইয়াও, আজি পর্য্যন্ত জীবিত আছে। এই সমাজ মধ্যে সকল নীতি অপেক্ষা ধর্ম্ম-নীতি অধিকতর প্রাধান্ত লাভ করায়,—অন্য নানা কারণে অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও,—প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের ন্যায় হিন্দু-জাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

বিধাতার বিড়ম্বনায় হিন্দুসমাজশরীর নানাবিধ রোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু উহার অবস্থা একেবারে চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়া পড়ে নাই। হিন্দুসমাজান্তর্গত বাঙ্গালিজাতির অবস্থা কিছু অধিক শোচনীয় হইয়াছে। তথাপি তাহার হতাশ হইবার মত অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই। আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের শরীর বিবিধ কঠিন ও জটিলরোগে আক্রান্ত হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু রীতিমত চিকিৎসিত হইলে, এখনও তাহার আরোগ্য লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অগ্রে রোগ নির্ণয়, পরে চিকিৎসা। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা বঙ্গীয়সমাজশরীরগত রোগের পর্য্যা-লোচনায় প্রয়াস পাইব।

আধুনিক বাঙ্গালিজাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার বহুবিধ কারণ এক সঙ্গে উপস্থিত হওয়ায়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকাল-মৃত্যুর পরিমাণ অতি অল্পকালের মধ্যে এরূপ শোচনীয়ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে যে কারণে আধুনিক বাঙ্গালিজাতি সুখ, শান্তি ও বিমল স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে এবং যে যে কারণে তাহারা নিরন্তর রোগ, শোক, তাপ ও ক্লেশজীর্ণ দেহভার বহন করিয়া, অকালে কালের করালকবলে নিপ-তিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ম্যালে-রিয়াকে একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যে ভীষণ ব্যাধির প্রবল পীড়নে সুসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণা বঙ্গভূমি দারিদ্র্য, নির্জ্জীবতা ও অশান্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কৃতান্ত দূত সদৃশ সেই ম্যালেরিয়ার সহিত সেকালের লোকের কোনও পরিচয় ছিল না। কেবল একালের লোকের দেহে উহার সর্ব্বসংহারক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতিদিন সহস্র সহস্র বঙ্গীয় নরনারীকে অকালে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে। এই দুরন্ত ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ, তাহার সবিশেষ আলোচনা করিবার স্থান উপস্থিত প্রবন্ধে নাই। ম্যালেরিয়া কথাটা বিদেশীয়। দুইটী লাটিন শব্দের সংযোগে উহার উৎপত্তি,—অর্থ দূষিত বাষ্প। আজি কালিকার দিনে দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইবার পক্ষে কারণের অসদ্ভাব নাই। তন্মধ্যে আমরা অন্য একটী মাত্র কারণের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। একালে রেলপথের কল্যাণে এবং রেলপথসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক নদনদীর একপার্শ্বে বাঁধ প্রস্তুত হওয়ায়, বৃষ্টি ও বন্যার জলরাশি যথাযথভাবে নিষ্কাশিত হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিতেছে। আবার পক্ষান্তরে নদীর অন্যপার্শ্বস্থ প্রদেশ-সমূহ বন্যার জলে অত্যধিক মাত্রায় প্লাবিত হইতে থাকায়, সেই সমস্ত জলরাশিও সম্যক্-রূপে নির্গত হইতে পারে না। এইরূপে বৃষ্টি ও বন্যার জলসমূহ দেশ মধ্যেই বসিয়া যায় এবং অনেক স্থানের রুদ্ধ জল নানা

জাতীয় লতাগুল্মাদিসহ পচিয়া, একটা অতি বিকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। রৌদ্রের প্রখর তাপে যখন সেই সকল আর্দ্রভূমি ও রুদ্ধ জলসমূহ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, তখন একটা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া, সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে। সেই দূষিত বায়ুর সাহায্যে বিবিধ রোগবীজ মানবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, দেশব্যাপী সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। সেকালে বর্ষা ও বন্যার জলে দেশের সমস্ত আবর্জ্জনা ও ক্লেদাদি ধৌত হইয়া যাইত; সুতরাং ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা বা বসন্তাদি কোনও দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি সেকালের লোকের দেহে তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। বসন্ত বিসূচিকাদি রোগ সময়ে সময়ে নানা কারণবশতঃ প্রবল হইলেও, ম্যালেরিয়ার দ্বারা সেকালের লোকে কখনই আক্রান্ত হইত না। পূর্ব্বের মত একালে দেশের ক্লেদাদি ধৌত বা বিদূরিত হওয়া দূরে থাকুক, তৎসমুদয় সহ বর্ষা ও বন্যার জল দেশ মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে এবং বর্ষা গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ,—এই মাসত্রয়ে তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে।

মনুষ্যের দেহ ও জীবনরক্ষার পক্ষে বায়ু, জল ও অন্নই সর্ব্বপ্রধান উপায়। এই তিন বস্তু ভিন্ন মানুষ কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ তিনের বিশুদ্ধি ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষা হওয়াও অসম্ভব। উহাদের মধ্যে একতমের ঈষন্মাত্র ব্যতিক্রমেই স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। আজিকালি দেশের বায়ু কিরূপে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে জলের কথা বলা আবশ্যক। একালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নিতান্ত দূষিত, পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় ও নানা রোগবীজপূর্ণ জলপান করিয়া, পল্লীগ্রামের লোকের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, দেশব্যাপী ও সংক্রামক জ্বর, বিসূচিকা ও বসন্তাদি রোগে লোকে দলে দলে কিরূপে অকালমৃত্যুর কবলগত হইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন; সুতরাং তাহার অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক।

একালে যেরূপ বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। সেকালে স্নান ও পানের জন্য দেশে প্রচুর জলাশয় বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্ম ও পরোপকারের জন্য সেকালের লোকে অসংখ্য দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিত। আর একালের লোকের জলাশয় প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হওয়ায়, নূতন জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রাচীনগুলিও ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, অনেক গ্রামে একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছে। এমন কি, গ্রামান্তর হইতে জল না আনিলে, অনেক গ্রামের অধিবাসিগণের জীবনরক্ষা হয় না। যাহাদের গ্রামান্তর হইতে জল আনিবার উপায় নাই, নির্ম্মল জলের অভাবে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া, স্বগ্রামস্থ সেই কর্দ্দমাক্ত রোগবীজপূর্ণ জলপান করিয়া, স্বাস্থ্যনষ্ট ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইতেছে।

আহারের দোষে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কদর্য্য সামগ্রীর আহার আজিকালিকার দিনে এক প্রকার অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। চাউল, দাল, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল ও ময়দা প্রভৃতি একালে আর খাঁটি পাওয়া ভার হইয়াছে। সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যেই নানাপ্রকার অখাদ্য, অনভ্যস্ত ও দুষ্পাচ্য পদার্থ মিশ্রিত থাকা সত্বেও, বাধ্য হইয়া, তাহাই সকলকে ভোজন করিতে হইতেছে। ঘৃত তৈলাদিতে সময়ে সময়ে এরূপ দুর্গন্ধ দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয় যে, উহা গলাধঃকরণ করিতে পারা দূরে থাকুক, নাসিকার নিকট লইয়া যাইবামাত্র লোকের বমনোদ্রেক

হইয়া থাকে। উদরের জ্বালায় একালের লোকদিগকে সেই সকল ঘৃত তৈলাদিতে পাক করা সামগ্রী খাইতে হয়। সেকালের সেই হৈয়ঙ্গবীন ও বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল একালের লোকের—বিশেষতঃ নগরবাসিগণের নিকট যেন আষাঢ়ে গল্প বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকল কদন্ন ভোজনের অনিষ্টকারিতায় আজি কালি দেশের লোকে স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইতেছে।

জল বায়ু ও আহার,—এই ত্রিবিধ বস্তুর উপর যখন মানবজাতির স্বাস্থ্য বা আরোগ্য নির্ভর করিতেছে, তখন ঐ তিনের বিকৃতি ঘটিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যসুখলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সেকালে দেশে নির্ম্মল জল বায়ু ও বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী ছিল; সুতরাং দেশের লোকের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিত।

দারিদ্র্য—আধুনিক বঙ্গের স্বাস্থ্যহানির একটী প্রধান কারণ। অনাহার সর্ব্ববিধ রোগের জনক। খাদ্যসামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের অন্নকষ্টও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। দুই সন্ধ্যা উদরপূর্ত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অনেক দরিদ্র গৃহস্থের এক সন্ধ্যাও পূর্ণ আহার জুটে না। সেকালের লোকের আর যত বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, তাহাদের দুই বেলা আহার জুটিত। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা তাদৃশ অভাবও অনুভব করিত না। আপনাপন অবস্থায় তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। একালে যে সামগ্রী যে মূল্যে পাওয়া যায়, সেকালে সেই মূল্যে তাহার চতুর্গুণ বা ততোধিক সামগ্রী পাওয়া যাইত। চাউল, দাল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য ও মাংসাদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যই সেকালে প্রচুর ও সুলভ থাকায় কাহাকেও অনাহারে কষ্ট পাইতে কিংবা খাদ্যাভাবে রোগগ্রস্ত হইতে হইত না।

এখনকার দিনে বাঙ্গালিজাতির আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন এতদ্দেশীয় জনগণের প্রকৃতির অনুকূল নহে। স্কুলের বালকেরা ও আফিস আদালতের কর্ম্মচারী বা উকীল মোক্তারেরা প্রাতে ৯টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, বিদ্যালয় ও স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। মধ্যাহ্নকাল পিত্তের কাল, পিত্ত ভিন্ন কোনও দ্রব্য জীর্ণ হয় না। আবার পিত্তের কালে যেরূপ পিত্ত নিঃসরণ হয়, কফ বা বায়ুর কালে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। কফ বা বায়ুর কালে আহার করিলে এবং ঐ সময়ে আহার করা অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, পরিপাক কার্য্যের অনুরোধে ক্রমাগত অকালে পিত্ত-নিঃসরণ-হেতু পিত্তের প্রকোপবশতঃ নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ মধ্যাহ্নকালকেই ভোজনের উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আজিকালি দেশের বহুসংখ্যক লোককে কার্য্যানুরোধে বাধ্য হইয়া, মধ্যাহ্নের অনেক পূর্ব্বে—কফের কালে আহার করিতে হয়। আহারের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকের প্রাক্কালে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা একান্ত নিষিদ্ধ; কিন্তু আজি কালি ঠিক সেই সময়েই দ্রুতপদে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক বা মানসিক শ্রমে নিযুক্ত হইতে হয়। তাহার বিষময় ফলে কি বালক, কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ সকলেরই পিত্ত নিতান্ত বিকৃত হইয়া, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগ প্রায় তাহাদের চিরসঙ্গী হইয়া পড়ে। ছাত্রগণ এক একটী পরীক্ষায় দশ দশ বৎসরের পরমায়ু ক্ষয় করিয়া, দ্বাবিংশতি বৎসরে পঞ্চাশদ্বর্ষবয়স্কের মত

হইয়া কলেজ হইতে বহির্গত হয়েন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অর্দ্ধমৃতের মত বোধ হয়। তাহার পর তাঁহাদের জীবনের অবশিষ্ট অংশটা নানাবিধ রোগে ভুগিতে ভুগিতেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। আমরা ৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে পাই, এ-কালের লোকেরা অম্লপিত্ত বা যকৃদ্ রোগে যেরূপ কষ্ট পাইতেছে এবং অনুসন্ধান করিলে, যেরূপ অধিকাংশ লোকেরই উক্ত রোগদ্বয়ের কথা শুনা যায়, সেকালে সেরূপ শুনিতে পাওয়া যাইত না। আজিকালি শতকরা প্রায় ৯০ জনের অম্লপিত্ত রোগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং দুই এক দিন জ্বর হইবামাত্র যকৃতে বেদনা না হয়, এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। একালে পিত্ত প্রকোপের নানাবিধ কারণ নিত্য সঙ্ঘটিত হইতে থাকায়, যকৃতের বিকৃতি এবং পিত্তজন্য বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। আর সেকালের লোকেরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল-যোগ করিয়া, পাঠার্থী, শিক্ষক ও কর্ম্মচারিগণ ধীরে সুস্থে পাঠশালা বা কর্ম্মস্থানে গমন করিত। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক স্নানাহার সমাপনের পর তাহারা কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের অবকাশ পাইত। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় অপরাহ্ণ-কালে কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা স্বকার্য্যসাধনে নিযুক্ত থাকিত। উপযুক্ত সময়ে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ সামগ্রীর আহার, উপযুক্ত সময়ে বিশ্রাম এবং উপযুক্ত সময়ে পরিশ্রমহেতু তাহাদের দেহ ও মন সুস্থ থাকিত। আহার করিবার শক্তিও যেরূপ ছিল, দেহে বলও তদনুরূপ থাকায়, সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া, মনের সুখে তাহারা দিনপাত করিত। পরিপাকশক্তির অভাব বা পিত্তবিকৃতিজন্য কোন প্রকার উৎকট রোগ সেকালের লোকদিগকে ভোগ করিতে হইত না। আমরা একালের পাঠশালা বা চতুষ্পাঠীর ছাত্র, শিক্ষক বা অধ্যাপক ও জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারি-গণের শারীরিক অবস্থার সহিত স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক বা অধ্যাপক এবং আফিস আদালতের কর্ম্মচারী ও উকিল মোক্তার প্রভৃতির শরীরের অবস্থার পরস্পর তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাই।

পানদোষ বা মাদক সেবনকে আমরা এ কালের লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার পক্ষে একটী বিশেষ কারণ বলিয়া মনে করি। সেকালে সুরাপান বা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকলের ব্যবহার বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আজিকালিকার বাজারে একটুকু আধটুকু সুরাপান না করিলে বাবু বা সাহেব হওয়া যায় না। সন্ধ্যার সময় যে কোনও প্রকারের কিঞ্চিৎ মাদকদ্রব্য সেবন না করিলে, একালের অনেক লোকের "ধাত" ঠিক থাকে না,—নাড়ী ঠাণ্ডা হইয়া যায়। উচ্চপদস্থ পরিদর্শক কর্ম্মচারী মফস্বলে বাহির হইলেন, সঙ্গে ব্রাণ্ডি ও কুইনাইন চলিল। কি জানি, পাছে ম্যালেরিয়া নামক জন্তু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে! অনেক বালক পঠদ্দশা হইতেই মাদক সেবনে প্রবৃত্ত হয়। সে সময় দরিদ্র ছাত্রগণের পক্ষে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া, সুরাপান করিবার তাদৃশ সুযোগ ঘটে না; সুতরাং তখন তাহারা "সস্তার নেশা" সিদ্ধি বা চরস খাইতে আরম্ভ করে। আজিকালি আবার অনেক বালক কোকেন খাইতে শিখিয়াছে। কোকেন্ সেবনের পরিণাম অন্যান্য মাদক সেবন অপেক্ষা শত-গুণে শোচনীয়। বিশ বৎসর গুলি সেবন করিলে, মানুষের মূর্ত্তি যেরূপ কদর্য্য হয়, বোধ

হয়, ছয় মাস কোকেন খাইলেই তদ্রূপ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল কোকেন সেবনে লোকে নানাবিধ উৎকট ও অসাধ্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আবকারির আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, এই বঙ্গদেশে মাদকদ্রব্যের বিক্রয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মাদকদ্রব্যের বিক্রয়ও বাড়িয়া থাকে। আমরা নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, যদি কেহ অপরাহ্নে আফিমের দোকানের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি দেখিতে পাইবেন, দলে দলে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সিদ্ধি ও চরস ক্রয় করিতেছে। আজি কালি সিগারেটের প্রচলন শোচনীয়ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে আরম্ভ করিয়া, পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মুখে সিগারেট বিরাজ করিতেছে। যখন যাহাদের অধঃপতনের সময় হয়, তখন তাহাদের অনেক প্রকার উপসর্গ আসিয়া জুটে; সুতরাং বহু উপসর্গের উপর "চা" এক নূতনতর উপসর্গ জুটিয়াছে। ফলতঃ ঐ সকল মাদকদ্রব্য ও চা প্রভৃতি নিতান্ত পিত্তপ্রকোপকর। পিত্তপ্রকোপের বহুবিধ কারণ একসঙ্গে উপস্থিত হওয়ায়, একালের লোকের এত যকৃদ্‌ রোগের প্রাদুর্ভাব না হইবে কেন?

তীব্রবীর্য্য ঔষধাদির ব্যবহারকে আমরা একালের লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গের একটী অতি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া মনে করি। ডাক্তারী ঔষধমাত্রই অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসিগণের প্রকৃতির বিরোধী। উহা শীতপ্রধান দেশবাসিগণের প্রকৃতির অনুকূল হইলেও, বাঙ্গালিজাতির পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর; পরন্তু নানাবিধ উৎকট রোগের জনক। মানবপ্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ এতদ্দেশীয়গণের প্রকৃতির অনুকূল এতদ্দেশজাত মৃদুবীর্য্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তৈলজলাভিষিক্ত হিন্দুর দেহোপযোগী ঔষধসংযুক্ত বিবিধপ্রকার ঘৃত তৈলাদি প্রায় সকল রোগেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তীব্রগুণসম্পন্ন ডাক্তারী ঔষধসমূহ আমাদের দেহের উপর অতি শীঘ্র ক্রিয়া করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়ার ফল অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। যে অশুভক্ষণ হইতে এ দেশে ডাক্তারী ঔষধের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই দেশের লোকের স্বাস্থ্যহানিরও সূত্রপাত হইয়াছে। আজি কালি লোকে রোগ হইবামাত্র অর্থাৎ দূষিত রসাদির পরিপাক হইতে না হইতেই, রাশি রাশি ডাক্তারী ঔষধ খাইয়া, রোগকে আপাততঃ চাপা দিয়া রাখে। অল্পকালের মধ্যেই তাহা ভীষণতর মূর্ত্তিতে তাহাদের দেহে প্রকটিত হয়। আবার রোগের সময় পথ্যাপথ্য সম্বন্ধেও একালের লোকের বড়ই গোলযোগ ঘটিতেছে। যে দেশের লোকেরা প্রতিদিন অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান, অর্দ্ধসিদ্ধ বা আমমাংস ভক্ষণ, দিবা ও রাত্রির মধ্যে অনেকবার ডিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্পাচ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া, তৎসমুদয়কে উত্তমরূপে জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়, রোগের সময় সেই দেশের লোকেরা যে সকল সামগ্রী পথ্য করে, আজি কালি এ দেশের দুর্ব্বল পাকস্থলী, শাকান্নভোজী মানবেরা লঘু পথ্য বোধে সেই সকল দ্রব্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে! সেকালের লোকের রোগও হইত, যমের বাড়ীও যাইত বটে; কিন্তু একাল অপেক্ষা সেকালে যে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক অল্প ছিল, ইহা অবিসংবাদী সত্য। রোগ হইলে, সেকালের লোকে স্বদেশীয় ঔষধ ও পথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নীরোগ

হইত। সামান্ত জর জ্বালা হইলে, অনেকের দুই একটা উপবাস বা সামান্ত গাছগাছড়ার রসেই তাহা সারিয়া যাইত। আর একালের লোকের শারীরিক অবস্থার এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, ঐ সকল সামান্ত উপায়ে তাহাদের রোগ সারে না। সেকালের "আলুই বড়ী," বিল্বপত্র বা তুলসী পত্রের রসের পরিবর্ত্তে এখনকার শিশুগণকে সূতিকা গৃহ হইতেই ডাক্তারী ঔষধ খাওয়াইতে হয়। একালের শিশুদিগের পিতৃগণের শারীরিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, মাতৃগণের অবস্থাও ততোধিক। একালের জননীরা নানারোগগ্রস্তা, সুতরাং তাঁহাদের দূষিত স্তন্তপানে শিশুগণ সূতিকা-গৃহ হইতেই বিবিধ রোগে পীড়িত হয়। তন্মধ্যে শিশুর যকৃৎ রোগ একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালে অনেক শিশু যকৃৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সেকালে এ সকল আপদ বালাই ছিল না।

শারীরিক শ্রম-বিমুখতা-জনিত নানাপ্রকার রোগে একালের লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। একালের লোকের মানসিক পরিশ্রম বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তত্তুলনায় শারীরিক শ্রম অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত দ্বিবিধ শ্রমের অসামঞ্জস্যে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই যে একালের ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে এত শিরঃপীড়া, অকালে দৃষ্টিহীনতা, যৌবনে বার্দ্ধক্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মধুমেহ প্রভৃতি বিবিধ উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেকালে তাহা ছিল না। সেকালে ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, সকল শ্রেণীর মধ্যেই ব্যায়ামের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। আমরা বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, তাঁহাদের বাল্যকালে আমাদের দেশের প্রত্যেক ধনীর গৃহেই ব্যায়াম বা কুস্তির আড্ডা ছিল। সেই সকল আড্ডায় ধনিসন্তানগণের সহিত অনেক গৃহস্থের বালকেরা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিত। মধ্যবিত্ত লোকেরা মিলিত হইয়া, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়ামশালার স্থাপন করিতেন। তাহাতে অনেক ইতর লোকেরাও যোগদান করিত। তদ্ভিন্ন সেকালে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই লাঠী খেলার প্রচলন ছিল। লাঠী খেলা না জানিলে, তখনকার লোকেরা সমাজে বিশেষরূপে অবজ্ঞাত হইত। ফলতঃ কুস্তির দ্বারাই হউক, লাঠী খেলার দ্বারাই হউক, অথবা যে কোনও প্রকারেই হউক, সেকালে ইতর ভদ্র সকলেই বিশেষভাবে শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। পরিশ্রম করিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল। রেলপথের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ সম্রান্ত ব্যক্তিগণও কিছুমাত্র অপমান বোধ না করিয়া, অনায়াসে ২০।২৫ ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সেইরূপ আহারও করিতেন। আহার্য্য সামগ্রী পরিপাক করিবার শক্তিও তাঁহাদের যথেষ্টপরিমাণে ছিল। আর এখনকার লোকেরা ক্ষীণজীবী, দুর্ব্বল—এক ক্রোশ পথ হাঁটিবারও সামর্থ্য নাই, সামান্ত আহার করিলেই, অম্লপিত্ত জন্ত বুকজ্বালা করে। উত্তম পরিপাক-শক্তি এখন শতকরা ২।৪ জনেরও আছে কিনা সন্দেহ। সেকালের তুলনায় একালের লোকের শারীরিক ও মানসিক বল ও স্বাস্থ্য সর্ব্বাংশে হীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

চরিত্রহীনতা আধুনিক বাঙ্গালিজাতির অঙ্গের ভূষণস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্রের বল না থাকিলে, শরীর ও মনের বল থাকে না। চরিত্রহীন জনের স্বাস্থ্যও কিছুতেই অক্ষুন্ন থাকিতে পারে না। সেকালের লোকের যেরূপ চরিত্র-বল ছিল, এখনকার লোকের তাহা নাই। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রাদেশের

প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায়, নিত্যসদনুষ্ঠানসম্পন্ন হিন্দু সন্তানগণের সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ, যাত্রা ও কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার বিবিধ উপায়ের দ্বারা সেকালের নরনারীর চরিত্রকে গঠিত করিবার পক্ষে যে সকল সুযোগ বিদ্যমান ছিল, একালে তৎসমুদয়ের অভাব হওয়ায়, অথবা লোকের ঐ সকল বিষয় হইতেই শিক্ষালাভের প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হওয়ায়, তাহাদের নীতিশিক্ষার পথ ক্রমশঃই রুদ্ধ হইতেছে। স্কুল বা কলেজে ছাত্রগণের নীতিশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকায়, একালের বালক ও যুবকগণ নিতান্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। পিতা মাতা, শিক্ষক বা অন্যান্য গুরুজনকে তাহারা মোটেই গ্রাহ্য করে না। যে সকল বালক পিতা মাতা বা তৎপর্য্যায়স্থ কোনও অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকিয়া, স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করে, তাহারা বরং তরুণবয়সসুলভ উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়কে অনেকাংশে সংযত রাখিয়া, স্ব স্ব জীবনকে কোনও প্রকারে নিয়মিত করিয়া লয়; কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত, শিথিলধর্ম্মপ্রবৃত্তি পিতা বা পিতৃব্যগণের আদর্শে তাহাদের চরিত্র যেরূপে গঠিত হইতে থাকে, তাহাতে ধর্ম্মনীতি কোনও ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করে না। সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি বর্জ্জিত, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের সন্তানগণ সন্ধ্যা আহ্নিক বা হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহারের কোনও ধারই ধারে না। আর যে সকল ভদ্রসন্তান বিদেশে, সহরে, স্বগ্রাম ও আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া, স্কুল কলেজের বিদ্যা উপার্জ্জন করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত উদ্ধতপ্রকৃতি ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে। নিকটে শাসন করিবার বা নীতিশিক্ষা দিবার কেহ না থাকায়, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে। পল্লীগ্রাম হইতে সহরে নূতন আসিয়া, নানাপ্রকার প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইয়া, তাহারা স্ব স্ব চিত্তবৃত্তিকে সংযত রাখিতে একান্ত অক্ষম হয়। যে সকল ছাত্রাবাস বা "মেসে" তাহারা অবস্থিতি করে, সে সকলের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে, সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বর্ত্তমান প্রস্তাব-লেখককে তাঁহার পঠদ্দশায় একজন সমপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে একবার কলিকাতার একটী ছাত্রাবাসে গমন করিতে হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, তিনি যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। দেখিলেন, একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে ১৫।১৬ জন বালক ও যুবক স্ব স্ব পুস্তক ও তক্তাপোষ বাজাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে নিতান্ত কদর্য্য গীত গান করিতেছে। চরসের ধূমে গৃহ অন্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই ঘরেই ছাত্রাবাসের একটী অল্পবয়স্কা কুলটা চাকরাণী স্ফীতমুখে বসিয়া আছে। চরসের ধূমে প্রস্তাব-লেখকের মস্তক ঘুরিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় উপবেশন করিয়া, তিনি গৃহমধ্যস্থ ঐ সকল বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। ফলতঃ তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাড়িখানার সহিত ঐ ছাত্রাবাসের বিশেষ কোনও পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেন না। তদবধি সহরের ছাত্রাবাসসমূহ সম্বন্ধে এই প্রস্তাব-লেখকের হৃদয়ে একটা অতি ঘৃণিত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। কলিকাতার উক্ত ছাত্রাবাসের যে সকল যুবক সে দিন তাদৃশ পৈশাচিক অভিনয়ে মত্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সে বৎসর প্রশংসার সহিত এফ্ এ ও বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পঠদ্দশায় কলিকাতা ও অন্যান্য

সহরের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। পরে আবার তাঁহারাই সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মান্যগণ্য ও পদস্থ ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি অদ্য-পর্য্যন্ত—প্রায় পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে এই প্রস্তাব-লেখককে স্কুল কলেজের অসংখ্য ছাত্রের প্রমেহ, (গণোরিয়া) ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি নানা রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হইতে হইয়াছে। এই যে, আজিকালি প্রত্যেক সহরে বেশ্যার সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের দ্বারাই তাহাদের অধিকাংশের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এ কালের সকল ছাত্রই যে, ঐ সকল অপরাধে অপরাধী, আমাদের কথার এরূপ কদর্থ যেন কেহ না করেন। তবে একালের বহু লোকেই সেকালের লোকদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে যে নৈতিক অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। চরিত্রবিষয়ে হীনতা ঘটিলে, মানুষের স্বাস্থ্যবিষয়েও হীনতা ঘটিবে। ভ্রষ্টচরিত্র মানবের দেহ নানা রোগের আকরস্বরূপ। চরিত্রভ্রষ্ট লোক সকল দেশে সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে। তবে জাতীয় অধঃপতনের দিনে উহার সংখ্যা অধিক হয়।

আনন্দ বা মানসিক স্ফূর্ত্তি নামক একটা পদার্থ যেন বঙ্গদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। একালের বাঙ্গালীর মুখ হইতে উচ্চহাস্য আর তেমন নির্গত হইতে দেখা যায় না। আমরা বঙ্গের পূর্ণ দুর্দ্দশার দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদেরই বাল্যকালে দেশে যে আনন্দের স্রোতঃ প্রবাহিত হইত, একালে আর তাহা দেখিতে পাই না। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে পল্লীগ্রামের এক একটা চণ্ডীমণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ,—বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তাস, পাশা ও সতরঞ্চ খেলায় মত্ত, কোথাও বা গীতবাদ্যের মধুর ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত, কোনও স্থান বা আনন্দ ও হাস্যের উচ্চরোলে নিনাদিত। আর আজিকালি সেই পল্লীগ্রামের দুরবস্থা দেখিলে, অশ্রু সংবরণ করা যায় না। চণ্ডীমণ্ডপগুলি ভগ্নপ্রায় ও দীপপরিশূন্য অন্ধকার। যে সকল গৃহে পূর্ব্বে লোক ধরিত না, আজি সেই সকল গৃহ অনুসন্ধান করিলে, দুই একটী বিধবা স্ত্রীলোক পাওয়া যায় মাত্র। কোনও কোনও গৃহে এক আধজন পুরুষ বাহির হয় বটে; কিন্তু তাহারা রুগ্ন, ম্রিয়মাণ ও আনন্দপরিশূন্য। আজি তাহাদের মুখে একবারও হাস্য-রেখা প্রকটিত হয় না। সন্ধ্যা হইবামাত্র তাহারা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। রুগ্ন দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে তাহারা কোনও প্রকারে দিনপাত করে এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার মহকুমা বা জেলায় গিয়া, তাহারই মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত মামলা মোকদ্দমা করে। তাহাদেরই মধ্যে আবার যাহাদের রক্তের তেজঃ অপেক্ষাকৃত প্রখর আছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে ফৌজদারীও করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অবস্থার বর্ণনা করিতে লেখনী কম্পিত হইয়া উঠে। আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাসের মধ্যে ঐ সকল গ্রামে গমন করিলে, বর্ষীয়ান্ পর্য্যাটক দেখিতে পাইবেন, তাঁহার বাল্যাবস্থায় যে গ্রামকে তিনি আনন্দ উল্লাস, উৎসাহ উৎফুল্লতা, হাস্য ও গীতিধ্বনিমুখরিত কত সুখের স্থানরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান আজি জনমানবশূন্য,—কোথাও অরণ্য, কোথাও শৃগাল কুকুরের ক্রীড়াভূমি, কোথাও অজগর ও কালসর্পের বাসস্থান

কোথাও পলায়িত বা ধ্বংসাবশিষ্ট কতিপয় গৃহস্থের মধ্যে পীড়িত ও মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, কোথাও বা শোকসন্তপ্তজনের হৃদয়বিদারক কাতরধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীগ্রামেরই আজিকালি ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ৺শারদীয়া পূজায় কয়েকদিন প্রবাসপ্রত্যাগত কতিপয় ব্যক্তির কলরবে গ্রামে মানবের অস্তিত্ব অনুভূত হয় মাত্র। তাহার পর গ্রামগুলি যে অরণ্য, সেই অরণ্যেই পরিণত হয়। ৺পূজার পর হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত, এই মাসত্রয়ে গ্রামগুলি যেন শ্মশানের আকার ধারণ করে। যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা দলে দলে গ্রাম হইতে পলায়নপূর্ব্বক আজি কালি নগরে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। আর যাহারা হীনাবস্থ, তাহারা গ্রামে থাকিয়াই, অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। নগরে পলায়ন করিয়াই বা লোকের নিষ্কৃতি কোথায়? নগরবাসিগণও সহস্র রোগে পীড়িত, তদুপরি জীবনসংগ্রামের কঠোরতায় তাহারা একান্ত জর্জ্জরীভূত। ফলতঃ একালের লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা কোনও কোনও বিষয়ে সুবিধা ঘটিলেও, স্বাস্থ্যবিষয়ে তাহারা যে সেকাল অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যে কারণে একালের লোকেরা স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, আমরা যথাসাধ্য তাহার কারণনির্ণয়ে প্রয়াস পাইলাম। যতদূর সম্ভব তাহার প্রতীকারে মনঃসংযোগ না করিলে, বাঙ্গালীর এই অধঃপতনের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য। স্বাস্থ্য ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত।*

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন।

সিংহলরাজ দূতু জেমনু।

সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ প্রদেশস্থ রুহুণা একটী বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই জনপদে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সুবিখ্যাত রাজবংশীয় ব্যক্তিবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যশঃ সুখ্যাতির সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠাবান্ রাজবংশটী অতি প্রাচীন ছিল। যিশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক কালে, যে মহাত্মা এই সুবিখ্যাত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীশ্রীকামন তিষ্য। এই নরপতি অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ এবং পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সমগ্র সিংহলদ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাহাতে নিজ রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে ইঁহার

* "স্বাস্থ্যতত্ত্ব—একাল ও সেকাল" সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনি সাহিত্য-সভা হইতে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শর্ম্মা শাস্ত্রি-প্রদত্ত একটী রৌপ্য-পদক পুরস্কার পাইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তদনুসারে সাহিত্য-সভায় অনেকগুলি প্রবন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে পরীক্ষায় বর্দ্ধমান রাজবাটীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং কবিরত্ন মহাশয়ই সাহিত্য-সভা হইতে শাস্ত্রি-প্রদত্ত রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চেষ্টা ও সমধিক যত্ন ছিল। এই অশেষ গুণাকর নরনায়কের দুইটী মাত্র পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জেমনু। এই মহাত্মারই সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সাহিত্য-সংহিতা'র পাঠক পাঠিকাগণের জ্ঞান-গোচর করিতেছি।

রাজবংশাবতংস সুধীর শ্রীশ্রীকামনতিষ্কার রাজত্বসময়ে, পাণ্ড্যগণ (তামিল) সমগ্র সিংহলদ্বীপে অত্যন্ত অত্যাচার ও নানাপ্রকার উপদ্রব করায়, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীশ্রীজেমনু পাণ্ড্যগণকে সিংহলরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার মানসে বিশেষরূপ সচেষ্ট ছিলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই ঘোর অত্যাচারী পাণ্ড্যগণকে তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবেন, সর্ব্বদাই তাহার উপায় চিন্তা করিতেন। কিন্তু রাজা শ্রীশ্রীকামনতিষ্কা, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া অতীব দুরূহ জ্ঞান করিয়া, এক প্রকার উদাসীনভাবে কালহরণ করিতেন। এই কারণ বশতঃ পিতাপুত্রে সর্ব্বদাই বাদানুবাদ হইত। দুর্বৃত্ত পাণ্ড্যগণের ঘোর অত্যাচারের প্রতিকারকরণার্থ রাজকুমার জেমনু সর্ব্বদাই পিতৃসমীপে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সফলমনোরথ হইতে না পারায়, পিতার উপর একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নিরন্তর মনোকষ্টে কালযাপন করিতেন। সিংহল দ্বীপের অপর প্রদেশের রাজগণও, পাণ্ড্যগণের অত্যাচারের প্রতীকারকরণে কুণ্ঠিত ছিলেন। পাষণ্ড পাণ্ড্যগণের অত্যাচার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে, একদা রাজকুমার জেমনু নিজ নিভৃত কক্ষে খট্টাঙ্গোপরি স্বীয় হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজা শ্রীশ্রীকামনতিষ্কা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, পুত্রের এই ভাব সন্দর্শনে জেমনুকে কহিলেন, "বৎস! হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া, এরূপভাবে শয়ন করিবার তাৎপর্য্য কি? সরল ও সহজভাবে শয়ন কর, নতুবা পীড়া জন্মাইবার সম্ভাবনা।" রাজকুমার জেমনু, পিতৃবাক্যে আক্ষেপ করতঃ বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করিলেন—"পিতঃ! পাষণ্ড পাণ্ড্যগণ আমাদিগের হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং কি প্রকারে হস্তপদাদি প্রসারিত হইবে? এক্ষণে পদপ্রসারণের সম্ভাবনা নাই।" নরপতি কামনতিষ্কা স্বীয় পুত্রের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ব্যথিত-হৃদয়ে বিনাবাক্যে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার পর, কয়েক বৎসর গত হইলে, কুমার জেমনু যখন দেখিলেন যে, এ সময়ে দুর্বৃত্ত পাণ্ড্যদিগকে দমন করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সিংহলের নানা প্রদেশ—নানা রাজ্য হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহকরতঃ অনুরাধাপুরস্থিত পাণ্ড্যরাজ ইলালের সহিত যুদ্ধকরণার্থ স্বীয় পিত্রাদেশ প্রার্থনা করিলেন। কুমার জেমনু তিনবার বিনীতভাবে রাজানুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এ বিষয় অসম্ভব জ্ঞানে, রাজা কামনতিষ্কা তিনবারই স্বীয় পুত্রকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। কোন ক্রমেই জেমনুর বাসনা পূর্ণ করিলেন না। পিতার এই আচরণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া একদিন রাজকুমার-জেমনু, জনৈক পরিচারিকার করে একখানি সাড়ী কাপড় প্রদানকরতঃ তাহা রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। এই কথা বলিয়া দিলেন—"লোকে কহে আমার পিতা পুরুষ নহেন—স্ত্রীলোক। এই নিমিত্তই আমি এই সাড়ীখানি, এই পরিচারিকা-হস্তে রাজ-সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম। পুরুষ-বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনি ইহাই পরিধান করিবেন, এই বাসনা।" রাজা কামনতিষ্কা এই পুত্রটীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সহসা কোনরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া, পুত্রকে

বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিতেছি। এরূপ রাজদ্রোহী পিতৃদ্রোহী পুত্রকে আমার রাজ্য হইতে বিদূরিত না করিলে, আমার মঙ্গল নাই।" রাজকুমার জেমনু যদিও জানিতেন যে, পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, এবং কোনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না, তাহা হইলেও তিনি স্বীয় পিতৃদেবের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পিতৃ-রাজধানী পরিত্যাগকরতঃ, কোন এক পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলাইয়া গিয়া, সেই জনমানবশূন্য স্থানে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না পাণ্ড্যগণের অত্যাচার হইতে সিংহলবাসিগণকে মুক্ত করিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন রাজধানীতে প্রত্যাগমন এবং আপনাকে রাজকুমার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবেন না। ক্রমে, পলায়িত পুত্রের সন্ধান পাইয়া, রাজা কামনতিষ্ঞা কয়েকবার স্বীয় পুত্রকে রাজপুরে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনার পর হইতে সকলে, রাজকুমার জেমনুকে 'দুতু জেমনু' বলিত। "দুতু" শব্দের অর্থ (সিংহলী ভাষায়) অবাধ্য। রাজকুমার স্বীয় পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই এই অখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতৃদেবের অবাধ্য না হইলে, সাধারণের নিকট "দুতু জেমনু" বলিয়া অভিহিত হইতেন না। কালে, "দুতু জেমনু" নামটাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে। জেমনুর পিতৃদেব রাজা কামনতিষ্ঞার মৃত্যু হইলে, জেমনু নিজ বাসনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বহুতর পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাবলী গঙ্গা পার হইয়া, অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পাণ্ড্যরাজ ইলালের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজকুমার জেমনুর সহিত বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত রণহস্তীও ছিল। তৎকালে বিজিতপুর পাণ্ড্যগণের একটী সুন্দর নগর ছিল। রাজকীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ এই সুরম্য নগরে বাস করিতেন। জেমনু বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে এই নগর অবরোধ করিলেন। নগরবাসী পাণ্ড্যসৈন্যগণ কয়েক মাসাবধি এই অবরুদ্ধ নগরটীকে রক্ষা করিয়া বীরত্বের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে একদিন জেমনুর একটী সুশিক্ষিত রণহস্তী বিজিতপুরের লৌহদ্বার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলায়, সেই সুযোগে জেমনু দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত স্বীয় সৈন্যগণসহ নগরমধ্যে প্রবেশ করতঃ, নগররক্ষককে নিহত করিলেন। জনৈক পাণ্ড্যসেনাপতি এই নগরের রক্ষক ছিলেন; নগরপালের মৃত্যুদর্শনে পাণ্ড্যসৈন্যসমূহ রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, আর তাহারা যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। বিপক্ষ সৈন্যগণের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে, জেমনু আপন বিক্রমে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইলেন এবং রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া, অতি অল্পকালমধ্যেই বত্রিশটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ও নিরাপদ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, এক দিবস পাণ্ড্যরাজ ইলাল বহুসংখ্যক সৈন্য ও স্বীয় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর দিগজ্জকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং আপনার সুশিক্ষিত রণমাতঙ্গে আরোহণকরতঃ, জেমনুকে আক্রমণ করণাভিলাষে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাণ্ড্যপতি ইলালের এই আগমন-সংবাদ শ্রবণে, রাজকুমার জেমনুও অগ্রসর হইয়া ইলালের

সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পাণ্ড্যসৈন্যগণের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, জেমমুর সৈন্যনিচয় তাহাদিগের নিজস্ব একটী দুর্গে প্রবেশকরতঃ, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও সিংহলী সৈন্যগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। প্রবলপরাক্রান্ত অমিতশক্তি-সম্পন্ন পাণ্ড্যসেনাপতি দিগজ্ঞ স্বীয় অদ্ভুত রণকৌশলে ও বীরবিক্রমে, একে একে জেমমুর প্রায় সমুদায় দুর্গই করতলগত করিলেন। এমন সময়ে, জেমমুর প্রধান সেনানায়কের অপূর্ব্ব কৌশল ও অমিত-তেজোবলে ইলালের গতিরোধ হইল। ইহাতে ইলালের সৈন্যগণ উৎসাহহীন হইয়া পড়ায়, কামনতিষ্কার বংশধর জেমমুর সুশিক্ষিত অশ্বারোহি-সৈন্যগণ ভীমবেগে পাণ্ড্যসৈন্যগণের উপর নিপতিত হইয়া তাহা-দিগকে পশ্চাৎপদ করিতে লাগিল। এক্ষণে ইলাল বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, কতকগুলি পাণ্ড্যসৈন্য লইয়া, তাঁহার পলায়নোন্মুখ সৈন্য-গণকে পুনরাহ্বানকরতঃ, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সিংহল-রাজকুমার জেমমু ও পাণ্ড্যপতি ইলাল, উভয়েই স্ব স্ব সুশিক্ষিত রণমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র, পরস্পরে সম্মুখ সমরে রত হইলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এ সময়ে কোন পক্ষের সৈন্যই অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া, স্থিরভাবে উভয় বীরের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। দুই গজারোহি সাংযুগিশূরের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে, পাণ্ড্যরাজ ইলাল জেমমুকে লক্ষ্য করিয়া, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণধার বড়শা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রণনিপুণ জেমমু তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সরিয়া যাওয়ায়, ইলালহস্ত নিক্ষিপ্ত বড়শা ব্যর্থ হইয়া গেল। পরে জেমমুর ইঙ্গিতে তদীয় সুশিক্ষিত রণহস্তী ইলালের রণহস্তীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। ইলালের হস্তী ভয় পাইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ইলাল আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া, সেই ভূপতিত গজ-চাপে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইলেন। এই ঘটনায় পাণ্ড্যসৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল;—অবশিষ্ট সৈন্যগণ জেমমুর সৈন্য-হস্তে সমর-স্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। জেমমু শত্রু জয় করিয়া, মহাসমারোহে অনুরাধাপুরে গমনকরতঃ, রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। জেমমুর অসাধারণ বীরত্বে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৬৪ অব্দে, পুনর্ব্বার সিংহ-বংশের রাজ্যলাভ হইল।

দুতু জেমমু যে কেবলমাত্র বীর ও উৎ-সাহী পুরুষ ছিলেন, এমন নহে। পরোপকার-বৃত্তি, দয়া, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণেও তিনি বিভূষিত ছিলেন। বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, গুণবানের প্রকৃত গুণগ্রহণে কদাচ তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। সংগ্রামে নিহত হইলে, সাহসিক শত্রুর প্রতিও তিনি উদারতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সমরক্ষেত্রে, হস্তি-চাপে যে স্থানে পাণ্ড্যরাজ ইলালের মৃত্যু হইয়াছিল, উদার-হৃদয় জেমমু রাজোচিত সমারোহে সেই স্থানে ইলালের দেহ দাহ করাইয়া, তথায় একটী সুদৃশ্য প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই স্তম্ভের নিকট দিয়া যদি স্বয়ং নরপতিও গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও হস্তী বা হয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট সীমা বা পথ পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিতে হইবে, কেহই এ আদেশ অমান্য করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জেমনু অত্যন্ত দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি পরের সুখে সুখ ও পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কাহারও দুঃখ দেখিলে, তিনি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। এই পরম ধার্ম্মিক-পুরুষ যারপরনাই ন্যায়নিষ্ঠ ও দুষ্কর্ম্মবিরত অধীশ্বর ছিলেন। পাণ্ড্যরাজ ইলালের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে যে বিস্তর লোকক্ষয় হইয়াছিল, এই অসুখকর বিষয়টী চিন্তা করিয়া, ধার্ম্মিকপ্রবর জেমনু মৃত্যুর পর, পরলোকের বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। প্রাণিক্ষয়রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি স্বরাজ্যনিবাসী দরিদ্রজনগণকে প্রভূত ধন দান করিলেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাস্থানে নানাবিধ বিহার ও ধাতুগর্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত, রাজকুল-গৌরব জেমনু যথেষ্ট যশঃ-সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজা দুতু জেমনু অনুরাধাপুরে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া যে একটী পিত্তলময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এই পরম সুন্দর ও সুপ্রশস্ত প্রাসাদটী চতুষ্কোণবিশিষ্ট এবং ইহার পরিধি প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত; ইহার উচ্চতাও এতদনুরূপ। এই সুদৃশ্য প্রাসাদে বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত মূল্যবান গ্রেনাইট্ (Granite) প্রস্তরবিনির্ম্মিত ১৬০০ এক সহস্র ছয় শতটী সুদৃশ্য স্তম্ভ ৪০ চল্লিশ শ্রেণীতে সংস্থাপিত ছিল। অর্থাৎ প্রতি পংক্তিতে ৪০ চল্লিশটী করিয়া স্তম্ভ ছিল। এই সুরম্য ও সুবৃহৎ প্রাসাদ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। অতি সুন্দর কারু-কার্য্যবিশিষ্ট অনেকগুলি স্তম্ভ অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই প্রাসাদের মধ্যস্থলের সমুদায় স্তম্ভই অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট এবং চতুষ্পার্শ্বের স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যবিহীন অর্থাৎ সাদা। এই প্রাসাদটী ৯ নয় তলা এবং ইহাতে প্রায় ১০০০ এক সহস্র প্রকোষ্ঠ ছিল। এই প্রাসাদের উপরের অংশ (ছাদাদি) সমস্তই পিত্তল দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই, লোকে ইহাকে পিত্তলময় প্রাসাদ আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই প্রাসাদের মধ্যভাগটী অতীব চমৎকার। ইহার মধ্যস্থলে একটী সুপ্রশস্ত দালান (Hall) ছিল, এই দালানে হস্তী ও সিংহাদির নানাপ্রকার গিল্টি করা সুন্দর মূর্ত্তি ও গজদন্তবিনির্ম্মিত অতি অদ্ভুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট, পরম সুন্দর ও বৃহৎ একটী সিংহাসন ছিল। এই পিত্তলময় প্রাসাদের সর্ব্ব উপর তলায়, পরমধার্ম্মিক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। যাঁহারা নিম্ন-শ্রেণীর ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী এবং যাঁহাদিগের আচার ও ব্যবহারে প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ পরিলক্ষিত না হইত, তাঁহদিগকে নিম্নতলে বাস করিতে হইত, তাঁহার উপর তলায় বাস করিবার অধিকার পাইতেন না। এই প্রাসাদের সোপানপথ (সিঁড়ি) অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। নয় তলা আরোহণাবরোহণ করিতে উদাসীনগণের বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কেবলমাত্র সম্মান বা মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থই উচ্চতম স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তৎকালে বৌদ্ধ উদাসীনগণকে বৌদ্ধধর্ম্মের রীতি ও নীতি এবং অনুষ্ঠানাদি পূর্ণমাত্রায় মানিয়া চলিতে হইত, কোন বিষয়ের কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম করিবার শক্তি ছিল না। যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের রীতিনীতিগুলির সম্পূর্ণভাবে পরিপালন না করিতেন, তাঁহাকে উচ্চপদ বা ভিক্ষু-সম্মান প্রদান করা হইত না। যিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়মানুসারে চলিতেন, তিনিই উচ্চপদ লাভকরতঃ সর্ব্বসাধারণের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইতেন।

সিংহল-সাম্রাজ্য মধ্যে অনুরাধাপুর একটী পরম সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরে 'ৰূ বে নৃ ব লা শ য়' নামে একটী সুবৃহৎ ও অতীব রমণীয় বৌদ্ধ-মঠ ছিল। এই পরম, সুন্দর মঠটীর ন্যায় চিত্রবিচিত্রময় বৌদ্ধমঠ সমগ্র সিংহল দ্বীপে আর ছিল না। এই বৃহদায়তম বৌদ্ধমঠটী প্রায় ২০০ দুইশত হস্ত পরিমিত উচ্চ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে, ইহার ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকপ্রস্তরাদি একটী প্রকাণ্ড স্তূপাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই স্তূপোপরি বিবিধ জাতীয় বন্য বৃক্ষলতাদি পরিবর্দ্ধিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই স্তূপটীর উচ্চতাও এক্ষণে ১২৫ একশত পঞ্চবিংশতি হস্ত পরিমিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবৃহৎ ও পরম রমণীয় বৌদ্ধমঠের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাটিকা ছিল। এই মনোহর স্থানটীর পরিধি ১৪০০ চৌদ্দ শত হস্ত, এবং ইহার সর্ব্বত্র প্রস্তর বিমণ্ডিত ও চারিদিকেই প্রশস্ত পরিখা ছিল। পরিখাটী প্রায় ৫০ পঞ্চাশৎ হস্ত প্রশস্ত। পরিখার ঘাট্‌গুলির উভয় পার্শ্বই পরম সুন্দর ও মূল্যবান্‌ মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত (কৃত্রিম) হস্তীর প্রথমার্দ্ধভাগ স্থাপিত ছিল। রাজকুলতিলক মহাত্মা দুতু জেমনু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, এই সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত, অট্টালিকা শিল্পিগণকে তিনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক প্রদান করতঃ তাহাদিগকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। রাজকুলরত্ন মহামতি জেমনু কোন ব্যক্তিকেই, বিনা বেতনে, এই সকল শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই।

জীবনের অন্তিম অবস্থায়, জেমনু আর একটী পরম রমণীয় বৌদ্ধমঠ নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; এবং তিনি এ কার্য্য আরম্ভও করিয়াছিলেন; কিন্তু সমাধা করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। আসন্ন মৃত্যুর অতি অল্পকাল পূর্ব্বে, রাজা জেমনুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর দারু-বিনির্ম্মিত সেই প্রকার একটী মঠের আদর্শ প্রস্তুত করতঃ, জেমনুকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। একান্ত অসুস্থ অবস্থায়, রাজা জেমনুকে, লোকে পালকীতে আরোহণ করাইয়া, উক্ত মঠ প্রদক্ষিণ করাইয়াছিল। তদনন্তর, বহুমূল্যের একখানি সুকোমল গালিচা এমন এক স্থানে স্থাপিত করিয়া জেমনুকে তদুপরি উপবেশন করান হইয়াছিল যে, যে স্থান হইতে তিনি ঐ মঠটী অতি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। এই আদর্শ বৌদ্ধমঠটী সম্যক্‌ সন্দর্শন করতঃ জেমনু যৎপরোনাস্তি আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে, পরলোক গমনোন্মুখ রাজা জেমনুর হৃদয় কিঞ্চিৎ উদ্বেলিত ও তাঁহার মনে নানাপ্রকার ভাব উদিত হইয়াছিল। তাঁহার কৃত অনেকগুলি সদনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গেল দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজকুলতিলক, ধার্ম্মিক-প্রবর মহাত্মা জেমনুর যৌবনাবস্থায় তাঁহার জনৈক প্রিয় সেনাপতি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এক্ষণে এই মুমূর্ষু অবস্থায় রাজা জেমনু সেই ধর্ম্মপ্রাণ উদাসীনকে প্রিয় ও মধুর সম্ভাষণে বলিয়াছিলেন;—"এতদিন পর্য্যন্ত আমি দশজন সেনানায়কের সাহায্যে বহু যুদ্ধ করিলাম; কিন্তু এক্ষণে মৃত্যুরূপ ভীষণ শত্রুর সহিত আমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এ প্রবল শত্রুকে আমি কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হইব না।"

পরলোক-গমনোন্মুখ রাজা জেমনুর বাসনানুসারে, তাঁহার কৃত সৎকীর্ত্তির এক সুদীর্ঘ তালিকা তৎকালে তাঁহার সম্মুখে পাঠ করা হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া

যায় যে, এই পরম জ্ঞানী, সদাশয়, উচ্চমনা ও একান্ত প্রজাবৎসল নরপতি বহু অর্থব্যয়ে, ৯৯ নিরনব্বই টী বিহার নির্ম্মাণ ও বহুবিধ জলাশয়াদি খনন করাইয়া, যথেষ্ট যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত রমণীয় মঠ সমূহে উদাসীন সকল নিরন্তর পরমসুখসচ্ছন্দে কালহরণ করিতেন। সমগ্র সিংহলদ্বীপে যতগুলি উদাসীন বাস করিত, কৃপাশীল জেমনু তাঁহাদের সকলকেই প্রতি বর্ষে তিন প্রস্ত করিয়া, তিনবার বস্ত্রদান করিতেন। দুতু জেমনুর রাজ্যাধিকার কাল-মধ্যে কোন সময়ে সিংহলদ্বীপে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সে সময়ে, এই প্রজাবৎসল রাজা প্রচুর পরিমাণে শস্য সংগ্রহ করতঃ, তাহা অকাতরে দান করিয়া প্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল দুর্মূল্য শস্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রয় করিয়া আনিবার নিমিত্ত, মহানুভব জেমনু স্বীয় বহুমূল্যের কর্ণকুণ্ডল খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারদেশে যত সংখ্যক উদাসীন বা ভিক্ষাজীবী আগমন করিত, তাহাদের সকল-কেই তিনি অকাতরে অন্নবস্ত্রাদি দান করিয়া পরম সুখ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি স্বীয় রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থ বাহির করতঃ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে,—"কেহ কোথাও অন্নাভাবে যেন কষ্ট না পায়। অন্যত্র অন্ন না মিলিলে রাজভবনে নিশ্চয়ই অন্ন মিলিবে।" এই উদারচেতা, উচ্চমনা, ও সদাশয় মহাপুরুষ, স্বীয় রাজত্ব সাত সাত দিবসের নিমিত্ত, পাঁচবার উদাসীনগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের দ্বাদশটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ নিশাকালে ৭০০০ সপ্ত সহস্র ঘৃত প্রদীপ জ্বলিত। অষ্টা-দশ আবশ্যক স্থলে, ১৮ অষ্টাদশটী চিকিৎ-সালয় প্রতিষ্ঠিত করতঃ, যাহাতে ইহাদিগের সদুদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, তদ্বিষয় রাজা জেমনু স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। এই সকল চিকিৎ-সালয়ের চিকিৎসকগণকে যথোপযুক্ত বেতন বা পারিশ্রমিক এবং রোগিগণকে আবশ্যক মত উপযুক্তরূপ পথ্যাদি প্রদান করিতেন। ৪৪টী স্থান হইতে, প্রতিদিন অনবরত অন্ন, শর্করা, দুগ্ধ, মধু ও লবণ দরিদ্রদিগকে প্রদান করা হইত। সমগ্র সিংহলদ্বীপের যাবতীয় বৌদ্ধমঠ ও অপরাপর মন্দিরে নিশাকালে যে সকল আলোক জ্বলিত, দানশীল জেমনু স্বয়ং সে সকল বিষয়ের ব্যয়-ভার বহন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে সমস্ত বিহারে বিশেষ-ভাবে ধর্ম্মালোচনা হইত। তজ্জন্য উদাসীন-গণ রাজকোষ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ, ঘৃত এবং বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন। কৃপাবান্ রাজা জেমনু অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। জেমনুর রাজত্ব সময়ে, তাঁহার অপার কৃপায়, কোন প্রজারই অন্ন ও বস্ত্রের অভাব হইত না। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে, বিহার গুলির বিষয় উল্লেখ করিয়া, এই মহানুভব বলিয়াছিলেন;—"আমার সম্পদ্ সময়ে এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল বিষয় হইতে এক্ষণে আমি সান্ত্বনা পাইতেছি না। পরন্ত, আমার দুঃখের সময়ে যে দুইটী দান করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি বড়ই সান্ত্বনা পাইতেছি।" অনন্তর ধাতু-গর্ভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দীনপ্রতিপালক, প্রজাবৎসল ও কীর্ত্তিশালী নরপতি জেমনু তনুত্যাগ করতঃ, চিরদিনের নিমিত্ত চিরানন্দ-ময় ধামে গমন করিলেন। খ্রীষ্টজন্মের ১৪০ একশত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মহাত্মার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

রাজবংশাবতংস জেমনু পরমধার্ম্মিক ও উদাসীনগণের অতীব প্রিয় সেবক ছিলেন। তিনি উদাসীনদিগের দাসানুদাস, "এ কথা জেমনু স্বয়ং বহুবার বহুসময়ে বহুলোক সমক্ষে আনন্দান্তঃকরণে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা জেমছুর মৃত্যুর পর, রাজকুমার সৈ দৈ তি স স্বীয় পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই অধীশ্বরও স্বীয় পিতৃদেবের স্থায় প্রজামাত্রেরই ভক্তি ও অনুরাগ ভাজন হইয়া পরমসুখে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পুণ্যবান্ জনকের স্থায় অনেক সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

জীবনচরিত সঙ্কলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিত—মুনিবিশেষ, মহর্ষি গৌতমের পুত্র। তপস্যাদ্বারা ইনি ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা ইঁহাকে পিতার স্থায় মান্য করিতেন। একদা ইনি একত ও দ্বিত নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যজ্ঞীয় পশু-আহরণার্থ গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে পশুর লোভে ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বৃকদর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার সময়ে ত্রিত এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। কথিত আছে যে, ইনি সেই স্থানেই সোমযাগ করেন। তখন দেবতারা তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর ত্রিত আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া বৃকরূপে পরিণত করেন।

ত্রিপাদ—শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দৈত্যরাজ বলির নিগ্রহার্থ ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বলির যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলে, ভগবান্ এক পাদ দ্বারা স্বর্গ ও অপর পাদ দ্বারা মর্ত্ত্য আক্রমণপূর্ব্বক নাভিপদ্মোদ্ভূত তৃতীয় পাদ স্থাপনের স্থান না পাইয়া বলিকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে বলেন। অঙ্গীকারপরায়ণ, দানশীল বলি আপনার মস্তক পাতিয়া দিয়া তাহাতেই তৃতীয় পাদ স্থাপন করিতে বলায় বামনদেব তাহাই করিয়া বলিকে পাতালে নীত করেন; তদবধি বিষ্ণুর এক নাম হইল ত্রিপাদ।

ত্রিশঙ্কু—স্বনামখ্যাত সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপবিশেষ। অযোধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র ইঁহারই পুত্র। ইনি সশরীরে স্বর্গগমন কামনায় কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণকে যজ্ঞ করিতে বলেন। তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইলে, ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে ইঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবগণ ইঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রাখিয়া নূতন নক্ষত্রলোক সৃজনপূর্ব্বক অন্য দেবতা ও স্বর্গের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে সেই মধ্যপথে নবনক্ষত্রসমূহে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে দিলেন।

দক্ষ—দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র; বিধাতার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম হয়।

ইঁহার ভার্য্যার নাম প্রসূতি। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা হয়; তন্মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ বারটী, ধর্ম্মরাজ দশটী, চন্দ্র সাতাইশটী, অরিষ্টনেমী চারিটী ও অঙ্গিরা দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়।

একদা ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব শ্বশুরকে অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করেন, এবং শিবকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিব ভিন্ন অন্য সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেও পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হন। কন্যাকে দেখিয়া দক্ষ কটুবাক্যে শিবনিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। পতিনিন্দাশ্রবণে পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ করেন। শিব সংবাদ পাইয়া সানুচর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। শিবের অনুচরেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তক ভস্মীভূত হওয়ায় একটী ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা করা হইল। শিবনিন্দার ফলে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইলেন।

দণ্ডী—নৃপবিশেষ। ইনি ঘোটকীরূপিণী অভিশপ্তা অপ্সরা উর্ব্বসীকে প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ ইঁহার নিকট ঘোটকী প্রার্থনা করিলে, ইনি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর দণ্ডী কৃষ্ণের ভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই ইঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। অবশেষে দণ্ডী পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইলে, মহাবল ভীম ভ্রাতৃগণের অসম্মতিতে ইঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। এই কারণে পাণ্ডবদিগের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধঘটনা হয়। যুদ্ধে কৌরবগণ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দেবগণ কৃষ্ণের সাহায্যার্থ আগমন করেন। তখন অষ্টবজ্র একত্র হইলে উর্ব্বসী শাপমুক্তা হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দণ্ডীও স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

দত্তাত্রেয়—ঋষিবিশেষ, অত্রিমুনির পুত্র; বিষ্ণুর অংশে ইঁহার জন্ম, সুতরাং ইনি ভগবানের অংশাবতার; ইনি প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেন; ইঁহার পুত্রের নাম নিমি।

দধীচ, দধীচি—মুনিবিশেষ। অথর্ব্ব মুনির ঔরসে তৎপত্নী শান্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত অলম্বুষা অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অলম্বুষা দর্শনে ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে তাহাতেই পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। ইনি শিষ্য নন্দীকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তদবধি নন্দী শিবের পার্শ্বচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতিকে শিবহীন যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। দক্ষ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ইনি যজ্ঞক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ জানিতে পারেন যে, দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যতীত অন্য অস্ত্রে অসুরের বিনাশ হইবে না। তখন ইন্দ্র সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, মুনিবর অকুণ্ঠিতচিত্তে পরোপকারার্থ আত্মজীবনদানে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া

বলিলেন যে, নশ্বর অস্থিপঞ্জর লোক-হিতার্থে, বিশেষতঃ দেবকার্য্যে, নিয়োগ করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতঃপর দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, ইহাঁর পবিত্র অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এবং সেই অস্ত্রাঘাতে বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করা হয়।

দনু—কশ্যপভার্য্যা, দক্ষরাজের কন্যা। ইহাঁর গর্ভে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি চল্লিশটি পুত্রের জন্ম হয়; এই সকল পুত্রই দানব নামে খ্যাত।

দন্তবক্র—নৃপবিশেষ, চেদিরাজ দমঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম শিশুপাল। ইহাঁরা সম্পর্কে কৃষ্ণের পিতৃষ্বসৃপুত্র হইলেও তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী এবং মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। শিশুপাল নিহত হইলে, দন্তবক্র কৃষ্ণের প্রাণবধার্থ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেন; পরন্তু একদা যুদ্ধে কৃষ্ণের গদাঘাতে নিজেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দমঘোষ—ইনি চেদি রাজ্যের রাজা ছিলেন। বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইহাঁর শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই পুত্র জন্মে। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার শাসনে ইহাঁকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়।

দশরথ—অযোধ্যার নৃপবিশেষ, রামচন্দ্রাদির পিতা। সূর্য্যবংশীয় প্রথিতনামা মহারাজ রঘুর পুত্র; অজের ঔরসে তদীয় মহিষী ইন্দুমতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা নামে ইহাঁর তিনটী প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। দশরথ একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া রজনীতে অন্ধক মুনির পুত্রকে মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বধ করেন। তাহাতে অন্ধক মুনি ইহাঁকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "আমার ন্যায় তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে।" এই শাপ দশরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। অতঃপর ইনি স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করাইয়া তাহার ফলে চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করেন। কৌশল্যার গর্ভে রামের, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের, এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। দশরথ যেমন শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন, তেমনই সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, কৈকেয়ী অতি যত্নপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিয়া ইহাঁকে সুস্থ করেন। সেই সময়ে ইনি কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিবার অঙ্গীকার করেন।

রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহের পর রাম রাজ্যশাসনের উপযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করেন। এদিকে কৈকেয়ী স্বীয় দুষ্টবুদ্ধি পরিচারিকা মন্থরার পরামর্শে দশরথের পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। সত্যপরায়ণ দশরথ কিছুতেই কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে

তৎক্ষণাৎ ভার্য্যা জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণসহ বনে গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

দাশরথি রায়—বঙ্গের বিখ্যাত পাঁচালীরচয়িতা ও গায়ক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ বাঁদমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে অতি সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া এক নীলকুঠিতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইহাঁর মাতুলালয় পীলা গ্রামের অকাবাই নাম্নী এক রমণীর কবির দলের সরকার ও ছড়াদার হন। একদা কোন স্থানে কবি গাহিতে যাইয়া ইনি অত্যন্ত গালি খান এবং তদবধি কবির দল পরিত্যাগ করেন। অতঃপর দাশরথি গান ও ছড়া বাঁধিয়া কতকগুলি বয়স্যের সহিত কবির দলের সৃষ্টি করেন। এইবার প্রতিভাবান্ প্রতিভাবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমে ইহাঁর যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা ইহাঁর পাঁচালী শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইত। পাঁচালী গাহিয়া ইনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে এই প্রতিভাশালী পুরুষের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি সর্ব্বাংশে আদর্শ নরপতি ছিলেন। ইহাঁর মহিষী সুদক্ষিণাও ইহাঁর অনুরূপ গুণসম্পন্না ছিলেন। দীর্ঘকাল অনপত্য থাকায়, ইহাঁরা অতিশয় মনঃক্লেশে ছিলেন। অবশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে কামধেনু নন্দার সেবায় নিযুক্ত হইলে ইহাঁদের রঘুনামক দেশবিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

দিলু—নৃপতিবিশেষ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের অতি নিকটে একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

দিবোদাস—১। কাশীরাজবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম সুদেব। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দিবোদাস বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে হৈহয়গণ ঐ পুরী আক্রমণ করিলে, ইনি প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শেষে পরাজিত হন। অতঃপর ইনি ভরদ্বাজ মুনির শরণাগত হইলে, তিনি ইহাঁর একটি মহাবীর্য্যবান্ পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে প্রতর্দ্দনের জন্ম হইলে, তিনি হৈহয়দিগকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। বিশ্বেশ্বর অনেক কৌশলে দিবোদাসের নিকট হইতে বারাণসী গ্রহণ করেন।

২। বিখ্যাত চিকিৎসকবিশেষ। কথিত আছে যে, ইনি ভাস্করের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। চিকিৎসাদর্পণ নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ইহাঁরই প্রণীত।

দীনবন্ধু মিত্র—বঙ্গের খ্যাতনামা নাটককার। ইহাঁর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া, পরে হুগলী কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দুকলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন।

ছাত্রজীবনে ইনি উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং ছাত্রবৃত্তি পুরস্কারাদিও প্রাপ্ত হন।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে দীনবন্ধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাকবিভাগের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ১৫০্ টাকা বেতনে ডাকবিভাগের অন্যতম তত্ত্বাবধারক (Superintendent) নিযুক্ত হন। এই পদে ইনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া প্রভাকর-পত্রে প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। এই নাটক মহাত্মা লঙ্ সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার জন্য লঙ্ সাহেবের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। যাহা হউক, এই নীলদর্পণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু সমধিক প্রস্ফুটিত হওয়ায় নীলকরদিগের অত্যাচার অনেকপরিমাণে কমিয়া যায়। অতঃপর দীনবন্ধু, "নবীন-তপস্বিনী" "সধবার একাদশী" "লীলাবতী" প্রভৃতি নাটক, "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসন, এবং "দ্বাদশ কবিতা" ও "সুরধনী কাব্য" নামক পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচনা ললিত ও মনোহর। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গভাষায় লেখকদিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দীর্ঘতমাঃ—ঋষিবিশেষ। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে তৎপত্নী মমতার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। খুল্লতাত বৃহস্পতির শাপে ইনি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলেও ইনি তপশ্চরণ দ্বারা ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর প্রদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার গৌতমাদি পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি গোধর্ম্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্বেষী ইঁহাকে নানাপ্রকারে বিস্তর কষ্ট দিয়া অবশেষে নদীতে নিক্ষেপ করেন।

দুঃশলা—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। এক শত পুত্রের পর গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। সিন্ধুরাজকুমার জয়দ্রথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র সমরে জয়দ্রথ হত হইলে, দুঃশলা শিশু পুত্র সুরথকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে শাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ্যে উপস্থিত হইলে ভীরু সুরথ ভয়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন দুঃশলা অর্জ্জুনকে সমুদায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি সুরথের পুত্রকে সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

দুঃশাসন—দুর্য্যোধনের মধ্যম ভ্রাতা। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তৎপত্নী গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দুর্য্যোধনের অতিশয় অনুগত ও

বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠকে নিয়ত পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দিতেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে, ইনি দুর্য্যোধনের আদেশে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনয়ন করেন, এবং তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বসন আকর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু ভগবানের অপার মহিমায় ইনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। এইরূপ দুরাচরণ হেতু ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃ ভেদ করিয়া রুধির পান করিবেন। কুরুক্ষেত্র সমরের সপ্তদশ দিবসে ইনি ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম ইহাঁকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক রক্ত পান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। তাহাতেই দুঃশাসন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দুন্দুভি—দৈত্যবিশেষ। এই অসুর মহিষাকার ও প্রভূত বলশালী ছিল। বলদৃপ্ত হইয়া দুন্দুভি একদা যুদ্ধার্থ সমুদ্রের নিকট গমন করে। বরুণ ইহাকে হিমালয়ের নিকট যাইতে বলেন। তদনুসারে অসুর হিমালয়ের নিকট 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইলে, নগরাজ পরাভব স্বীকার করিয়া ইহাকে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালির নিকট গমন করিতে উপদেশ দেন। কপিরাজের সহিত অসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সমরে বালি জয়ী হন, দুন্দুভি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মায়াবী।

দুর্গা—মহাদেবী, পরমা প্রকৃতি, হরমহিষী। [সুরথ রাজার সময় হইতে ধরাধামে এই দেবীর পূজাপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তৎপরে রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশার্থ সৌরাশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে অকালে বোধন করাইতে অর্থাৎ জাগাইতে হইয়াছিল। তদবধি এদেশে শারদীয় পূজার আরম্ভ হইয়াছে]। দুর্গাদেবীর ভক্তগণ নানা জনে নানাভাবে দুর্গানামের ব্যুৎপত্তি সাধন ও অর্থ করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে নিম্নে এক প্রকার মাত্র অর্থ দেওয়া গেল; যথা,—দুর্গাশব্দের বর্ণবিশ্লেষণ করিলে এইরূপ হয়,—দ্+উ+র্+গ্+আ। এই সকল অক্ষরের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে, তদ্ যথা—

"দৈত্য নাশার্থ বচনো
দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্ত
বাচকো দেবসম্মতঃ।
রেফো রোগঘ্নবচনো
গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ, দ কার দৈত্যনাশার্থবাচক উ কার বিঘ্ননাশের বাচক, রেফ্ (র) রোগনাশবাচক, গ পাপবিনাশনবাচক, এবং আকার ভয়শত্রুনাশার্থবাচক।

দুর্গাবতী—কালঞ্জরের শেষ রাজা কীর্ত্তিসিংহের কন্যা। গড়মণ্ডলের রাজা দলপতির সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইনি অতিশয় বীর-রমণী ছিলেন। আকবরের বড় বড় সেনাপতিদিগকে ইনি বার বার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। অবশেষে আসফ খাঁ নামে একজন সেনাপতি বিপুলবাহিনী সহ ইহাঁর রাজ্য আক্রমণ করিলে বীরবালা অসীম বীরত্ব সহকারে তাঁহাকে

বাধা দেন, কিন্তু সহসা আহত হওয়ায় যবনের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করেন (১৫৬০ খৃঃ)।

দুর্জনশাল—ইনি কিছুদিন ভরতপুরের রাজা ছিলেন। জাঠরাজ বলদেব সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু মৃত বলদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্জনশাল, বলবন্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করেন। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট মিত্রতার অনুরোধে বলবন্তের পক্ষ অবলম্বন করায় দুর্জনশাল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্যান্য কয়েকজন দেশীয় রাজাও দুর্জনশালকে গোপনে উৎসাহ দিতেছিলেন। ইংরেজ-সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়ার দুর্জনের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লেকের পরভবাবধি ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। ইংরেজসেনাপতি দুর্গের একাংশ তোপে উড়াইয়া দিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। অতঃপর বলবন্ত সিংহকে তাঁহার পিতৃসিংহাসনে পুনঃস্থাপনপূর্ব্বক দুর্জনশালকে বন্দী করিয়া বারাণসীতে প্রেরণ করা হইল (১৮২৬ খৃঃ)।

দুর্য্যোধন—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহাঁর জননীর নাম গান্ধারী। ইনি বাল্যে পাণ্ডবদিগের সহিত একত্রে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে সত্রাভুক দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়ায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারায় ইহাঁর মনে বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হয়। বিশেষতঃ ভীমের বলবিক্রম হেতু ইনি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন। অতঃপর ইনি ভীমের বিনাশার্থ তাঁহাকে দুইবার বিষ প্রদান করেন, কিন্তু সৌভাগ্যবলে ভীম দুইবারই তাহাতে রক্ষা পান। অতঃপর সকলেই প্রথমে কৃপাচার্য্য ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন সমধিক দক্ষতা লাভ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের বল, বীর্য্য ও শিক্ষায় উৎকর্ষের সহিত ইহাঁর চিরপোষিত বিদ্বেষানল ক্রমে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল। অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার দিন দুর্য্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে সাঙ্ঘাতিক প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে দ্রোণাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের অস্ত্রকৌশল দেখিয়া দুর্য্যোধন হিংসায় ম্রিয়মাণ হইলে, কর্ণ ক্রীড়াভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের ন্যায় অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে মিত্রভাবে সম্বোধন করিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজা করিয়া দিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, দুর্য্যোধন ক্ষোভে ও হিংসায় একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; কিসে পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবেন, স্বতঃ পরতঃ তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদিগের আশু বিনাশের নিমিত্ত বারণাবতে এক জতু-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া পাণ্ডবগণকে কৌশলে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুরের যত্নে নিরীহ পাণ্ডবগণ

আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া মনে মনে অতিশয় সুখী হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কিন্তু দুর্য্যোধনের হিংসা হইল। তাহার উপর আবার যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয়-যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া ইহাঁর দুঃখের সীমা রহিল না। ইতঃপূর্ব্বে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর স্থলে গমন করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অথচ ছদ্মবেশী অর্জ্জুন অনায়াসে সেই লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদী-রত্ন লাভ করেন। ইহাতে পাপমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী এই সকলের প্রতিই দারুণ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্য্যোধন সস্ত্রীক পাণ্ডবগণের অনিষ্টসাধনের নূতন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের মত করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থ হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজধর্ম্মানুসারে যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধনের মাতুল অক্ষক্রীড়াপটু দুষ্ট শকুনি ভাগিনেয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপটক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্যাদি-সমস্ত হারাইয়া পরে একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ও অবশেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণে হারিয়া বসিলেন। এইবার দুর্য্যোধন অনেক দিনের পোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়া পাঞ্চালীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লইয়া আসিলে, দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধন তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিয়া স্বীয় উরুদেশের বস্ত্রোত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহাকে বাম উরু প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে সেই উরু ভঙ্গ করিবেন। অতঃপর অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে নানারূপে সন্তুষ্ট করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়া আনাইলেন। এবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া খেলা হইল। ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হওয়ায় পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দুর্য্যোধন নিষ্কণ্টকে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অতীব সুখী হইলেন।

দুর্য্যোধন ভানুমতী নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার পর সখা কর্ণের সহায়তায় চিলাদ-রাজকন্যাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহাকেও বিবাহ করেন। ইহাঁর লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ইনি তাঁহার স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিলে, ইনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম শাম্বকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও ইনি তাহা অগ্রাহ্য করায় বলদেব হস্তিনাপুর ধ্বংস করিতে

উন্মত্ত হন। তখন দুর্য্যোধন শাম্বকে মুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ দেন; এবং এইরূপে বলরামের তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

পাণ্ডবদিগকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও হিংসকের হিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাঁহাদের বিনাশের নিমিত্ত দুর্য্যোধন এক নূতন উপায় স্থির করিলেন। একদা মহাতপাঃ দুর্ব্বাসা ঋষিকে কোন প্রকারে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে দশ সহস্র শিষ্যসহ দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যুধিষ্ঠিরের নিকট অতিথি হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোপনস্বভাব ঋষি ভক্ষ্যদ্রব্য না পাইয়া পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবেন। পরন্তু কৃষ্ণের কৌশলে দুর্য্যোধনের সে চেষ্টাও বিফল হইল।

অতঃপর দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের এবং স্বচক্ষে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া সুখী হইবার মানসে ছলপূর্ব্বক ঘোষযাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদির দৈন্য দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বনে গমন করিলে তাঁহার সহিত কৌরবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ বীরগণ পরাস্ত হইলে দুর্য্যোধন স্বয়ং রণে গমন করেন এবং পরাজিত ও নারীগণ সহ বন্দী হন। এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্বের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন চিত্রসেনকে পরাভূত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিলেন। এইরূপে হতমান হইয়া দুর্য্যোধন অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রভূত অর্থ আনয়নপূর্ব্বক ইহাঁকে প্রদান করিলে ইনি বৈষ্ণব-যজ্ঞ সমাপন করিয়া কতকটা হৃষ্ট হইলেন।

দুর্জ্জন চিরদিনই পরের অনিষ্টসাধনের পথ অন্বেষণ করে। একদা দুর্য্যোধন ভীষ্মদ্রোণাদি মহাবীরগণের মত করাইয়া বিরাটরাজের গোধনহরণ-মানসে যাত্রা করেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন সারথি হইয়া এবং বিরাটতনয় উত্তরকে রথী করিয়া লইয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। কুরুসেনা দর্শনে উত্তর ভয় পাইলে, অর্জ্জুন নিজে যুদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় ভীষ্মদ্রোণাদি বীরগণকে পরাস্ত করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনায় প্রতিগমন করেন।

ত্রয়োদশবর্ষান্তে পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশায় দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি দিতেও অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর যুদ্ধের আশঙ্কায় দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে বরণ করিতে চাহিলে, কৃষ্ণ স্বয়ং কোনও পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় এবং ইহাঁকে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করায় ইনি সন্তুষ্টচিত্তে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ নিজে সন্ধি-স্থাপনার্থ অনুরোধ করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় আসিলে ইনি তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রো

কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ইঁহার সেনাপতি ছিলেন; তথাপি ইঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল, কারণ ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি দ্রোণদত্ত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি ইঁহাকে অস্ত্রহীন করেন। পরে তলাঘাতে পীড়িত হইয়া দুর্য্যোধন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইলে যুদ্ধের ঊনবিংশ দিবসে ইনি পলায়নপূর্ব্বক এক হ্রদে প্রবেশ করেন। পাণ্ডবগণ ইঁহার অনুসরণে তথায় উপস্থিত হইলে, ইনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ভূতলশায়ী হন। পরে অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া অতি হর্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

তুমি আমি।

যতদিন 'তুমি' 'আমি'
তত দিন বিরহ মিলন,
যতদিন তুমি আমি 'দুই'
ততদিন হাসি ও রোদন!
যতদিন তুমি আমি
দূরে দূরে করিব গো বাস
ততদিন মরিব খুঁজিয়া
সমীরণে সুদীর্ঘ নিশ্বাস!
যতদিন তুমি আমি
না হইব প্রেমিক তেমন
ততদিন শুধু লুকোচুরি
পলে পলে বাঁচন মরণ
যতদিন তুমি আমি
বাসনার থাকিব অধীন
ততদিন চোখের মিলনে
আত্মবোধ হইবে বিলীন।
যতদিন তুমি আমি
আত্মরতি করিব পোষণ,
ততদিন 'প্রেম' 'ভালবাসা'
মৃগতৃষ্ণা—কেবলি ছলন!
যেইদিন তুমি আমি
তুমি কিংবা আমি হ'য়ে যা'ব
সেইদিন প্রকৃত মিলন
সেইদিন অমরতা পা'ব।
সেইদিন ভালবাসা
সেইদিন নবীন জীবন
সেইদিন তোমার আমার—
মধুময় প্রকৃত মিলন।
যেইদিন তুমি আমি,
ক্ষুদ্র দুই সলিলের কণা
মিশে যা'ব অনন্ত সলিলে
সেইদিন সফল সাধনা।
সেইদিন সুখ দুঃখ
হা হুতাশ, বিরহ মিলন
মিশে যাবে অনন্ত মিলনে
ঘুচে যাবে হাসি ও রোদন!

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব শর্ম্মা।

সন্ন্যাসী।

পুণ্য জন্মভূমি, দরশন আশে,
দীর্ঘ বিংশ বর্ষশেষে।
নিষ্কাম সন্ন্যাসী, আজি উপনীত
পবিত্র আপন দেশে।
ত্যজিয়ে সকলি, যে জন জ্ঞানেতে,
ধরেছে নিষ্কাম ব্রত।
সে কেন ফিরিল, আবেগ পরাণে,
স্বদেশে গৃহীর মত।
সকামী জনার, কামনার সার,
মহাতীর্থ জন্মস্থান।
প্রকৃতি হৃদির, বন্ধনে যথায়,
প্রসূত মানবপ্রাণ।
দেহ আছে বলে, জানিছে প্রকৃতি,
রূপ রস আদিস্থান।
হৃদি খুলে দেয়, আত্মার মহিমা,
অনাদি অনন্ত জ্ঞান।
থাকিতে জীবন, রহিবে বন্ধন,
প্রকৃতি-প্রতিভূ দেহ।
দেহের কামনা, প্রকৃতি সাধনা,
সন্ন্যাসে রহে না কেহ।
কামনার আশা, জনমের মোহ,
ত্যজিবারে চিরতরে।
তাই ত সন্ন্যাসী, কাম্যক্ষেত্রে ফিরি,
শেষ দেখা যায় করে।
বিশাল অশ্বত্থ, তরুতলে বসি,
প্রশান্ত সন্ন্যাসিবর।
হেরিছে উদাসে, পুণ্য জন্মভূমি,
সেই নদী সেই ঘর।
সাঁজেতে উষায়, কার কুলবধূ,
দীন হীন বেশ ধরি।
শূন্য ঘাটে যায়, শূন্য পানে চাহে,
কলসি সলিলে ভরি।

দেবতা মন্দিরে, গললগ্নি বাসে,
কি ভিক্ষা যাচিছে নারী।
কাতর পরাণে, নয়ন সলিলে,
পৃথিবীর সুখ ছাড়ি।
প্রকৃতির প্রেমে, বরষিল বারি,
ডুবিল হৃদয় মরু।
মমতা হিল্লোলে, ছুটিল লহরী,
আমরি মাধুরী চারু।
হায়রে নিমিষে সকল(ই) বিলীন
হেন উৎস মনোহর।
সংযম তপস্যা, জ্ঞান দিন করে,
শুষ্ক মায়া-সরোবর।
কামনা আহুতি, প্রদানিতে ত্বরা
সেই তরুতলে বসি।
রহিল সন্ন্যাসী, সাধনা-সমরে,
দিন যায় আসে নিশি।
হায় কতজন, সন্ন্যাসী সমীপে,
আপন ভবিষ্য কথা
জানিবার তরে আকুলে কহিল,
পরশি মরমে ব্যথা।
একদিন মরি, ভাতিছে নীলিমে
সুরম প্রকৃতি ছবি।
গোধূলি ললাটে কনকের ফোঁটা
অস্তমুখগত রবি।
সে রূপ প্রতিভূ এক কুলবধূ
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু।
শোভিছে মোহন সন্ধ্যাদেবী কিবা
যামিনী বিলয়ে ইন্দু।
পিঙ্গল মলিন রুক্ষ কেশজাল,
লম্বিত নিতম্ব দেশে।
করুণা মুরতি কল্পনা চিত্রিত
মরমস্পর্শিনী বেশে।

উড়িছে আঁচল, কাঁপিছে মূরতি
বুঝিবা পরাগ দল।
বিচ্যুত লতিকা নিথর চলিছে
লুটায়ে ধরণীতল।
আইল ললনা সেই তরুতলে
বুঝিবা অনিলভরে।
হেরি সে মূরতি নিমিষে সন্ন্যাসী
কাঁপিল কি মায়া-ডোরে।
প্রণমিল সতী সন্ন্যাসী চরণে
ভকতি-পূরিত-প্রাণে।
কহিল কাতরে করপুট করি
বীণার বাদন তানে।
"বিংশ বর্ষ আজ গিয়েছেন স্বামী
কঠোর সন্ন্যাস ধরি।
আর কি জনমে তাঁরি পদযুগ
হেরিবে তাঁহার নারী।
জানিছি হৃদয়ে জীবিত আছেন
আমার দেবতা পতি।
দুঃখিনী লাগিয়া ফিরিবে না গেহে
সংসারে বিরাগ মতি।
এ সংসার ত্যজি সন্ন্যাস সংসার
পাতিল সাধিয়ে ব্রত।
একাকী সে পথে না জানি দেবতা
পাইল যাতনা কত।
তাঁহারি চরণে থাকিলে ভকতি
আছে কি দুঃখিনী ভালে।
সেই পদতলে লুটায়ে মরিতে
অন্তিমে মিলনকালে।
কহ না সন্ন্যাসি, ফুকলিবে কবে,
অভাগীর এই সাধ।
না জানি বিধাতা, এ পোড়া কপালে
আরো কি সাধিবে বাদ।"
নিরবিল বামা সতীত্ব-প্রভায়
সংযম তপস্যা ব্রত।
অনল পরশে কনকের সম
উজলে নিমিষে তত।
কহিল সন্ন্যাসী প্রদীপ্ত পরাণে
প্রবেশে হৃদয়ে স্মৃতি।
"সন্ন্যাস আগার সতীত্ব বিকাশ
সন্ন্যাসী সতীর পতি।
সাধনার বলে জ্ঞান ভক্তি মিলি
পূর্ণ হৃদি বিকশিত।
সে মিলনে সদা বিনাশে কামনা
আপনি আপনে স্থিত।
কি মহা জাগ্রত, জীবনের ভুলে,
ত্যজিনু অর্দ্ধেক ব্রত।
হে দেবি পূর্ণত্বে মিলাইলে আজি
দোঁহা হৃদি একীভূত।"
নিরবিল যোগী প্লাবিল ভকতি
বিশুদ্ধ হৃদয় ভরি।
কেবলি ভকতি আত্মা উপাসনা
জ্ঞানেতে সংস্কার করি।
অমনি লুটিল সে প্রেম-লতিকা
সন্ন্যাসীর পদতলে।
বাজিল কাকলি ফুটিল কুসুম
বহে নদী কলকলে।
কেহ কেহ কহে সেই চারু সতী
হয়েছে সন্ন্যাসী ছায়া।
সুরপুরে যেতে কেহ বা দেখিল
ত্যজিয়ে মরত কায়া॥

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু।

বসন্ত।

আম্র বিটপ 'পরি, বসি বসি মরি মরি,
পিককুল পঞ্চম উগরে।
সহবধূ মধুকর, উড়ি উড়ি ফুল প'র,
পিয়ি মধু উড়ি পুন বিহরে॥
বিহরি মলয় গিরি, মলয়জ পরিহরি,
অনিল বহিল লভি গন্ধ।
সুরভি কুসুমদল, উগরিল পরিমল,
মধুপ হইল বুঝি অন্ধ॥
সভয় হৃদয় হই, হিম ঋতু হিম লই,
হিমগিরি আশ্রয় লইল।
প্রখর দিবসকর, দিনভরি নিজ কর,
বরষি শয়নতল লভিল॥
দয়িত চলিল বুঝি, নয়ন বুজিল বুঝি,
নলিন যুবতি সর উপরি।
নবকিসলয় দল, অলপ চপল হল,
মৃদুল অনিল ঘন বিতরি॥
শান্ত ভুবনতল, ফুল্ল কুসুমদল,
বরষিল সুন্দর গন্ধ।
উনমত্ত অলিকুল, ফুলমুখ চুম্বিল,
হইল কুসুম পরিবন্ধ॥
বিমল গগন প'রি, ঝক্ ঝক্ ঝক্ করি,
বিহসিত উড়ুগণ উদিল।
স্মিতমুখ শশধর, গগন-সমিতি প'র,
বসি কর বরিষণ করিল॥
টল টল জল প'রি, চল চল মরি মরি,
বিহসিত কুমুদ কদম্ব।
নিরখি নয়ন ভরি, সকল দুখ বিস্মরি,
মুগধ ভুবন অবিলম্ব॥
জাগ্রত রতিপতি, মূর্চ্ছিত পথিপতি,
উপগত সরস বসন্ত।
বল বল সহচরি, কি করি কি করি হরি,
মধুপুরি রহিল ঘুমন্ত॥

শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী।

বর্ষশেষ।

সেই বৈশাখের শুভ পবিত্র প্রভাতে,
হে বরষ! নব গুল্ম-লতা আভরণে,
সুগন্ধি কুসুমপুঞ্জে, ভ্রমর-গুঞ্জনে,
এসেছিল বাণীকুঞ্জে, কোকিল কূজনে—
তোমার সে সুমধুর আগমন-উষা।
কিছুদিন বাল্যক্রীড়া হ'ল সমাপন;
পরে যৌবনের তব তীক্ষ্ণ-গ্রীষ্মতেজে
কত রত্ন উদগারিল সাহিত্য ভাণ্ডার।
আসি প্রৌঢ়া অবসন্না বরষা তোমার—
কাঁদাইল কত দুঃখী বিরহীর প্রাণ!
স্বদেশের কত রত্ন তার আঁখি জলে,
ডুবিলরে অন্তিমের অনন্ত সলিলে।
তারপর জরা তব শীত বিভীষণ,
আসিয়া কহিয়া গেল যেন একবার—
কত কলা, শিল্প, তত্ত্ব হ'ল আবিষ্কার?
হে বরষ! আজি তুমি শত কীর্ত্তি ফেলে
ডাকিয়া ধূসর সন্ধ্যা তনু আবরিলে?
সকলি আমার যেরে, সবে এক টান,
তোমারে বিদায় দিতে তাই কাঁদে প্রাণ।
হে বরষ! সংহিতার বন্ধু পুরাতন,
দেখা দিও, ফিরে যেন পাই দরশন।
বর দিয়া বাঙ্গালীরে—ঘুচাও বিদ্বেষ—
ঘরে যাও, তবে চৈত্র, ওহে বর্ষশেষ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

১৩১৩ সালে সাহিত্য-সংহিতার বিনিময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছে।

১। উদ্বোধন। ২। বসুমতী। ৩। জন্মভূমি। ৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ৫। নব্যভারত। ৬। বঙ্গদর্শন। ৭। পন্থা। ৮। সঞ্জীবনী। ৯। হিতবাদী। ১০। সময়। ১১। ভারতী। ১২। East Dacca. ১৩। Education Gazette. ১৪। হিন্দু পত্রিকা। ১৫। ঢাকা প্রকাশ। ১৬। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ। ১৭। মোসলমান। ১৮। শিল্প সাহিত্য। ১৯। বান্ধব। ২০। স্বদেশ। ২১। দারোগার দপ্তর। ২২। আরতি। ২৩। মেদিনী বান্ধব। ২৪। ঢাকা গেজেট।

১৩১৩ সালে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ সাহিত্য-সভার পুস্তকালয়ে উপহারস্বরূপে প্রদান করিয়াছেন।

	পুস্তকের নাম		গ্রন্থকারের নাম।
১।	যুবতী-জীবন	... ...	শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।
২।	Early History and Growth of Calcutta	...	Raja Binaya Krishna Deb Bahadu
৩।	Religion of the Hindoos	...	Babu Dhirendra Nath Pal.
৪।	কিরাতার্জ্জুন	... ...	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, এম. এ. বি. এল।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বঞ্চিল বাসর রাতি, সন্তান জন্মিল তথি,
দুই চারি মাস নিবড়িল।
নয় মাসে সাদ খায়, দশ মাস গেল প্রায়,
শুভদিনে প্রসব হইল॥
ভূমিষ্ঠ হইল বালা রূপে ঘর কৈল আলা,
নাভি আসি কাটি দিল দাই।
সুখে হরষিত মন, বাপের পরাণ ধন,
আনন্দে হইল ধাওয়া ধাই॥
সোনার খাড়ু চরণে, রাঙ্গা ধড়া পরিধানে,
উভ চূড়া চাঁচর চিকুর॥
তাড় বালা পরাইল, সাদ করি মায়ে দিল,
গোরোচনা কপালে সিন্দুর॥
অনেক সাধের ছেলে, শিশু সঙ্গে বুলে খেলে,
লুইচন্দ্র ঘরে নাহি রয়
নগরে বালক সাথে, ধনুক বাঁটুল হাতে,
কাননে ফিরয় নিরন্তর।
অবিরত পক্ষী মারে, বল্লুকা নদীর তীরে,
লুইচন্দ্র দিল দরশন।
পরিসর বটবৃক্ষ, বোসেছে অনেক পক্ষ,
উল্লুক বোসেচে আগ ডালে।
ধর্ম্মের বহিল পাখী, মেঘের বরণ দেখি,
বাঁটুল ছুঁড়িল হেনকালে॥
লক্ষ্মণ পড়িল শেলে, হনুমান যেই কালে,
গন্ধমাদন লইয়া পর্ব্বত।
অযোধ্যা উপরে যান, দেখি বীর হনুমান,
যেন বাঁটুল ছুঁড়িল ভরত॥
ছুঁড়িল বাঁটুল তাকে, বাজিল পক্ষের বুকে,
হুহুঙ্কার শব্দ গরজন।
বাজিল বজ্রের প্রায়, গগনে উলট খায়,
পক্ষিরাজ হোল অচেতন॥
বাঁটুলে দারুণ ব্যথা, মুখে না নিঃসরে কথা,
অভিশাপ পক্ষ দিল তারে।

মোরে দুঃখ দিলে যত, হরিশ্চন্দ্র নৃপসুত,
পেড়ো তুমি ধর্ম্মের খর্পরে॥
উড়িয়ে বৈকুণ্ঠ পানে, চলিল ধর্ম্মের স্থানে,
মহাপক্ষ উল্লুক বাহন।
ধর্ম্মের নিকট গিয়া, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া,
কোলে করি নিল নিরঞ্জন॥
কহ পক্ষ নিবেদন, কেন হোলি অচেতন,
পক্ষ বলে শুন ধর্ম্মরাজ।
বল্লুকা তীরেতে গেলাম, বাটুলের মার খেলাম,
বাঁচিয়ে এলাম তোমার কৃপায়॥
হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার, লুইচন্দ্র পুত্র তার,
বেঁধেছিল আমার পরাণ।
ধর্ম্মরাজা বলে ভাল, মনেতে পড়িয়ে গেল,
লুয়্যা বটে আমার মানান॥
উল্লুক বলেন যাহ, হরিশ্চন্দ্র পূজা লহ,
কর যাত্রা অযোধ্যানগর।
ব্রহ্মচারী বেশ ধরি, চল ধর্ম্ম-অধিকারী,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন।

পক্ষরাজ উল্লুকের শুনিয়া বচন।
ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি হল ব্রহ্ম সনাতন॥
গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা জুড়িয়া কপাল।
কমণ্ডলু কুশাসন নিল ব্যাঘ্রছাল॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা অরুণ বসন।
হরিশ্চন্দ্র ভূপতিকে ছলিতে গমন॥
হনুমান সঙ্গে রথে গমন করিল।
পৃথিবীতে অযোধ্যায় নামিয়া আসিল॥
রথ লয়ে শূন্য পথে হনুমান রয়।
অযোধ্যানগর এল দেব জ্যোতির্ম্ময়॥
ময়ূরপুচ্ছ-ছায়নী সুবর্ণ ছাতা মাথে।
গজেন্দ্র গমনে যান আশা বাড়ি হাতে॥

অমরাবতীর রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়।
বসতি দেখিল যেন নিজ রাজ্যপ্রায়।
গীত নৃত্য কত ঠাঁই ধর্ম্মের গাজন।
চারিদিকে বিরাজিছে সকল ব্রাহ্মণ॥
দুসারি সহর মাঝে সাধু সদাগর।
অমূল্য রতন বিকে চন্দন চামর॥
রামের নগর যেন অযোধ্যা-বসতি।
রাজার দুয়ারে গিয়া হোল উপনীত॥
দুয়ারে দুয়ারি ছিল নাম সিংহরায়।
ব্রহ্মচারী দেখিয়া প্রণাম করে পায়॥
ঠাকুর বলেন তুমি শুন হে দুয়ারি।
কহ গিয়া রাজাকে দুয়ারে ব্রহ্মচারী॥
খুঁজিলাম দস্তর মেলা আদি সত ঠাঁই।
আজি কেন রাজা বা রাম দেখি নাই॥
বড় দাতা হরিশ্চন্দ্র বলে সর্ব্বজন।
দেখিতে রাজাকে এলাম অমরা ভুবন॥
বলে সিংহরায় শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
রাত্রে যাব কেমনে রাজার অন্তঃপুর॥
রাজার অতিথিশালা দক্ষিণ দুয়ারে।
সিধাপত্র লহ গিয়া রন্ধনের তরে॥
অন্নশালে অন্ন আছে ব্রাহ্মণ রাজন্।
যদি ক্ষুধা আছে গোঁসাই করহ নামন॥
না হয় কিছু ভিক্ষা লহ, তাহা দিতে পারি।
ধর্ম্ম বলে নহি আমি তেমন ভিখারী॥
অন্নক্ষুদ্ধ বাছা আমি নই কোন কালে।
না বসি আপন জ্ঞানে অতিথির শালে॥
দিবানিশি একা বসি নাই মায়া ভয়।
কেবল ভক্তের মাত্র ভকতি আশ্রয়॥
না লব তোমার দান নই পেটাতুর।
আমার বচনে যাও রাজ-অন্তঃপুর॥
হরিশ্চন্দ্র ভূপতির ভকতি বুঝিব।
লুইচন্দ্র কোঙারে আশীষ করে যাব॥
দুয়ারী ভাবিল, তবে দ্বিজের বচনে।
রাজার দুয়ার ছেড়ে যাইব কেমনে॥
নাহি গেলে ব্রহ্মশাপে সর্ব্বনাশ হয়।
যোড় হাতে দুয়ারী দ্বিজের কাছে কয়॥

আপনি দুয়ারে বোস সন্ন্যাসী গোঁসাই।
সমাচার দিতে যাই ভূপতির ঠাঁই॥
এত শুনি বাঘছাল ফেলিয়া সত্বরে।
নারায়ণ বেশে যেন বলীর দুয়ারে॥
সিংহরায় গেল রাজার অন্দর মহল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদি মঙ্গল॥
সিংহরায় গেল যদি রাজার হুজুর।
যোড় হাতে সবিশেষ বলিল মধুর॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ এক বসিয়া দুয়ারে।
আশীষ করিতে চায় সাক্ষাতে তোমারে॥
কত রূপ ধরেন বলিতে নাহি পারি।
খেলে দ্বিজ দরিদ্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী॥
সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণে বড় দেখিলাম সাক্ষাৎ।
অন্দর দলিজে আন বলে মহীনাথ॥
এত শুনি দুয়ারী কহিল গিয়া দ্বিজে।
শুভ হক্ মহাশয় অন্দর দলিজে॥
গা তুলিয়া দ্বিজবর দলিজে গমন।
অষ্টাঙ্গ লুটায় রাজা দেখিয়া ব্রাহ্মণ॥
পূজিল ব্রাহ্মণে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনে।
স্তব করে নৃপতি বসিয়ে ধরাসনে॥
ব্রাহ্মণ মহিমা বড় বেদে দিতে নারে।
দ্বিজ রূপে নারায়ণ ভ্রমেণ সংসারে॥
অনেক তপস্যাতে মনুষ্যজন্ম হয়।
কতশত ভাগ্যে জন্মে ব্রাহ্মণতনয়॥
জ্ঞানবান্ তাহাতে আপনি তীর্থবাসী।
কাটিয়ে সংসার-মায়া হোয়েছ সন্ন্যাসী॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র বাসর।
কি কার্য্যে আইলে তবে কহ দ্বিজবর॥
হরিশ্চন্দ্র বচনে বলেন নিরঞ্জন।
আমার দুঃখের কথা শুনহে রাজন্॥
দয়াতে আমার জন্ম রজঃ সত্বগুণে।
ভাই বন্ধু মাতাপিতা নাহি ত্রিভুবনে॥
সেই ঘর আমারে যে জন দয়া করে।
বহু দিন থাকি আমি বল্লুকার তীরে॥
একাদশী কালি গেছে শুনেছ রাজন্।
ভ্রমিলাম অনেক দেশ করিতে পারণ॥

পারণা করিতে আমি যার ঘর যাই।
আমার নিয়ম শুনে হাসেন সবাই॥
পারণা উত্তীর্ণ হল বেড়াতে বেড়াতে।
পারিবে নারিবে রাজা কহিবে সাক্ষাতে॥
হেঁট মাথা কোরে রাজা কিবা মনে ভাব
এসেছি অনেক আশে পারণ করিব॥
রাজা বলে ত্রাস লাগে শুনিয়া বচন।
পারণা-সময়ে প্রভু নিয়ম কেমন॥
নিয়ম কেমন প্রভু আজ্ঞা কর দেখি।
দ্বিজ বলে পারণাতে মাংস খেয়ে থাকি।
পারণা সময়ে ভাল মাংস ঝোল ঝাল।
মাংস রেঁধে ভোজন করাও মহীপাল॥
তুমি দাতা হরিশ্চন্দ্র অমরা ভিতর।
তোমা বিনে কেবা করে দ্বিজের আদর॥
রাজা হরিশ্চন্দ্র বলে করাব ভোজন।
প্রাণ যায় যাক্ মোর দ্বিজের কারণ॥
মাংস দিব অঙ্গীকার করিয়া সাক্ষাৎ।
মদনা রাণীর কাছে গেল মহীনাথ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে শুন মদনা প্রেয়সী।
কোথা হোতে এল এক ব্রাহ্মণ তপস্বী॥
একাদশী ব্রতে চায় মাংসের পারণ।
অঙ্গীকার করে এলাম দ্বিজের সদন॥
আয়োজন করহ শীকার করে আসি।
বচন শুনিয়া কাঁদে মদনা রূপসী॥
কেন রাজা অঙ্গীকার করিলে ব্রাহ্মণে।
রাজা হয়ে এ কথা বুঝিতে নার মনে॥
একাদশী পারণাতে মাংসের ভোজন।
কোন্ শাস্ত্রে আছে রাজা এমন লিখন॥
এইরূপে কর্ণ দিল অক্ষয় কবচ।
এইরূপে অর্দ্ধ অঙ্গ দিল ময়ূরধ্বজ॥
এইরূপে বলি রাজা গেছেন পাতাল।
কোন্ দেব ছলিতে এসেছে মহীপাল॥
সর্ব্বনাশ হল রাজা আর দেখ কি।
ব্যাকুল হইল বড় মান্ধাতার ঝি॥
কোন্ মাংস খান দ্বিজ জানিব কেমনে।
জিজ্ঞাসিতে রাজা রাণী গেল দুইজনে॥

পায়রা পক্ষড় পক্ষ বালকড়া হাঁস।
আজ্ঞা হক্ গোঁসাই খাইবে কোন মাস॥
তার মত আয়োজন করিবারে চাই।
ঠাকুর বলেন, আমি মহামাস খাই॥
পারণা সময়ে খাই মনুষ্যের মাস।
শুনিয়া নৃপতি রাণী ভাবিল তরাস॥
পুত্র বলিদান দিয়া করহ সন্তোষ।
নাশিব তোমার কোটি জনমের দোষ॥
বেটা তোমার লুইচন্দ্র আমার মানন।
বেটা কেটে রাঁধ রাণী করিব পারণ॥
রাজা রাণী চাওয়া চাই করে দুইজনে।
বল্লুকার সন্ন্যাসী পড়িয়া গেল মনে॥
চরণে ধরিয়া তবে রাজা রাণী কয়।
দারুণ বচন ক্ষমা কর মহাশয়॥
পুত্র কেটে কেমনে মা বাপ হয়ে দিব।
বিষ খেয়ে তবে মোরা দুজনে মরিব॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ভাবি শঙ্খাসুর।
ভক্ত নায়কেরে দয়া না ছাড় ঠাকুর॥
মানুষে মানুষ খায়, কোথাও না শুনি।
চমৎকার বাক্য শুনে রাজা আর রাণী॥
রাণী বলে লুইচন্দ্র আমার জীবন।
আমারে কাটিয়া মাংস করহ পারণ॥
রাজা বলে প্রাণ দিব পুত্রের বদল।
অনেক সাধের মোর কনক কমল॥
রাজা রাণী সদনে বলেন নিরঞ্জন।
বেটা কেটে কর রাণী ব্রাহ্মণ ভোজন॥
জঠর জ্বালায় আর না দেখি নয়নে।
লুইচন্দ্র আনহ আমার বিদ্যমানে॥
ছাড়হ প্রলাপ-কথা কোপ কর দূর।
ব্রাহ্মণ ভোজনে রাজা না হও নিষ্ঠুর॥
আশ্বাসিয়া আমারে রাখিলে নিজালয়।
বেটা আন রাজন্ বিলম্ব নাহি সয়॥
পুত্র বলিদান দিয়া রাখ নিজ পুর।
হরিশ্চন্দ্র বলে প্রভু কোপ কর দূর॥
অবধানে শুনহে ব্রাহ্মণ উদাসীন।
লুইচন্দ্র ঘরে নাই হল অনেক দিন॥

যথা ইচ্ছা যায় তথা নাহি বসে ঘরে।
পড়িতে রেখেছি লয়ে মাতুল মন্দিরে॥
হস্তিনা নগরে সে যে করে অধ্যয়ন।
ঠাকুর ভাবিত হল শুনিয়া বচন॥
সঙ্কেত করিয়া যে পবনে আদেশিল।
লুইচন্দ্র আনিবারে পবন চলিল॥
ধর্ম্মের কিঙ্কর লয়ে রাজার নন্দন।
হস্তিনা নগর ত্যজি করিল গমন॥
পাতপুঁথি সঙ্গে খড়ি পড়ুয়ার বেশে।
অমরানগর এল আঁখির নিমেষে॥
যেখানেতে বসিয়া ঠাকুর নিরঞ্জন।
পিতা মাতা সেইখানে দেখিল তখন॥
তিন ধর্ম্ম এক ঠাঁই দেখিয়া নয়নে।
দণ্ডবৎ করিতে ভাবেন মনে মনে॥
গর্ভধারিণী জননী পোষণ পালনে।
এ বড় গরিষ্ঠ কথা বলে মুনিগণে॥
মহাগুরু জননী লিখন বটে দড়।
মাতা হোতে পিতা গুরু দশগুণে বড়॥
পরাৎপর সভাতে বসিয়ে ধর্ম্মরায়।
সবা আগে প্রণাম করিব কার পায়॥
পিতা মাতার চরণে রাখিয়া দুই হাত।
ধর্ম্মের চরণে লুই হল প্রণিপাত॥
লুইচন্দ্র দেখিয়া বিস্ময় মনে গণি।
হরিশ্চন্দ্র কান্দেন মদনা পাটরাণী॥
কাঁদিয়া মদনা যে কপালে মারে হাত।
কোথা পেলে ধর্ম্মরাজ ত্রিদশের নাথ॥
দেখিয়ে পুত্রের মুখ পরাণ বিদরে।
কেন ধর্ম্ম বর দিলে বল্লুকার তীরে॥
কঠিন হৃদয় দ্বিজ এল কোথা হোতে।
মাংস খেতে চায় একাদশী পারণাতে॥
পাত পুঁথি ভূমে রাখ এস করি কোলে।
কি জানি দারুণ বিধি লিখিল কপালে॥
কার বোলে এলে বাছা দ্বিজের সদন।
তোমারে খাইতে চায় রাক্ষস ব্রাহ্মণ॥
এত বলি মদনা বদনে চুম্ব খায়।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়॥

রাজা বলে সত্যে বদ্ধ করিল ব্রাহ্মণ।
কেমনে কাটিয়া দিব কোলের নন্দন॥
ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া রাজা কাঁদে।
মদনা ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে নানা ছাঁদে॥
অভাগীর মুখ চাহি ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
পুত্র দান দিয়া রাখ আমার জীবন॥
বাছার মরণে মোর প্রাণ নাহি রয়।
আমারে কাটিয়ে মাংস খাহ মহাশয়॥
এত শুনি ক্রোধযুত হল দ্বিজবর।
বেটা লয়ে তোমরা আনন্দে কর ঘর॥
গা তুলিয়া যান দ্বিজ নৃপে ক্রোধ করি।
রাজা রাণী বসালেন হাতে পায়ে ধরি॥
লুইচন্দ্র বলে পিতা কর অবধান।
এই দ্বিজ আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্॥
যদি মোর মাংস খেতে চান মহাশয়।
ব্রাহ্মণের আশা ভঙ্গ ভাল কর্ম্ম নয়॥
ব্রাহ্মণের মহিমা বড় পুরাণে লিখন।
নারায়ণে পদাঘাত করিল ব্রাহ্মণ॥
শ্রীবৎস করিয়ে বক্ষে নিল ভগবান্।
যেই হরি সেই দ্বিজ ইথে নাহি আন॥
যে জন বঞ্চিত করে ব্রাহ্মণের সুখে।
সেই জনা নরাধম পুরাণেতে লেখে॥
যদি মাংস খেতে চান, না কর নৈরাশ।
আমারে কাটিয়ে পূর ব্রাহ্মণের আশ॥
হরিশ্চন্দ্র কাঁদে শুনে সুন্দরী মদনা।
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করিল বর্ণনা॥
প্রাণ নাহি রহে যে পুত্রের কথা শুনি।
ব্রাহ্মণের পায়ে ধরি কাঁদে রাজা রাণী॥
দেহ মোরে পুত্র দান ব্রাহ্মণ গোঁসাই।
লুইচন্দ্র বিনে আর পুত্র কন্যা নাই॥
কেমনে কাটিয়ে দিব প্রাণ মোর ফাটে।
কত দুঃখ বিধি হায় লিখিল ললাটে॥
রাজ্য দেশ লহ প্রভু রত্ন সিংহাসন।
ভিক্ষা মাগি খাব হাটে লইয়া নন্দন॥
মদনা-মহিষী কাঁদে আকুল কুন্তলে।
দাসী হয়ে রব প্রভু চরণকমলে॥

পুত্র দিয়ে প্রাণ রাখ বলেন মদনা।
ত্রিভুবনে হবে তব যশের ঘোষণা॥
রাণীর বচনে ধর্ম্ম মায়াতে মোহিত।
সক্রোধে কহেন নহে অন্তর সহিত॥
যদি না কাটিবে পুত্র আমার সাক্ষাৎ।
তবে কেন বাক্যদত্ত হোলে মহীনাথ॥
একাদশী পারণাতে জঠর জলন।
বিমুখ করিলে তবে না দিলে নন্দন॥
মোর মায়া ত্যজ মাতা লুইচন্দ্র বলে।
পাইবে শতেক পুত্র ধর্ম্মপথে র'লে॥
আমারে কাটিয়ে দাও দ্বিজের পারণে।
স্বর্গবাসী হবে মাতা তুষিলে ব্রাহ্মণে॥
আমন্ত্রণ করে যদি না দাও ভোজন।
অধোগতি সে জনার নরকে গমন॥
যোড়হাতে কয় শিশু অতি প্রিয় বাণী।
নানারূপে প্রবোধিল জনক জননী॥
না কর বিলম্ব কষ্ট পান তীর্থবাসী।
তৈল আমলকী দাও স্নান করে আসি॥
ধর্ম্মপূজা কর রাজা হয়ে এক মন।
আমাকে কাটিয়ে তোষ বিদেশী ব্রাহ্মণ॥
চরণ পাখালি মাথে হরিদ্রা আমলা।
সরোবরে স্নান করে লুইচন্দ্র আলা॥
স্নান করি সানন্দে তর্পণ সমাধিয়া।
ধর্ম্মপদ ভাবে শিশু সূর্য্য-অর্ঘ্য দিয়া॥
ধন্য তুমি ঠাকুর অনন্ত ভগবান্।
তুলা দিতে নাহি পাপী আমার সমান॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি বিচার তোমার হাত।
পরিণামে উদ্ধারিও ত্রিদশের নাথ॥
স্নান করি লুইচন্দ্র রাজার নন্দন।
উপনীত হল গিয়া ব্রাহ্মণ সদন॥
সুবেশ হইলা পরি বস্ত্র অলঙ্কার।
অঙ্গেতে চন্দন চুয়া গলে পুষ্পহার॥
তা দেখিয়া ঈষৎ হাসেন ধর্ম্মরাজা।
হরিশ্চন্দ্র বিধিমত কৈল ধর্ম্মপূজা॥
ধূপ ধুনা ঘটাতে হইল অন্ধকার।
রাণী সঙ্গে নৃপতি পূজিল চরণ তার॥

আত্মপূজা মদনা দিলেন সাবধানে।
একান্ত মনেতে ভাবে ধর্ম্মের চরণে॥
তুলসী ত্রিপত্র দিল কুমার উপরে।
মহাবাক্যে উৎসর্গ করিল লুইধরে॥
খড়্গপূজা করে রাজা প্রাণ ধরে নয়।
কৃতাঞ্জলি নৃপতি ব্রাহ্মণ কাছে কয়॥
পুত্রমায়া দূরেতে রাখিয়া রাজারাণী।
খড়্গহস্তে লুইচন্দ্রে কাটহ আপনি॥
তুমি ত্যজিয়াছ মায়া আমরা সংসারী।
রাজার বচন শুনি হাসে ব্রহ্মচারী॥
আর কে কাটিবে এসে তোমার তনয়।
আপনি কাটিবে রাজা এ কথা নিশ্চয়॥
নিজপুত্র কাটিতে বিষাদ যদি ভাব।
পুত্রবধ-ভাগী হবে আমি না রহিব॥
খড়্গ ধরি এক কোপে কাটহ তনয়।
মুণ্ড ধরি মদনাসুন্দরী দিক্ জয়॥
প্রাণ বিদরিয়া যায় এ কথা শুনিতে।
কেমনে কাটিব পুত্র আপনার হাতে॥
নিদারুণ বচন শুনিতে প্রাণ ফাটে।
পিতা হোয়ে কে কোথা আপন পুত্র কাটে
কেন পুত্র বর দিল অনাস্থ গোঁসাই।
আমার সমান পাপী পৃথিবীতে নাই॥
খড়্গ হাতে করিতে সঘনে অঙ্গ কাঁপে।
সন্ন্যাসী সম্মুখে লুইচন্দ্র ধর্ম্ম জপে॥
সাহস করিয়া চোট ওসারে নিদান।
স্কন্ধমুণ্ড লুয়ার হইল দুইখান॥
অবনী লোটায় মুণ্ড ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে।
জয়ধ্বনি মদনা করিল হেনকালে॥
লুইচন্দ্র পুত্রকে কাটিয়ে দিয়া বলি।
রাজা রাণী শোকে হল চিত্রের পুতুলী॥
পুত্রশোক বিনে দুঃখ নাহি ত্রিভুবনে।
দশরথ নৃপতি শুনেছি রামায়ণে॥
রমণী বাক্যেতে রাজা পাঠাইয়া বন।
রামশোকে প্রাণত্যাগ করিল রাজন্॥
এমন দারুণ শোক রাজা রাণী সয়।
ফুকুরিয়া নাহি কাঁদে ব্রাহ্মণের ভয়॥

ক্রোধ হয়ে পাছে দ্বিজবর চলে যান।
কাতর হরিণী সম রাজা রাণী চান॥
রাজা বলে সন্ন্যাসী শুনহ মন দিয়া।
কেটে কুটে আপনি রন্ধন কর গিয়া॥
ঠাকুর বলেন, তবে করিব পারণা।
ভালরূপে রেঁধে দিক্ সুন্দরী মদনা॥
পিতামহকালে আমি না জানি রন্ধন।
ভক্ত হোলে তার অন্ন আমার ভোজন॥
কিছু কর ভাজা আর কিছু কর ঝাল।
দ্বিজ রামচন্দ্র বলে এ বড় জঞ্জাল॥

করুণা-ত্রিপদী ছন্দ।

শোকানলে প্রাণ ফাটে, কেবা কোথা পুত্র কাটে
ত্রিভুবনে না শুনি এমন।
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, আগুয়ান রাজা রাণী
মাংস কুটে করিতে রন্ধন॥
আহা মরি বাছা ওরে, কেমনে কুটিব তোরে
এত বিধি লিখেছে করমে।
মরা পুত্র কোলে লয়্যা, যায় প্রাণ বিদরিয়া
রাজা রাণী মরিয়া মরমে॥
মাংস কুটি মহারাজা, কাটিল অস্থির মজ্জা
দ্বিজবর ক্রোধ করে পাছে।
খরতর তীক্ষ্ণ ধারে, কাটিয়া কুটিয়া সারে
অবশেষ মুণ্ড মাত্র আছে॥
দারুণ ব্রাহ্মণ তরে, ফুকারে কাঁদিতে নারে
রাণী ভাবে মুণ্ড করি কোলে।
দেখি বাছার মুখশশী, কাঁদিব বিরলে বসি
রাখে মুণ্ড মরাইএর তলে॥
তাহে দিল ঝুড়ি চাপা, সুখেতে ঘুমায় বাপা,
অভাগীকে লহ সম্বরিয়া।
ভাবিয়া তোমার গুণে, অন্তর জারিল ঘুণে,
পাপ প্রাণ না যায় ছাড়িয়া॥
রন্ধনের দ্রব্য যত, আয়োজন করি ক্রত,
পাকশালে করিয়ে যতন।
স্নান করি গঙ্গাজলে, এলেন রন্ধনশালে,
এক মনে ভাবি নিরঞ্জন॥
চরণ পাখালি রাণী, পরিল পবিত্র ভুনি,
ত্রিভাগ করিল মাংস যত।
উননে অনল জ্বালি, বসাইল পাকস্থলী,
হুতাশনে হয়ে দগ্ধবৎ॥
মদনা রন্ধন করে, পরাণ ধরিতে নারে,
পুত্রশোকে হইয়ে বিকল।
স্বর্ণ থালে মাংস থুয়ে, হরিদ্রা লবণ দিয়ে,
আঁশানি মারিয়া দিল জল॥
মরি বাছা মরি মরি, পরাণ ধরিতে নারি,
ঘৃত দিয়া ভাজিল আঁতুড়ি।
না কাঁদে ব্রাহ্মণ ভয়, শাকাদি ব্যঞ্জন ছয়,
শশা মূলা ভাজে ফুলবড়ি॥
চৌদিকে কোটরা পুরি, শাল্যন্ন রন্ধন করি,
বাড়ে থালে সুন্দরী মদনা।
না পারে ধরিতে বুক, পাখালিয়া হস্ত মুখ,
ধর্ম্মরাজে করিল ভাবনা॥
মার্জ্জনা করিয়ে স্থল, রাখিল আসন জল,
মহামুনি করিবে ভোজন।
নিবাস মল্লের দেশে, নিরঞ্জন অভিলাষে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥

অন্ন ব্যঞ্জন বাড়ি মদনা সুন্দরী।
আচ্ছাদন স্বর্ণ থাল দিল তদুপরি॥
রাজাকে বলিল রাণী করিয়া রন্ধন।
আনহ ব্রাহ্মণে ডেকে করিতে ভোজন।
এত শুনি ভূপতি ব্রাহ্মণে গিয়া কয়।
অন্ন হল গোঁসাই বিলম্ব নাহি সয়॥
যোড়হাতে বলে হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
আশা বাড়ি ঐখানে রাখহ বাঘছাল॥
পারণ করিতে গোঁসাই করহ পয়াণ।
রাজার বচনে পা তুলিল ভগবান্॥
চলে বা না চলে পদ মাধুরী গমনে।
রন্ধনশালেতে গেলা নৃপতির সনে॥
দেখিল ব্যঞ্জন কত হয়েছে প্রচুর।
থাল থাল উপরে করহ রাণী দূর॥

মদনা লইল থাল শুনিয়া বচন।
সবাই আনন্দ হল এ তিন ভুবন॥
পরিপাটী ব্যঞ্জন ওদন অপরূপ।
ধর্ম্মরাজ বলে শুন হরিশ্চন্দ্র ভূপ॥
মহামাংস পাক হল ব্যঞ্জনের সার।
অম্বল বিহনে মুখে না পাইব তার॥
কাঁচা আমে অম্বল খাওয়াবে নৃপমণি।
রাজা বলে এ কথা অনর্থ প্রভু শুনি॥
মার্গশীর্ষ মাসে কোথা গাছে আম্র হয়।
সকল বচন তব শুনি বিপর্য্যয়॥
ক্ষমা কর প্রভু মোরে অম্বলের দায়।
ঠাকুর বলেন, শুন হরিশ্চন্দ্র রায়॥
লুইচন্দ্রের মুণ্ড আছে মরাইএর তলে।
ঢেঁকিতে কুটিয়ে দেহ আমার অম্বলে॥
দক্ষিণ দুয়ারে আছে আম্র তরুবর।
দেখেছি তাহাতে আম্র ধরেছে বিস্তর॥
রাজা বলে পঞ্চাশ বৎসর তরু মরা।
কেমনে ধরিল তাহে আম্র গাছ ভরা॥
মুণ্ড আছে লুইএর ভূপতি নাহি জানে।
বচন শুনিয়া চান মদনার পানে॥
রাণী বলে মুণ্ড আমি রেখেছিলাম বটে।
বিস্ময় ভাবিয়া দিল ভূপতি নিকটে॥
আম্র দেখিবারে রাজা তাড়াতাড়ি যান।
দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া বৃক্ষ পানে চান॥
কেহ কাঁচা কেহ পাকা কেহ বা মুকুল।
মরা গাছ মঞ্জুরিছে যেন রাসফুল॥
গোটা কত আম্র লয়ে গেল ত্বরা করি।
উত্তরিলা যেখানেতে মদনা সুন্দরী॥
অকালে আম্রের ফল দেখিয়া নয়নে।
রাজা রাণী বিস্ময় ভাবিল দুই জনে॥
ঢেঁকিতে কুটিয়া মুণ্ড রাঁধিয়া অম্বল।
স্বর্ণ থালে পরিপূর্ণ বাড়িল সকল॥
সমাচার দ্বিজবরে দিল নৃপবর।
ভোজন করিতে চলিলেন মায়াধর॥
রাজা রাণী পাখালিল দ্বিজের চরণ।
পূর্ব্ব মুখে আসনে বসিলা নিরঞ্জন॥

ঠাকুর বলেন তবে রাজা রাণী বস।
তিন জনে একত্রে ভোজন করি এস॥
তিন থালে কোরে অন্ন বাড় তিন ঠাঁই।
পারণার অন্ন খেলে বাড়ে পরমাই॥
মাংস ভাজা ভূপতিকে বাড়া করে দেয়।
ঝোল ঝাল কোটরা পুরিয়া রাণী নেয়॥
পরিপূর্ণ ব্যঞ্জন ভোজন মনোমত।
রাজা বলে গোঁসাই তোমাকে দণ্ডবৎ॥
আপনি পারণা কর মোরা কেন খাব।
রাণী বলে আর আমি ঘরে না থাকিব॥
দশ মাস দশ দিন ধরেছি জঠরে।
কেমনে পুত্রের মাংস খেতে বল মোরে॥
ত্রিভুবনে কে কোথায় পুত্র মাংস খায়।
বচন শুনিতে যে পরাণ ফেটে যায়॥
কৃতাঞ্জলি হোয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র কয়।
আপনি পারণা কর দ্বিজ মহাশয়॥
পুত্রমাংস পিতামাতা খাইব কেমনে।
উপবাসী আছ তুমি বসহে ভোজনে॥
মাংস লয়ে জলে ফেল বলেন ব্রাহ্মণ।
পারণ তোমার ঘরে না হল রাজন্॥
নাহি খাবে তোমরা এ বড় অবিচার।
ভাগ্যে সে বুঝিলাম, এত সব সমাচার॥
একলা করিব আমি মাংসের পারণা।
হেন বুঝি বিষ দিয়া রেঁধেছে মদনা॥
পুত্রকে বধিতে বুঝি দুঃখ হল মনে।
বিষ খাওয়াইয়া বুঝি বধিবে পরাণে॥
সঙ্গে বস রাজা রাণী করিতে ভোজন।
রাজা বলে অবোধ শত্রু হইল ব্রাহ্মণ॥
না করে পারণা দ্বিজ ভাল কর্ম্ম নয়।
অন্ন বাড়ে মদনা মনেতে পেয়ে ভয়॥
কলঙ্ক রহিল মোর জগৎ সংসারে।
রাক্ষসী হলাম আমি ব্রাহ্মণের তরে॥
মাংস অন্ন মদনা বাড়িল তিন থাল।
ঠাকুরের ডাহিনে বসিল মহীপাল॥
গণ্ডুষ ধরিল রাজা ভোজন করিতে।
দুহাতে ধরিল ধর্ম্ম দু জনার হাতে॥

মাংস নাহি খাও রাজা বলেন গোঁসাই।
তোমার সমান দাতা ত্রিভুবনে নাই॥
দেখিতে দেখিতে মাংস ব্যঞ্জন ওদন।
শূন্য পথে সকল হইল অদর্শন॥
বর মাগ হরিশ্চন্দ্র আমি মায়াধর।
এস গো মদনা রাণী মাগি লহ বর॥
রাজা রাণী তখন ধর্ম্মের পায় ধরে।
দরশনে মুক্ত হয় কিবা কাজ বরে॥
মদনা বলেন যদি হবে বর দান।
লুইচন্দ্র বিনে যায় বিদরিয়া প্রাণ॥
বাছা মোর লুয়্যাকে দেখাও যুগপতি।
ঠাকুর হাসেন শুনে রাণীর ভারতী॥
আমি কি তোমার বাছা বধেছি পরাণে।
দেখ গিয়া লুইচন্দ্র খেলায় গাজনে॥
গাজন দুয়ারে লুই শিশু সঙ্গে খেলে।
নাম ধরে ডাক তাকে পাইবেক কোলে॥
ধর্ম্মের বচনে রাণী গাজন দুয়ারে।
লুইচন্দ্র বাছা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোথা আছ লুইচন্দ্র বলে ডাক দিয়া।
বিদরে মায়ের প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥

গাজন দুয়ারে বসে লুইচন্দ্র ছিল।
জননীকে দেখে ফুল বনে লুকাইল॥
খিড়কী দুয়ারে গিয়ে হাসে খল্ খল্।
পাছু পানে এসে ধরে মায়ের আঁচল॥
বাহু পাশরিয়া রাণী বাছা নিল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥
বাছা কোলে করিয়া পাসরে পরিতাপ।
রাণী বলে এতক্ষণ কোথা ছিলে বাপ॥
লুইচন্দ্র বলে মাতা রাঁধ যখন তুমি।
ঠাকুরের কোলে বোসে খেলা করি আমি॥
এমন ধর্ম্মের ঠাঁই মন চাই দড়।
দুই মন করিলে বিষম হয় বড়॥
সেতাই পণ্ডিত এত কহিলা বারতা।
কর্ণসেন প্রভৃতি শুনিল এই কথা॥
রাত্রি যোগে রঞ্জাবতী শালে দিতে ভর।
রথ ভরে বৈকুণ্ঠে গেলেন মায়াধর॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়।
হরিধ্বনি করে সবে পালা হল সায়॥

ক্রমশঃ

হরিশ্চন্দ্র পালা সমাপ্ত